Barcode - 4990010044644
Title - Rabindra-Rachanabali,Khanda.13,Prabandha
Subject - Literature
Author - Tagore,Rabindranath
Language - bengali
Pages - 854
Publication Year - 1990
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 044644

सो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

081
F
VOL - 13
337459

রবীন্দ্র-রচনাবলী

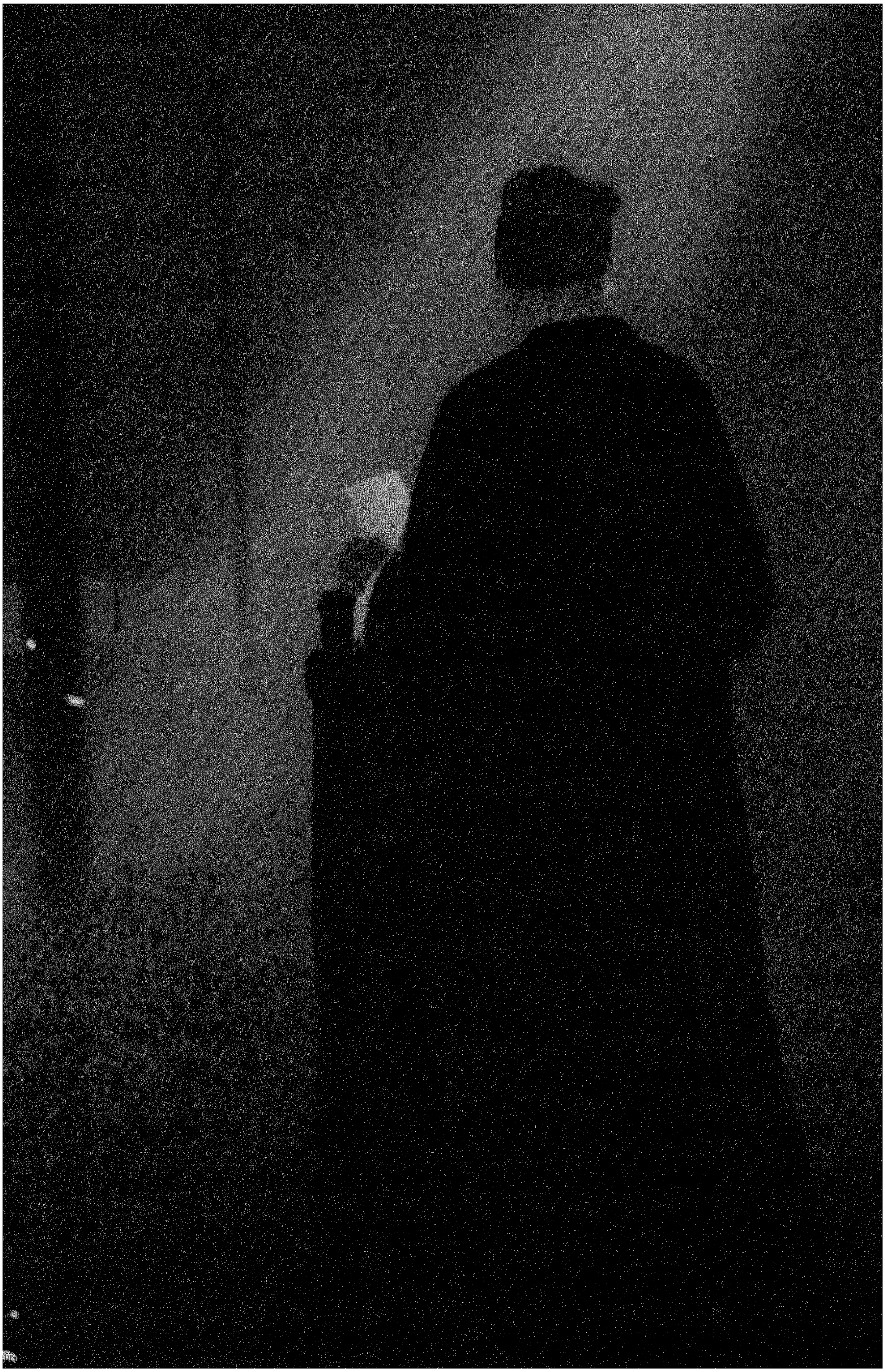

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

প্রবন্ধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৯৭
নভেম্বর ১৯৯০

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
সভাপতি

শ্রীক্ষুদিরাম দাশ
শ্রীভূদেব চৌধুরী
শ্রীনেপাল মজুমদার
শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

শ্রীভবতোষ দত্ত
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীশঙ্খ ঘোষ

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
সচিব

প্রকাশক
শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রাকর
শ্রীসরস্বতী প্রেস (১৯৮৪) লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
১১ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫৬

সূচীপত্র

নিবেদন [৭]

চিঠিপত্র ১
মন্ত্রী-অভিষেক ২৩
আত্মশক্তি ৩৫
ভারতবর্ষ ১১৩
রাজা প্রজা ১৮৫
সমূহ ২৫৭
স্বদেশ ৩৬৩
সমাজ ৩৮৩
পরিচয় ৪৮৯
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ৫৬৯
কালান্তর ৫৮৫
সভ্যতার সংকট ৭৩৩

পরিশিষ্ট

সমবায়নীতি ৭৪১
পল্লীপ্রকৃতি ৭৬১

শিরোনাম-সূচী ৮১৭

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে : ১৯১৭
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত মুখপত্র

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনকালে :
১৮৯০ ৩২

স্বদেশী আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ : ১৯০৬
সুকুমার রায়-গৃহীত আলোকচিত্র ১১২

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ও মহাত্মা
নবীন গান্ধী-গৃহীত আলোকচিত্র ৬৯৬

হিজলি-রাজবন্দী-হত্যা-প্রতিবাদসভার পথে রবীন্দ্রনাথ
কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়-গৃহীত আলোকচিত্র ৭২৪

হিজলি-রাজবন্দী-হত্যার প্রতিবাদে ভাষণদান-রত রবীন্দ্রনাথ
কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়-গৃহীত আলোকচিত্র ৭২৫

সুরুল (শ্রীনিকেতন)-এর এক সভায় (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ :
ভাষণপাঠরত ক্ষিতিমোহন সেন ৭৮৪
পুলিনবিহারী সেন-সংগ্রহ

শ্রীনিকেতনে ‘সীতাযজ্ঞ’ (হলকর্ষণ) অনুষ্ঠানের (শ্রাবণ ১৩৩৬)
ভিত্তিচিত্র ৭৯২
নন্দলাল বসু-অঙ্কিত : মাঘ ১৩৩৬

পাণ্ডুলিপিচিত্র

“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” পাণ্ডুলিপি। প্রথম পৃষ্ঠা ৫৭০

“সভ্যতার সংকট” পাণ্ডুলিপি। প্রাথমিক খসড়া
মুদ্রিত পাঠ থেকে স্বতন্ত্র ৭৩৬

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।
পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা ৭৮৫

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ ‘মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে’ না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রবীন্দ্রভবন। শান্তিনিকেতন

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মিগণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

চিঠিপত্র

প্রকাশ : ১৮৮৭

‘বালক’ পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে ‘চিঠিপত্র’-এর নয়টি নিবন্ধ প্রকাশের পর ১৮৮৭ সালে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনান্তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯০৮ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ডে ‘সমাজ’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তিকালেও রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ সম্পাদনা করেছিলেন। বর্তমান সংস্করণে প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী নিবন্ধগুলির শিরোনাম রক্ষিত।

চিরঞ্জীবেষু

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া নবীনকিশোর, এখনকার আদব-কায়দা আমার ভালো জানা নাই—সেইজন্য তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ বা চিঠিপত্র আরম্ভ করিতে কেমন ভয় করে। আমরা প্রথম আলাপে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু শুনিয়াছি এখনকার কালে বাপের নাম জিজ্ঞাসা দস্তুর নয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বাবার নাম আমার অবিদিত নাই, কারণ আমিই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলাম। ভালো নাম দিতে পারি নাই—গোবর্ধন নামটা কেন দিয়াছিলাম তাহা আজ বুঝিতেছি। তোমাকে বর্ধন করিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িবে ভাগ্যদেবতা তাহা জানিতেন। সেইজন্যই বোধ করি সেদিন ন্যায়রত্ন মহাশয় তোমাকে তোমার ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তোমার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তা, তুমিই না-হয় তোমার বাবার নূতন নামকরণ করো। আমার গোবর্ধন নাম আমি ফিরাইয়া লইতেছি।

আসল কথা কি জান? সেকালে আমরা নাম লইয়া এত ভাবিতাম না। সেটা হয়তো আমাদের অসভ্যতার পরিচয়। আমরা মনে করিতাম নামে মানুষকে বড়ো করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে। মন্দ কাজ করিলেই মানুষের বদনাম হয়, ভালো কাজ করিলেই মানুষের সুনাম হয়। বাবা কেবল একটা নামই দিতে পারে, কিন্তু ভালো নাম কিংবা মন্দ নাম সে ছেলে নিজেই দেয়। ভাবিয়া দেখো, আমাদের প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো নাম শুনিতে নিতান্ত মধুর নয়—যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু ঐ-সকল নাম অক্ষয়বটের মতো আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে। আমাদের আজকালকার উপন্যাসে ললিত নলিনমোহন প্রভৃতি কত মিঠি মিঠি নাম বাহির হইতেছে, কিন্তু এখনকার পাঠক-পিপীলিকারা এই মিষ্ট নামগুলিকে দুই দণ্ডেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে—সকালের নাম বিকালে টিঁকে না। যাহাই হউক, আমরা নামের প্রতি মনোযোগ করিতাম না। তুমি বলিতেছ সেটা আমাদের ভ্রম। সেজন্য বেশি ভাবিয়ো না ভাই—আমরা শীঘ্রই মরিব এমন সম্ভাবনা আছে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজের সমস্ত ভ্রম সমূলে সংশোধিত হইয়া যাইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি এখনকার আদব-কায়দা আমার বড়ো জানা নাই; কিন্তু ইহাই দেখিতেছি আদব-কায়দা এখনকার দিনে নাই, আমাদের কালেই ছিল। এখন বাপকে প্রণাম করিতে লজ্জাবোধ হয়, বন্ধুবান্ধবকে কোলাকুলি করিতে সংকোচ বোধ হয়, গুরুজনের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া তাস পিটিতে লজ্জাবোধ হয় না, রেলগাড়িতে যে বেঞ্চে পাঁচজনে বসিয়া আছে তাহার উপরে দুইখানা পা তুলিয়া দিতে সংকোচ জন্মে না। তবে হয়তো আজকাল অত্যন্ত সহৃদয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আদব-কায়দার তেমন আবশ্যক নাই। সহৃদয়তা! তাই বুঝি কেহ পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজ রাখে না; বিপদ-আপদে লোকের সাহায্য করে না; হাতে টাকা থাকিলে সামান্য জাঁকজমক লইয়াই থাকে, দশজন অনাথকে প্রতিপালন করে না; তাই বুঝি পিতামাতা অযত্নে অনাদরে কষ্টে থাকেন, অথচ নিজের ঘরে সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব নাই—নিজের সামান্য অভাবটুকু হইলেই রক্ষা নাই—কিন্তু পরিবারস্থ আর-সকলের ঘরে গুরুতর অনটন হইলেও বলেন 'হাতে টাকা নাই'। এই তো, ভাই, এখনকার সহৃদয়তা। মনের দুঃখে অনেক কথা বলিলাম! আমি কালেজে পড়ি নাই, সুতরাং আমার এত কথা বলিবার কোনো অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা কিছু আমাদের নিন্দা করিতে ছাড় না, আমরাও যখন তোমাদের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলি সে কথাগুলোয় একটু কর্ণপাত করিয়ো।

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তোমাকে কী 'পাঠ' লিখিব এই ভাবনা প্রথম মনে উদয় হয়। একবার ভাবিলাম লিখি 'মাই ডিয়ার নাতি', কিন্তু সেটা আমার সহ্য হইল না; তার পরে ভাবিলাম বাংলা করিয়া লিখি 'আমার প্রিয় নাতি', সেটাও বুড়োমানুষের এই খাক্‌ড়ার কলম দিয়া বাহির

হইল না। খপ্ করিয়া লিখিয়া ফেলিলাম 'পরমশুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু'। লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভাবিলাম ছেলেপিলেরা তো আমাদিগকে প্রণাম করা বন্ধ করিয়াছে, তাই বলিয়া কি আমরা তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে ভুলিব! তোমাদের ভালো হউক ভাই, আমরা এই চাই; আমাদের যা হইবার হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমাদের প্রণাম কর আর না কর আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের আছে। ভক্তি করিতে যাহাদের লজ্জাবোধ হয় তাহাদের কোনোকালে মঙ্গল হয় না। বড়োর কাছে নিচু হইয়া আমরা বড়ো হইতে শিখি, মাথাটা তুলিয়া থাকিলেই যে বড়ো হই তাহা নয়। 'পৃথিবীতে আমার চেয়ে উঁচু আর কিছু নাই— আমি বাবার জ্যেষ্ঠতাত— আমি দাদার দাদা' এইটে যে মনে করে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহার হৃদয় এত ক্ষুদ্র যে সে আপনার চেয়ে বড়ো কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। তুমি হয়তো আমাকে বলিবে, তুমি আমার দাদামহাশয় বলিয়াই যে তুমি আমার চেয়ে বড়ো এমন কোনো কথা নাই। আমি তোমার চেয়ে বড়ো নই! তোমার পিতা আমার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, আমি তোমার চেয়ে বড়ো নই তো কী? আমি তোমাকে স্নেহ করিতে পারি বলিয়া আমি তোমার চেয়ে বড়ো, হৃদয়ের সহিত তোমার কল্যাণ কামনা করিতে পারি বলিয়াই আমি তোমার চেয়ে বড়ো। তুমি না-হয় দু-পাঁচখান ইংরাজি বই আমার চেয়ে বেশি পড়িয়াছ, তাহাতে বেশি আসে যায় না। আঠারো হাজার ওয়েবস্টার ডিক্‌শনারির উপর যদি তুমি চড়িয়া বস তাহা হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নীচে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও আমার হৃদয় হইতে আশীর্বাদ নামিয়া তোমার মাথায় বর্ষিত হইতে থাকিবে। পুঁথির পর্বতের উপর চড়িয়া তুমি আমাকে নিচু নজরে দেখিতে পার, তোমার চক্ষের অসম্পূর্ণতাবশত আমাকে ক্ষুদ্র দেখিতে পার, কিন্তু আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পার না। যে ব্যক্তি মাথা পাতিয়া অসংকোচে স্নেহের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে পারে সে ধন্য, তাহার হৃদয় উর্বর হইয়া ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠুক। আর, যে ব্যক্তি বালুকাস্তূপের মতো মাথা উঁচু করিয়া স্নেহের আশীর্বাদ উপেক্ষা করে সে তাহার শূন্যতা শুষ্কতা শ্রীহীনতা— তাহার মরুময় উন্নত মস্তক— লইয়া মধ্যাহ্নতেজে দগ্ধ হইতে থাকুক। যাহাই হউক ভাই, আমি তোমাকে একশো বার লিখিব 'পরমশুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু', তুমি আমার চিঠি পড় আর নাই পড়।

তুমিও যখন আমার চিঠির উত্তর দিবে, প্রণামপূর্বক চিঠি আরম্ভ করিয়ো। তুমি হয়তো বলিয়া উঠিবে, 'আমার যদি ভক্তি না হয় তো আমি কেন প্রণাম করিব? এ-সব অসভ্য আদব-কায়দার আমি কোনো ধার ধারি না।' তাই যদি সত্য হয় তবে কেন, ভাই, তুমি বিশ্বসুদ্ধ লোককে 'মাই ডিয়ার' লেখ। আমি বুড়ো, তোমার ঠাকুরদাদা, আজ সাড়ে তিন মাস ধরিয়া কাশিয়া মরিতেছি, তুমি একবার খোঁজ লইতে আস না। আর, জগতের সমস্ত লোক তোমার এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে মাই ডিয়ার না লিখিয়া থাকিতে পার না। এও কি একটা দস্তুর মাত্র নয়? কোনোটা বা ইংরাজি দস্তুর, কোনোটা বাংলা দস্তুর। কিন্তু সেই যদি দস্তুর-মতোই চলিতে হইল তবে বাঙালির পক্ষে বাংলা দস্তুরই ভালো। তুমি বলিতে পার, 'বাংলাই কি ইংরাজিই কি, কোনো দস্তুর, কোনো আদব-কায়দা মানিতে চাহি না। আমি হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া চলিব।' তাই যদি তোমার মত হয়, তুমি সুন্দরবনে গিয়া বাস করো, মনুষ্যসমাজে থাকা তোমার কর্ম নয়। সকল মানুষেরই কতকগুলি কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যশৃঙ্খলে সমাজ জড়িত। আমার কর্তব্য আমি না করিলে, তোমার কর্তব্য তুমি ভালোরূপে করিতে পার না। দাদামহাশয়ের কতকগুলি কর্তব্য আছে, নাতির কতকগুলি কর্তব্য আছে। তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার আদেশ পালন কর, তবেই তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি ভালোরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। আর, তুমি যদি বল আমার মনে যখন ভক্তির উদয় হইতেছে না তখন আমি কেন দাদামহাশয়ের কথা শুনিব, তাহা হইলে যে কেবল তোমার কর্তব্যই অসম্পূর্ণ রহিল তাহা নহে, তাহা হইলে আমার কর্তব্যেরও ব্যাঘাত হয়। তোমার দৃষ্টান্তে তোমার ছোটো ভাইরাও আমার কথা মানিবে না, দাদামহাশয়ের কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই কর্তব্যপাশে বাঁধিয়া

রাখিবার জন্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য অবিশ্রাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সমাজে অনেকগুলি দস্তুর প্রচলিত আছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, নহিলে তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সকল মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তুরে বদ্ধ থাকিতে হয়, নতুবা তাহারা সমাজের কার্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যে গুরুজনকে তুমি প্রণাম করিয়া থাক, যাঁহাকে প্রত্যেক চিঠিপত্রে তুমি ভক্তির সম্ভাষণ কর, যাঁহাকে দেখিলে তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, ইচ্ছা করিলেও সহসা তাঁহাকে তুমি অমান্য করিতে পার না, সহস্র দস্তুর পালন করিয়া এমনি তোমার মনের শিক্ষা হইয়া যায় যে, গুরুজনকে মান্য করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে, না করা তোমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন দস্তুর সমস্ত ভাঙিয়া ফেলিয়া আমরা এই-সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। ভক্তি-স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। পারিবারিক সম্বন্ধ উল্টা-পাল্টা হইয়া যাইতেছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মিয়াছে। তুমি দাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ কর না সেটা শুনিতে অতি সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত সামান্য নহে। কতকগুলি দস্তুর আমাদের হৃদয়ের সহিত জড়িত, তাহার কতটুকু দস্তুর বা কতটুকু হৃদয়ের কার্য বলা যায় না। অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা প্রণাম করি কেন? প্রণাম করাও তো একটা দস্তুর। এমন দেশ আছে যেখানে ভক্তিভাবে প্রণাম না করিয়া আর-কিছু করে। আমরা প্রণাম না করিয়া হাঁ করি না কেন? প্রণামের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ভক্তির বাহ্যলক্ষণস্বরূপ একপ্রকার অঙ্গভঙ্গি আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহাকে আমরা ভক্তি করি তাঁহাকে স্বভাবতই আমাদের হৃদয়ের ভক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়, প্রণাম করা সেই ভক্তি দেখাইবার উপায় মাত্র। আমি যদি প্রণাম না করিয়া ভক্তিভরে তিনবার হাততালি দিই তাহা হইলে যাঁহাকে ভক্তি করিলাম তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, এমন-কি, তাহা অপমান জ্ঞান করিতে পারেন। ভক্তি দেখাইবার সময়ে হাততালি দেওয়াই যদি দস্তুর থাকিত, তাহা হইলে প্রণাম করা অত্যন্ত দোষের হইত সন্দেহ নাই। অতএব দস্তুরকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, হৃদয়ের অভাব প্রকাশ করি বটে।

অতএব আমাকে প্রণামপুরঃসর চিঠি লিখিবে, ভক্তি থাক্‌ আর নাই থাক্‌—সে দেখিতে বড়ো ভালো হয়। তোমার দেখাদেখি আর পাঁচজনে দাদামহাশয়কে ভদ্র রকমে চিঠি লিখিতে শিখিবে এবং ক্রমে ভক্তি করিতেও শিখিবে।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

শ্রীচরণেষু

শ্রীচরণকমলযুগলেষু

আরও ভক্তি চাই! যুগলের উপর আরও এক-জোড়া বাড়াইয়া দিব। দাদামহাশয়, তোমার অন্ত পাওয়া ভার, চিরকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিয়া আসিয়াছ, আর আজ হঠাৎ ভক্তি আদায় করিবার জন্য আমাদের উপর এক পরোয়ানাপত্র বাহির করিয়াছ, ইহার অর্থ কী? আমি দেখিয়াছি, যে অবধি তোমার সুমুখের এক জোড়া দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই অবধি তোমার মুখে কিছুই বাধে না। তোমার দাঁত গিয়াছে বটে, কিন্তু তীব্র ধারটুকু তোমার জিভের আগায় রহিয়া গিয়াছে। আর আগেকার মতো পরমানন্দে রুইমাছের মুড়ো চিবাইতে পার না, সুতরাং দংশন করিবার সুখ তোমার নিরীহ নাতিদের কাছ হইতে আদায় কর। তোমার দন্তহীন হাসিটুকু আমার বড়ো মিষ্ট লাগে। কিন্তু তোমার দন্তহীন দংশন আমার তেমন উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না।

তোমাদের কালের সবই ভালো, আমাদের কালের সবই মন্দ, এইটি তুমি প্রমাণ করিতে চাও।

দু-একটা কথা বলিবার আছে, তাহাতে যদি তোমাদের আদব-কায়দার কোনো ব্যতিক্রম হয় তবে আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমরা যাহা করি তাহা তোমাদের চক্ষে বেয়াদবি বলিয়া ঠেকে, এইজন্যই ভয় হয়। তোমরা চোখে কম দেখ, কিন্তু নাতিদের একটি সামান্য ত্রুটি চশমা না লইয়াও বেশ দেখিতে পাও।

যে লোক যে কালে জন্মগ্রহণ করে সে কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে কালের উপযোগী কাজ সে ভালো করিয়া করিতে পারে না। যদি সে মনে করে যে কাল গেছে তাহাই ভালো আর আমাদের কাল অতি হেয়, তবে তাহার কাজ করিবার বল চলিয়া যায়; ভূতকালের দিকে শিয়র করিয়া সে কেবল স্বপ্ন দেখে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং ভূত-ত্ব প্রাপ্ত হওয়াই সে একমাত্র বাঞ্ছনীয় মনে করে। স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভালো না বাসিলে যেমন স্বদেশের কাজ করা যায় না, তেমনি স্বকালকে ভালো না বাসিলে স্বকালের কাজও করা যায় না। যদি ক্রমাগতই স্বদেশের নিন্দা করিতে থাক, স্বদেশের কোনো গুণই দেখিতে না পাও, তবে স্বদেশের উপযোগী কাজ তোমার দ্বারা ভালোরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কেবলমাত্র কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তুমি স্বদেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। তোমার হৃদয়হীন কাজগুলো বিদেশী বীজের মতো স্বদেশের জমিতে ভালো করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তেমনি স্বকালের যে কেবল দোষই দেখে, কোনো গুণ দেখিতে পায় না, সে চেষ্টা করিলেও স্বকালের কাজ ভালো করিয়া করিতে পারে না। এক হিসাবে সে নাই বলিলেও হয়; সে জন্মায় নাই, সে অতীতকালে জন্মিয়াছে, সে অতীতকালে বাস করিতেছে; এ কালের জনসংখ্যার মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না। ঠাকুরদাদামশায়, তুমি যে তোমাদের কালকে ভালোবাস এবং ভালো বল, সে তোমার একটা গুণের মধ্যে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তোমাদের কালের কর্তব্য তুমি করিয়াছ। তুমি তোমার বাপ-মাকে ভক্তি করিয়াছ, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীদের বিপদে-আপদে সাহায্য করিয়াছ, শাস্ত্রমতে ধর্মকর্ম করিয়াছ, দানধ্যান করিয়াছ, হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ। যেদিন আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করি, সেদিনের সূর্যালোক আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, সেদিনের সুখস্মৃতি বহুকাল ধরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেকালের কাজ তোমরা শেষ করিয়াছ, অসম্পূর্ণ রাখ নাই, সেইজন্য আজ এই বৃদ্ধ বয়সে অবসরের দিনে সেকালের স্মৃতি এমন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া একালের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? ক্রমাগতই একালের নিন্দা করিয়া একালের কাছ হইতে আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমাদিগের জন্মভূমি এবং আমাদের জন্মকাল এই দুয়ের উপরেই আমাদের অনুরাগ অটল থাকে এই আশীর্বাদ করো।

গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গার অবিচ্ছিন্ন সহস্রধারে যোগ রক্ষা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পিছু হঠিয়া গঙ্গোত্রীর উপরে আর উঠিতে পারে না। তেমনি, তোমাদের কাল ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমরা কোনোমতেই ঠিক সে জায়গায় যাইতে পারিব না। এটা যদি নিশ্চয় হয় তবে সাধ্যাতীতের জন্য নিষ্ফল বিলাপ ও পরিতাপ না করিয়া যে অবস্থায় জন্মিয়াছি তাহারই সহিত বনিবনাও করিয়া লওয়াই ভালো। ইহার ব্যাঘাত যে করে সে অনেক অমঙ্গল সৃষ্টি করে।

বর্তমানের প্রতি অরুচি ইহা প্রায়ই বর্তমানের দোষে হয় না, আমাদের নিজের অসম্পূর্ণতাবশত হয়, আমাদের হৃদয়ের গঠনের দোষে হয়। বর্তমানই আমাদের বাসস্থান এবং কার্যক্ষেত্র। কার্যক্ষেত্রের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই সে ফাঁকি দিতে চায়। যথার্থ কৃষক আপনার চাষের জমিটুকুকে প্রাণের মতো ভালোবাসে, সেই জমিতে সে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বপন করে। আর, যে কৃষক কাজ করিতে চায় না, ফাঁকি দিতে চায়, নিজের জমিতে পা দিলে তাহার পায়ে যেন কাঁটা ফুটিতে থাকে, সে কেবলই খুঁত খুঁত করিয়া বলে— 'আমার জমির এ দোষ, সে দোষ, আমার জমিতে কাঁকর, আমার জমিতে কাঁটাগাছ' ইত্যাদি। নিজের ছাড়া আর সকলের জমি দেখিলেই তাহার চোখ জুড়াইয়া যায়।

সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীনকালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে। পরিবর্তনের মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, যেটুকু গুণ আছে, তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ, সেইখান হইতে রসাকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে বাড়িতে হইবে, আর-কোনো গতি নাই। যদি আমরা সত্যই জলে পড়িয়া থাকি, তবে সেখানে ডাঙার মতো চলিতে চেষ্টা করা বৃথা, সাঁতার দিতে হইবে।

অতএব, তুমি যে বলিতেছ, আমরা আজকাল গুরুজনকে যথেষ্ট মান্য করি না সেটা মানিয়া লওয়া যাক, তার পরে এই পরিবর্তনের ভিতরকার কথাটা একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাক। এ কথাটা ঠিক নহে যে, ভক্তিটা সময়ের প্রভাবে মানুষের হৃদয় হইতে একেবারে চলিয়া গেছে। তবে কিনা ভক্তিস্রোতের মুখ এক দিক হইতে অন্য দিকে গেছে এ কথা সম্ভব হইতে পারে বটে। পূর্বে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ভাবের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। ভক্তি বল ভালোবাসা বল, একটা ব্যক্তি-বিশেষকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। একজন মূর্তিমান রাজা না থাকিলে আমাদের রাজভক্তি থাকিতে পারিত না। কিন্তু শুদ্ধমাত্র রাজ্যতন্ত্রের প্রতি ভক্তি, সে য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই দেখা যায়। তখন সত্য ও জ্ঞান, গুরু-নামক একজন মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। তখন আমরা রাজার জন্য মরিতাম, ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রাণ দিতাম— কিন্তু য়ুরোপীয়েরা কেবলমাত্র একটা ভাবের জন্য, একটা জ্ঞানের জন্য মরিতে পারে। তাহারা আফ্রিকার মরুভূমিতে, মেরুপ্রদেশের তুষারগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করিয়া আসিতেছে। কাহার জন্য? কোনো মানুষের জন্য নহে। বৃহৎ ভাবের জন্য, জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপে মানুষের ভক্তি-অনুরাগ জ্ঞানে ও ভাবে বিস্তৃত হইতেছে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাগে কিছু কিছু কম পড়িতেছে। সেই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষদের চারি দিক হইতে আমাদের শিকড়ের পাক প্রতিদিন যেন অল্পে অল্পে খুলিয়া আসিতেছে। এখন মতের অনুরোধে অনেকে পিতামাতাকে ত্যাগ করিতেছেন, এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে, এবং সুদূর উদ্দেশ্যের জন্য অনেকে জীবনযাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ ভাব যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার কাজ চলিতেছে, ইহার নানা লক্ষণ অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভালোমন্দ দুইই আছে। সে কথা সকল অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে। তবে, যখন এই পরিবর্তন একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার মধ্যে যে ভালোটুকু আছে সেটা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই ভালোটুকুর উপর যদি অনুরাগ বদ্ধ করিতে পারি, তবে সেই ভালোটুকু শীঘ্র শীঘ্র স্ফূর্তি পাইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, মন্দটা ম্লান হইয়া যায়। নহিলে, সকল জিনিসের যেমন দস্তুর আছে, মন্দটাই আগেভাগে খুব কণ্টকিত হইয়া সকলের চোখে পড়ে, ভালোটা অনেক বিলম্বে গা-ঝাড়া দিয়া উঠে।

আমার কথা তো আমি বলিলাম, এখন তোমার কথা তুমি বলো। তুমি কালেজে পড় নাই বলিয়া কিছুমাত্র সংকোচ করিয়ো না। কারণ, তোমারও লেখাতে কালেজের বিলক্ষণ গন্ধ ছাড়ে। সেটা সময়ের প্রভাব। ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় সেটা মিথ্যা কথা নয়। অতএব এখনকার সমাজে বসিয়া তুমি যে নিশ্বাস লইতেছ ও নস্য লইতেছ, তাহাতেই কালেজের অর্ধেক বিদ্যা তোমার নাকে সেঁধোইতেছে। নাক বন্ধ করিতে পারিতেছ না, কেবল নাক তুলিয়াই আছ। যেন পেঁয়াজ-রসুনের খেতের মধ্যে বাস করিতেছ এবং তোমার নাতিরাই তাহার এক-একটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু ইহা জানিয়ো এ গন্ধ ধুইলে যাইবে না, মাজিলে যাইবে না, নাতিগুলোকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে পার তো যায়। কিন্তু এ তো আর তোমার পাকা চুল নয়, রক্তবীজের ঝাড়।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

চিরঞ্জীবেষু

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, দাদামহাশয়দের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিতে পাও বলিয়া যে তাঁহাদের ভক্তি করিতে হইবে না এটা কোনো কাজের কথা নহে। দাদামহাশয়েরা তোমাদের চেয়ে এত বেশি বড়ো যে তাঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিলেও চলে। কেমনতরো জান? যেমন ছোটো ছেলে বাপের গায়ে পা তুলিয়া দিলে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে, বাপের প্রতি সেই ছোটো ছেলের ভক্তি নাই, অর্থাৎ নির্ভরের ভাব নাই, অর্থাৎ সে সহজেই বাপকে আপনার চেয়ে বড়ো মনে করে না। তোমরা তেমনি আমাদের কাছে এত ছোটো যে, আমরা নিরাপদে তোমাদের সহিত বেয়াদবি করিতে পারি এবং অকাতরে তোমাদের বেয়াদবি সহিতে পারি। আর-একটা কথা, সন্তানের শুভাশুভ সমস্তই পিতার উপর নির্ভর করিতেছে, এইজন্য স্বভাবতই পিতার স্নেহের সহিত শাসন আছে এবং পুত্রের ভক্তির সহিত ভয় আছে—পদে পদে কঠোর কর্তব্যপথে সন্তানকে নিয়োগ করিবার জন্য পিতার আদেশ করিতে হয় এবং পুত্রের তাহা পালন করিতে হয়, এইজন্য পিতাপুত্রের মধ্যে আচরণের শৈথিল্য শোভা পায় না। এইরূপে পিতার উপরে কঠোর স্নেহের ভার দিয়া দাদামহাশয় কেবলমাত্র মধুর স্নেহ বিতরণ করেন এবং নাতি নির্ভয়ভক্তিভরে দাদামহাশয়ের সহিত আনন্দে হাস্যালাপ করিতে থাকে। কিন্তু সে হাস্যালাপের মর্মের মধ্যে যদি ভক্তি না থাকে তবে তাহা বেয়াদবির অধম। এত কথা তোমাকে বলিবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তোমার লেখার ভঙ্গি দেখিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ সাবধান করিয়া দিতে হয়।

বাস্ রে! আজকাল তোমরা এত কথাও কহিতে শিখিয়াছ! এখন একটা কথা কহিলে পাঁচটা কথা শুনিতে হয়। তাহার মধ্যে যদি সব কথা বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলেও এতটা গায়ে লাগিত না। ভাবের মিল থাকিলেও অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়া বিস্তর মনান্তর উপস্থিত হয়। আমি বুড়ামানুষ, তোমার সমস্ত কথা ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে, কিন্তু যেরূপ বুঝিলাম সেইরূপ উত্তর দিতেছি।

স্বকাল, পরকাল, এ এক নূতন কথা তুমি তুলিয়াছ। পরকালটা নূতন নয়, সমুখের একজোড়া দাঁত বিসর্জন দিয়া অবধি ঐ কালের কথাটাই ভাবিতেছি—কিন্তু স্বকাল আবার কী?

কালের কি কিছু স্থিরতা আছে নাকি? আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে কাল-স্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্তী শৈলের মতো কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে না?

আমরা পরিবর্তনের মধ্যে থাকি বলিয়াই একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নহিলে কিছুক্ষণ বাদে আর-কিছুই ঠাহর হয় না; নহিলে আমরা পরিবর্তনের দাস হইয়া পড়ি, পরিবর্তনের খেলনা হইয়া পড়ি। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহাতে তুমি পরিবর্তনকেই প্রভু বলিয়াছ, কালকেই কর্তা বলিয়া মানিয়াছ। অর্থাৎ, ঘোড়াকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছ এবং আরোহীকেই তাহার অধীন বলিয়া প্রচার করিতেছ। কালের প্রতি ভক্তি এইটেই তুমি সার ধরিয়া লইয়াছ, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি—ধ্রুব আদর্শের প্রতি—ভক্তি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি, পুত্রের প্রতি স্নেহ—এ যে কেবল পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র কালবিশেষের ধর্ম এ কথা বলিতে কে সাহস করে! এ ধর্ম সকল কালের উপরেই মাথা তুলিয়া আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধূলি উড়াইয়া ইহাকে চোখের আড়াল করিতে পার, তাই বলিয়া ফুঁয়ের জোরে ইহাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে পার না।

যদি সত্যই এমন দেখিয়া থাক যে, এখনকার কালে পিতামাতাকে কেহ ভক্তি করে না, অতিথিকে কেহ যত্ন করে না, প্রতিবেশীদিগকে কেহ সাহায্য করে না, তবে এখনকার কালের জন্য শোক করো—কালের দোহাই দিয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়ো না।

অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্তমানকে সংযত করিতে হয়। যদি ইচ্ছা কর তো চোখ বুজিয়া ছুটিবার সুখ অনুভব করিতে পার। কিন্তু অবিলম্বে ঘাড় ভাঙিবার সুখটাও টের পাইবে।

বর্তমান কাল ছুটিতেছে বলিয়াই স্তব্ধ অতীত কালের এত মূল্য। অতীতে কালের প্রবল বেগ, প্রচণ্ড গতি, সংহত হইয়া যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে। কালকে ঠাহর করিতে হইলে অতীতের দিকে চাহিতে হয়। অতীত বিলুপ্ত হইলে বর্তমান কালকে কেই বা চিনিতে পারে, কেই বা বিশ্বাস করে, তাহাকে সামলায় কাহার সাধ্য! কেননা, চিনিতে পারিলে, জানিতে পারিলে তবে বশ করা যায়। যাহাকে জানি না সে আমাদের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব পরিবর্তনশীল কালকে ভয় করিয়া চলো, তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করো, তাহাকে নিতান্ত বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়ো না।

যাহা থাকে না, চলিয়া যায়, মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হয়, তাহাকে আপনার বলিবে কী করিয়া? একখণ্ড ভূমিকে আপনার বলা যায়, কিন্তু জলের স্রোতকে আপনার বলিবে কে? তবে আবার স্বকাল জিনিসটা কী?

তুমি লিখিয়াছ আমাদের সেকালে ব্যক্তির প্রতিই ভক্তি-প্রীতি প্রভৃতি বদ্ধ ছিল, ভাবের প্রতি ভক্তি-প্রীতি ছিল না। ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-প্রীতি কিছু মন্দ নহে, সে খুব ভালোই, সুতরাং আমাদের কালে যে সেটা খুব বলবান ছিল সেজন্য আমরা লজ্জিত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বল যে, ভাবের প্রতি আমাদের কালের লোকের ভক্তি-প্রীতি ছিল না তবে সে কথাটা আমাকে অস্বীকার করিতে হয়। আমাদের কালে দুইই ছিল, এবং উভয়েই পরস্পর বনিবনাও করিয়া বাস করিত। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের দেশে যে স্বামীপ্রীতি বা স্বামীভক্তি ছিল (এখনো হয়তো আছে) তাহা কী? তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি বা ভক্তি নয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান, তাহা স্বামী-নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি। ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ মাত্র, স্বামীই প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য ব্যক্তির ভালোমন্দের উপর ভক্তির তারতম্য হইত না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীই সমান পূজ্য। য়ুরোপীয় স্ত্রীর ভক্তি-প্রীতি ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ, ভাবে গিয়া পৌঁছায় না। এইজন্য স্বামী-নামক ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ-অনুসারে তাহার ভক্তি-প্রীতি নিয়মিত হয়। এইজন্যই সেখানে বিধবাবিবাহে দোষ নাই, কারণ সেখানকার স্ত্রীরা ভাবকে বিবাহ করে না, ব্যক্তিকেই বিবাহ করে, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অবসানেই স্বামীত্বের অবসান হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কই এইরূপ সুগভীর ভাবের উপরে স্থায়ী।

কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেন, অন্যান্য বিষয় দেখো-না। আমাদের ব্রাহ্মণেরা কি সমাজের হিতার্থ সমাজ ত্যাগ করেন নাই? রাজারা কি ধর্মের জন্য বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করেন নাই? (য়ুরোপের রাজারা তাড়া না খাইলে কখনো এমন কাজ করেন?) ঋষিরা কি জ্ঞানের জন্য, অমরতার জন্য, সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেন নাই? পিতৃসত্য-পালনের জন্য রামচন্দ্র যৌবরাজ্যত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র স্বর্গত্যাগ, পরহিতের জন্য দধীচি দেহত্যাগ করেন নাই? কর্তব্য অর্থাৎ ভাবমাত্রের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের দেশে ছিল না কে বলে? কুকুর যেরূপ অন্ধ আসক্তিতে মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সীতা কি সেইভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, না মহৎ ভাবের পশ্চাতে মনুষ্য যেরূপ অকাতরে বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া যায় সীতা সেইরূপ ভাবে গিয়াছিলেন?

তবে কি ব্যক্তির প্রতি ও ভাবের প্রতি ভক্তি একই সময়ে থাকিতে পারে না? বর্তমানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ‘পারে না’ বলিয়া এমন একটি রত্ন অবহেলায় হারাইয়ো না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, কাহারও বা এক ভাবের প্রতি ভক্তি, কাহারও বা আর-এক ভাবের প্রতি ভক্তি। কেহ বা লৌকিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা আত্মার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

এ-সকল কথা তোমাদের বয়সে আমরা বুঝিতে পারিতাম না ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তোমরা অনেক কূট-কচালে কথা বুঝিতে পার বলিয়াই এতখানি বকিলাম।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

শ্রীচরণেষু

শ্রীচরণেষু

দাদামশায়, তোমার চিঠি ক্রমেই হেঁয়ালি হইয়া উঠিতেছে। আমাদের চোখে এ চিঠি অত্যন্ত ঝাপসা ঠেকে। কোথায় রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র দধীচি, অত দূরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। তোমরাই তো বল আমাদের দূরদর্শিতা নাই, অতএব দূরের কথা দূর করিয়া নিকটের কথা তুলিলেই ভালো হয়।

আমরা যে মস্ত জাতি, আমাদের মতো এতবড়ো জাতি যে পৃথিবীর আর কোথাও মেলে না, তাহাতে আমাদের মনে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বেদ বেদান্ত আগম নিগম পুরাণ হইতে ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। আমাদের বেলুন ছিল, রেলগাড়ি ছিল, আমাদের স্টাইলোগ্রাফ পেন ছিল, গণপতি তাহাতে মহাভারত লিখিয়াছিলেন, ডারুইনের বহুপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁহাদের পূর্বতর পুরুষদিগকে বানর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য-ভৃগু-গৌতমের সম্পূর্ণ জানা ছিল, ইহা সমস্তই মানিলাম— কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমরা আমাদের কৌলীন্য লইয়া স্ফীত হইতে থাকিব, সেই সুদূর কুটুম্বিতার মধ্যেই গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিব, কাছাকাছির সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিব না, এমন হইতে পারে না। বাল্যকালে একদিন উত্তমরূপে পোলাও খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া যে অবশিষ্ট জীবন ভাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে এ বড়ো দুঃখের বিষয়, এখন সকাল-সকাল এই দুঃখ সারিয়া লইয়া বর্তমান যুগের কাজ করিবার জন্য একটু সময় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমি যখন বলিয়াছিলাম ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের নিষ্ঠা নাই, ব্যক্তির প্রতিই আসক্তি, তখন আমি রামচন্দ্র-হরিশ্চন্দ্র-দধীচির কথা মনেও করি নাই— কীটের মতো যেখানকার যত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে আমার উৎসাহ নাই। আমি অপেক্ষাকৃত আধুনিকের কথাই বলিতেছি। তর্কবিতর্কের প্রবৃত্তি দূর করিয়া একবার ভাবিয়া দেখো দেখি, মহৎ ভাবকে উপন্যাসগত কুহেলিকা জ্ঞান না করিয়া মহৎ ভাবকে সত্য মনে করিয়া, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, তাহার জন্য আমাদের দেশে কয়জন লোক আত্মসমর্পণ করে! কেবল দলাদলি, কেবল 'আমি আমি আমি' এবং 'অমুক অমুক অমুক' করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়াও যে দেশের কোনো কাজ, কোনো মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। এইজন্য আপন আপন অভিমান লইয়াই আমরা থাকি। আমাকে বড়ো চৌকি দেয় নাই, অতএব এ সভায় আমি থাকিব না— আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই, অতএব ও কাজে আমি হাত দিতে পারি না— সে সমাজের সেক্রেটারি অমুক, অতএব সে সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না— আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি। সুপারিশের খাতির এড়াইতে পারি না, চক্ষুলজ্জা অতিক্রম করিতে পারি না, আমার একটা কথা অগ্রাহ্য হইলে সে অপমান সহ্য করিতে পারি না। দুর্ভিক্ষনিবারণের উদ্দেশ্যে কেহ যদি আমার সাহায্য লইতে আসে, আমি পাঁচ টাকা দিয়া মনে করি তাহাকেই ভিক্ষা দিলাম, তাহাকেই সবিশেষ বাধিত করিলাম— সে এবং তাহার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ-সংখ্যক পূর্বপুরুষের নিকট হইতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়া থাকি। নহিলে মনের তৃপ্তি হয় না। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বাধিত করিলাম না— আমি রহিলাম কলিকাতার এক কোণে, বীরভূমের এক কোণে এক ব্যক্তি আমার টাকায় মাসখানেক ধরিয়া দুই মুঠা ভাত খাইয়া লইল— ভারি তো আমার গরজ! পরোপকারী বলিয়া নাম বাহির হয় কার? যে ব্যক্তি আশ্রিতদের উপকার করে। অর্থাৎ, একজন আসিয়া কহিল, 'মহাশয়, আপনার হাত ঝাড়িলে পর্বত, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমার একটা গতি করিতে পারেন— আমি আপনাদেরই আশ্রিত।' মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়গুড়ি হইতে ধূমাকর্ষণপূর্বক অকাতরে বলিলেন, 'আচ্ছা!' বলিয়া পত্রযোগে একজন বিশ্বাসপরায়ণ বান্ধবের ঘাড়ে সেই

অকর্মণ্য অপদার্থকে নিক্ষেপ করিলেন। আর-একজন হতভাগ্য অগ্রে তাঁহার কাছে না গিয়া পাঁচুবাবুর কাছে গিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে কানা-কড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক, বাক্যযন্ত্রণায় তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া তবে ছাড়িয়া দিলেন। আপনার স্থূল উদরটুকু ধারণ করিয়া এবং উদরের চতুষ্পার্শ্বে সহচর-অনুচরগণকে চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যে ব্যক্তি বিপুল শনিগ্রহের মতো বিরাজ করিতে থাকে আমাদের এখানে সে ব্যক্তি একজন মহৎ লোক। উদারতার সীমা উদরের চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত। আমাদের মহত্ত্ব ব্যাপক দেশে, ব্যাপক কালে, স্থান পায় না। অত কথায় কাজ কী, উদার মহত্ত্বকে আমরা কোনোমতে বিশ্বাস করিতেই পারি না। যদি দেখি কোনো-এক ব্যক্তি টাকাকড়ির দিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি 'হুজুকে'। আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড়ো কাজ একটা হুজুক বৈ আর কিছুই নয়। আমরা টাকাকড়ি ক্ষুধাতৃষ্ণা এ-সকলের একটা অর্থ বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশে এবং সংকীর্ণ কর্তব্যজ্ঞানে কাজ করাকেই বুদ্ধিমান প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া জানি—কিন্তু মহৎ কার্যের উৎসাহে আত্মসমর্পণ করার কোনো অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বলি, ও ব্যক্তি দল বাঁধিবার জন্য বা নাম করিবার জন্য বা কোনো-একটা গোপনীয় উপায়ে অর্থ-উপার্জন করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্পষ্ট করিয়া কিছু যদি না বলিতে পারি তো বলি, ওর একটা মতলব আছে। মতলব তো আছেই। কিন্তু মতলব মানে কি কেবলই নিজের উদর বা অহংকার-তৃপ্তি, ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো উচ্চতর মতলব আমরা কি কল্পনাও করিতে পারি না? এমনি আমাদের জাতির হৃদয়গত বদ্ধমূল ক্ষুদ্রতা! কিন্তু এ দিকে দেখো, রামহরি বা কালাচাঁদের উপকারের জন্য কেহ প্রাণপণ করিতেছে এরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে আমরা তাহার প্রশংসা করিয়াই থাকি। অথচ, মানবজাতির উপকারের জন্য আপিস কামাই করা—এরূপ অবিশ্বাসজনক হাস্যজনক প্রস্তাব আপিস-কোটর-বাসী ক্ষুদ্র বাঙালি পেচকের নিকটে নিতান্ত রহস্য বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক প্রবন্ধ দেখিলে বাঙালি পাঠকেরা ক্রমাগত ঘ্রাণ করিয়া করিয়া সন্ধান করিতে থাকে ইহা কোন্ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লিখিত। সমাজের কোনো কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ করিতে পারে ইহা তেমন সম্ভব বোধ হয় না—এই উপলক্ষ করিয়া কোনো শত্রুর প্রতি আক্রমণ করা ইহাই একমাত্র যুক্তিসংগত, মনুষ্যস্বভাব- অর্থাৎ বাঙালিস্বভাবসংগত বলিয়া সকলের বোধ হয়। এইজন্য অনেক বাংলা কাগজে ব্যক্তিবিশেষের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া উঞ্ছবৃত্তি করা হয়—যাকে-তাকে ধরিয়া তাহার উকুন বাছিয়া বা উকুন বাছিবার ভান করিয়া বাঙালি দর্শক-সাধারণের পরম আমোদ উৎপাদন করা হয়।

এই-সকল দেখিয়া শুনিয়াই তো বলিয়াছিলাম, আমরা ব্যক্তির জন্য আত্মবিসর্জন করিতেও পারি, কিন্তু মহৎ ভাবের জন্য সিকি পয়সাও দিতে পারি না। আমরা কেবল ঘরে বসিয়া বড়ো কথা লইয়া হাসিতামাশা করিতে পারি, বড়ো লোককে লইয়া বিদ্রূপ করিতে পারি, তার পরে ফুড়্ ফুড়্ করিয়া খানিকটা তামাক টানিয়া তাস খেলিতে বসি। আমাদের কী হবে তাই ভাবি। অথচ ঘরে বসিয়া আমাদের অহংকার অভিমান খুব মোটা হইতেছে। আমরা ঠিক দিয়া রাখিয়াছি আমরা সমুদয় সভ্য জাতির সমকক্ষ। আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট— আমাদের রসনার অদ্ভুত রাসায়নিক প্রভাবে জগতে যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবে আমরা তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি, সমস্ত জগৎও সেই দিকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। দাদামশায়, আর হরিশচন্দ্র-রামচন্দ্র-দধীচির কথা পাড়িয়া ফল কী বলো শুনি। উহাতে আমাদের ফুটন্ত বাগ্মিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মাত্র— আর কী হয়?

আমরা কেবল আপনাকে একে ওকে তাকে এবং এটা ওটা সেটা লইয়া মহা ধুমধাম ছটফট বা খুঁতখুত করিয়া বেড়াইতেছি—প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্তব্যসাধনের জন্য হৃদয়ের অনিবার্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, এ-সকল আমাদের দেশে কেবল কথার কথা হইয়া রহিল—দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র

বলিয়া জাতির হৃদয়ের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিতে পারিল না, কেবল বাষ্পময় ভাষার প্রতিমাগুলি আমাদের সাহিত্যে কুজ্ঝটিকা রচনা করিতে লাগিল।

আমরা আশা করিয়া আছি ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ-সকল সংকীর্ণতা ক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই শিক্ষার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থিত ভালো জিনিসটুকু দেখিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

চিরঞ্জীবেষু

চিরঞ্জীবেষু

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ো খুশি হইলাম। বাস্তবিক, বাঙালিজাতি যেরূপ চালাকি করিতে শিখিয়াছে তাহাতে তাহাদের কাছে কোনো গম্ভীর বিষয় বলিতে বা কোনো শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়। আমাদের এক কালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এক কালে বড়ো বড়ো বীরসকল জন্মিয়াছিলেন— কিন্তু বাঙালির কাছে ইহার কোনো ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া, ধুলা ঝাড়িয়া, সভাস্থলে পুতুল নাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন সে বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা তো স্মৃতি নহে, প্রাণ ধরিয়া রাখাই স্মৃতি। কিন্তু প্রাণ জাগাইয়া রাখিতে হইলেই তাহার উপযোগী বাতাস চাই, তাহার উপযোগী খাদ্য চাই। আমাদের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত সেই স্মৃতির শিরার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া চাই। মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীষ্ম দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা তো নকল মানুষ। অনেকটা মানুষের মতো। ঠিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই— দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই! কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সে জাতির মহত্ত্বকে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরি মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না। সেখানে সংকল্প কার্য হইয়া উঠে, কার্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়; সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়! সে জাতিতে সৌন্দর্য ফুলের মতো ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মতো পক্বতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস, আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে, আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উদয় হইবে কী করিয়া? বিদ্যুৎপ্রয়োগে মৃতদেহ জীবিতের মতো কেবল অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি করে মাত্র। আমাদের দেশে সেই বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু হায় হায়, কে আমাদিগকে এমন করিয়া নাচাইতেছে? কেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা নিতান্ত অসহায়? আমাদের এত-সব উন্নতির মূল কোথায়? এ-সব উন্নতি রাখিব কিসের উপরে? রক্ষা করিব কী উপায়ে? একটু নাড়া খাইলেই দিন-দুয়ের সুখস্বপ্নের মতো সমস্তই যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে! অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজির উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজি ফ্যাশানে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য, অভিমান,

অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাস। দৃঢ়তা নাই, উদ্যম নাই; কারণ, সকলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে সিদ্ধি সাধনা-ব্যতীত হইয়াছে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়ো না। তাহাকে তোমার বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু সে কখনোই তোমার নহে। আমরা উপার্জন করিতে পারি, কিন্তু লাভ করিতে পারি না। আমরা জগতের সমস্ত জিনিসকে যতক্ষণ না আমার মধ্যে ফেলিয়া আমার করিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ আমরা কিছুই পাই না। ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না। আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্যকিরণকে আমাদের উপযোগী আলো-আকারে গড়িয়া লয়, তা না হইলে আমরা অন্ধ; আমাদের অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্যকিরণ পড়িলেও কোনো ফল নাই। আমাদের হৃদয়ের সেই স্নায়ু কোথায়! এ পক্ষাঘাতের আরোগ্য কিসে হইবে! আমরা সাধনা কেন করি না? সিদ্ধির জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নাই বলিয়া। সেই মাথাব্যথাটা গোড়ায় চাই।

অর্থাৎ, বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোনো বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাস করিব, রোজগার করিব, ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা মামলা ও দলাদলিতে আছি। অর্থাৎ, হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জতটা আমাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের অপেক্ষা পলায়নেই পিতৃযশ রক্ষা হয় এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ আত্যন্তিক স্নিগ্ধ ভাব ও মজ্জাগত শ্লেষ্মার প্রভাবে নিদ্রাটা আমাদের কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নটাকেই সত্যের আসনে বসাইয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আমাদের প্রধান আবশ্যক বাতিক। সেদিন একজন বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্তের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি বায়ুভরে একেবারে কাত হইয়া পড়িয়াছেন—এমন-কি, অনেক সময়ে বায়ুর প্রকোপ তাঁহার আয়ুর প্রতি আক্রমণ করে। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম যে, আর কিছু না, আমাদের দেশে একটি বাতিকবর্ধনী সভার আবশ্যক হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কতকগুলা ভালোমানুষের ছেলেকে খেপাইতে হইবে। বাস্তবিক, প্রকৃত খেপা ছেলেকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বায়ুর মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে? যে-সকল জাত ঊনবিংশ শতাব্দীর 'পরে ঊনপঞ্চাশ বায়ু লাগাইয়া চলিয়াছেন, আমরা সাবধানীরা কবে তাঁহাদের নাগাল পাইব? আমাদের যে অল্প একটু বায়ু আছে, সভার নিয়ম রচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়।

মহৎ আশা, মহৎ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধানী বিষয়ী লোকেরা বাষ্পের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাষ্পের বলেই উন্নতির জাহাজ চলিতেছে। এই বাষ্পকে খাটাইতে হইবে, এই বায়ুকে পালে আটক করিতে হইবে। এমন তুমুল শক্তি আর কোথায় আছে? আমাদের দেশে এই বাষ্পের অভাব, বায়ুর অভাব। আমরা উন্নতির পালে একটুখানি ফুঁ দিতেছি, যতখানি গাল ফুলিতেছে ততখানি পাল ফুলিতেছে না।

বৃহৎ ভাবের নিকটে আত্মবিসর্জন করাকে যদি পাগলামি বলে, তবে সেই পাগলামি এক কালে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছিল। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কর্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানিকে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বড়ো জ্ঞান করিত না। এইজন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাম রাবণকে দুইবার জয় করিয়াছেন। একবার বাণ মারিয়া, একবার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তন্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ। হোমরের একিলিস পরাভূত হেক্টরের মৃতদেহ ঘোড়ার

লেজে বাঁধিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন—রামে একিলিসে তুলনা করো। য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়েই মহাভারত শেষ করিতেন। কিন্তু আমাদের ব্যাস বলিলেন রাজ্য গ্রহণ করায় শেষ নহে, রাজ্য ত্যাগ করায় শেষ। যেখানে সব শেষ তাহাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, আমাদের কবিরা পুরস্কারেরও লোভ দেখান নাই। ইংরাজেরা য়ুটিলিটেরিয়ান, কতকটা দোকানদার; তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে পোয়েটিক্যাল জাস্টিস-নামক একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ দেনাপাওনা, সৎকাজের দর-দাম করা। আমাদের সীতা চিরদুঃখিনী, রাম-লক্ষ্মণের জীবন দুঃখে কষ্টে শেষ হইল। এতবড়ো অর্জুনের বীরত্ব কোথায় গেল? অবশেষে দস্যুদল আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাদবরমণীদের কাড়িয়া লইয়া গেল, তিনি গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের সমস্ত জীবন দারিদ্র্যে দুঃখে শোকে অরণ্যে কাটিয়া গেল, শেষেই বা কী সুখ পাইলেন! হরিশ্চন্দ্র যে এত কষ্ট পাইলেন, এত ত্যাগ করিলেন, অবশেষে কবি তাঁহার কাছ হইতে পুণ্যের শেষ পুরস্কার স্বর্গও কাড়িয়া লইলেন। ভীষ্ম যে রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাইলেন, তাঁহার সমস্ত জীবনে সুখ কোথায়! সমস্ত জীবন যিনি আত্মত্যাগের কঠিন শয্যায় শুইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি শরশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন!

এক কালে মহৎ ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের এত বিশ্বাস এত নিষ্ঠা ছিল। তাঁহারা মহত্ত্বকেই মহত্ত্বের পরিণাম বলিয়া জানিতেন, ধর্মকেই ধর্মের পুরস্কার জ্ঞান করিতেন।

আর আজকাল! আজকাল আমাদের এমনি হইয়াছে যে, কেরানিগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই, এমন-কি, বাণিজ্যকেও পাগলামি জ্ঞান করি! দরখাস্তকে ভবসাগরের তরণী করিয়াছি, নাম সহি করিয়া আপনাকে বীর মনে করিয়া থাকি।

আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই! মহত্ত্বের একাল আর সেকাল কী? যাহা ভালো তাহাই আমাদের হৃদয় গ্রহণ করুক, যেখানে ভালো সেখানেই আমাদের হৃদয় অগ্রসর হউক! আমাদের লঘুতা চপলতা সংকীর্ণতা দূরে যাক! অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে প্রসূত বাঙালিসুলভ অভিমানে মোটা হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া আপনাকে সকলের চেয়ে বড়ো মনে না করি ও মহৎ হইবার আগে দেশকালপাত্রনির্বিশেষে মহতের চরণের ধূলি লইতে পারি এমন বিনয় লাভ করি।

শুভাশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

শ্রীচরণেষু

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া, আমাদের সেই কলিকাতা শহরকে একটা মস্ত ইঁটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শতসহস্র মানুষকে একটা বড়ো খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমি তো বাঁচি না। আমি ষোলো আনা 'ভেজিটেরিয়ান'। আমি কায়মনে উদ্ভিদ সেবন করিয়া থাকি। ইঁট-কাঠ চুন-সুরকি মৃত্যুভারের মতো আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড়ো বড়ো ইমারতগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারি দিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত ক্রোশ দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল-গাছে-কাঁঠালের দেশ। যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথার দেশ। পেটে-পিলে কানে-কলম ও মাথায়-শামলার দেশ। মনে হইত এখানে বিচিগুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত-পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু—তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে, সাগরের উপকূলে, তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে, তাঁহার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে, এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি, শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি—বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসব ভারতবর্ষের চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নবজাতির জন্মসংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ—প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত—দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড়ো হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড়ো কথা সয় না। ছোটো কথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে—সেটা ভালো নয়। যাই হোক, তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা কী জান? এতদিন বঙ্গদেশ শহরগুলিতে পড়িয়া ছিল, এখন আমাদিগকে শহর-ভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা আমি গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানবসমাজ-নামক বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর রাজধানী-ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে 'সমস্ত একাক্কার হইয়া গেল'—কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাক্কার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালি হইব তখন একবার 'একাক্কার' হইবে, আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাক্কার' হইবে। বিপুল মানবশক্তি বাংলা-সমাজের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার। আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে—বাঙালিদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্নধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই, সকলেই আপন-আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

'মার খেয়েছি, নাহয় আরও খাব।
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!'

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া? আপন-আপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মন্‌সাসিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। একজন বাঙালি আসিয়া একদিন বাংলাদেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালি তো একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালিরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়া ছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি তো বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন-আপন গর্তের মধ্যে সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া প্রবেশ করে। কারণ, মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা-অসুবিধার কথা হইতেছে না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বলো!

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে—আর একদিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা একজাতি

হইয়া উঠিতে পারিব, বৈঠকখানার আসবাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব, বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকার দিনের এইসকল সংবাদপত্রের মেকি সংগ্রাম, শতসহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি সমস্ত চুলায় যাইবে—আজিকার দিনের বড়ো বড়ো ছোটোলোকদিগের নখে-আঁকা গণ্ডিগুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে! সেই আর-একদিন বাংলা একাকার হইবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা কেই বা মন্ত্রী! তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধুলার মতো আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়লোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়োলোক হইব। আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন-সকল বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

তুমি নাকি বড়ো চিঠি পড় না, তাই ভয় হইতেছে পাছে এই চিঠি ফেরত দিয়া ইহার সংক্ষেপ মর্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ কর। কিন্তু তুমি পড় আর নাই পড় আমি লিখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। এ যেন আমিই আমাকে চিঠি লিখিলাম, এবং পড়িয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

চিরঞ্জীবেষু

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, আমাদের সেকালে পোস্টাপিসের বাহুল্য ছিল না—জরুরি কাজের চিঠি ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার চিঠি হাতে আসিত না, এইজন্য সংক্ষেপ-চিঠি পড়াই আমাদের অভ্যাস। তা ছাড়া বুড়ামানুষ—প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া করিয়া পড়িতে হয়—বড়ো চিঠি পড়িতে ডরাই সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার চিঠি পড়িয়া দীর্ঘ পত্র পড়ার দুঃখ আমার সমস্ত দূর হইল। তুমি যে হৃদয়পূর্ণ চিঠি লিখিয়াছ তাহার সমালোচনা করিতে বসিতে আমার মন সরিতেছে না। কিন্তু বুড়ামানুষের কাজই সমালোচনা করা। যৌবনের সহজ চক্ষুতে প্রকৃতির সৌন্দর্যগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।

বিদেশে গিয়া যে বাঙালি জাতির উন্নতি-আশা তোমার মনে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার গুটিকতক কারণ আছে। প্রধান কারণ—এখানে তোমার অজীর্ণ রোগ ছিল, সেখানে তোমার খাদ্য জীর্ণ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে ধরিয়া লইতেছ যে বাঙালি মাত্রেরই পেটে অন্ন পরিপাক পাইতেছে—এরূপ অবস্থায় কাহার না আশার সঞ্চার হয়! কিন্তু আমি অম্লশূলপীড়ায় কাতর বাঙা

তোমার চিঠিটা আমার কাছে আগাগোড়াই কাহিনী বলিয়া ঠেকিতেছে। পেটে আহার জীর্ণ হওয়া এবং না হওয়ার উপর পৃথিবীর কত সুখদুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। পাকযন্ত্রের উপর যে উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই সে উন্নতি ক'দিন টিঁকিতে পারে? জঠরানলের প্রখর প্রভাবেই মনুষ্যজাতিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। যে জাতির ক্ষুধা কম সে জাতি থাকিলেও হয় গেলেও হয়; তাহার দ্বারা কোনো কাজ হইবে না। যে জাতি আহার করে, অথচ হজম করে না, সে জাতি কখনোই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বাঙালি জাতির অম্লরোগ হইল বলিয়া বাঙালি কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না। তাহার সাহস হয় না, আশা হয় না, উদ্যম হয় না। এজন্য বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের শরীর অপটু, বুদ্ধি অপরিপক্ক, উদরান্ন ততোধিক। অতএব সমাজ-সংস্কারের ন্যায় পাকযন্ত্র-সংস্কারও আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

আনন্দ না থাকিলে উন্নতি হইবে কী করিয়া! আশা উৎসাহ সঞ্চয় করিব কোথা হইতে? অকৃতকার্যকে সিদ্ধির পথে বার বার অগ্রসর করিয়া দিবে কে! আমাদের এই নিরানন্দের দেশে উঠিতে ইচ্ছা করে না, কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, একবার পড়িয়া গেলেই মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। প্রাণ না দিলে কোনো কাজ হয় না—কিন্তু প্রাণ দিব কিসের পরিবর্তে! আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইবে কে! আনন্দ নাই, আনন্দ নাই—দেশে আনন্দ নাই, জাতির হৃদয়ে আনন্দ নাই। কেমন করিয়া থাকিবে! আমাদের এই স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহ, অম্লশূলে বিদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, রোগের অবধি নাই—বিশ্বব্যাপিনী আনন্দসুধার অনন্ত প্রস্রবণধারা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না—এইজন্য নিদ্রা আর ভাঙে না, একবার শ্রান্ত হইয়া পড়িলে শ্রান্তি আর দূর হয় না, একবার কার্য ভাঙিয়া গেলে কার্য আর গঠিত হয় না, একবার অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

অতএব কেবল মাতিয়া উঠিলেই হইবে না; সেই মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার, সেই মত্ততা সমস্ত জাতির শিরার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা সঞ্চয় করা চাই। একটি স্থায়ী আনন্দের ভাব সমস্ত জাতির হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল হওয়া চাই। এমন এক প্রবল উত্তেজনাশক্তি আমাদের জাতিহৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে অহরহ দণ্ডায়মান থাকে যাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাসবেগে আমাদের জীবনের প্রবাহ সহস্র ধারায় জগতের সহস্র দিকে প্রবাহিত হইতে পারে! কোথায় বা সে শক্তি! কোথায় বা তাহার দাঁড়াইবার স্থান! সে শক্তির পদভারে আমাদের এই জীর্ণ দেহ বিদীর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আমি তো ভাই, ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে দেশের আবহাওয়ায় বেশি মশা জন্মায় সেখানে বড়ো জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলা-জমি জঙ্গল, এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে, কর্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিতেছে, কিন্তু উপায় নাই; কাজ বাড়াইয়া দিতেছে, কিন্তু শরীর নাই; অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে, কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে, তাহার পরিবর্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই, কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভালো—আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে—স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজনবৎসল পুত্রকন্যা, পরিবারপ্রতিম পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে লইয়া, যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভালো। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ-উপকরণসকল আমরা কোথায় পাইব! কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট! অবিশ্রাম কর্মানুষ্ঠান, বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ, নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন, অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দাহন—সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্রসিক্ত দেশে জীর্ণশীর্ণ দুর্বল দেহে পারিব কেন? কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।

বালকেরা শুনিবে এবং বৃদ্ধেরা বলিবে—এইজন্য তোমাদের কাছে সংক্ষেপ-চিঠি প্রত্যাশা করি, কিন্তু নিজে বড়ো চিঠি লিখি। অর্বাচীনদের কথা ধৈর্য ধরিয়া বেশিক্ষণ শুনিতে পারি না, কিন্তু নিজের কথা বলিয়া তৃপ্তি হয় না—অতএব 'নিজে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে' এই উপদেশ-অনুসারে আমার সহিত কাজ করিয়ো না, আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

শ্রীচরণেষু

শ্রীচরণেষু

তবে আর কী! তবে সমস্ত চুলায় যাক। বাংলাদেশ তাহার আম-কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাকুক। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ করো, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত করো, ইংরাজি পড়া একেবারেই বন্ধ করো, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে-সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে-সকল মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশবিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাকো। অর্থাৎ, যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে কাজ করিবার অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হয়—সে সমস্ত হইতে দূরে থাকো। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়ো, কোন্ দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা করো। দালান ডাবাহুঁকা নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘমধ্যাহ্ন অতিবাহিত করো। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষণের জোগাড় করিয়া রাখো।

দাদামহাশয়, তুমি কি সত্য-সত্যই বলিতেছ আমরা একশত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিলাম অবিকল সেইরূপ থাকাই ভালো, আর কিছুমাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই? জ্ঞানলাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে! লোকহিতপ্রবর্তক উন্নত উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই, পাছে মানবহিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বড়োলোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের দুর্বল হৃদয়ে বড়োলোক হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়! তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠান্ডা হও, ছায়ায় থাকো, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করো, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রীপুত্রপরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন করো!

কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া বৃথা, সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানবজাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিয়াছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম সমস্ত সে চাহিতেছে; তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামীপ্রেমের মর্ম অবগত হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে—তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয় বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামীসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না—তেমনি আমরা মানবপ্রেমের

মর্ম অবগত হইতেছি, এখন আমরা মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোনো দাদামশায়ের কোনো উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মরণ হয় তো মরিব, কোনো উপায় নাই। কী সুখেই বা বাঁচিয়া আছি!

আনন্দের কথা বলিতেছ? এই তো আনন্দ! এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই তো আনন্দ! আনন্দের লক্ষণ কি কিছু ব্যক্ত হইতেছে না! জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে না? বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না! তাই কি সমাজের সর্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! আমাদের এ দেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এ দেশে রোগ শোক তাপ আছে, রোগে শোকে নিরানন্দে আমরা জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি—সেইজন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই—সেইজন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করুক, মরিতেই যদি হয় তো যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি!

আর, মরিব কেন! তুমি এমনি কি হিসাব জান যে, একবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে আমরা মরিতেই বসিয়াছি! তোমার বুড়োমানুষের হিসাব-অনুযায়ী মনুষ্যসমাজ চলে না। তুমি কি জান মানুষ সহসা কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে! মনুষ্যসমাজ সাধারণত হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক-এক সময়ে সেখানে যেন ভেল্‌কি লাগিয়া যায়, তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয়, সহসা একদিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়োমানুষেরা চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে তখনই সেই ভেল্‌কি লাগিবার সময়—তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহর পাইবার যো নাই। অতএব আঁববাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।

হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভালো। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রম্‌ওয়েল যখন ইংলন্ডের দাসত্বরজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। ওয়াশিংটন যখন আমেরিকায় স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কী। নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা নাহয় বাঁচিব নাহয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদামশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে! জিজ্ঞাসা করি—এখনই বা কে বাতি দিতেছে! সমস্তই যে অন্ধকার!

বিদায় লইলাম দাদামহাশয়! আমাদের আর চিঠিপত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স। সংসারে কাজের বাধা যথেষ্ট আছে—পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার 'পরে বুড়োমানুষদের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পেঁছিবার পূর্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ 'পথের মধ্যে খানা আছে, ডোবা আছে, সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভালো'—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বল পাইতেছি না। আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীনবুদ্ধি বটে, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বুদ্ধি পাইতেছি না। অতএব আমার যেটুকু বল, যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম—মরিতে হয় তো চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

চিরঞ্জীবেষু

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মতো শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কী করিয়া? তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।

অনেক বুড়ো আছে বটে, তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবন লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা। যেখানে একটুমাত্র তাত পাওয়া যায় সেইখানেই তাহারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়া সমস্ত জুড়াইয়া হিম করিয়া দিতে চাহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে কাঁচা চুল আগাগোড়া উৎপাটন করিয়া তাহার পরিবর্তে তাহারা পাকা চুল বুনানি করিতে চায়; তাহারা যে এক কালে যুবা ছিল তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়, এইজন্য যৌবন তাহাদের নিকটে একেবারে দুর্বোধ হইয়া পড়ে। যৌবনের গান শুনিয়া তাহারা কানে আঙুল দেয়, যৌবনের কাজ দেখিয়া তাহারা মনে করে পৃথিবীতে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্যামল কিশলয়ের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া ধুলাশায়ী জীর্ণ পত্র যেমন অত্যন্ত শুষ্ক পীত হাস্য হাসিতে থাকে, অপরিণত যৌবনের সরস শ্যামলতা দেখিয়া অনেক বৃদ্ধ তেমনি করিয়া হাসিয়া থাকে। এইজন্যই ছেলে-বুড়োর মাঝখানে এত দৃঢ় ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

আমার কি ভাই, সাধ যে কেবল কতকগুলো উপদেশের ধোঁয়া দিয়া তোমাদের কাঁচা মাথা একদিনে পাকাইয়া তুলি! কাজ করিতে যদি পারিতাম তা হইলে কী আর সমালোচনা করিতে বসিতাম! তোমরা যুবা, তোমাদের কত সুখ আছে বলো দেখি। আমাদের উদ্যমের সুখ নাই, কর্মানুষ্ঠানের সুখ নাই, একমাত্র বকুনির সুখ আছে—তাহাও সম্মুখের দন্তাভাবে ভালোরূপে সমাধা হয় না। ইহাতেও তোমরা চটিলে চলিবে কেন!

কাজ নাই ভাই—আমার সংশয়, আমার বিজ্ঞতা, আমার কাছেই থাক; তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধান করো, সত্যের জন্য সংগ্রাম করো, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করো। যে স্রোতে পড়িয়াছ এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতিতীর্থের দিকে ধাবমান হও; নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই; উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।

আমি যে চিরজীবন কাটাইয়া অবশেষে যাবার মুখে তোমাদের দুটো-একটা কথা বলিয়া যাইতেছি, তাহা শুনিলে যে তোমাদের উপকার হইবে না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহার সকল কথাই যে বেদবাক্য তাহা নহে, কিংবা তাহার সকল কথাই যে এখনকার দিনে খাটিবে তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে তাহাতে কিছু-না-কিছু সত্য আছেই—আমার এই সুদীর্ঘ জীবন কিছু সমস্ত ব্যর্থ, সমস্ত মিথ্যা নহে। এই সংশয়াচ্ছন্ন সংসারে আমার দীর্ঘ জীবন যে সত্যপথ-নির্দেশের কিছুমাত্র সহায়তা করিবে না তাহা আমার মন বলিতে চায় না। এইজন্য, আমি কোনো দৃঢ় অনুশাসন প্রচার করিতে চাই না, আমি বলিতে চাই না আমার সমস্ত কথা আগাগোড়া পালন না করিলে তোমরা উৎসন্ন যাইবে, আমি কেবল এই বলিতে চাই—আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুন, একেবারে কানে আঙুল দিয়ো না, তার পরে বিচার করো, বিবেচনা করো, যাহা ভালো বোধ হয় তাহা গ্রহণ করো। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও, কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখো।

আমার তো ভাই, যাবার সময় হইয়াছে। যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ। আমরা সেই অস্তগামী চন্দ্র, আমরা রজনীতে বঙ্গভূমির নিদ্রিতাবস্থায় বিরাজ করিতেছিলাম। তখন যে একটি সুগভীর শান্তি ও সুস্নিগ্ধ মাধুর্য ছিল তাহা অস্বীকার

করিবার কথা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া আজ এই-যে কর্মকোলাহল জাগাইয়া অরুণোদয় হইতেছে, ইহাকে সাদর সম্ভাষণ না করিব কেন? কেন বলিব তীক্ষ্নপ্রভ দিবসের প্রয়োজন নাই, রজনীর পরে রজনী ফিরিয়া আসুক? এসো অরুণ, এসো, তুমি আকাশ অধিকার করো— আমি নীরবে তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিই। আমি তোমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণহাস্যে তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। আমার নিদ্রা, আমার শান্ত নীরবতা, আমার স্নিগ্ধ হিমসিক্ত রজনী আমার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়া যাক— তোমারই সমুজ্জ্বল মহিমা জীবন বিতরণ করিয়া জলে স্থলে চরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

১২৯২

মন্ত্রী-অভিষেক

প্রকাশ : ১৮৯০

‘ভারতী ও বালক’ মাসিক পত্রিকায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হবার পরের মাসেই ‘মন্ত্রী-অভিষেক’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে আর মুদ্রিত হয় নি। গ্রন্থপ্রকাশকালে আখ্যাপত্রে উল্লেখ ছিল :

‘এমারেল্ড নাট্যশালায় লর্ড্ ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত হয়।’

আমি যে বিষয় উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা আপনা হইতেই অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এমন কেহই নাই যাঁহাকে এ সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা বলিতে পারি বা যাঁহাকে প্রমাণপ্রয়োগ-পূর্বক কিছু বুঝানো আবশ্যক। আমরা সকলেই একমত। আমার কর্তব্য কেবল উপস্থিত সকলের হইয়া সেই মত ব্যক্ত করা; সেইজন্যই সাহস-পূর্বক আমি এখানে দণ্ডায়মান হইতেছি। নতুবা জটিল রাজনৈতিক অরণ্যের মধ্যে সরল পথ কাটিয়া বাহির করা আমার মতো নিতান্ত অব্যবসায়ী লোকের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত।

বিষয়টা আপাতত যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আমার নিকটেও তেমন দুর্বোধ ঠেকিতেছে না। আমাদের শাসনকর্তারা স্থির করিয়াছেন মন্ত্রীসভায় আরও গুটিকতক ভারতবর্ষীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন কথাটা কেবল এই দাঁড়াইতেছে, নির্বাচন কে করিবে? গবর্নমেন্ট করিবেন, না আমরা করিব?

মীমাংসা করিবার পূর্বে সহজ-বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে?

আমাদেরই সুবিধার জন্য। কারণ, ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই যিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে। অবশ্য, ইংরাজের ইহাতে আনুষঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না। তবে কী আশা লইয়া আজ আমরা এখানে সমবেত হইতাম! তবে আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র আমাদের মনে উদয় হইবার বহু পূর্বেই বিলাতের নির্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা নিরঙ্কুর হইয়া লোপ পাইত।

এ পর্যন্ত কখনো কখনো দৈববশত দুর্ঘটনাক্রমে উক্ত মর্মঘাতী চর্মখণ্ডের তাড়নে আমাদের জীর্ণ প্লীহা বিদীর্ণ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদের শীর্ণ আশালতা ক্রমশ সজীব হইয়া উন্নতি-দণ্ড আশ্রয়-পূর্বক সফলতালাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি ইহার আক্রোশ কার্যে স্পষ্টত প্রকাশ পায় নাই।

উপস্থিতক্ষেত্রে আমার এই প্রবন্ধে বিদীর্ণ প্লীহার উল্লেখ করা কালোচিত স্থানোচিত বিজ্ঞোচিত হয় নাই এইরূপ অনেকেরই ধারণা হইতে পারে। বিষয়টা সাধারণত মনোরঞ্জক নহে, এবং ইহার উল্লেখ আমাদের কর্তৃপুরুষদের কর্ণে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া আঘাত করিতে পারে।

কিন্তু কথাটা পাড়িবার একটু তাৎপর্য আছে। ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্ষে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্বল প্লীহা এবং অনাথ মানসম্ভ্রম শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কথাটা গোপন করিয়া রাখা সহজ হইতে পারে কিন্তু বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই স্বাভাবিক রূঢ়তা আমরা যদি চর্মের উপরে ও মর্মের মধ্যে একান্ত প্রাণান্তিকরূপে অনুভব না করিতাম তবে ইংরাজ গবর্নমেন্টের উদারতা ও উপকারিতা-সম্বন্ধে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কত সহজ হইত!

মনুষ্যের স্বভাব এই, অপরাধীর প্রতি রাগ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ নিরপরাধী ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের প্রতি কাল্পনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সান্ত্বনা অনুভব করে। তেমনি আমরা অনেক সময়ে দলিত প্লীহাযন্ত্রের যন্ত্রণায় কোনো বিশেষ ইংরাজ কাপুরুষের প্রতি রাগ করিয়া গবর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হই। কারণ, গবর্নমেন্টকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না, অনেকটা শিক্ষা ও কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে খাড়া করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহাতে করিয়া জিহ্বা এবং জীবাত্মার অধিকাংশই বহির্গত হইয়া পড়ে অথবা অপমানশেল হৃৎপিণ্ডের শোণিত শোষণ করিতে থাকে, তাহা অত্যন্ত নিকটে অনুভব না করিয়া থাকা যায় না।

অতএব ভ্রমের কারণ মন হইতে দূর করিয়া সেই ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইয়া

আমরা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।

অতএব সকলেই বলিবেন ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কাজ। সেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহজেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভালো হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।

এই সন্তোষ পদার্থটি কিছু উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইহাতে কাজ যেমন অগ্রসর করিয়া দেয় এমন আর কিছুতে নহে। রুচিপূর্বক আহার করিলে তবে পরিপাকের সহায়তা হয়। কার্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নতুবা উপকারের গ্রাসও গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া উঠে এবং তাহা অন্তরে অন্তরে অন্তর্দংশ বেদনা আনয়ন করে।

কিন্তু আমাদের বিরোধীপক্ষীয় ইংরাজি সম্পাদকেরা অতিরিক্ত বুদ্ধিপ্রভাবে বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্যজাতীয়, অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রি-অভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেই অসন্তুষ্ট হইবে।

আমাদের ইংরাজি সম্পাদক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করেন তো নির্ভয় হইয়া একটা কথা বলি। আমার বিশ্বাস আছে হাস্যরসকুতূহলী ইংরাজ জাতি হাস্যাস্পদ হইতে একান্ত ডরাইয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যখন সমস্ত ভারতবর্ষ কন্‌গ্রেসযোগে ইংলন্ডের নিকটে নিবেদন করিতেছেন যে স্বাধীন মন্ত্রীনিয়োগের অধিকারই তাঁহাদের সর্বপ্রধান প্রার্থনা এবং সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের প্রধান অসন্তোষের কারণ দূর হইবে, তখন কোন্ লজ্জায় হাস্যরসতত্ত্বের সমুদয় নিয়ম বিস্মৃত হইয়া ইংলন্ডবাসী সম্পাদক এ কথা বলেন যে, এই গৌরবজনক অধিকার লাভে সফল হইলেই প্রাচ্য ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হইবে! এ বিষয়ে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো মতভেদ থাকিতে পারে না যে, ব্যথিত ব্যক্তি নিজের বেদনা যতটা বোঝে, স্বয়ং ইংরাজ সম্পাদকও এতটা বোঝেন না।

অতএব আমাদের সন্তোষ-অসন্তোষের সম্বন্ধে আমরাই প্রামাণ্য সাক্ষী; ইংরাজ সম্পাদকের প্রতিবাদ এ-স্থলে কিঞ্চিৎ অসংগত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা এই মন্ত্রী-অভিষেক-প্রথায় ক্ষুব্ধ হইবেন। কেন হইবেন? তাঁহাদের অধিক পরিমাণে তেজ আছে বলিয়াই কি তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা চাহেন না? স্বাধীন অধিকার কি তবে কেবল যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষেই অরুচিকর? আমরা যুদ্ধপ্রিয় নহি, কিন্তু অনুমান করি যোদ্ধৃজাতির প্রতি এরূপ কলঙ্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অন্যায়।

তবে যদি এ কথা বল, আমাদের যোদ্ধৃজাতীয়েরা এখনো এতটা দূর বাক্‌পটুতা লাভ করেন নাই যাহাতে করিয়া মন্ত্রীসভায় বসিয়া পরামর্শ দান করিতে পারেন, সুতরাং সেখানে আসন অধিকার করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন না এবং সক্ষম-শ্রেণীয়দের প্রতি তাঁহাদের অসূয়ার উদ্রেক হইবে— তাহার আর কী প্রতিবাদ করিব? এ কথা কতকগুলি সংকীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্রকল্পনাপ্রসূত। ইহাতে আমাদের বীরজাতিদিগকে অপমান করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি নাই এবং তাঁহাদের জাতীয়েরা যোগ্য ব্যক্তিকে চিনিতে পারে না, দুই-চারিজন ইংরাজের মুখের কথাকে ইহার প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি— ইংরাজের সুশাসনে আমাদের যোদ্ধৃবর্গের যুদ্ধ করিবার অবসর কোথায়? অতএব যখন যুদ্ধগৌরবের দ্বার রুদ্ধ, তখন কি স্বভাবতই জাতীয় রাজনৈতিক গৌরবের প্রতি তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে না? যদি স্বতঃ না হয় তবে যে-কোনো উপায়ে হউক জাতিস্বভাবসুলভ যুদ্ধলালসা হইতে তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজ্যচালন ও শান্তিকার্যের মধ্যে তাঁহাদের গৌরবস্পৃহা চরিতার্থ করিতে দিবার চেষ্টা করা কি রাজপুরুষেরা উচিত জ্ঞান করেন না?

পূর্ব এবং পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক্‌ তথাপি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধীধর্মাবলম্বী নহে। তাহা যদি হইত তবে ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজি শাসনপ্রণালী এ দেশে মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় আদ্যোপান্ত নিষ্ফল হইত। বিরোধীপক্ষীয়েরা হয়তো অবিশ্বাস করিবার মৌখিক ভান করিবেন তথাপি এ কথা আমরা বলিব, যে, যদিও আমরা প্রাচ্য এবং তোমাদের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় গৌরব উপার্জন করিতে অক্ষম হইয়াছি তথাপি কোন্‌ অধিকার গৌরবের এবং কোন্‌ নিষেধ অপমানের তাহা আমাদের প্রাচ্য হৃদয়েও অনুভব করিতে পারি। আমাদের মানবপ্রকৃতির এত দূর পর্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুষ্ট হইব। আমাদের জাতিধর্ম-সহিষ্ণুতাকে তোমরা সম্যক্‌ অসাড়তা বলিয়া ভ্রম কর, তাহার কারণ তোমরা আমাদের সুখদুঃখ-বিরাগ-অনুরাগপূর্ণ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া আসিতেছ। যদিও আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে চিরকাল যথেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি, তথাপি মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাপ্রীতির মৃত্যুঞ্জয়ী বীজ আমাদের হৃদয়ে এখনো সম্পূর্ণ নির্জীব হয় নাই।

আর কিছু না হউক তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সুখসন্তোষের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্বদিকে বাস করিয়াও একরকম বুঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধৃজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এ বিষয়ে আমাদের হইতে কিছুমাত্র পৃথক তাহাও মনে করিতে পারি না। অতএব দুঃখনিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসন্তুষ্ট হইবে ইংলন্ডবাসী ভারতহিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি।

অথচ সন্তোষ-উদ্রেকের জন্য বেশি যে কিছু করিতে হইবে তাহাও নহে। যদি কর্তৃপক্ষেরা বলিতেন তোমরা মন্ত্রীসভায় বসিবার একেবারেই যোগ্য নও, অতএব মিছে কানের কাছে বকিয়ো না। তাহা হইলে আমরা ধমকটি খাইয়া শুষ্কমুখে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম।

কিন্তু গোড়াকার প্রধান কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তোমাদের রাজতন্ত্রের পার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছ; আরও লোক বাড়াইতে চাও। তোমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পদেও আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমাদের যোগ্যতার প্রতি যে তোমাদের আন্তরিক বিশ্বাস আছে তাহার সহস্র পরিচয় দিয়াছ। তোমরা আপনা হইতে স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে যে-সকল উচ্চ অধিকার দিয়াছ, যে উন্নতিমঞ্চে আরোপণ করিয়াছ, তাহা আমাদের পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার স্বপ্নেরও অগম্য। আজ আমরা অন্তরের মধ্যে আত্মগৌরব অনুভব করিয়া আত্মবিশ্বাসের সহিত আমাদের লব্ধ অধিকার ঈষৎ বিস্তৃত করিবার প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেন বিমুখ হইতেছ?

আমাদের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে তাহা প্রমাণ করিবার অবসর তো তোমরাই দিয়াছ। আমাদের প্রতি তোমরা যখন জেলা শাসনের ভার দিলে তখনই আমরা নিজে জানিলাম যে আমরা শাসনভার লইবার যোগ্য, তোমরা যখন আমাদিগকে সর্বোচ্চ বিচারাসনে স্থান দিলে তখন আমরা আপনারাই দেখিলাম আমরা সে গুরুতর কার্যভার ও উচ্চতর সম্মানের অধিকারী, তোমরা যখন ভারতীয় রাজকার্যের পরামর্শের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিলে তখন আমরা প্রমাণ পাইলাম এই বিপুল রাজ্যচালনকার্যে আমাদের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া, আমাদের আশা উদ্রেক করিয়া, আজ আমাদের শিক্ষা আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহকে কোন্‌ মুখে নিষ্ফল করিবে?

যখন প্রার্থনা করি নাই, এবং রাজশক্তির নিকট প্রার্থনা করিবার উপায় মাত্র জানিতাম না, তখন তোমরা আমাদের উচ্চ-অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছ। কিন্তু তদনুরূপ কার্য হয় নাই, তাহা তোমরাও স্বীকার করিতেছ এবং আমরাও অনুভব করিতেছি। একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল বদান্যতা আছে যাহা সহসা স্বতঃ উৎসারিত উচ্ছ্বাসপ্রাচুর্যে মুক্তহস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু স্বহস্ত-

রচিত ঋণপত্র বা প্রতিশ্রুতিলিপি দেখিলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্তি ধারণ করে, যাহা আকস্মিক আবেগে বৃহৎ অঙ্গীকারে জড়িত হয় এবং অবশেষে ন্যায্য উপায়-ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ছলে বলে সেই স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকারপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

দেখা যাইতেছে, তোমরা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছ এবং কিছু কিছু দিয়াছ। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস-অনুসারিণী অধিকারপ্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা প্রকাশ কর। কিন্তু মনে মনে কি জান না ইহাতেই যথার্থ রাজভক্তি প্রকাশ পায়?

তোমাদের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহা কোনো বিজিত জাতি কোনো জেতৃজাতির নিকট বিশ্বাসপূর্বক প্রার্থনা করিতে পারিত না। ইহাই তোমাদের প্রতি যথার্থ ভক্তি, সেলাম করা বা জুতা খোলা নহে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুখে যাহাই বলি, যখনি তোমাদের নিকট উন্নত অধিকার প্রত্যাশা করি তখনি তোমাদের মহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি কী সুগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছ এবং আপন প্রচণ্ড বলে এই আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছ। আমাদের মনে এ আশা কোথা হইতে জন্মিল যে তোমাদের ঐ মহিমান্বিত রাজপ্রাসাদের উচ্চ সোপান আমাদের পক্ষে অনধিগম্য নহে? অবশ্যই তোমাদের খাপের মধ্য হইতে যেমন তরবারি মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় আপন বিদ্যুৎ-আভা প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে দীপ্ত মনুষ্যত্বের মহিমা বিরাজ করিতেছে তাহাও প্রবল শাসনের মধ্য হইতে মাভৈঃ শব্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নে ভূমিতলে দ্বারের নিকট যে প্রহরী বন্দুকের উপরে সঙিন চড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহার অপ্রসন্ন মুখে নিষেধের ভাব দেখা যায়, কিন্তু যে জ্যোতিষ্মান পুরুষ প্রাসাদের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া আছে সে আমাদিগকে অভয়দান করিয়া আহ্বান করিতেছে। ঐ দুর্মুখ প্রহরীটাকে আমরা ভয় করি এবং মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই তাহার শক্তিশেলের লক্ষ্য এড়াইয়া তাহার প্রতি নিষ্ফল কটুকাটব্যও প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সেই প্রসন্নমূর্তি মহাপুরুষের মুখের দিকে আমরা আশান্বিত চিত্তে চাহিয়া আছি। ইহাকেই কি ভক্তির অভাব বলে!

এক ইংরাজ আমাদের প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া তাকায়। আর-এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহত্ত্বের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করে। এইজন্য ভয়ের অপেক্ষা ভক্তিই প্রবল হয়। আশঙ্কার উপরে আশাই জয়লাভ করে। এবং আমাদের এই আশাই যথার্থ রাজভক্তি।

দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র এক দল আছেন ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহাদের মনে এতই বলবান যে কন্‌গ্রেসের প্রতি কিছুতেই তাঁহারা প্রসন্নদৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহারা নীরবে রাজবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, ইংরাজের নিকট উপকার প্রত্যাশা করে বলিয়াই তাঁহারা কন্‌গ্রেসের প্রতি বিমুখ। ইঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কন্‌গ্রেসের যথার্থ ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

ইঁহারা বলেন ইংরাজ কি তেমনি পাত্র! এত কাল যাহারা তোমাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আসিয়াছে তাহারা কি আজ তোমাদের কথায় ভুলিবে! তোমরা এ বিদ্যা কত দিনই বা শিখিয়াছ! উহাদের কথার সহিত কাজের মিল করাইবার জন্য দাবি করিয়া বসিলে লাভে হইতে ফল হইবে এই যে, মিষ্ট কথাটুকু হইতেও বঞ্চিত হইবে। তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখো। যে অবধি তোমরা উক্ত দেশহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই অবধি পায়োনিয়র-প্রমুখ দেশের ইংরাজি কাগজ খৃস্টানজনোচিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। স্বয়ং বড়োকর্তা সালিস্‌বারি আর থাকিতে পারিলেন না, প্রকাশ্যে তোমাদের কালামুখের উপর মুখনাড়া দিলেন। মিষ্টবাক্য মধুর-আশ্বাস এ-সকল সভ্যতার ভূষণ—এগুলোকে তোমরা এত বেশি খাঁটি বলিয়া ধরিয়া লইতেছ যে দায়ে ফেলিয়া অবশেষে ইংরাজের মধুর সভ্যতা এবং শোভন ভদ্রতাটুকুও তাড়াইবে। একদিন দেখিবে

মিষ্টান্নও নাই, মিষ্ট বচনও নাই। দেখো-না কেন, কর্তৃজাতীয়দের কেহ কেহ এত দূর পর্যন্ত স্পষ্টবক্তা হইয়াছেন যে, এই ঊনবিংশ খৃস্টশতাব্দীর অপরাহ্ন-ভাগে তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলিতেছেন যে 'তরবারিদ্বারা আমরা জয় করিয়াছি, তরবারিদ্বারা আমরা রক্ষা করিব'। অর্থাৎ, মানবপ্রেম, নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা এ-সকল ধর্মবচন কেবল নিজের উপরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তরবারিলব্ধ ভারতবর্ষের প্রতি এ-সকল খৃস্টীয় বিধান খাটে না। দেখো একবার কী কাণ্ডটা করিয়াছ! স্বয়ং ঊনবিংশ শতাব্দীর বোল ফিরাইয়া দিয়াছ! তবে আর তাহার অবশিষ্ট কী রাখিলে! তাহার তরবারি এবং জিহ্বা দুটোই সমান প্রখর হইয়া উঠিল, ধর্মনীতি কোথাও স্থান পাইল না।

কিন্তু কন্‌গ্রেসের ভিত্তি ইংরাজবিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কন্‌গ্রেস বলে, অবশ্য, মনুষ্যচরিত্র একেবারে দেবতুল্য নহে। ক্ষমতালালসা প্রভুত্বপ্রিয়তা স্বার্থপরতা ইংরাজের হৃদয়েও আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও এমন-কিছু আছে যাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হয় না। প্রতিদিন গালি খাইতেছি, লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি, তবুও কোথা হইতে অন্তরের মধ্যে অভয় প্রাপ্ত হইতেছি।

ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী 'ষড়যন্ত্রকারী বাবুসম্প্রদায়' 'মুখসর্বস্ব বাক্যবীর' ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্রজ্বালা নিহিত করিয়া চতুর্দিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না! তোমরা যদি আরম্ভ কর তো আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি! তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বায়ব-শক্তিতেই তো তোমাদের এত বড়ো রাজনৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে। কথা-ভরা-ভরা রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ, এত দিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম তবে আর কী শিখিলাম! তোমাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি—কথাই তোমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য, ভালো কথা এবং মন্দ কথা দুইই আছে। আমরা যে সব সময়ে মিষ্ট কথাই বলি তাহা নহে। কিন্তু তোমরাও যে বল তাহাও সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি না।

সকলেই স্বীকার করিবেন, নির্বাপিত জঠরানলে সার্বভৌমিক প্রেম অত্যন্ত সহজ হইয়া আসে। তোমরা প্রভু, তোমরা কর্তা, তোমরা বিজেতা, তোমরা স্বাধীন, আমাদের তুলনায় সর্বতোভাবে সকল প্রকার সুবিধাই তোমাদের আছে—তোমাদের পক্ষে সহিষ্ণু হওয়া, উদার হওয়া, ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কত অনায়াসসাধ্য। আমাদের মনে স্বভাবত অনেক সময়ে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, আমরা তোমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য, দরিদ্র এবং অসহায়, আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি তোমাদের বিজাতীয় ঘৃণা অথবা কৃপাদৃষ্টি অনেক সময়ে পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ পায়, আমরা সে ঘৃণার যোগ্যপাত্র হই বা না হই তাহার অপমানবিষ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব আমরা যদি অসহিষ্ণু হইয়া কখনো অসংযত কথা বলিয়া ফেলি, অথবা ক্ষুব্ধ অভিমানকে সান্ত্বনা করিবার আশায় মুখে তোমাদিগকে লঙ্ঘন করিবার ভান করি, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তোমাদের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, সৌভাগ্যসুখের মধ্যে থাকিয়াও অসংবৃত হইয়া তোমরা আমাদের প্রতি এমন রূঢ়ভাষা প্রয়োগ কর যাহাতে তোমাদের আন্তরিক দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা নিজের রসনাকে যখনই সংযত করিতে পার না তখনই আমাদিগকে বল বাক্যবাগীশ। আমাদের আবার এমনি দুর্ভাগ্য তোমাদের ভাষা লইয়াই তোমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়, সুতরাং তাহাতেও হার মানিয়া আছি।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই বাক্যকেই আমরা একমাত্র সম্বল করিতেছি বলিয়া তোমরা এত বিরক্ত হও কেন? আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে একদল আছেন তাঁহারা কথা কহিতে চান না; যেটুকু কহেন তাহাতে এত অতিমাত্রায় রাজভক্তির আড়ম্বর যে তাহাতে তোমরাও ভোল না আমরাও ভুলি না; তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার নিকটেও অধিক পরিমাণে ঋণী নহেন, ইংরাজের

রাজত্ব আসিয়াও তাঁহাদের গৌরব বা সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি করে নাই— সামান্য অধিকার এবং সামান্য সম্মানকে তাঁহারা স্বভাবতই উপহাসযোগ্য মনে করেন। তাঁহারা যেরূপ সাবধান চোরা মৌনভাব অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেরূপ গবর্নমেন্টের সকল কথাতেই অতিরিক্ত পরিমাণে স্কন্ধ-আন্দোলন করিয়া রাজভক্তির প্রচুর আস্ফালন করেন, সেইরূপ ভাবই কি তোমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান কর?

আমাদের একমাত্র বিশ্বাস কথার উপরে— হয়তো আমাদের কোনো কোনো মুসলমান ভ্রাতার তাহা নাই— এজন্য বরং তোমাদের নিকট হইতেও আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি, তথাপি কন্‌গ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কন্‌গ্রেসের প্রতি সন্দিগ্ধভাব দূর করিয়া কন্‌গ্রেসের চতুর মৌনী বিরোধী পক্ষের প্রতি সন্দেহ স্থাপন করো।

কন্‌গ্রেস আর-এক উপায়ে রাজভক্তি শিক্ষা দিতেছে।

ইংরাজেরই মহিমা কন্‌গ্রেসের অস্থিমজ্জার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে। ইংরাজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি কন্‌গ্রেসের মর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান করিতেছে। বাহিরে পায়োনিয়রের স্তম্ভে, রাজকর্মচারীদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্যপ্রণালীর মধ্যে, ইংরাজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি— এ দিকে দুর্ভাগা দরিদ্র জাতির জন্য হিউমের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন, ইউল ও বেডর্‌বর্নের জ্যোতির্ময় সহৃদয়তা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

ইংরাজ জাতি যে কত মহৎ কন্‌গ্রেস না থাকিলে তাহার এমন নিকট প্রমাণ পাইবার আমাদের অবসর হইত না। সেই প্রমাণ পাইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘর্ষ— এবং ইংরাজ এখানে প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতামদে মত্ত, সুতরাং স্বভাবত ইংরাজের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ভারতবর্ষে তেমন স্ফূর্তি পায় না, বরঞ্চ তাহার ক্ষুদ্রতা নিষ্ঠুরতা ও দানবভাব অনেক সময়ে সজাগ হইয়া উঠে।

এ দিকে ইংরাজি সাহিত্যে আমরা ইংরাজি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না— এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মনে অল্প দিন হইল ইংরাজের ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পর্ধিত সভ্যতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতি-নীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে সহৃদয়তা ও অকৃত্রিমতা নাই।

ইহার প্রধান কারণ ইংরাজের নিকট হইতে সহৃদয়তা প্রত্যাশা করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি, এবং আমাদের আহত হৃদয়ের বেদনায় ইংরাজি সভ্যতাকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে হিউম, ইউল, বেডর্‌বর্ন কন্‌গ্রেসকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতার আশ্রয়ে আনীত হইয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ হইয়া তাহার সুফল-সকল স্বেচ্ছাপূর্বক অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। আমরা ইতিহাসে ও সাহিত্যে ইংরাজের যে মহৎ আদর্শ লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ মূর্তিমান ও জীবন্ত হইয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যতই সাধুপ্রসঙ্গ ও সৎশিক্ষা থাক্‌ তাহা এক হিসাবে মৃত, কারণ যে-সকল মহাপুরুষেরা সেই সাধুভাব সকলকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে

পুনশ্চ প্রাণলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর বর্তমান নাই—কেবল শুষ্ক শিক্ষায় অসাড় জীবনকে চৈতন্যদান করিতে পারে না। আমরা মানুষ চাই। বর্তমান সভ্যতা যাঁহাদিগকে মহৎজীবন দান করিয়াছে এবং যাঁহারা বর্তমান সভ্যতাকে সেই জীবন প্রত্যর্পণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই-সকল মহাপুরুষের মহৎ প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। হিউম্‌কে নিকটে পাইয়া আমাদের ইংরাজি ইতিহাসশিক্ষার ফল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে—নতুবা আমরা যে-সকল উদাহরণ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহাতে সে শিক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছিল।

অতএব কন্‌গ্রেসের দ্বারায় উত্তরোত্তর আমাদের যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি হইতেছে এবং মহৎ মনুষ্যত্বের নিকট-সংস্পর্শ লাভ করিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে মহত্ত্ব সঞ্চারিত হইতেছে।

আমরা কথা কহি বলিয়া যে ইংরাজি সম্পাদকেরা আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মনের ভাব যে কী তাহা ঠিক জানি না। বোধ করি তাঁহারা বলিতে চান 'তোমরা কাজ করো'।

ঠিক সেই কথাটাই হইতেছে! কাজ করিতেই চাই। সেইজন্যই আগমন। যখন আমরা কাজ চাহিতেছি তখন তোমরা বলিতেছ, 'কথা কহিতেছ কেন!' আচ্ছা, দাও কাজ।

অমনি তোমরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, 'না না, সে কাজের কথা হইতেছে না—তোমরা আপন সমাজের কাজ করো!'

আমরা সমাজের কাজ করি কি না করি সে খবর তোমরা রাখ কি? যখনি কাজ চাহিলাম অমনি আমাদের সমাজের প্রতি তোমাদের সহসা একান্ত অনুরাগ জন্মিল। আমাদের সমাজের কাজে যদি আমরা কোনো শৈথিল্য করি আমাদের চৈতন্য করাইবার লোক আছে; জানই তো বাক্‌শক্তিতে আমরা দুর্বল নহি। অতএব পরামর্শ বিলাত হইতে আমদানি করা নিতান্ত বাহুল্য।

যাঁহারা রাজনীতিকে সমাজনীতির অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যাঁহারা রাজপুরুষদের কর্তব্যবুদ্ধি উদ্রেক করাইতে নিরতিশয় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের কর্তব্যকার্যে অবহেলা করেন, তাঁহারা অন্যায় করেন এবং সে সম্বন্ধে আমাদের স্বজাতীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমরা মাঝে মাঝে চেষ্টার ত্রুটি করি না। শ্রোতৃবর্গ বোধ করি বিস্মৃত হইবেন না, বর্তমান বক্তাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে মধ্যে মধ্যে অগত্যা এইরূপ অপ্রীতিকর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কর্তব্যের আপেক্ষিক গুরুলঘুতা সকল সময়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া চলা কোনো জাতির নিকট হইতেই আশা করা যাইতে পারে না। অন্ধতা, হৃদয়ের সংকীর্ণতা বা কৃত্রিম প্রথা-দ্বারা নীত হইয়া তোমাদের স্বজাতীয়েরা যখনি যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃতের অপেক্ষা অধিকতর সম্মান দিয়াছে, তখনি তোমাদের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, তোমাদের কার্লাইল, ম্যাথু আর্নল্ড, রস্কিন্ স্বজাতিকে সতর্ক করিতে ভূয়োভূয় চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হইতেছে কি না বলা কঠিন। কারণ, সামাজিক সংস্কারকার্য অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে নিগূঢ় অলক্ষিতভাবে সাধিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক জীবনশক্তির ন্যায় সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখে। তাহার প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ হিসাব পাওয়া দুঃসাধ্য।

আমাদের সমাজেও সেইরূপ জীবনের কার্য চলিতেছে, তাহা বিদেশীয় দৃষ্টিগোচর নহে। এমন-কি স্বদেশীয়ের পক্ষেও সমাজের পরিবর্তন প্রতি মুহূর্তে অনুভবযোগ্য হইতে পারে না।

অতএব আমাদের সমাজের ভার আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকদের প্রতি অর্পণ করিয়া যে কথাটা তোমাদের কাছে উঠিয়াছে আপাতত তাহারই উপযুক্ত যুক্তি-দ্বারা তাহার বিচার করো। বলো যে 'তোমরা অযোগ্য' অথবা বলো যে 'আমাদের ইচ্ছা নাই'—কিন্তু 'তোমাদের বাল্যবিবাহ আছে' বা 'বিধবাবিবাহ নাই' এ কথাটা নিতান্তই অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সামাজিক অসম্পূর্ণতা তোমাদের দেশেও আছে এবং পূর্বে হয়তো আরও অনেক ছিল, কিন্তু সে কথা বলিয়া তোমাদের বক্তৃতা কেহ বন্ধ করে নাই, তোমাদের রাজনৈতিক প্রার্থনা কেহ নিরাশ করে নাই।

তোমরা এমন কথাও বলিতে পারিতে যে 'তোমাদের দেশে আমাদের মতো এমন সংগীতচর্চা ও চিত্রশিল্পের আদর এখনো হয় নাই অতএব তোমাদের কোনো কথাই শুনিতে চাহি না'। ইহা অপেক্ষা বলা ভালো 'আমার ইচ্ছা আমি শুনিব না', তাহাতে তোমাদেরও কথা অনেকটা সংক্ষেপ হইয়া আসে। কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যেই তোমাদের অপেক্ষা আরও উচ্চ বিচারশালা আছে, সেইজন্যই আমরা আশা ত্যাগ করি নাই এবং সেইজন্যই আমাদের কন্‌গ্রেস।

যদিও আমার এ-সকল কথা তোমাদের কর্ণগোচর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই—কারণ, আমাদের সমাজের মঙ্গলের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত প্রচুর অনুরাগ সত্ত্বেও আমাদের ভাষা তোমরা জান না, জানিতে ইচ্ছাও কর না—তথাপি দুরাশায় ভর করিয়া আমাদের কন্‌গ্রেসের প্রতি তোমাদের অকারণ অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য মাঝে হইতে তৎসম্বন্ধে এতটা কথা বলিলাম। দেখাইলাম তোমাদের প্রতি ভক্তিই কন্‌গ্রেসের একমাত্র আশা ও সম্বল।

অতএব কন্‌গ্রেসের নিকট হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে তাহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি করিয়া থাকা তোমাদের বিবেচনার ভুল। তাহার প্রতি প্রসন্ন কর্ণপাত করা রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্তব্য। কারণ, কন্‌গ্রেস জেতৃ ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া দিতেছে।

গবর্নমেন্টের দ্বারা মন্ত্রীনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রী-অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকটে প্রার্থনীয় মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সন্তোষ একটি প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী এই অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। যদি ইহা দান করিলে গবর্নমেন্টের কোনো ক্ষতি না হয় তো প্রজারঞ্জন একটা মহৎলাভ।

গবর্নমেন্ট শব্দটা শুনিবামাত্র হঠাৎ ভ্রম হয় যেন তাহা মানবধর্মবিবর্জিত নির্গুণ পদার্থ। যেন তাহা রাগদ্বেষবিহীন। যেন তাহা স্তবে বিচলিত হয় না, বাহ্য চাকচিক্যে ভোলে না, যেন তাহার আত্মপরবিচার নাই, যেন তাহা নিরপেক্ষ কটাক্ষের দ্বারা মন্ত্রবলে মানবচরিত্রের রহস্য ভেদ করিতে পারে। অতএব এরূপ অপক্ষপাতী সর্বদর্শী অলৌকিক পুরুষের হস্তেই নির্বাচনের ভার থাকিলেই যেন ভালো হয়।

কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি গবর্নমেন্ট আমাদেরই ন্যায় অনেকটা রক্তমাংসে গঠিত। উক্ত গবর্নমেন্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্‌টেনিস্‌ খেলেন, মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন এবং অধম আমাদেরই মতো সামাজিক স্তুতিনিন্দায় বহুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকেন।

অতএব, এ স্থলে গবর্নমেন্টের দ্বারা নির্বাচনের অর্থ আর কিছুই নয়, একটি বা দুইটি বা অল্পসংখ্যক ইংরাজের দ্বারা নির্বাচন।

কিন্তু আমরা পদে পদে প্রমাণ পাইয়াছি ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুরক্ত নহেন। কারণ, নব্যরুচি অনুসারে ইঁহারা চশমা ব্যবহার করেন, দাড়ি রাখেন, ইংরাজি জুতা পরেন, এবং সে জুতা সহজে খুলিতে চাহেন না। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, ইঁহাদের ঔদ্ধত্য, ইঁহাদের বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহারা একান্ত উদ্‌বেজিত হইয়া আছেন। অতএব তাঁহাদের হস্তে নির্বাচনের ভার থাকিলে এই শিক্ষিত দলের পক্ষে বড়ো আশার কারণ নাই। ইঁহাদের দর্প চূর্ণ করা তাঁহারা রাজনৈতিক কর্তব্য জ্ঞান করেন। অতএব শিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে কেবল যে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন তাহা নহে, উপরন্তু সাহেবের নিকট দুটো শ্রুতিপরুষ অথচ বাৎসল্যগর্ভ উপদেশ শুনিয়া এবং প্রবেশাধিকারের মূল্যস্বরূপ দ্বারীকে কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা কিছু এমনি বিড়ম্বনা নহে যে কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সকল প্রকার যোগ্যতা লাভে অক্ষম হইয়াছেন। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই-যে বিরাগ তাহা কেবল ব্যক্তিগত রুচিবিকার মাত্র, তাহা যুক্তিসংগত ন্যায়সংগত নহে।

কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনকালে : ১৮৯০

নলিনবিহারী সরকার, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক, ফিরোজশাহ্ মেহতা, শেলি বন্দ্যোপাধ্যায়

তদ্ভিন্ন তাঁহারা কয় জন দেশীয় উপযুক্ত লোককে রীতিমত জানেন? তাঁহাদের নির্বাচনক্ষেত্রের পরিধি কতই সংকীর্ণ! উপাধিবান রাজা উপরাজার সহিতই তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণ মৌখিক আলাপ আছে মাত্র। মন্ত্রীসভায় আসন পাওয়া যাঁহারা কেবলমাত্র সম্মান বলিয়া জ্ঞান করেন, জীবনের গুরুতর কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে সেখানে স্থান পাইয়া থাকেন।

অবশ্য, সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। অনেক যোগ্য ব্যক্তিও স্থান পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত বর্তমান বক্তার পরম গৌরবের আত্মীয়তাসম্পর্ক আছে। কিন্তু সে-সকল যোগ্য ব্যক্তি সাধারণের অপরিচিত নহেন। সাধারণের দ্বারা তাঁহাদের নির্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

আমার জিজ্ঞাস্য কেবল এই যে, আমাদের অপেক্ষা গবর্নমেন্টের অর্থাৎ দুই-চারি জন ইংরাজের এ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা কোথায়? আমাদের শিক্ষিতসাধারণে যাঁহাদিগকে বড়োলোক বলিয়া জানেন তাঁহাদের অবশ্য কিছু-না-কিছু যোগ্যতা আছেই। কিন্তু গবর্নমেন্ট যাঁহাদিগকে বড়োলোক বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য, বৃহৎ শিরোপা বা অতিবিনীত সেলামের ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু যথার্থ যোগ্যতা না থাকিতেও পারে।

আমরা যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রীসভায় দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ গবর্নমেন্ট তেমন অত্যাবশ্যক মনে করেন না, সুতরাং নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধান ও বিবেচনার সহিত কাজ করা তাঁহারা অনেকটা বাহুল্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের ভাব ঠিক তাহার বিপরীত। গবর্নমেন্টকে বাস্তবিক সুপরামর্শ দিয়া দেশের হিতসাধন করিতে হইবে এবং স্বজাতির যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া গৌরব লাভ করিব, এই আমাদের উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র সভাগৃহের শোভা-সম্পাদনে আমাদের কোনো ফল নাই, স্বার্থ নাই। সুতরাং নির্বাচনের সময় আমাদিগকে সবিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করিতে হইবে।

পুনশ্চ, গবর্নমেন্ট যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা গবর্নমেন্টের অনুগ্রহআশ্রয়ে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির সে আশা নাই, সুতরাং খুব মজবুত দেখিয়াই লোক বাছিতে হইবে। অতএব আমাদের হাতে যোগ্য লোক বাছাই হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অর্থাৎ, গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে 'গরজ' বলে তাহার দ্বারা সংসারের অধিকাংশ কাজ হইয়া থাকে। মন্ত্রীসভায় দেশীয় লোক নির্বাচন করিতে গবর্নমেন্টের কোনো গরজ দেখা যাইতেছে না। অর্ধ অনিচ্ছার সহিত তাঁহারা একটা আপসে মীমাংসা করিতে চাহেন। লর্ড্‌ ক্রস বলেন যদি ভারত-শাসনকর্তারা ইচ্ছা করেন তো নিজে গুটিকতক দেশীয় লোক নির্বাচন করিয়া মন্ত্রীসংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে পারেন। আমাদের ভারতরাজকর্মচারীগণও এ বিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না।

অতএব যখন দেশীয় মন্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গবর্নমেন্টের কিছুমাত্র গরজ নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে দুই-চারিটা দেশী লোককে ডাকিলেও চলে, না ডাকিলে হয়তো আরও ভালো চলে, তখন তাঁহাদের হাতে নির্বাচনের ভার কোন্‌ সাহসে দিই! গরজ আমাদেরই। অতএব আমরাই যথার্থ নির্বাচনের অধিকারী।

এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে, আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র; বিচারের ভার, কার্যের ভার তোমাদের। আমরা কেবল জানাইতে চাহি ও জানিতে চাহি। তোমরা আমাদের উপর আইন খাটাইবে। আমরা আমাদের গায়ের মাপ দিতে চাহি। দেখাইতে চাহি কোথায় কষাকষি করিলে আমাদের নিশ্বাস রোধ হইয়া আসে, এবং কোথায় ঢিলা হইলে আমাদের অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ও আরামের ব্যাঘাত হয়।

অতএব আমাদেরই লোক যদি না পাঠাইলাম তবে আমাদের আবশ্যক কে জানাইবে? তোমরা যাহাকে নির্বাচন করিয়া সম্মানিত কর সে স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণে তোমাদের অঙ্গভঙ্গির

অনুকরণ করে ও তোমাদেরই ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করে মাত্র। তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা জানাইতে সহজে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। তোমরা যে অতিরিক্ত আরও গুটিকতক দেশীয় লোক মন্ত্রীসভায় আহ্বান করিতেছ তাহার উদ্দেশ্য কী? আমাদের অভাব, আমাদের আবশ্যক, আমাদের লোকের মুখে আরও ভালো করিয়া জানিতে চাও। ইহা ছাড়া দেশীয় মন্ত্রীবৃদ্ধির আর কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। যদি বাস্তবিক সেই উদ্দেশ্যই থাকে তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে তোমাদের নির্বাচনে তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, এবং আমাদের নির্বাচনেই সেই উদ্দেশ্য বাস্তবিক সফল হইবে। আগে একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে স্থির করো, তার পরে সে উদ্দেশ্য কিসে সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া দেখো।

যদি বল 'উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই, আমরা দেশীয় মন্ত্রীর কোনো আবশ্যক বোধ করিতেছি না, কেবল, তোমরা কিছুদিন হইতে বড়ো বিরক্ত করিতেছ, তাই অল্পস্বল্প খোরাক দিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য', তবে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই আজই তাহার প্রমাণ। আজ আমরা এই শহরের যত বক্তা এবং যত শ্রোতা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাশয্যা হইতে কায়ক্লেশে গাত্রোত্থান করিয়া ভগ্নক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি উত্থাপন করিতে আসিয়াছি, শরীর যতই সুস্থ ও কণ্ঠস্বর যতই সবল হইতে থাকিবে আমাদের আপত্তি ততই অধিকতর তেজ ও বায়ুবল লাভ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতরাজ্যতন্ত্রে প্রজাসাধারণের দ্বারা মন্ত্রীনির্বাচন কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রবর্তিত করা যুক্তিসংগত। এ সম্বন্ধে লর্ড্ নর্থ্‌ব্রুক, লর্ড্ রিপন, লর্ড্ ডফারিন, স্যর্ রিচার্ড্ টেম্প্‌ল্ প্রভৃতির কথা কতদূর শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের উপরে আমাদের আর নূতন যুক্তি দেখাইবার আবশ্যক করে না।

আমরা কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিব যে, যুক্তি আমাদের পক্ষে, অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে, সহৃদয়তা আমাদের পক্ষে, বড়ো বড়ো সুযোগ্য লোকের মত আমাদের পক্ষে, তথাপি কেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না? আমাদের এই দুর্দশা দেখিয়াই আমরা আরও অধিকতর আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব যে, যে রাজকীয় রহস্যধামে আমাদের ভাগ্য স্থির হয় সেখানে আমাদের আপনার লোক যেন পাঠাইতে পারি—তাহা হইলে যদি কোনো প্রার্থনায় নিষ্ফলকাম হই, তবে আর কিছু না হউক তাহার একটা যুক্তিসংগত উত্তর শুনিবার স্বল্প সুখ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এইখানেই আমি ক্ষান্ত হইতে চাহি। আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ, অনেক তর্ক এবং অনেক ইতিহাস আছে। আমি একান্ত সসংকোচে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করি নাই। অভ্যাস অনুরাগ ও চর্চা অনুসারে রাজনীতি আমার অধিকারবহির্ভূত। কেবল মনে মনে ঈষৎ ভরসা আছে যে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গও সম্ভবত যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়, অর্থাৎ সত্যের নিয়ম হয়তো এখানেও খাটে, এইজন্য সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া লর্ড্ ক্রসের রচিত বিধির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি ব্যক্ত করিয়াছি। অনভিজ্ঞতাবশত যদি কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়, তবে আমার পরবর্তী যোগ্যতর বক্তা মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক তাহা সংশোধন ও সম্পূরণ করিয়া লইবেন। যদি কোনো অন্যায় অবিবেচনার কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহার পাপের ভার শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহপূর্বক বক্তার নিজের শিরে চাপাইবেন, কোনো সম্প্রদায় বা সভার স্কন্ধে আরোপ করিবেন না।

আত্মশক্তি

প্রকাশ : ১৯০৫

‘আত্মশক্তি’ ১৯০৫ সালে প্রকাশিত। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে আর মুদ্রিত হয় নি। ফলে গদ্যগ্রন্থাবলীর একাদশ খণ্ড ‘সমূহ’ গ্রন্থে ‘স্বদেশী সমাজ’, ‘“স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট’, ‘ভারতবর্ষীয় সমাজ’ প্রবন্ধের একাংশ এবং ‘সফলতার সদুপায়’, গদ্যগ্রন্থাবলীর দ্বাদশ খণ্ড ‘স্বদেশ’ গ্রন্থে ‘দেশীয় রাজ্য’ এবং চতুর্দশ খণ্ড ‘শিক্ষা’ গ্রন্থে ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ অন্তর্ভুক্ত হলেও বর্তমান গ্রন্থভুক্ত অপর চারটি প্রবন্ধ বিশ্বভারতী-কর্তৃক রচনাবলী প্রকাশ পর্যন্ত দীর্ঘকাল পাঠকদের অগোচরে থেকে যায়। বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থভুক্তিকালে সম্পাদনাসূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে রক্ষিত হয়েছিল।

নেশন কী

নেশন ব্যাপারটা কী, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে দুই-একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরেজিতে—যাহাকে race বলে তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরেজি 'রেস' শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব, এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।

'ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস' শব্দের তর্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাসভা' ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু 'জাতীয়' বলিলে বাঙালি-জাতীয়, মারাঠি-জাতীয়, শিখ-জাতীয়, যে-কোনো জাতীয় বুঝাইতে পারে—ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বুঝায় না। মাদ্রাজ ও বম্বাই 'ন্যাশনাল' শব্দের অনুবাদ-চেষ্টায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ও সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন—বাঙালি কোনোপ্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠি প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালির যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়—সেই প্রভেদে বাঙালির আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাংলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। 'সার্বজনিক' শব্দকে বিশেষ্য আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসি সর্বজন' শব্দ 'ফরাসি নেশন' শব্দের পরিবর্তে সংগত শুনিতে হয় না।

মহাজন শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ' শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেক স্থলেই নেশন শব্দের পূর্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে, 'ক্ষুদ্র মহাজাতি' বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরেজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেনাঁ বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন' ছিল না। ইজিপ্ট চীন প্রাচীন কাল্‌ডিয়া 'নেশন' জানিত না। আসিরীয়, পারসিক ও আলেক্‌জান্ডারের সাম্রাজ্যকে কোনো নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোম-সাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে-না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই-সকল টুকরা বহু শতাব্দী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংলান্ড, জার্মানি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন কেন? সুইজর্‌লান্ড তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল? অস্ট্রিয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, নেশন হইল না?

কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্‌ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোনো বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে। ইংলান্ড, স্কটলান্ড, আয়র্লান্ড পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোটো ছোটো রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে সুইজর্‌লান্ড ও আমেরিকার য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌

ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন টিঁকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারও অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে ন্যাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই ন্যাশনাল অধিকারের ভিত্তি কী, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে?

অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ race-এর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব, জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাঁটি।

কিন্তু, জাতিমিশ্রণ হয় নাই য়ুরোপে এমন দেশ নাই। ইংলান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। কে টিউটন, কে কেল্ট, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। ভাষার ঐক্যে ন্যাশনাল ঐক্যবন্ধনের সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে এক করিবেই এমন কোনো জবরদস্তি নাই। য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্ ও ইংলান্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন নহে। অপর পক্ষে সুইজর্‌লান্ডে তিনটা-চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন। ভাষা অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বড়ো; ভাষাবৈচিত্র্যসত্ত্বেও সমস্ত সুইজর্‌লান্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রুসিয়া আজ জার্মান বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্‌স্ ইংরেজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন ধর্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, য়িহুদি অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক-না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসি বা জার্মান হইবার কোনো বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেনাঁর মতে সে বন্ধন নেশন বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে—তাহার যেমন দেহ আছে তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজনপটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীস্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি ভাষা বৈষয়িক স্বার্থ ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামক মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ

অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীত কালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প—ইহাই জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি আমাদের ভালোবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ি নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব সে বাড়িকে আমরা ভালোবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে, 'তোমরা যাহা ছিলে আমরা তাহাই, তোমরা যাহা আমরা তাহাই হইব।' এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ন্যাশনাল গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ—একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা—এইগুলিই আসল জিনিস, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়; একত্রে মাসুলখানা-স্থাপন বা সীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট-পরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনাঁ বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের আধিপত্য নির্বাসিত করিয়াছি এখন বাকি কী রহিল? মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত—তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মতো প্রাচীন মহৎসম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে—কিন্তু পৃথিবীতে এমন-কিছু আছে যাহার পরিবর্তন নাই? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয়তো এই নেশনদের পরিবর্তে কালে এক য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশনসকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—এক আইন, এক প্রভু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।

বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতাবিস্তারকার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক-একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনাঁ বলেন—মানুষ জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিঁকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেনাঁর উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে রেনাঁর সারগর্ভ বাক্যগুলি আমাদের দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক।

শ্রাবণ ১৩০৮

তুরস্ক যে যে জায়গা দখল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর-কোনো ঐক্য নাই। সেখানে তুর্কি গ্রীক আর্মানি শ্লাভ কুর্দ্ কেহ কাহারও সঙ্গে না মিশিয়া, এমন-কি, পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া কোনোমতে একত্রে আছে। যে-শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী— সেই শক্তি তুরস্করাজ্যের রাজলক্ষ্মীর মতো হইয়া এখনো আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন য়ুরোপে বর্বর জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়া লইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল— কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক-একটি নেশন কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল, সেটা নানাপ্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া সুনির্দিষ্ট আকার ধরিয়া সুদীর্ঘকালে এক-একটি নেশনকে এক-একটি সভ্যতার আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছে।

যে কোনো উপলক্ষে হউক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোনো-না-কোনো প্রকার মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্যসেতু বাঁধিতেছে— বর্বর য়ুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান সৃজন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে য়ুরোপের সভ্যতা ও বর্বরতা উভয়েরই কাজ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্মস্থলে মিলনের উচ্চ আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিয়া বর্বরতার বিচ্ছেদ-অভিঘাতগুলা দ্বিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকি।

এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য একপ্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে-ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার— কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবত সব চেয়ে বড়ো মনে করে। যাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাট করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে মর্মে মর্মে বড়ো বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোনো আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অনুভব করে না। এইজন্য য়ুরোপের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ; আমরাও য়ুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল ভাবের অভাবে লজ্জা বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য— বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা— হিন্দু তাহার কী করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ন্যাশনাল নাম দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষ-বাঁধা লইয়াই বিষয়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই তাহাদের আর কোনো প্রভেদ চোখে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা, কে জিত, সে কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার— নেশনকে বিচ্ছেদবিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভুলিতে হইবে। যেখানে দুই পক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেখানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ— সেখানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্যজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভুলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটিয়াছে? য়ুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন

তাহারা খৃস্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই— তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার— সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই— উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

রেনাঁ দেখাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কী, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, দেশের ভূসংস্থান, এ-সকলের উপরে ন্যাশনালত্বের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুত্বের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দুসমাজের ঐক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্য এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রয়টি বাহির করা সহজ নহে।

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানত কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্য দিব।

রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো। কন্‌গ্রেসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কন্‌গ্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ বিফল হইলেও, ইহা নিজেকে কোনো-না-কোনো দিকে সার্থক করিবেই, দেশের পক্ষে কোন্‌টা মুখ্য ব্যাপার, তাহা আবিষ্কার করিবেই— যাহা বৃথা এবং ক্ষণিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে— সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ তো আছেই, সে তো আমাদের পূর্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দু-সভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে—পূর্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফলভোগ করিতেছে, তাহা নহে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—অখণ্ড কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর-এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্বলিত, অপরাংশ নির্বাপিত, এরূপ নহে। সে হইলে তো সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল—জীবনের সহিত মৃত্যুর কী সম্পর্ক।

কেবলমাত্র অলস ভক্তিতে যোগসাধন করে না—বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরেজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভালো, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে—তাহাতে আসল ইংরেজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ ইংরেজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে। ইংরেজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড়ো হইয়াছে—পরের গড়া জিনিস অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরেজ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইংরেজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরেজত্ব আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্মের সহিত আমাদের জড় সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে—তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে তবেই আমরা বড়ো হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে, নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।

জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে—আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্যচেষ্টা নাই—বাহির হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ—ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না

এবং বর্তমান পরিবর্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্বপুরুষের দোহাই মানিলে তো পূর্বপুরুষ সাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, 'বর্তমানের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদের কীর্তিকে রক্ষা করো, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া ইহাকে সমূলে ধ্বংস হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবসূত্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক কালের সহিত আর-এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।'

কী করিতে হইবে? নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া থাকে। যে সময় হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজ-কলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর— ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন— তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল— ইহাকে বাণিজ্যহিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। ইহাতে পশু হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাসে স্বার্থ পরিহার করা নিশ্বাসত্যাগের ন্যায় সহজ হইয়া আসে। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোনো ফল নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।

শ্রাবণ ১৩০৮

স্বদেশী সমাজ[১]

'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে— কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে— গবর্মেন্ট সাড়া দিয়াছেন— তৃষ্ণানিবারণের যা-হয় একটা উপায় হয়তো হইবে— অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না।

---

[১] বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

আমাদের যে-সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই নাহয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জনসাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, নাহয় অ্যান্ড্রয়ুল-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়কালের সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্‌দেবী তাহার পরিবেশনের ভার লইলে অসংগত হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিস! ব্রিটিশ গবর্মেন্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালোরূপেই হইয়া আসিয়াছে—এজন্য শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহত ভাবে সমস্ত ধনীদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টৌনহল-মীটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। নাহয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই-সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?

ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই

সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে— কিন্তু কেবল আংশিক ভাবে; বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাত-প্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে— কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন— তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে— তাহাদের সমস্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন— প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন— কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না— সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগচর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর— আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলন্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্বিচারে গবর্মেন্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের সর্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না, তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে, বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত— তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না— অত্যন্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন-কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি— কোনো আপত্তি করি নাই। এ-পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার-বিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে— পরিবর্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান— যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান— আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না— সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চ ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে-সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন— রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য গবর্মেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন— স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে— তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উলটাপালটা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে,

ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

এইজন্য কবিকথিত 'স্রোতের সেঁওলি'র মতো ভাসিয়াই চলিয়াছি।

কিন্তু বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে, নানা দিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে—স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসংগতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে-সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো, প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান

উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে— কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে— সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে— প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই-সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন— কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন— তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে— ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না— সে-স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্‌' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে— তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে

প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন—এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেন্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে—অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবলবেগে গবর্মেন্টের সাঁকো নাড়াইতে শুরু করিয়া দিই—মেলাগুলির মাথার উপরে দলবল-আইনকানুন-সমেত পুলিস কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক—সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক। ধৈর্য ধরিতে হইবে—বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন—ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ কথা যেন আমরা না ভুলি।

আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে, আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল-ব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না তাঁহাদিগকে অন্য পক্ষে 'পেসিমিস্ট' অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভদ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ 'পেসিমিস্ট' আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারি দিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালোমন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন-কি তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।

জাপান-যুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি একটা কলের জিনিস সন্দেহ নাই—সৈন্যদিগকে কলের মতো হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতোই

চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট— সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত— রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্জখেলার দাবাবোড়ের মতো মরিত না— মানুষের মতো হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া ধর্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আত্মহত্যার মতো হইয়া দাঁড়াইত— এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, 'ইহা চমৎকার— কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে।' জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ— আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনোপ্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি রাজসাহী ও ঢাকার প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কনফারেন্স-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই— কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীদল গিয়াছি— আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্য দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই— এত চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেড-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন— তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ংকর কেজো হইয়া উঠি-না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কনফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই, আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কনফারেন্স তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারীগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে আত্মীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে— যে অংশ কেজো, তিন দিন মাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড়ো বড়ো যজ্ঞানুষ্ঠান হইত— এখন বহুদিন হইতে সে-সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কন্‌গ্রেস-কনফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতি বক্তৃতার ধুম ও চটপটা করতালি— সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও, আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন,

সকলকে ভাগিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না। মার মুখের হাসি আরও একটুখানি ফুটিত, যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই-সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়— আহূত-অনাহূত আপামর সাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত— কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই-সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান জলদান আশ্রয়দান স্বাস্থ্যদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য সমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প— একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না। স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ— সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না। আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্মগুলিকে পরের হাতে বিদায় দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব। গবর্মেন্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন— মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না— তাহার ফল কী হইল। তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি— কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেন্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে। এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনোই চিরদিন এ দেশে প্রশ্রয় পাইবে না— কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। আমরা আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই— তাহাদিগকেও

নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অন্নও বহুদূর-কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা এক দিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই— আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব— তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি— আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি— কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়— দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না— এইজন্য অব্যবহিত ভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক-না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না— যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লী-সমাজই খণ্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে— স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজও আমাদের মনুষ্যত্ব আছে— কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্য যাহা ভাঙিয়াছে তাহার জন্য আমরা শোক করিব না— যাহা গড়িতে হইবে তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনোই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া

লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ— আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না— শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়— তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়— একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে— কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কী করিয়া কলের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়, কী করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব— আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে

একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেন্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন— আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল! দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো— কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না। সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন— কিন্তু সৎকর্মের সাধুবাদ ও আশীর্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মতো আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন— নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে— পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব— সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের

অভাবে কাজে লাগিল না, সে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই— কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ— দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না— দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে— মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি বা অনেকে অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন-কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ কথা বলিলেও পাছে অহংকার প্রকাশ করা হয়, এজন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে, তাহা আমার সৃষ্টি নহে; তাহা আমা-কর্তৃক উচ্চারিত মাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না, আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশী সমাজ গঠনকার্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আসুন, আমরা মনকে প্রস্তুত করি— ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষার্ত শিকড় সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি— শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি— শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্র গন্ধ উদ্‌গত হইতে থাক্‌— দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্বতোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অনুভব করুক।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারি দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কীভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে— স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য

করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে— সমস্ত কলরব-কোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে এক দিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের সূচিমুখ-কণ্টকখচিত ঈর্ষ্যাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন— তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে শান্তি ও কর্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন— সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি— জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্যেরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরও গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে— মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল; পূর্বাপেক্ষা আরও বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা স্বতোবিরোধ আত্মখণ্ডন-সংকুল এই হিন্দুধর্মের এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে। সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন— কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোটো গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে তাহারা ইহাকে চ্যাপটা বলিয়াই অনুভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসংগত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল;

নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে— হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান— তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্তন মাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়— তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে— আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি— কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্যবিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলংকারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোয়া যাইতেছে তাহা খোয়াই যাইতেছে।

বস্তুত, এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরম-সম্পদরূপে ছিল না— তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই— তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল, যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর-সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না— সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য বিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া

কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভার গ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল তাহাকেও অকর্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাটমানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত, কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্‌বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলিপাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব তাহা নহে—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন—মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না তাহা বলিতে পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে—ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো। আমরা কি এই জননীর জীর্ণ গৃহ সংস্কার করিতে পারিব না। পাছে সাহেবের বাড়ির বিল চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়ম্বরে কমতি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারই অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব। আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না। একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই-চারি দিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' একবার স্বীকার করো, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায়

অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

ভাদ্র ১৩১১

‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

‘স্বদেশী সমাজ’-শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মতো লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়াল জবাবের মতো হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ খাপছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আকারে আমার কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন তখনি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল, অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই তখনি তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

য়ুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে—স্টেটই ভিক্ষাদান করে, স্টেটই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরেজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরি-পাওনার মতো লইতেছে—ফাউ বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখো। ইংরেজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে। হয়তো যথার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুশি থাকিলে চলিবে না। পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা-অনুসারে আপসে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত তাহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না হিন্দু-সমাজে আচারবিচারের কোনো পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত।

কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিঁকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত সে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য প্রকাশ করিয়া পৃথকপন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরেজের আইন কোন্‌টা হিন্দু, কোন্‌টা অহিন্দু তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে—রফা করিবার ভার ইংরেজের হাতে নাই, সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক হওয়ার দরুন কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইংরেজ-রচিত স্বতন্ত্র আইনের আশ্রয়ে কাহারও কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব, এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেল দাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভালো নহে—বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে; এবং এই বর্জন করিবার জন্য ইংরেজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানে সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোটো করিতেছে তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলই খোয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয় তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারও অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন। সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃস্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই-সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন—এমনভাবে করিতেন যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব অশান্তি অব্যবস্থা ও দুর্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানির্ণয় সম্বন্ধে কোনো কর্তৃত্বপ্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে তাহাই হইতেছে; যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয় তখনি ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ,

শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে— সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কী করিয়া?

এইরূপে বিদেশী শিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিত লোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেহ বিচার করে না যে, কেন এমনটা ঘটিতেছে।

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দিকাশি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতি সভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিসই ভালো, অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ত।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ সক্রিয় থাকিত তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ যখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞান-দর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূরপশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় সেই সময়ে একটা সচেষ্ট শক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায়, তাহার বজ্রবিদ্যুৎ বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন।

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব তখনি নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল তাহারই মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু, প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কী করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা, নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি ঠিক তেমনি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মতলব মনে মনে আঁটিয়াছি, ‘বঙ্গবাসী’র কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার

বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশ জনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে। প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব! যদি এমন মতলবই আমার থাকিবে তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন। কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মতলব আছে শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে।

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না—ভারতবর্ষ স্টীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার করা নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এ কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে। আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি—আমরাও যদি পদশব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই, অমনি হাঁ হাঁঃ শব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে—ইহার রক্ষাদেবতা যিনি সহাস্যমুখে সকলকে ডাকিয়া আনিয়া, সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া, অতি নিঃশব্দে অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, তিনি কখন ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি সে স্থলে 'নূতন' কথাটার তাৎপর্য কী। পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন।

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরও-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভৃত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেইসঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে—ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না, যদি করি তবে হিন্দুধর্মানুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না।

এ সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দু-চারিটা কথা যাহা বলিয়াছি অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত জহরিকে ডাকিয়া বলি 'ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সামলাও' তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণরচনার গঠন সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে। তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুশি গড়িয়ো, তাহা

লইয়া তোমাতে আমাতে হয়তো চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া ধুইয়া ফেলো, তোমার মণিমাণিকের পসরা সামলাও—দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড় অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

আশ্বিন ১৩১১

সফলতার সদুপায়

প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল তখন এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সম্প্রতি সে সংকল্প বন্ধ হওয়াতে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাদ দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধনপ্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাট-বাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনোই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম নষ্ট হয়, এবং—ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই এক পক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্যয় আপনি ঘটাইবে; নিরস্ত্র নিঃসত্ত্ব নিরন্ন ভারতের দুর্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু, রাষ্ট্রনীতিকে বড়ো করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। বিশেষত, লোভ যখন বেশি হয় তখন দেখিবার শক্তি আরও কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ—ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়—চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি? যে সময়ে ওঅর্ড্স্‌ওঅর্থ, শেলি, কীট্স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলন্ড উদ্‌ভ্রান্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না, একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে সময়ে বীর্যের

স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না-বলিব তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভালো করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয় তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না, যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই। এই-সব কথা ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে—কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি। সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব যাহার দ্বারা তাঁহারা এক মুহূর্তে আশ্বস্ত হইবেন? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়? যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্বাচীন যে এমন কথায় মুহূর্তকালের জন্য শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে-পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, সে-পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকাইয়া—সেই স্বার্থকে যত বড়ো নামই দাও-না কেন, নাহয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মুই বলো—যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারত-রাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চ-অঙ্গের ধর্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কী জবাব আছে। এ কথাটা সত্য যে, আমাদের দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান বলবান হইয়া উঠিতেছে; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; যে-সকল জ্ঞান, যে-সকল ভাব কেবল ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে-সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালের মুখস্থ কথা মাত্র ছিল এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায় স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কি বলিতে পারি 'না, তাহা হইতেছে না' এবং বলিলেই কি কাহারও চোখে ধুলা দেওয়া হইবে? জ্বলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে—না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে অন্তত চারটে বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কী বলিতে পারি? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়িবে। যখন বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে, তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা কী করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে—তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে?

আমরা জানি পার্লামেন্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে

এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুশি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না—এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বাম-হাত ডান-হাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেমনি একই? গবর্মেন্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাঁহারা যে-ডাল নাড়া দিলে যে-ফল পড়ে আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ সম্বন্ধে মিল কী বলিয়াছেন, স্পেন্‌সর কী বলিয়াছেন, সীলি কী বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার সিকি-পয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই; নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত করো-না। যখন য়ুনিভার্সিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেন্ট আমাদের বিদ্যার উন্নতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন? কারণ, লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসন সম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই করো, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেন্ট আছে, সে দেশেও এডুকেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদবিবাদ চলিয়াছিল—কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য ফল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এতবড়ো বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। কখনোই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রমসংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতে হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য করা একই।

আমাদের দেশে সে কথা খাটে না। কারণ, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, এবং আমরা কর্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন, 'সে কী কথা। আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর—আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না কেন। আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।' গোরু যে নন্দনন্দনকে দুই বেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে দুধের হিসাব তলব না করে! কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

সাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে করো-না কেন, ফরাসি রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মতলব করে, তবে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন-কি, তাহাকে ধর্মোপদেশও শোনায় না—তখন ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—এইজন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জর্মনি যখন ইংলন্ডের বন্ধু ছিল তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজ রাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জর্মনরাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল যেদিন মোগল-সভায়, নবাবের দরবারে, ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য প্রসন্নতার সহিত গায়ে মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মতো নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা করিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে? যে দুধের

মধ্যে মাখন আছে, সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাখনের দুধ রহিল গোয়াল-বাড়িতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতেও কি মাখন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন—আমরা তো কোনোরূপ সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভালো। মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ন্যায্য স্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেন্ট বলিতে তো একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছেন—তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়্‌রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এ দেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়-সংশোধনের সুন্দর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবে না। এমন-কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করেন না; জজের মন বুঝিয়া অনেক সময় ভালো তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় বিচারকের কাছে মৌখিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়—তাহার কারণ, জজ তো আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মনুষ্য। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্‌পাত করাও প্রয়োজন হইবে না?

কিন্তু আমাদের যে কী ব্যবস্থা, কী উদ্দেশ্য এবং কী উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিকাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব—গবর্মেন্ট যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

কিন্তু আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি—আমার যা-কিছু বক্তব্য সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে এই-সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনা, এই-সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার একদিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন—ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোটো ছোটো আঘাত নানা দিক হইতে আসিয়া পড়ে—হাতে হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিত-প্রতিকারের জন্য দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দিকে ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ এখানে বেদনা ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনি-তখনি সেটা নিবারণের জন্য রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই-সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জ্বালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেমনি প্রত্যেক তাড়নার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই—কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথা তৃপ্তি, তাহাই ভোগ করিবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হই নাই; আমি দুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশী লোকের কাছে উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয়

কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বারংবার ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য উপলক্ষস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধারক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেক বার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত, বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেখানে বজ্র পড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গতিবিধি নাই; আমার পরামর্শ প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না। তৃতীয়ত, বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য। যেখান হইতে বজ্র পড়ে সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্রদণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে বিচারপূর্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তুত, আজ যে পোলিটিকাল প্রসঙ্গ লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছি সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশ্চর্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ যাঁহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম তিনি সাড়া দিলেন না— অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইঁহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি বা দয়া করেন তবু আশ্বস্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাত-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড়ো অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। ‘সনাতন ধর্মশাস্ত্রমতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়’ বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে স্থলে ধর্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক দুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক— পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে— আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁত ইংরেজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক, রাগারাগি করা চলে না।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যাবসা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র খৃস্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন— আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দুভ্রাতা আইনের বিরূপতাসত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া এই লাখ টাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খৃস্টানধর্মের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন— আইনমতে যাহা আমার তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জো থাকিত না। কারণ, সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবি খাটে না। সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্ত্বের জোরে যান, মহতের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে

তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভালো বাগ্মী— যদি বলিত, বিজিত পরদেশী সম্বন্ধে অল্পসংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক আশঙ্কাবশত যে-সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে তাহা আমরা করিব না— যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্মেন্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব, সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয় এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে, এ দেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণই এদেশবাসীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবরদারি করিতে আসিয়াছি এমনিতরো নিরাসক্তভাবে কাজ করিয়া যাইব— তবে আমাদের মতো লোককে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে ততকাল আমরা ধন্য হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই; তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক্‌; আমরা মুড়ি খাই তোমরা চাহিয়া দেখো, অথবা তোমরা চাহিয়া দেখো আমরা মুড়ি খাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে— সেই হিসাবে যা পাই সেই ভালো, তাহার উপরে যাহা জোটে সেটা নিতান্তই উপরিপাওনা, তাহার জন্য আদালতে দাবি চলে না, এবং কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া সেরূপ উপরিপাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে দুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোটো। সুদূর য়ুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে— ফরাসি, জর্মান, রুশ, ইটালিয়ান, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল, তাহাদের সম্বন্ধে সর্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়; আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাগদ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেন্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক; ইংরেজ স্রোতের জলের মতো নিয়তই এ দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদআহ্লাদ করে সেও স্বজাতির সঙ্গে— এখানকার ইতিবৃত্তচর্চার ভার জর্মানদের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দিসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেন্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে— এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোটো, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হই, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, ব্যাপারখানা এই এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র তাহার মর্মান্তিক বেদনাকেও, তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার একটুখানি মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া, আমরা ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য হইতেছি— এত কলরবেও মনের মতো ফল পাইতেছি না কেন? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে

নাই। তাহারা যেখানে আছে সেখানে যদি যাইতে পারিতাম তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোটো দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জন সাহেব অমন অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়ালতন্ত্রের মধ্যে বিসর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন? সর্বনাশ! আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়সম্ভাষণের মতো শুনাইতেছে! এই, অস্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল-আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্যাপ্ত প্রেমের সংগীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্যন্ত দুর্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে— তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড়ো অত্যুক্তিতে যদি কর্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি। আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কর্জন সাহেব আমাদের সুখদুঃখের সীমানা হইতে বহু ঊর্ধ্বে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না! নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছটফট করে কেন! এ কেমনতরো— যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্যসিন্দুর-হস্তে লোক আসে, এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়— এ কী আশ্চর্য, এতবড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ তাহা যে সে এক মুহূর্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর। ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালিল্যান্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয়, তখন জমার অঙ্ক এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এমনিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক এবং যাহা স্বাভাবিক তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখো, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি, 'তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো— তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব করো', তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, 'আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের যে নিম্নতন কোঠায় আমি আছি সেই কোঠায় তুমিও এসো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই— স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো— স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার অন্তত আরাম বল অর্থ বল কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!' এ কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি— আলস্যপূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি, ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই, ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও 'হান্টার' বৈ গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতাসত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না।

সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে— যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই— এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনোই যথার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে অনেক টাকা আছে, অন্য পক্ষে শুদ্ধমাত্র চেকবইখানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না— ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক-একবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল— কিন্তু সে অপমান সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হউক আর নিঃশব্দেই হউক গলাধঃকরণপূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড়ো কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়। পুরাতন কথা বলিতেছি এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব। আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জিত এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন যে 'এ আবার তুমি কী নূতন কথা তুলিয়া বসিলে' তবেই আমার পক্ষে মুশকিল— কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। এমন-কি, শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে সেই জানে যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে— যেমনই আলো হয় অমনি মুহূর্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকার রাত্রি— এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণিক কথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন তবে তাহাও সকরুণচিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা তাহা নহে। আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারও কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত— আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য; আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য— কোনো বিশেষ আইন রদ করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে।

ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ তাহা সমস্ত উদ্‌বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য, যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুই-চারি জন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহল-মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই-যে থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে—আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সম্বন্ধে গাম্ভীর্য রক্ষা করা আর তো সম্ভব হয় না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরও উল্টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলই চাওয়া, আর এক পক্ষে কেবলই দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়। ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নিবানো যায় না, সে তো শাস্ত্রেই বলে—এরূপ দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায় বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল দাতার পক্ষেও তেমনই অসুবিধা।

কিন্তু, যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও এক স্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেন্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কর্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বড়ো শক্ত। এই মনে করো—স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক এই কান্না! যাহা একজন

দিতে পারে তাহা আর-একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে!

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে—কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই। এজন্য গবর্মেন্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক স্বায়ত্তশাসন। তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই।

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে 'গবর্মেন্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব'—তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, 'দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।' তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ—যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্ত চিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক এবং কর্জনও বাঁচিয়া থাকুন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে? কর্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জীব দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম দিবে সেই আমাদের প্রতি কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না—যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনোই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্ত-কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সমুদ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের ব্যাবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারও-কারও কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্‌স্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড়ো কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায় তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি—তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হালকা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারী করিয়া তোলা কর্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু, আমাদের নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিবার

সময় ঠিক তাহার উল্টা দিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলায় ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয় তখন নিজের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলই উষ্ণবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে ফললাভের লক্ষ দূরে দিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড়ো হইয়া উঠে। যথার্থভাবে গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্ত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়—ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলি—প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসংগত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্য দ্বারা দুর্বলতার বৃদ্ধিই হয়—ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই-সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—স্বভাবের দুর্বলতার উপর নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের উপরেও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্বলতা তাহাকে বড়ো নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি তাহা নহে—গর্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখো, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরি যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা যে আমাদের দেশে সুলভ নহে, এ কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই তাহা আছে ভান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কী আছে। এ সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষিতা আমাদের যথেষ্ট দুর্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না—কারণ, সেরূপ অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের এই দুর্বল দেশহিতৈষিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার উপলক্ষ আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না—যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে এক স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি তাহা যে একদিনেই হইবে, কথাটা পড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারি দিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে খর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা,

নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ—কাজ করিতে করিতে এই-সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয়—এই-সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতে দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন-সকল খাঁটি লোক শক্ত লোক যাঁহারা আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণ-কর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা, কেবল কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া এখনি আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন-কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি যাহা ব্যবহার না করিব অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে; আমি যদি শক্তি অর্জন না করি অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে—ইহা বিশ্বের অনিবার্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু, যদি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার 'নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব', তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা—এই মহৎ সৃষ্টিকার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে, এজন্য আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা চারখানা করিবার সংকল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃখের বিষয়—কিন্তু শুধু কি নিরাশ্বাস দুঃখভোগেই এই দুঃখের পর্যবসান? ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই? শুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুই টুকরা করিতে গবর্মেন্ট পারেন। আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না? বাংলাভাষাকে গবর্মেন্ট নিজের ইচ্ছামত চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন। আর আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না? এই-যে আশঙ্কা ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে? যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয় তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না? সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমুদয় উদ্‌যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সমুদয় পূজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাণ্ডার যে আমাদের নিতান্তই চাই। আমাদের কয়েকজনের চেষ্টাতেই সেই বৃহৎ ঐক্য-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা দুরূহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এ পর্যন্ত আমরা ফুটা কলসে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেইজন্যই বার বার আক্ষেপ করিয়াছি—এ দেশে কাজ করিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজি ভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছি, দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরূপ উদাসীন কেন। ইংরেজি

ভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন পাস করিয়াছি, অথচ দুঃখ করিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যবোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন। পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তাহার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি, এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন। একবার যথার্থ কর্মের সহিত যথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক, তাহার পরেও যদি সফলতা লাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

সংকটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে দুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু, খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিম্নতম গুহার গভীরতম ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে?

একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্তিত অনুবাদ দ্বারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি 'পরে জানি
কমলা সদয়!
পরে করিবেক দান, এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে!
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

চৈত্র ১৩১১

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

অদ্য বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সর্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন্‌খানে যোগ সে কথা হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। যোগ আছে। সেই যোগ অনুভব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অদ্যকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—কিন্তু সংহত-অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ।

আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দিকে

জ্যোতির্বাষ্পের মতো বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই দুই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহা মুখে আনিবার জো ছিল না। তখন ইংরেজি-শিক্ষামদে-উন্মত্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈন্যকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয় সাহিত্যকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধান-রেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন-কি, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজি মাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না— তখন কেহ বা বাংলার মিল্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন, কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন— এমন-কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারও সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কারণ গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু, প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়রন-স্কটের সুদূর সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, এ কথা ইংরেজিওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তখনকার দিনের একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ঐ ইংরেজি উপাধিগুলার কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বাংলা সাহিত্য আর কাহারও সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজমূর্তিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সম্মান ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অনুভব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমহাশয়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আসিতেছে। একদিন গেছে যখন আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি পুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রস্ততা এতদূর পর্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইষষ্ঠী ফিরাইয়া দিয়াছে এবং আমোদ করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছে— এতবড়ো শিক্ষিত-মূর্খতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ রোগের সমস্ত উপসর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধন্না না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন-কি পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয়।

নিজের মধ্যে এই-যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, যে অনুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ স্ফূর্তি হইতে পারে না, ইহা কোনো একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকল দিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্মে, কর্মে, সমাজে, সর্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খৃস্টান পাদরির চোখে দেখিতাম— পাদরির কষ্টিপাথরে কোন্‌টাতে কী রকম দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিসকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম-প্রথম সে বিচারে দেশের কোনো জিনিসেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর-একটু ভালো লক্ষণ দেখা দিল। তখন আমরা বিলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে যা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল; আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন

ছিল শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন সূর্যালোকে গাছপালা অক্সিজেন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেইজন্যেই প্রাতঃকালে পূজার পুষ্পচয়নের বিধান হইয়াছে। এ কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাঁকি দিয়া অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্মল প্রত্যুষে সর্বকর্মারম্ভে সুন্দরভাবে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনো সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই যে, পাদরির কষ্টিপাথরে যাহা উজ্জ্বল দাগ দেয় তাহা মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই তো একমাত্র মূল্যবান পদার্থ নয়; পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান জিনিসও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজকাল অল্প অল্প করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদরির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গর্হিত, আমাদের দিক হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে পলিটিক্‌স্‌ বলি তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সানুনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্যরকম হইয়া গেছে— ভিক্ষুকতা যতদূর পর্যন্ত উদ্ধত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এ কথা বলিতে শুরু করিয়াছি যে, হাতজোড় করিয়াই ভিক্ষা করি আর চোখ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না— দেশের জন্য স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে দুই দিকে লাভ— এক তো ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়— সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া কর্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি— সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্‌স্‌ পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার উলটা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছাসমাগত সেবকদের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন।

পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট খেলাতেও না-হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে,

তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনই হউক-না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব, আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না— তখন ঐ গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-পরিষৎ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটি জ্বলিতেছে। সেখানে আয়োজন খুব বেশি নাই— কিন্তু, তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্ত দিন যিনি পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে— সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ— সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, বিদ্যাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশীচালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে— যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন— সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেইসঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি। আমার অনুনয়, বাঙালি ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন— যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎ-পরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল— কিন্তু তাহা না হইবার কারণ,

আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে-বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে-জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি— কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম, সমাজ, এমন-কি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতা-বিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এতকাল গেল, তথাপি এই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে,

পুঁথিগত অনুকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত পেট্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চাল-চিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ পেট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বোঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনি তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষৎ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে পরিবর্তন কোন্‌ পথে চলিতেছে, কোন্‌ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেইসঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য-পরিষৎ নিজের কর্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায় এতবড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না; কিন্তু, আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন— তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব, আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভালো কি মন্দ তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে— কিন্তু, ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে না— এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু, সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবয়সী ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্বকেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি।

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে— তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে— কিন্তু, সেই অকারণ হাত-পা ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পবয়সে উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারি দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল— তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না— এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়টিজমের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয় আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম— এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র— কিন্তু, ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমী-বৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দিষ্ট— এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিট-খাম্বাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক-না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে।— একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্প-কল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে— সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্বকেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে— সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম সেই তীক্ষ্ণ সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই— উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে-একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই। আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয় আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে— নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না— তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি— ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে। কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে

নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি বিষাণ বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ, আর, আজ সাহিত্য-পরিষৎ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—সে আহ্বান দেশের 'উৎসবে ব্যসনে চৈব', কিন্তু 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না? সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্মেন্টের কোনো আইন-পাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্তব্য কী তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য দেশবিদেশের বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া তিনি কূলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়—আগে দেখো তোমার ছেলেটা কোথায় আছে, কী করিতেছে, সে পাৎকুয়ায় পড়িল কি আলপিন গিলিয়া বসিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে কি শীত করিতেছে। এ-সব কথা সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি দুর্দৈবক্রমে বিশেষ স্থলে বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত, সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না—সূর্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না—অবিচলিত আশার সহিত আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে

মাঝে ঐ-যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে—সূর্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন-চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে—আর ভয় নাই, গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে তখন দিগ্‌বিদিক সম্বন্ধে দশ জন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদ-বিতণ্ডা করিতে হইবে না—তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর—তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ঐ শোনা যাইতেছে—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।

বৈশাখ ১৩১২

য়ুনিভার্সিটি বিল

এতকাল ধরিয়া য়ুনিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনেক আলোচনাই হইয়া গেছে, সেগুলির পুনরুক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটামুটি দুই-একটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত অবস্থা অনুকূল হইলে, বন্দোবস্তর চূড়ান্ত করা যাইতে পারে সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া দুরাশাকে খর্ব করিতেই হয়। লর্ড্‌ কর্জন ঠিক বলিয়াছেন, বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ খুব ভালো—কিন্তু ভারতবন্ধু লাটসাহেব তো বিলাতের সব ভালো আমাদিগকে দিবার কোনো বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল একটা ভালোই মানাইবে কেন?

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো সে-ই তাহার সর্বোত্তম ভালো, তাহার চেয়ে ভালো আর হইতে পারে না—অন্যের ভালোর প্রতি লোভ করা বৃথা।

বিলাতি য়ুনিভার্সিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবরদস্ত শাসনকর্তার আইনের জোরে এক রাত্রে পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল—স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না!

সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের য়ুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না—এখনো ইহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি—আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরাজের কাছ হইতে আমরা কী পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কী আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কী আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে; বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম

নহে, কিন্তু তাহারও যৎসামান্য আমাদের। রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়; তাহার মজুরের কার্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সংকুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে জিনিস যথার্থ আমাদের তাহা কম ভালো হইলেও, তাহার ত্রুটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও, তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

যে বিদ্যা পুঁথিগত, যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেমনি যে শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেমনি নিষ্ফল। দেশের বিদ্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই বিদ্যাশিক্ষার ফল। সেও যদি সম্পূর্ণ গবর্মেন্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভালো য়ুনিভার্সিটিও আমাদের পক্ষে দারিদ্র্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য করা কোনোমতেই সংগত নহে। আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল— দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই-সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী ইংরাজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল— এমন-কি, দেশে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ কথকতা যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে ইংরাজিশিক্ষাকেও যদি দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতি সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে লড়াই পর্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আর-সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান দুর্বলতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়; কোনো সভ্যতার মধ্যে যখন সর্ব বিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশয্য দেখা যায় তখন ইহা বুঝিতে হইবে, তাহার যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে তাহার অনেকটারই প্রতিমুহূর্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল মালমসলা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমতো রাখা যায় তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না তাহাও নহে— কিন্তু, সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দরকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব— কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, কারণ, আমাদের সমাজে সুখ স্বাস্থ্য শিক্ষা আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিয়াছে গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে; রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে দরিদ্র প্রজা বিনা আহবানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে, কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই; সম্পন্ন ব্যক্তি দিঘি-ঝিল কাটাইয়া তাহার চারি দিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসম্ভ্রম ছিল, ধনীর ঐশ্বর্যে তাহার স্বাভাবিক দাবি ছিল, এইজন্য তাহার অবস্থা যেমনই হউক সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই— যাঁহারা জাতিভেদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান তাঁহারা এ-সব কথা ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।

বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী? আমাদের কানে এ কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না।

আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল—রাজার উপরে, বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না—সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিদ্যাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়স্বরূপ হইয়াছে, তখন বিদ্যাশিক্ষা সমাজের হিতসাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাঁহাদের রাজ-পলিসির অনুকূল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে, বিজ্ঞানশিক্ষাটাকে পাকে-প্রকারে খর্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্বপ্রকার আত্মগৌরবকে সংকুচিত করিতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না—কর্তার ইচ্ছা কর্ম—আমরা সে কর্মের ফলভোগ করিব, কিন্তু সে কর্মের উপরে কর্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিসের জোরে।

তা ছাড়া, বিদ্যা জিনিসটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাটসাহেব তাঁহার অক্‌সফোর্ড্‌-কেম্‌ব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলই আস্ফালন করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়াছেন যে সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই, সুতরাং সেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেখানে বিদ্যাদানের জন্য উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিদ্যালাভের জন্য প্রস্তুত—পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই; অশ্রদ্ধার কণ্টকপ্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিস মনে গিয়া পৌঁছায়। পেড্‌লারের মতো লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ—তিনি আমাদিগকে কী দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কী লইতে পারি! হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে, সেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্‌ব্রিজ-অক্‌সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে—কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেশন করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

পরের কাছ হইতে হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই যে, গর্বিত দাতা খুব বড়ো করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে দুই বেলা খোঁটা দেয়, ‘এত দিলাম, তত দিলাম, কিন্তু ফলে কী হইল?’ মা স্তন্যদান করেন, খাতায় তাহার কোনো হিসাব রাখেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয়—স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোরুদ্যমান মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ খিট্‌খিট্‌ করিতে থাকে, ‘এত গিলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে!’

আমাদের ইংরেজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড্‌লার সেদিন বলিয়াছেন, ‘আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আনুকূল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না!’

অনুগ্রহজীবীদিগকে এই-সব কথাই শুনিতে হয়, অথচ আমাদের বলিবার মুখ নাই—‘বন্দোবস্ত সমস্ত তোমাদেরই হাতে এবং সে বন্দোবস্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয় তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই!’ এ দিকে খাতায় টাকার অংকটাও গ্রেট্‌প্রাইমার অক্ষরে দেখানো হইতেছে—যেন এত বিপুল টাকা এতবড়ো প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্য জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না,

অতএব ইহার moral এই—'হে অক্ষম, হে অকর্মণ্য, তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোলযুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না!'

ইহাতে বিদ্যালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোনো জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না; পরের ঘরে জল তোলা এবং কাঠ কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে খোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং যাঁহারা খোঁটা দেন তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায় এজন্য তাঁহারা ত্রস্ত আছেন।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতি সভ্যতা বস্তুত দুরূহ ও দুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশ বৎসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিস; পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মতো সম্পূর্ণ সুযোগ ও আনুকূল্য পাইলে এই ইস্কুল-পাঠ আমরা পেড্‌লার-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত, তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, তাহা ইস্কুলের পড়া নহে—তাহা জীবনের সাধনা।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কলেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালির মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্যই এগুলি স্মরণীয় তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্মসম্ভ্রমের জন্য। পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশ্বাস না জন্মে।

যাহাতে আমাদের যথার্থ আত্মসম্মানবোধের উদ্রেক হয় বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্বক করিবে না, এবং সেজন্য আমরা যেন ক্ষোভ অনুভব না করি। যেখানে যাহা স্বভাবতই আশা করা যাইতে পারে না সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা—এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কী, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এ স্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে-সকল প্রতিভা-সম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া; অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ, তাহার কৃশতা দেখিয়া ধৈর্যভ্রষ্ট না হইয়া আশার সহিত আনন্দের সহিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্তব্য। ইহাকে যদি দুরাশা বল, তবে কি পরের রুদ্ধদ্বারে জোড়হস্তে বসিয়া থাকাই আশা পূর্ণ হইবার একমাত্র সহজ প্রণালী? কবে কন্সার্ভেটিব গবর্মেন্ট গিয়া লিবারেল গবর্মেন্টের অভ্যুদয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুষ্ক চঞ্চু বিস্তারপূর্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবুদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সদুপায়?

আষাঢ় ১৩১১

অবস্থা ও ব্যবস্থা

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশি রাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে তখন সে বোলগুলি কেবলই মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাব-মোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে, ইত্যাদি। নানা মুখ হইতে এই-যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা উপস্থিতমত মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আসিতেছে তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে-সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে, পরের দ্বারস্থ হইবার জন্য নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্য, এ কথা আজ আমরা এক দিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি— বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই।

অতএব, আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে— ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্তী হইতে থাকে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধন সম্বন্ধে নিজের কাছে যে-সকল আশা করি না পরের কাছ হইতে সেই-সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মতো আঘাত বার বার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর-একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

'আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও'— এই যে-সকল দাবি আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসংকোচে উপস্থিত করিয়াছি ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষ-মাত্রেরই অধিকার সমান এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে?

সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে-সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে ধর্মে প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহাদিগকে ইঁহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন এমন ইঁহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই। এমন-কি, তাহারা ইঁহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখো, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তখন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন— তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুই-একটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য কোনো অংশে বিসর্জন না দিয়া, হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশীরূপে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরজাতি বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই। ইহার সহিত ইংরেজ উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয়তো অনেকে স্টেট্‌স্‌ম্যান-পত্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয় তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্তমানে যে-সকল বাড়ি এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে-সকল হৌস ঐশিয়দিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যাবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্য একটা Vigilance Association বা চৌকিদার-দল বাঁধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের শহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন-কি ইংলন্ডের কোনো শহরে দেওয়া সম্ভব হইত। ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, সেখানে তাহাদিগকে 'লিঞ্চ' করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে 'লিঞ্চ' করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে-সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মতো উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয় তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই জানে।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয় জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ— এ কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্য যে-সকল জাতিকে আমরা অনার্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি ডোম চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি, আমরাও আছি,

তাহারাও থাক্‌; বলিয়াছি, প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা ‘প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা’— সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভালো। য়ুরোপ বলে, জন্তুকে খাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে তাহা নহে, তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়া যায় তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ না খাইবে সে অংশে দয়ামায়া বাছবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে দুই-একটা প্রমাণ আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত যাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষ্যা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজ-নির্মাণের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের ‘দেশের কথা’-নামক বইখানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হউক, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল— কারণ, জগতে অ্যাংলোস্যাক্‌সন জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয় তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।

অ্যাংলোস্যাক্‌সন যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে— অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেক দিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, অ্যাংলোস্যাক্‌সন মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুর্মূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূমি করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেন্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় তো আর-এক দলের দয়া হইতে পারে। প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় তো, যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা তো আমাদের একটি নয়, এইজন্য বার বার সহস্রবার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না— এমনি আমাদের মুশকিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা

অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে, একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্বভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নৈতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম করিতে চান অবিশ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়। এই-যে অবিশ্বাস ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষ্যাবশত নহে; নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাসের জন্য ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কী শক্তি, কী মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না— উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ংকর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষনতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে-সকল পোলিটিকাল প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত তাহা হইলেও হয়তো মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত— কিন্তু তাহারা গর্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্ধাকে লালন করা হয়, এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্বকে খর্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই-সকল পোলিটিকাল সভা কৃতকার্যতার বল লাভ করিতে পারে না; একত্র হইবার যে শক্তি তাহা ক্ষণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্তি তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে— সে কেবল রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল— এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে— আর, ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া

রাখিবার যে কঠিন শক্তি তাহা আমাদের নাই, আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন-প্রকৃতি-বশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূল নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্যই য়ুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেন্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব করিবার সংকল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতরো সন্দিগ্ধ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত— আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বন্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না— এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন— যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ি যাওয়া। সে বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বশুরবাড়িতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড়ো কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে— তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপরতাও হয়তো আমাদের সমাজে একটা বড়ো রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল— হয়তো স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে

স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে— এ-সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে— সে-সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিব। আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম বিলাস আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল— আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্য-দ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা— ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো-একটা কর্মের দ্বারা, কাঠিন্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে— আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই ইহার দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে। ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই; ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যগ্রতাকে, আমাদের সুখদুঃখনিরপেক্ষ ফলাফলবিচারবিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দুর্নিবার বেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কী আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কী জাতির প্রকৃতিতে, কোনো-একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে— সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না, তখনি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি— নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখ বহন করিতে, বিলাস ত্যাগ করিতে, ক্ষতি স্বীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মতো একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষ ভাবে উদ্‌বোধিত

করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানকে এক-মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায় তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি— দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজি স্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত— ইঁহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনি আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য, যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না তাহারা চিন্তা করিতেছে, যাহারা পরিহাস করিত তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে, যাহারা কোনো মহান সংকল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে জানিত না তাহারাও যেন কিছু অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য উদ্যম অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত তাহারাও আজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ভালো করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন। ইতিপূর্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কলকৌশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা-আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্য সহস্র অত্যুক্তি-দ্বারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গ-বিভাগের উদ্‌যোগ বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত, বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি— পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে— সেই শক্তির প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, দুঃখভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলিতেছে, 'পরিত্যাগ করো বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের বিলাস পরিহার করো'— সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না; এই কথা নিঃসংকোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থ ভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্তকাল গোপন থাকে না তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন, দুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে সেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাসাদের

সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম, তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উদ্যমটুকু কখনোই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেইজন্যই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, কিন্তু সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি সেই জাগ্রত পুরুষ কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, 'গবর্মেন্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে-একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, বিলাতি জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া, তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও।' তাঁহার অনুশাসন এই যে, 'বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে—তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না—তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ ইহাতেই আনন্দিত হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য সকলের মনে যে একই উদ্যম জন্মিয়াছে ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ করো।'

অতএব, এখন কিছুদিনের জন্য কেবলমাত্র একটা হৃদয়ের আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া, এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি—আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায় তবে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লীবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে; বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সংঘটিত হইতে থাকে তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুত শক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরও দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে—সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু, অনির্দিষ্টভাবে সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর-কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সেদিন নাই—আমি যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা

ছাড়া আর-কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেইজন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ-উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা রুশীয় গবর্মেন্টের অধীনস্থ বাহ্লীক-প্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্বে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহ্লীক-প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না তাহা জানি না। সেখানে 'সকার্‌ট্‌ভেলিস্ট' নামধারী একটি জর্জীয় 'ন্যাশনালিস্ট' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে— ইঁহারা 'কার্স্‌' প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্য জিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন—

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education, Delyanoff, who by the way was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি— অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে— বস্তুত, দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোকে যে গবর্মেন্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না? কেবল চাকরির পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব? চাকরির খাতিরে আমাদের দুর্বলতা কতদূর বাড়িতেছে তাহা কি আমরা জানি না? আমরা মনিবকে খুশি করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি— এই চাকরি আরও বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম তবে গবর্মেন্টের আপিস রাক্ষসের মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কী শক্তি আছে তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম যেখানে 'দেশের কাজ করিতেছি' এই ধারণা সর্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে 'দেশকে ভালোবাসো' এ কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে এক দিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্য দিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের

প্রার্থী হওয়া, এমনতরো অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না— দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে— ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে— নতুবা বলিব, আজ আমরা যে-একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে না— বরঞ্চ তাহার বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎ-বিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। একসময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেন্টের আফিসে-গড়া জিনিস হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায় তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেন্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে— তাহা ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করিবে— এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন-সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে— পঞ্চায়েৎ ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপর পক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাসভঙ্গ করিবে— ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এ দেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে-সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন-অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে-গ্রাম্যপঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত— এই-সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেন্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে কাজ করিত গবর্মেন্টের জিনিস হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিস আমরা পাইতেই পারি না। সুতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব সেজন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে— পরের কাছ হইতে যাহা পাইব সেজন্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয় তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে— যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরি কেন?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর-একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষিদের অধিক সুদে কর্জ দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না— অতএব গবর্মেন্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে 'তোমরা অল্প সুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাংক স্থাপন করো', তবে নিজে খদ্দের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের দেশের চাষিদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে

বিকাইয়া দেওয়া হয় না? যাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাঁধা রাখিতে হইবে? আমরা যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাকৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব— এ কথা কি বুঝা এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত সুবিধার কারণ যেমনই হউক তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে আমাদের মোহজাল ততই দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব, আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তান-দিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে— কারণ, এ স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা সাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালোই করিয়াছেন। গবর্মেন্টের উপাধি-পুরস্কার-প্রসাদের প্রলোভন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয়তো গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ-সংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয়তো বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড়ো করিয়া দেখিতে পাই— কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক, দীন হউক, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে— আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেক দিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে এই বইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই।

এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য যাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়ীজালের মতো বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে; তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে; যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নত সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালি জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত আজ পর্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ এক মুহূর্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্বাচনপূর্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য

পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাংক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশের নানা স্থানে এইরূপ এক-একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই-সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গপ্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলই দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস— এইগুলিই সেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে— ইহাতে মহান সংকল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালিকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া, বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে— আপনাকে খর্ব করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিবার এই সাধনা, গর্বকে বিসর্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা— ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে তখন আমরা সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোনো শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব তখন আমরা দাসত্ব করিব না— তা আমাদের প্রভু যত বড়োই প্রবল হউন। জল যখন জমিয়া কঠিন হয় তখন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মতো তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি— জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনি আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন; একই ব্রহ্মপুত্র

তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই যদি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে কোনো প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনি ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে তখনি ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য; তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

আশ্বিন ১৩১২

ব্রতধারণ[1]

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি, বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার এই উদ্‌যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু-না-কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে দুর্যোগ বলিব কি? এই-যে দিগ্‌দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই-যে বিদ্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে,

---

[1] কোনো 'স্ত্রীসমাজে' জনৈক মহিলা-কর্তৃক পঠিত।

এই-যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল—এই দুর্যোগকেই যাহারা সুযোগ করিয়া তুলিয়াছে তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনি স্কন্ধে হল লইয়া কৃষককে কোমর বাঁধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে-এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড়ো দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে : ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনোই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়তো সহ্য হইয়া যাইবে—অপমানে যাহা শিখিয়াছি তাহা হয়তো আবার ভুলিয়া গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্য প্রস্তুত হইব। যে দুর্বল নিশ্চেষ্ট তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য—দুঃখ তাহাকে দুঃখই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই দুঃসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্ দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মতো আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না—তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক—পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার দুর্দিনে আমাদের পুরুষেরা কী কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!

যে নির্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয়তো এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজদ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে। সমুদ্রের এ পারেই কী আর ও পারেই কী, অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে—তাঁহাদের বহুদিনের বিশ্বাসক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে—এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটীর আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে যে পুরুষেরা কীভাবে সাড়া দিবেন তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও

কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্যা নহি? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে? দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না?

ভগিনীগণ, আপনারা হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কী করিতে পারি— দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কী না করিতেছি তাই দেখুন। আমরা পরনের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতি দোকানের, আমরা শয়নে স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া, তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া, বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়— আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না। আমরা ভালো হউক মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না। সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে। কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাস-ক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয় তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে— সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী বেনারসি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্যবোধের দাবি?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ— ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মতো চাঁদার খাতায় সহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড়ো কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে তখন ধর্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত তাহাতেই আনন্দ— সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, দুঃসাধ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে; তখন সুবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই; স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্যদ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিসকে রক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালোবাসিতে জানি। ভালোবাসা চাকচিক্যে ভুলিয়া নূতনের কুহকে চারি দিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে সুশ্রী হউক, আর কুশ্রী হউক, নারীর কাছে অনাদর পায় না— সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া

লজ্জার সহিত কৈফিয়ত দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে। যে বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা—তাহারা কালোই হউক আর ধলোই হউক—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশী বেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রীকন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতনত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্যার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের খোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব, আজ আমরা যদি আর-সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশঙ্কা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশী জিনিস ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেস্টর ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

সে কথা জানি। ম্যাঞ্চেস্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভারপুলে এঞ্জিনের আগুন না নিভুক। আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে চেষ্টা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে—নতুবা দুই দিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই-সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব ততদিন পর্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে—সে যেন অহংকার অনুভব না করে। অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই।

কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি। আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়ের অনুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
যাহা-কিছু পরবশ, তাহাই দুঃখ; যাহা-কিছু আত্মবশ, তাহাই সুখ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে— তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ভাদ্র ১৩১২

দেশীয় রাজ্য

দেশভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। যাহারা বিলখালের মধ্যে থাকে তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী হইয়া উঠে; যাহারা সমুদ্রতীরের বন্দরে থাকে তাহারা দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহারা সমতল উর্বরা ভূমিতে বাস করে তাহারা কৃষিকে উপজীবিকা করিয়া তোলে। মরুপ্রায় দেশে যে আরব বাস করে তাহাকে যদি অন্যদেশবাসীর ইতিহাস শুনাইয়া বলা যায় যে কৃষির সাহায্য ব্যতীত উন্নতিলাভ করা যায় না তবে সে উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বসা যায় যে মৃগয়া এবং পশুপালনেই সাহস ও বীর্যের চর্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নষ্টই হয়, তবে সেরূপ নিষ্ফল উত্তেজনা কেবল অনিষ্টই ঘটায়।

বস্তুত, ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করে এবং সমগ্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। য়ুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাবশত যে বিশেষ-প্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে আমরা যদি ঠিক সেইপ্রকার উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি তবে, নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ, আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে আমরা মনুষ্যত্বের যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, পরে বৃথা অনুকরণ-চেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিসকে নষ্ট করা হয় যাহা মানুষ অন্য কোনো স্থান হইতে পাইতে পারে না। সুতরাং, বিশ্বমানব সেই অংশে দরিদ্র হয়। চাষের জমিকে খনির মতো ব্যবহার করিলে ও খনিজের জমিকে কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানব-সভ্যতাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক, য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অনুকরণের দ্বারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা যখন বিদেশের ইতিহাস পড়ি বা বিদেশের প্রতাপকে প্রত্যক্ষ চক্ষে দেখি তখন নিজেদের প্রতি ধিক্‌কার জন্মে— তখন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্বাচীন বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায় তাহার মনে হইতে পারে যে, এমনি করিয়া ঘোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফালাফি করিতে যদি শিখি এবং দর্শকদলের বাহবা পাই তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শান্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নির্জীব ও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ স্থলে পিতাকে ধিক্‌কার দিবার কারণ থাকিতেও পারে। সার্কাসের খেলোয়াড় যেরূপ অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উদ্যম ও উদ্‌যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কর্মে উন্নতি লাভ না করিয়া থাকেন তবেই তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া চলে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অনুভব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয় তবে লজ্জার কারণটা ভালো করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা যথার্থ লজ্জার মূল কখনোই উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি যে, ইংলন্ডের পার্লামেন্ট আছে, ইংলন্ডের যৌথ কারবার আছে, ইংলন্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু-না-কিছু অধিকারী, এইজন্য তাহারা বড়ো, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোটো, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে যদি কয়েক দিনের জন্য মূঢ় আবুহোসেনের মতো ইংরেজি মাহাত্ম্যের বাহ্য অধিকারী হই, আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়, পার্লামেন্টের গৃহচূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহসন পঞ্চম অঙ্কে কী মর্মভেদী অশ্রুপাতেই অবসিত হয়! আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে পার্লামেন্টে মানুষ গড়ে—বস্তুত মানুষই পার্লামেন্ট গড়ে। মাটি সর্বত্রই সমান; সেই মাটি লইয়া কেহ বা শিব গড়ে, কেহ বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্তন করিতে হয় তবে মাটির পরিবর্তন নহে—যে ব্যক্তি গড়ে তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেষ্টা ও চিন্তার পরিবর্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—'কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং'—বীর্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্যই সার। এই বীর্য দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্মে বীর, কেহ বা কর্মে বীর। বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না তাহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু সর্বপ্রধান কারণ বীর্যের অভাব। এই বীর্যের দারিদ্র্যবশত যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি তবে বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?

আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেলবাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া ফেলিয়া আপেল-গাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব। এই কথা নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেল-গাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে—আমাদের আমবাগানের জমির সার বহুকাল হইল নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না ইহাই আমাদের মূল দুর্ভাগ্য নহে, মাটিতে সার নাই ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সেই সার যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুর পরিমাণে ফলিত এবং তখন সেই আম্রের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না। তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াসে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া এক রাত্রে পরের প্রসাদে বড়োলোক হইবার দুরাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর-কিছুই নহে—'কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং'—বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে। ঋষিরা বলিয়াছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। এই-যে আত্মা, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। বিশ্বাত্মা-পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক—যে ব্যক্তি দুর্বল সে নিজের আত্মাকে পায় না, নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে সে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপ নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে সে পথ আমাদের সম্মুখে নাই; কিন্তু যে মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক—তাহা বল, তাহা বীর্য। য়ুরোপ যে কর্মের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে আমরা সে কর্মের দ্বারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব

না—আমাদের সম্মুখে অন্য পথ, আমাদের চতুর্দিকে অন্যরূপ পরিবেশ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্যরূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্চয় অন্যত্র—কিন্তু আমাদের সেই বীর্য আবশ্যক যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেষকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানে সফল করিতে পারিব এবং শক্তির গূঢ় সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত-উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—আত্মা তো আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, দুঃখ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই; কৃশ সংকল্পের দৌর্বল্য, ক্ষীণ শক্তির আত্মবঞ্চনা, সুখবিলাসের ভীরুতা, লোকলজ্জা, লোকভয় আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে যথার্থভাবে আত্মপরিচয় আত্মলাভ আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে। সেইজন্যই ভিক্ষুকের মতো আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষ্যা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্য অবস্থা যদি দৈবক্রমে অন্যের মতো হয় তবেই আমাদের সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভালো করিয়া পড়িয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব, মহত্ত্ব কত বিচিত্র প্রকারের—গ্রীসের মহত্ত্ব এবং রোমের মহত্ত্ব একজাতীয় নহে—গ্রীস বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বড়ো, রোম কর্মে ও বিধিতে বড়ো। রোম তাহার বিজয়পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংস্রবে আসিল তখন বাহুবলে ও কর্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিদ্যা-বুদ্ধিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলাবিদ্যা ও সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস হইল না—সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অনুকৃতিতে নহে—সে লোকসংস্থানকার্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্য-বিজ্ঞান-কলাবিদ্যায় হইল না।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ য়ুরোপীয় প্রতাপের যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য আকারের হইতে পারে—আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্মের দ্বারা, চীন-জাপান ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ তিব্বত-মঙ্গোলিয়া—এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল। আজ য়ুরোপ অস্ত্রের দ্বারা বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক য়ুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে—ইংরেজের ইস্কুল ঘরে-বাহিরে দেহে-মনে আচারে-বিচারে সর্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে-সকল বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্যও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সে আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনোই আত্মোন্নতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির যথার্থ উপযোগিতা কী তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভালো নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়াই যথার্থ অগ্রসর হওয়া—তাহাতে যদি মন্দগতিতে যাওয়া যায় তবে সে-ও ভালো। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই—কারণ, চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়ামাত্রই লাভ নহে। ব্রিটিশ-রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের কৃতকার্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ-বিধিব্যবস্থা যত ভালোই হউক-না কেন, তাহা তো বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুলত্রুটি-ক্ষতিক্লেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভুল করিতে দিবার ধৈর্য যে ব্রিটিশ-রাজের নাই। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে

পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে তাহার সুবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বত্ব দিতে পারেন না। মনে করা যাক কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির পূর্ববর্তী কমিশনারগণ পৌরকার্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, সেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে এখন কলিকাতার পৌরকার্য পূর্বের চেয়ে ভালোই চলিতেছে, কিন্তু এরূপ ভালো চলাই যে সর্বাপেক্ষা ভালো তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা খারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো। আমরা গরিব এবং নানা বিষয়ে অক্ষম; আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য ধনী জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে দেশীয় লোকের কর্তৃত্ব খর্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেম্‌ব্রিজ-অক্‌সফোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেয় আছে— আমরা গরিবের যোগ্য বিদ্যালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি তবে সেই আমাদের সম্পদ। যে ভালো আমার আয়ত্ত ভালো নহে সে ভালোকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষম বিপদ। অল্পদিন হইল একজন বাঙালি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন— তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ-রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা; তিনি যে ভারবাহীমাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, এ কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশ-রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি— অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুররাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণেই এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি তবে তাহা লইয়া স্পর্ধাপূর্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না— আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্য লাভের জন্য, উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। ব্রিটিশ-রাজ ইচ্ছা করিলেও এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই একমাত্র মহিমা বলিয়া জানেন— এই কারণে, ভালোমনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পেট্রিয়ট বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্য উৎসুক— সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কখনোই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পারুক, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশ-রাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি ব্রিটিশ

মতে-হওয়া চাই। সে অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতি-প্রণালী স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা।

অতএব, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জন করিতে হইবে এ কথা আমার বক্তব্য নহে— তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে— উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভালো হইয়াছে?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালোই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়? দুটো লক্ষ্ণৌ ঠুংরি ও 'হিলিমিলি পনিয়া' শুনিয়া যদি কোনো বিলাতবাসী ইংরেজ ভারতীয়-সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে নিরস্ত করা। বিলাতি বাজারের কতকগুলি সুলভ আবর্জনা এবং সেইসঙ্গে দুটি-একটি ভালো ছবি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিদ্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি তাহা যে কত নিকৃষ্ট তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেখানে একটা জিনিসের আগাগোড়া নাই, কেবল কতকগুলা খাপছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেখানে সে জিনিসের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়— পরের দেশের ভালোটা তো শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালোটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে— একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে, নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম; ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম; পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতি চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ভালো। নহিলে নিজের দেশে কী আছে তাহা দেখিতে মন যায় না— কেবলই অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্দুকে আছে তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এ দেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন— তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে-সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান— তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর, যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি শিল্পজ্ঞান জন্মিত যাহার সাহায্যে শিল্পসৌন্দর্যের দিব্যনিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে তাহাকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করিয়া অহংকৃত হইয়া উঠি।

'পিয়ের লোটি'-ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসি ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতি আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতি আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতা-বশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতি সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব। সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সংগতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন— আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্খ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলো খাপছাড়া জিনিসপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি— তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আসবাবের দোকান যদি লর্ড কর্জন বলপূর্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম— তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিস-ক্রয়ের চর্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চা হইত। তাহা হইলে ধনীগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতরসম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই— সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে— তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই ফরমায়েশে-তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি-অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য সুলভ ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এ দেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে তেমনি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন-কি হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর হইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা তাকাইয়া আছি। এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মতো ধনুর্বিদ্যার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান করিব না। এ কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিলে দুর্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহার্য পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে ভাবে-ভঙ্গিতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এইজন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে— আমরা কেবলই অকৃতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব— এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের

প্রতিভা। আমাদের চন্ডীমন্ডপ হইতে বিলাতি কারখানাঘরের প্রভূত জঞ্জাল যদি ঝাঁট দিয়া না ফেলি, তবে দুই দিক হইতেই মরিব— অর্থাৎ বিলাতি কারখানাও এখানে চলিবে না, চন্ডীমন্ডপও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানাঘরের ধূমধূলিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে— সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্বাসন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মানুষ হইয়াছেন তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লইতেই হয় তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে— এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অনুকূলে পরিণত করিয়া তোলা, তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাদ্য যদি খাদ্যরূপেই বরাবর থাকিয়া যায় তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক্‌, ব্যাধি ঘটে। খাদ্য যখন খাদ্যরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয়, তখনি তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতি সামগ্রী যখন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায় তখনি তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে— যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতি সরস্বতীর পোষ্যপুত্রগণ এ কথা কোনোমতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্যই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মতো না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিমুহূর্তে ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হৃৎপিন্ডের নাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরানিচালিত বিপুল কারখানা নহে, নির্ভুল নির্বিকার এঞ্জিন নহে— তাহার বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রগুলি লোহদন্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু— রাজলক্ষ্মী প্রতিমুহূর্তে তাহার কর্মের শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্যে মন্ডিত করিয়া দেন, দেনাপাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমার অশ্রুজলে মার্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে, এই-সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি— এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন— দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

শ্রাবণ ১৩১২

স্বদেশী আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬

ভারতবর্ষ

প্রকাশ : ১৯০৬

‘ভারতবর্ষ’ প্রথম প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় পুনর্মুদ্রিত হয় নি। এই গ্রন্থের কোনো কোনো প্রবন্ধ পরে গদ্যগ্রন্থাবলীর বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তিকালে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করা হয়।

‘স্বদেশ’ গ্রন্থভুক্ত ‘ব্রাহ্মণ’ প্রবন্ধটিতে ‘চীনেম্যানের চিঠি’-র প্রথমাংশ বাদ দিয়ে শেষাংশ যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

‘বারোয়ারি মঙ্গল’ পরবর্তীকালে ‘চারিত্রপূজা’ (১৯০৭)-য় সংক্ষেপিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত সেই সংক্ষেপিত রূপটি বর্তমান রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে ‘চারিত্রপূজা’-য় এবং পূর্ণতর রূপটি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হল।

নববর্ষ

বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত

অধুনা আমাদের কাছে কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হউক, দূরে হউক, দিনে হউক, দিনের অবসানে হউক, কর্ম করিতে হইবে। কী করি, কী করি, কোথায় মরিতে হইবে, কোথায় আত্মবিসর্জন করিতে হইবে, ইহাই অশান্তচিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হউক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া, মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে! এই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জাতিকে পাইয়া বসে তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন দুর্গম হিমালয়শিখরে যে লোমশ ছাগ এতকাল নিরুদ্‌বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে তাহারা অকস্মাৎ শিকারির গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে; বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন পক্ষী এতকাল জনশূন্য তুষারমেরুর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল, অকলঙ্ক শুভ্র নীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে, এবং আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

এখানে আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই, দেখি সে অক্লিষ্ট অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে। এই নিখিলগৃহিণীর রান্নাঘর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন্‌ ভাণ্ডারের স্তরে স্তরে ইঁহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে? ইঁহার দক্ষিণহস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়, ইঁহার কাজকে লীলার মতো মনে হয়, ইঁহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে ঔদাসীন্যের মতো জ্ঞান হয়। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া, স্থিতিকেই গতির ঊর্ধ্বে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে— ঊর্ধ্বশ্বাস কর্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই কর্মের চতুর্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা, প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে, ইহাই তাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে, এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষমাত্র।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্নবিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং

আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী অতি সহজ সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বরমাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত, সৈনিক-সিপাহি অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত। আচাররক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজরক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন করা তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ট শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে—ইংরেজি কোর্তা, ইংরেজের দোকানের আসবাব, ইংরেজি মাস্টারের বাগ্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল কোথাও থাকিবে না—কোনো কাজেই লাগিবে না। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজি স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ; তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটহতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ-সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর, আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে—যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব—যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না, করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

আজ নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর-একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

সকল দেশেই একজন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব বেশভূষায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের কৌতূহল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহাকে ঘিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করে—তাহার দ্বারা আহত হয় না, এবং তাহাকে আঘাত করে না। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিয়োন্‌থসাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপে কখনো সেরূপ পারিতেন না। ধর্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃশ্যমান নহে—যেখানে ভাষা, আকৃতি, বেশভূষা, সমস্তই স্বতন্ত্র সেখানে কৌতূহলের নিষ্ঠুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত, সে নিজের চারি দিকে একটি চিরস্থায়ী নির্জনতা বহন করিয়া চলে—সেইজন্য কেহ তাহার একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। যাহারা সর্বদাই ভিড় করিয়া, দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নূতন লোকের চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে এক পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে, সেখানে কোনো বাধা রচনা করে না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই, তাহার একাকিত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক হউক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না; বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারি দিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়; আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোনো কথা বলে না।

এই একাকিত্বের মহত্ত্ব যাহার চিত্ত আকর্ষণ করে না সে ভারতবর্ষকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে না। বহুশতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্মত্ত বরাহের ন্যায় ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্বদ্বারা পরিরক্ষিত ছিল—কেহই তাহার মর্মস্থানে আঘাত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরোধ না করিয়াও নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে জানে—সেজন্য এ পর্যন্ত অস্ত্রধারী প্রহরীর প্রয়োজন হয় নাই। কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত, সর্বপ্রকার বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে, তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।

য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ আরাম সুখ নিজের; কিন্তু তাহার দানধ্যান, স্কুলকলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্যব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে; আমাদের দানধ্যান অধ্যাপন—আমাদের কর্তব্য একলার।

এই ভাবটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা করা কিছু নহে; করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, হইবেও না। এমন-কি, বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটো ছোটো সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তন্তুবায় যে মরিয়াছে সে একত্র হইবার ত্রুটিতে নহে; তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভালো হয় এবং প্রত্যেক তন্তুবায় যদি কাজ করে, অন্ন করিয়া খায়, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের ও ঈর্ষ্যার বিষ জমিতে পায় না এবং ম্যাঞ্চেস্টর তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। একটি শিক্ষিত জাপানি বলেন, 'তোমরা বহুব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড়ো কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিয়ো না। আমরা জার্মানি হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সস্তা কাঠে তাহার সুলভ ও সরল প্রতিকৃতি করিয়া শিল্পীসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া দিয়াছি; ইহাতে কাজের উন্নতি হইয়াছে, সকলে আহারও পাইতেছে।' এইরূপে যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে কাজেই সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়। তাহাতে কর্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে, মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই— তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে— মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড়ো দল ছোটো দলকে পিষিয়া ফেলে, বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মতো চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া, যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্‌। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই-সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে বাহিরে চারি দিকে মানুষগুলাকে যে ভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া, প্রমোদে মাতিয়া, বলপূর্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারও থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ খেলা নৃত্য ঘোড়দৌড় শিকার ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মতো দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যদি এক মুহূর্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলনলাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

ভারতবর্ষ ভোগের নিবিড়তাকে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লঘু করিয়া দিয়াছে, এবং কর্মের জটিলতাকেও সরল করিয়া আনিয়া মানুষে মানুষে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ভোগে কর্মে এবং ধ্যানে প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্বচর্চার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ব্যবসায়ী— সেও মন দিয়া কথকতা শোনে, ক্রিয়াকর্ম করে; শিল্পী— সেও নিশ্চিন্তমনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়ে। এই অবকাশের বিস্তারে গৃহকে, মনকে, সমাজকে কলুষের ঘনবাষ্প হইতে অনেকটা পরিমাণে নির্মল করিয়া রাখে, দূষিত বায়ুকে বদ্ধ করিয়া রাখে না, এবং মলিনতার আবর্জনাকে একেবারে গায়ের পাশেই জমিতে দেয় না। পরস্পরের কাড়াকাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষিতে যে রিপুর দাবানল জ্বলিয়া উঠে, ভারতবর্ষে তাহা প্রশমিত থাকে।

ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশিসবর্ষণে ও কল্যাণশস্যে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার, টাকা জুটাইবার ও সংকল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়া যে যেখানে, আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থিরশান্তচিত্তে ধৈর্যের সহিত —সন্তোষের সহিত পুণ্যকর্ম মঙ্গলকর্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি; আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটীরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই; ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি— চাতকপক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া না থাকি; তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব। বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল সেই স্থানটি আমরা যদি

আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি, তবে মুহূর্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ ছোটো-বড়ো স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই মর্যাদা দান করিয়াছে। এবং সে মর্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈতৃক কর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম যাহার পক্ষে সুলভতম, তাহা পালনেই তাহার গৌরব; তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্যাদা। এই মর্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে; বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্রমজীবী প্রাণপণে কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্যাদার আবরণ দেয় না। সে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থই হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে য়ুরোপের পনেরো আনা লোক দীনতায় ঈর্ষ্যায় ব্যর্থপ্রয়াসে অস্থির। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী, নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে—ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দিদাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে—বড়োদের আত্মীয়তার ভার ছোটোদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোটোবড়োর অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্বত্রই সকলপ্রকার ছোটোর সংখ্যাই অধিক ও বড়োর সংখ্যাই স্বল্প হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

য়ুরোপে এই অমর্যাদার প্রভাব এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সেখানে একদল আধুনিক স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক হইয়াছে বলিয়াই লজ্জাবোধ করে। গর্ভধারণ করা, স্বামী-সন্তানের সেবা করা, তাহারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে। মানুষ বড়ো, কর্মবিশেষ বড়ো নহে; মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া যে কর্মই করা যায় তাহাতে অপমান নাই; দারিদ্র্য লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে—সকল কর্মে, সকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলিয়া রাখা যায়, এ ভাব য়ুরোপে স্থান পায় না। সেইজন্য সক্ষম অক্ষম সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সমাজে প্রভূত নিষ্ফলতা, অন্তহীন বৃথাকর্ম ও আত্মঘাতী উদ্যমের সৃষ্টি করিতে থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনা বাটা, আত্মীয়-অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, ইহা য়ুরোপের চক্ষে অত্যাচার ও অপমান, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার—ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান। বিলাতে এই-সমস্ত কাজে যাহারা প্রত্যহ রত থাকে, শুনিতে পাই, তাহারা ইতরভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হয়। কারণ, কাজকে ছোটো জানিয়া তাহা করিতে বাধ্য হইলে, মানুষ নিজে ছোটো হয়। আমাদের লক্ষ্মীগণ যতই সেবার কর্মে ব্রতী হন, তুচ্ছ কর্মসকলকে পুণ্যকর্ম বলিয়া সম্পন্ন করেন, অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, ততই তাঁহারা শ্রীসৌন্দর্যে পবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া উঠেন—তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতুর্দিক হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া পলায়ন করে।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্যকথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভালো। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পরে আর কোনো অগৌরব নাই। রামের বাড়িতে শ্যামের কোনো অধিকার নাই, এ কথা স্থিরনিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়িতে কর্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু

শ্যামের যদি এমন পাগলামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, রামের বাড়িতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত এবং সেই বৃথাচেষ্টায় সে বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্যাদা ও শান্তি লাভ করে বলিয়াই, ছোটো সুযোগ পাইলেই বড়োকে খেদাইয়া যায় না, এবং বড়োও ছোটোকে সর্বদা সর্বপ্রযত্নে খেদাইয়া রাখে না।

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্ধাবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সংগত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে কাজে শৈথিল্য আনে ইহা যদি সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরি-ভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য, সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ-সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা-চক্‌মকির ঠোকাঠুকি-শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধনিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে মূল্যবান মনে করা বর্বরতা মাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্বরতা।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজ নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষ্যাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই-যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপে যাহাকে ‘ফ্রীডম’ বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর; তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বন্ধ করিয়া রাখে— তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় ফ্রীডম কোনোকালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না— কারণ, আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক কালের ধিক্‌কারসত্ত্বেও এই ফ্রীডম আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল— এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র

পরিয়াছেন এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে, যে ঋষি কবিরা ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীতহরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন— উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহুসহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তবেই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার-করা ফুলপাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচিরপ্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল নবসৌন্দর্য আমরা যদি অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই, তবে দুই দণ্ড বাদেই তাহা কদর্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্পপত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধনরজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা ভাবভঙ্গি আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জীব ও নিষ্ফল হয়— কারণ, তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই— তাহা অসংলগ্ন, অসংগত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব, সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনও তাহা ঝরিয়া পড়িবে না— তখন সেই অম্লানগৌরব মাল্যখানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্‌, তাহারই জয় হইবে; আমরা— যাহারা ইংরেজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে— 'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী-সমানা'। তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে : পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।

তিনি কহিবেন : ওঁ ইতি ব্রহ্ম।
তিনি কহিবেন : ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
তিনি কহিবেন : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন।

বৈশাখ ১৩০৯

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে— পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসি-ইংরেজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি-খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে।

ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না—সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও, মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর-সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনও ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইঁহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি; বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন আচারব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্‌গারকাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে, বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগর-রক্ত দীপ্তনেত্রের ন্যায় দেখা দেয়; সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মর-রচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরীরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন—এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে—সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যেসকল চাতুরী প্রবঞ্চনা হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের

ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্জের মতো ইংরেজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরও ক্ষুদ্র; বস্তুত শতরঞ্জের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো-আনাই সাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষা সমস্তই একটি বৃহৎ হোআইট্‌অ্যাওয়ে-লেড্‌লর দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি—আর-সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এই কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরানিশালার এক কোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইলডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খৃস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের', তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।

যিশুখৃস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি। ইংরেজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে; সেও নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তার করেন নাই—এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কী করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কী করিব তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়। ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ, যে, ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরেজ বল, ফরাসি বল, কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র-উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া?

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া

এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা— বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল— যাহাতে কোনো পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না— সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে, উদ্যম গুণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বণিকের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে— এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই-সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনোমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেন্ট কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই বিরোধশস্যেরই প্রাণবান বলবান বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায়— তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসি-বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে এমন স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু ফল উল্টা হইয়াছে— য়ুরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকেই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল, নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয়, মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ

করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশুযুদ্ধভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিয়ুজীল্যান্ড, কেপ-কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই—তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার মতো হইয়াছে—এরূপ স্থলে বাহিরের লোককে সে-সমাজে নিজের কোন্‌খানে আশ্রয় দিবে? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে. সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ, ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম, এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। একককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব

করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা— নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি সেই সেতু নির্মিত হয় তবে এই দ্বিধারও সফলতা আছে; কারণ, বিচ্ছেদের আঘাত না পাইলে মিলন সচেতন হয় না। যদি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকে তবে বিদেশ আমাদিগকে যে আঘাত করিতেছে সেই আঘাতে স্বদেশকেই আমরা নিবিড়তররূপে উপলব্ধি করিব। প্রবাসে নির্বাসনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাত্ম্যকে মহত্তম করিয়া তুলিবে।

মামুদ ও মহম্মদ ঘোরির বিজয়বার্তার সন-তারিখ আমরা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি। তিনি তাঁহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা দান করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে পরের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা লুকাইবার আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন এ কথা আমরা বুঝিব, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে; আমরা কেবল গ্রহণ করিব না, অনুকরণ করিব না, দান করিব, প্রবর্তন করিব, এমন সম্ভাবনা আছে; পলিটিক্‌স এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে, প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের পথে বৈরাগ্যকঠিন দারিদ্র্যগৌরব শিরোধার্য করিয়া দুর্গম নির্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্য আমাদের ঋষি-পিতামহদের সুগম্ভীর নিদেশ-নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি— সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্য কোনো পান্থ নাই বলিয়া আমরা ফিরিব না, গ্রন্থভারনত শিক্ষকমহাশয় সে পথে চলিতেছেন না বলিয়া লজ্জিত হইব না। মূল্য না দিলে কোনো মূল্যবান জিনিসকে আপনার করা যায় না। ভিক্ষা করিতে গেলে কেবল খুদকুঁড়া মেলে; তাহাতে পেট অল্পই ভরে, অথচ জাতিও থাকে না। বিদেশকে যতক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততক্ষণ আমরা কিছু লইতেও পারি না; লইলেও তাহার সঙ্গে আত্মসম্মান থাকে না বলিয়াই তাহা তেমন করিয়া আপনার হয় না, সংকোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসংগত হইয়া থাকে। যখন গৌরবসহকারে দিব তখন গৌরবসহকারে লইব। হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিবার সংগতি কোন্‌ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করো। তাহার পর হইতে আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি বাধাহীন ও অকুণ্ঠিত হইবে, আমাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অকৃত্রিম ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। ইংরেজ নিজেকে সর্বত্র প্রসারিত, দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত করাকেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে; তাহাদের বুদ্ধিবিচারের এই উন্মত্ত অন্ধ অবস্থায় তাহারা ধৈর্যের সহিত আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। উপনিষদে অনুশাসন আছে : শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্‌। শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। কারণ, শ্রদ্ধার সহিত না দিলে যথার্থ জিনিস দেওয়াই যায় না, বরঞ্চ এমন একটা জিনিস দেওয়া হয় যাহাতে গ্রহীতাকে হীন করা হয়। আজকালকার ইংরেজ শিক্ষকগণ দানের দ্বারা আমাদিগকে হীন করিয়া থাকেন; তাঁহারা অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার সহিত দান করেন, সেইসঙ্গে প্রত্যহ সবিদ্রূপে স্মরণ করাইয়া থাকেন, 'যাহা দিতেছি, ইহার তুল্য তোমাদের কিছুই নাই এবং যাহা লইতেছ তাহার প্রতিদান দেওয়া তোমাদের সাধ্যের অতীত।' প্রত্যহ এই অবমাননার বিষ আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতে পক্ষাঘাত আনিয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিয়া দেয়। শিশুকাল হইতেই নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করিবার কোনো অবকাশ কোনো সুযোগ পাই নাই। পরভাষার বানান-বাক্য-ব্যাকরণ ও মতামতের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত অভিভূত হইয়া

আছি— নিজের কোনো শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। ইংরেজের নিজের ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ নহে— অক্‌সফোর্ড-কেমব্রিজে তাঁহাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে তাহা নহে, তাহারা আলোক, আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাহাদের সুদূর কালের সম্বন্ধ নহে। একে তো তাহাদের চতুর্দিগ্‌বর্তী স্বদেশীসমাজ স্বদেশীশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আপন করিয়া লইবার জন্য শিশুকাল হইতে সর্বতোভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহার পরে শিক্ষাপ্রণালী ও অধ্যাপকগণও অনুকূল। আমাদের আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রতিকূল; যাহা শিখি তাহা প্রতিকূল, যে উপায়ে শিখি তাহা প্রতিকূল, যে শেখায় সেও প্রতিকূল। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা কিছু লাভ করিয়া থাকি, যদি এ শিক্ষা আমরা কোনো কাজে খাটাইতে পারি, তাহা আমাদের গুণ।

অবশ্য, এই বিদেশী শিক্ষাধিক্‌কারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া, স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছে তাহাকে নিজের বা পরের ইচ্ছামত বিকৃত করিলে আমরা জগতে নিষ্ফল ও লজ্জিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণ পরিণতি দিলে সে অনায়াসেই বিদেশের জিনিসকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার জিনিস বিদেশকে দান করিতে পারিবে।

এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর ভৃতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। একদিন এইরূপ গুরু আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামেই ছিলেন— তাঁহাদের জুতামোজা গাড়িঘোড়া আসবাবপত্রের প্রয়োজনই ছিল না— নবাব ও নবাবের অনুকারীগণ তাঁহাদের চারি দিকে নবাবি করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাঁহাদের দৃক্‌পাত ছিল না, তাঁহাদের অগৌরব ছিল না। এখনো আমাদের দেশে সেই-সকল গুরুর অভাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয় পরিবর্তিত হইয়াছে— এখন ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায় আমাদের জঠরানলনির্বাণের সহায়তা করে না এবং আধুনিক কালের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা নূতন শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের চাল বিগড়াইয়া গেছে। তাঁহাদের আদর্শ বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট নহেন, বিদ্যাদানকে তাঁহারা ধর্মকর্ম বলিয়া জানেন না, বিদ্যাকে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য করিয়া বিদ্যাকেও হীন করিয়াছেন নিজেকেও হীন করিয়াছেন। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে আমাদের সামাজিক উচ্চ আদর্শের এই বিপর্যয়দশা একদিন সংশোধিত হইবে, ইহা আমি দুরাশা বলিয়া গণ্য করি না। আমাদের বৃহৎ শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন দুই-চারিটি লোক নিশ্চয়ই উঠিবেন যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জীবনযাত্রার উপকরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া, বিলাস বিসর্জন দিয়া, দেশের স্থানে স্থানে যে আধুনিক শিক্ষার টোল করিবেন, ইন্‌সপেক্টরের গর্জন ও য়ুনিভার্সিটির তর্জন বর্জিত সেই-সকল টোলেই বিদ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে, মর্যাদা লাভ করিবে। ইংরেজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতরো জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় রহিয়াছে।

ভাদ্র ১৩০৯

ব্রাহ্মণ

সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোনো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল; তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ, বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

ঘটনাটা এতই লজ্জাকর যে, মাসিক পত্রে আমরা ইহার অবতারণা করিতাম না। মার খাইয়া মারা উচিত বা ক্রন্দন করা উচিত বা নালিশ করা উচিত, সে-সমস্ত আলোচনা খবরের কাগজে হইয়া গেছে—সে-সকল কথাও আমরা তুলিতে চাহি না। কিন্তু এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া যে-সকল গুরুতর চিন্তার বিষয় আমাদের মনে উঠিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত।

বিচারক এই ঘটনাটিকে তুচ্ছ বলেন—কাজেও দেখিতেছি ইহা তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তিনি অন্যায় বলেন নাই। কিন্তু এই ঘটনাটি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হওয়াতেই বুঝিতেছি, আমাদের সমাজের বিকার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইংরেজ যাহাকে প্রেস্টিজ, অর্থাৎ তাঁহাদের রাজসম্মান বলেন, তাহাকে মূল্যবান জ্ঞান করিয়া থাকেন। কারণ, এই প্রেস্টিজের জোর অনেক সময়ে সৈন্যের কাজ করে। যাহাকে চালনা করিতে হইবে তাহার কাছে প্রেস্টিজ রাখা চাই। বোয়ার যুদ্ধের আরম্ভকালে ইংরেজ-সাম্রাজ্য যখন স্বল্পপরিমিত কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে বার বার অপমানিত হইতেছিল তখন ইংরেজ ভারতবর্ষের মধ্যে যত সংকোচ অনুভব করিতেছিল এমন আর কোথাও নহে। তখন আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিলাম, ইংরেজের বুট এ দেশে পূর্বের ন্যায় তেমন অত্যন্ত জোরে মচমচ করিতেছে না।

আমাদের দেশে এক কালে ব্রাহ্মণের তেমনি একটা প্রেস্টিজ ছিল। কারণ, সমাজচালনার ভার ব্রাহ্মণের উপরেই ছিল। ব্রাহ্মণ যথারীতি এই সমাজকে রক্ষা করিতেছেন কি না এবং সমাজরক্ষা করিতে হইলে যে-সকল নিঃস্বার্থ মহদ্‌গুণ থাকা উচিত সে-সমস্ত তাঁহাদের আছে কি না, সে কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই—যতদিন সমাজে তাঁহাদের প্রেস্টিজ ছিল। ইংরেজের পক্ষে তাঁহার প্রেস্টিজ যেরূপ মূল্যবান ব্রাহ্মণের পক্ষেও তাঁহার নিজের প্রেস্টিজ সেইরূপ।

আমাদের দেশে সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের পক্ষেও ইহার আবশ্যক আছে। আবশ্যক আছে বলিয়াই সমাজ এত সম্মান ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল।

আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র একটি সুবৃহৎ ব্যাপার। ইহাই সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বিশাল লোকসম্প্রদায়কে অপরাধ হইতে, স্খলন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যদি এরূপ না হইত তবে ইংরেজ তাঁহার পুলিস ও ফৌজের দ্বারা এতবড়ো দেশে এমন আশ্চর্য শান্তিস্থাপন করিতে পারিতেন না। নবাব-বাদশাহের আমলেও নানা রাজকীয় অশান্তিসত্ত্বেও সামাজিক শান্তি চলিয়া আসিতেছিল—তখনো লোকব্যবহার শিথিল হয় নাই, আদানপ্রদানে সততা রক্ষিত হইত, মিথ্যা সাক্ষ্য নিন্দিত হইত, ঋণী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিত না এবং সাধারণ ধর্মের বিধানগুলিকে সকলে সরল বিশ্বাসে সম্মান করিত।

সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবার ও বিধিবিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্যসাধনের উপযোগী সম্মানও তাঁহার ছিল।

প্রাচ্যপ্রকৃতির অনুগত এই-প্রকার সমাজবিধানকে যদি নিন্দনীয় বলিয়া না মনে করা যায়, তবে ইহার আদর্শকে চিরকাল বিশুদ্ধ রাখিবার এবং ইহার শৃঙ্খলাস্থাপন করিবার ভার কোনো-এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর সমর্পণ করিতেই হয়। তাঁহারা জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া, অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজনযাজনকেই ব্রত করিয়া, দেশের উচ্চতম আদর্শকে সমস্ত দোকানদারির কলুষস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক যে সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন তাহার যথার্থ অধিকারী হইবেন—এরূপ আশা করা যায়।

যথার্থ অধিকার হইতে লোক নিজের দোষে ভ্রষ্ট হয়। ইংরেজের বেলাতেও তাহা দেখিতে পাই। দেশী লোকের প্রতি অন্যায় করিয়া যখন প্রেস্টিজ রক্ষার দোহাই দিয়া ইংরেজ দণ্ড হইতে অব্যাহতি চায়, তখন যথার্থ প্রেস্টিজের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। ন্যায়পরতার প্রেস্টিজ সকল প্রেস্টিজের বড়ো—তাহার কাছে আমাদের মন স্বেচ্ছাপূর্বক মাথা নত করে—বিভীষিকা আমাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া নোয়াইয়া দেয়, সেই প্রণতি-অবমাননার বিরুদ্ধে আমাদের মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মণও যখন আপন কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছে তখন কেবল গায়ের জোরে পরলোকের ভয় দেখাইয়া সমাজের উচ্চতম আসনে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

কোনো সম্মান বিনা মূল্যের নহে। যথেচ্ছ কাজ করিয়া সম্মান রাখা যায় না। যে রাজা সিংহাসনে বসেন তিনি দোকান খুলিয়া ব্যাবসা চালাইতে পারেন না। সম্মান যাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকেই সকল দিকে সর্বদা নিজের ইচ্ছাকে খর্ব করিয়া চলিতে হয়। গৃহের অন্যান্য লোকের অপেক্ষা আমাদের দেশে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীকেই সাংসারিক বিষয়ে অধিক বঞ্চিত হইতে হয়—বাড়ির গৃহিণীই সকলের শেষে অন্ন পান। ইহা না হইলে আত্মম্ভরিতার উপর কর্তৃত্বকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। সম্মানও পাইবে, অথচ তাহার কোনো মূল্য দিবে না, ইহা কখনোই চিরদিন সহ্য হয় না।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণেরা বিনা মূল্যে সম্মান আদায়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সম্মান আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর মৌখিক হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নয়; ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে কর্মে শৈথিল্য ঘটাতে সমাজেরও সন্ধিবন্ধন প্রতিদিন বিশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়-স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।

যে সমাজের এক দল ধনমানকে অবহেলা করিতে জানেন, বিলাসকে ঘৃণা করেন—যাঁহাদের আচার নির্মল, ধর্মনিষ্ঠা দৃঢ়, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান-অর্জন ও নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান-বিতরণে রত—পরাধীনতা বা দারিদ্র্যে সে সমাজের কোনো অবমাননা নাই। সমাজ যাঁহাকে যথার্থভাবে সম্মাননীয় করিয়া তোলে সমাজ তাঁহার দ্বারাই সম্মানিত হয়।

সকল সমাজেই মান্যব্যক্তিরা, শ্রেষ্ঠ লোকেরাই, নিজ নিজ সমাজের স্বরূপ। ইংলন্ডকে যখন আমরা ধনী বলি তখন অগণ্য দরিদ্রকে হিসাবের মধ্যে আনি না। য়ুরোপকে যখন আমরা স্বাধীন বলি, তখন তাহার বিপুল জনসাধারণের দুঃসহ অধীনতাকে গণ্য করি না। সেখানে উপরের কয়েক জন লোকই ধনী, উপরের কয়েক জন লোকই স্বাধীন, উপরের কয়েক জন লোকই পাশবতা হইতে মুক্ত। এই উপরের কয়েক জন লোক যতক্ষণ নিম্নের বহুতর লোককে সুখস্বাস্থ্য জ্ঞানধর্ম দিবার জন্য সর্বদা নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ ও নিজের সুখকে নিয়মিত করে ততক্ষণ সেই সভ্যসমাজের কোনো ভয় নাই।

য়ুরোপীয় সমাজ এইভাবে চলিতেছে কি না সে আলোচনা বৃথা মনে হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা নহে।

যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়নায়, পাশের লোককে ছাড়াইয়া উঠিবার অত্যাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেককে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করিতে হইতেছে, সেখানে কর্তব্যের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখা কঠিন। এবং সেখানে কোনো একটা সীমায় আসিয়া আশাকে সংযত করাও লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়।

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এ অবস্থায় এমন কথা কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না যে, বরঞ্চ পিছাইয়া

প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অন্যায় করিব না। এমন কথাও কাহারও মনে আসে না যে, বরঞ্চ জলে স্থলে সৈন্যসজ্জা কম করিয়া রাজকীয় ক্ষমতায় প্রতিবেশীর কাছে লাঘব স্বীকার করিব, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সুখসন্তোষ ও জ্ঞানধর্মের বিস্তার করিতে হইবে। প্রতিযোগিতার আকর্ষণে যে বেগ উৎপন্ন হয় তাহাতে উদ্দামভাবে চালাইয়া লইয়া যায়—এবং এই দুর্দান্তগতিতে চলাকেই য়ুরোপে উন্নতি কহে, আমরাও তাহাকেই উন্নতি বলিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু যে চলা পদে পদে থামার দ্বারা নিয়মিত নহে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। যে ছন্দে যতি নাই তাহা ছন্দই নহে। সমাজের পদমূলে সমুদ্র অহোরাত্র তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তি ও স্থিতির চিরন্তন আদর্শ নিত্যকাল বিরাজমান থাকা চাই।

সেই আদর্শকে কাহারা অটলভাবে রক্ষা করিতে পারে? যাহারা পুরুষানুক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে দূরে আছে, আর্থিক দারিদ্র্যেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা, মঙ্গলকর্মকে যাহারা পণ্যদ্রব্যের মতো দেখে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্মের মধ্যে যাহাদের চিত্ত অভ্রভেদী হইয়া বিরাজ করে, এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহদ্ভাবই যাঁহাদিগকে পবিত্র ও পূজনীয় করিয়াছে।

য়ুরোপেও অবিশ্রাম কর্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক-এক জন মনীষী উঠিয়া ঘূর্ণগতির উন্মত্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ, পরিণতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে কে? সম্মিলিত প্রকাণ্ড স্বার্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকারের দুই-এক জন লোক তর্জনী উঠাইয়া রুখিবেন কী করিয়া! বাণিজ্য-জাহাজে উনপঞ্চাশ পালে হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারি সারি যুদ্ধ-ঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে—এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে?

এই উন্মত্ততায়, এই প্রাণপণে নিজ শক্তির একান্ত উদ্‌ঘট্টনে আধ্যাত্মিকতার জন্ম হইতে পারে এমন তর্ক আমাদের মনেও ওঠে। এই বেগের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি; ইহা আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে; ইহা যে প্রলয়ের দিকে যাইতে পারে, এমন সন্দেহ আমাদের হয় না।

ইহা কী প্রকারের? যেমন চীরধারী যে-একটি দল নিজেকে সাধু ও সাধক বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা গাঁজার নেশাকে আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের সাধনা বলিয়া মনে করে। নেশায় একাগ্রতা জন্মে, উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক স্বাধীন সবলতা হ্রাস হইতে থাকে। আর-সমস্ত ছাড়া যায়, কিন্তু এই নেশার উত্তেজনা ছাড়া যায় না—ক্রমে মনের বল যত কমিতে থাকে নেশার মাত্রাও তত বাড়াইতে হয়। ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বা সশব্দে বাদ্য বাজাইয়া, নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মূর্ছান্বিত করিয়া যে ধর্মোন্মাদের বিলাস সম্ভোগ করা যায় তাহাও কৃত্রিম। তাহাতে অভ্যাস জন্মিয়া গেলে, তাহা অহিফেনের নেশার মতো আমাদিগকে অবসাদের সময় কেবলই তাড়না করিতে থাকে। আত্মসমাহিত শান্ত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত যথার্থ স্থায়ী মূল্যবান কোনো জিনিস পাওয়া যায় না ও স্থায়ী মূল্যবান কোনো জিনিস রক্ষা করা যায় না।

অথচ আবেগ ব্যতীত কাজ ও কাজ ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে না। এইজন্যই ভারতবর্ষ আপন সমাজে গতি ও স্থিতির সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি যাহারা হাতে কলমে সমাজের কার্যসাধন করে তাহাদের কর্মের সীমা নির্দিষ্ট ছিল। এইজন্যই ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া নিজের কর্তব্যকে ধর্মের মধ্যে গণ্য করিতে পারিত। স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে ধর্মের উপরে কর্তব্য স্থাপন করিলে, কাজের মধ্যেও বিশ্রাম এবং আধ্যাত্মিকতালাভের অবকাশ পাওয়া যায়।

য়ুরোপীয় সমাজ যে নিয়মে চলে তাহাতে গতিজনিত বিশেষ একটা ঝোঁকের মুখেই অধিকাংশ লোককে ঠেলিয়া দেয়। সেখানে বুদ্ধিজীবী লোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই ঝুঁকিয়া পড়ে, সাধারণ লোকে অর্থোপার্জনেই ভিড় করে। বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং

জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে। এমন সময় হওয়া বিচিত্র নহে যখন বিশুদ্ধজ্ঞানচর্চা যথেষ্ট লোককে আকর্ষণ করিবে না। এমন সময় আসিতে পারে যখন আবশ্যক হইলেও সৈন্য পাওয়া যাইবে না। কারণ, প্রবৃত্তিকে কে ঠেকাইবে? যে জর্মানি একদিন পণ্ডিত ছিল সে জর্মানি যদি বণিক হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার পাণ্ডিত্য উদ্ধার করিবে কে? যে ইংরেজ একদিন ক্ষত্রিয়ভাবে আর্তত্রাণব্রত গ্রহণ করিয়াছিল সে যখন গায়ের জোরে পৃথিবীর চতুর্দিকে নিজের দোকানদারি চালাইতে ধাবিত হইয়াছে, তখন তাহাকে তাহার সেই পুরাতন উদার ক্ষত্রিয়ভাবে ফিরাইয়া আনিবে কোন্ শক্তিতে?

এই ঝোঁকের উপরেই সমস্ত কর্তৃত্ব না দিয়া সংযত সুশৃঙ্খল কর্তব্যবিধানের উপরে কর্তৃত্বভার দেওয়াই ভারতবর্ষীয় সমাজপ্রণালী। সমাজ যদি সজীব থাকে, বাহিরের আঘাতের দ্বারা অভিভূত হইয়া না পড়ে, তবে এই প্রণালী অনুসারে সকল সময়েই সমাজে সামঞ্জস্য থাকে—এক দিকে হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্য দিক শূন্য হইয়া যায় না। সকলেই আপন আদর্শ রক্ষা করে এবং আপন কাজ করিয়া গৌরব বোধ করে।

কিন্তু কাজের একটা বেগ আছেই। সেই বেগে সে আপনার পরিণাম ভুলিয়া যায়। কাজ তখন নিজেই লক্ষ্য হইয়া উঠে। শুদ্ধমাত্র কর্মের বেগের মুখে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সুখ আছে। কর্মের ভূত কর্মী লোককে পাইয়া বসে।

শুদ্ধ তাহাই নহে। কার্যসাধনই যখন অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে তখন উপায়ের বিচার ক্রমেই চলিয়া যায়। সংসারের সহিত, উপস্থিত আবশ্যকের সহিত কর্মীকে নানাপ্রকারে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

অতএব যে সমাজে কর্ম আছে সেই সমাজেই কর্মকে সংযত রাখিবার বিধান থাকা চাই, অন্ধ কর্মই যাহাতে মনুষ্যত্বের উপর কর্তৃত্ব লাভ না করে এমন সতর্ক পাহারা থাকা চাই। কর্মীদলকে বরাবর ঠিক পথটি দেখাইবার জন্য, কর্মকোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটি বরাবর অবিচলিতভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য, এমন এক দলের আবশ্যক যাঁহারা যথাসম্ভব কর্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য, সেই সম্মান দেয়। ইঁহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি। ইঁহারা যে সমাজে আপনাকে মুক্তভাবে রাখেন ক্ষুদ্র পরাধীনতায় সে সমাজের কোনো ভয় নাই, বিপদ নাই। ব্রাহ্মণ-অংশের মধ্যে সে সমাজ সর্বদা আপনার মনের—আপনার আত্মার স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান ব্রাহ্মণগণ যদি দৃঢ়ভাবে উন্নতভাবে অলুব্ধভাবে সমাজের এই পরমধনটি রক্ষা করিতেন তবে ব্রাহ্মণের অবমাননা সমাজ কখনোই ঘটিতে দিত না এবং এমন কথা কখনোই বিচারকের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না যে, ভদ্র ব্রাহ্মণকে পাদুকাঘাত করা তুচ্ছ ব্যাপার। বিদেশী হইলেও বিচারক মানী ব্রাহ্মণের মান আপনি বুঝিতে পারিতেন।

কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সাহেবের আপিসে নতমস্তকে চাকরি করে, যে ব্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান অধিকারকে বিসর্জন দেয়, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক, বিচারালয়ে বিচারব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্‌কৃত করিয়াছে—সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কী করিয়া? সমাজ রক্ষা করিবে কী করিয়া? শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্মের বিধান লইতে যাইব কী বলিয়া? সে তো সর্বসাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ঘর্মাক্ত-কলেবরে কাড়াকাড়ি-ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গেছে। ভক্তির দ্বারা সে ব্রাহ্মণ তো সমাজকে ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট করে না, নিম্নেই লইয়া যায়।

এ কথা জানি কোনো সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকই কোনো কালে আপনার ধর্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে না, অনেকে স্খলিত হয়। অনেকে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় আচরণ করিয়াছে,

পুরাণে এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু তবু যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ সজীব থাকে, ধর্মপালনের চেষ্টা থাকে, কেহ আগে যাক কেহ পিছাইয়া পড়ুক, কিন্তু সেই পথের পথিক যদি থাকে, যদি এই আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই চেষ্টার দ্বারা, সেই সাধনার দ্বারা, সেই সফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমস্ত সম্প্রদায় সার্থক হইয়া থাকে।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজে সেই আদর্শই নাই। সেইজন্যই ব্রাহ্মণের ছেলে ইংরেজি শিখিলেই ইংরেজি কেতা ধরে—পিতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না। কেন এম.এ.-পাস-করা মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানবিৎ চট্টোপাধ্যায় যে বিদ্যা পাইয়াছেন তাহা ছাত্রকে ঘরে ডাকিয়া আসন হইয়া বসিয়া বিতরণ করিতে পারেন না? সমাজকে শিক্ষাঋণে ঋণী করিবার গৌরব হইতে কেন তাঁহারা নিজেকে ও ব্রাহ্মণসমাজকে বঞ্চিত করেন?

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, খাইব কী? যদি কালিয়া-পোলোয়া না খাইলেও চলে, তবে নিশ্চয়ই সমাজ আপনি আসিয়া যাচিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। তাঁহাদের নহিলে সমাজের চলিবে না, পায়ে ধরিয়া সমাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। আজ তাঁহারা বেতনের জন্য হাত পাতেন, সেইজন্য সমাজ রসিদ লইয়া টিপিয়া টিপিয়া তাঁহাদিগকে বেতন দেয় ও কড়ায় গণ্ডায় তাঁহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়। তাঁহারাও কলের মতো বাঁধা নিয়মে কাজ করেন; শ্রদ্ধা দেনও না, শ্রদ্ধা পানও না—উপরন্তু মাঝে মাঝে সাহেবের পাদুকা পৃষ্ঠে বহন করা-রূপ অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনার সুবিখ্যাত উপলক্ষ হইয়া উঠেন।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে, এ সম্ভাবনাকে আমি সুদূরপরাহত মনে করি না এবং এই আশাকে আমি লঘুভাবে মন হইতে অপসারিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের চিরকালের প্রকৃতি তাহার ক্ষণকালের বিকৃতিকে সংশোধন করিয়া লইবেই।

এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণসমাজের কাজে অব্রাহ্মণ অনেকেও যোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণেতর অনেকে ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞানচর্চা ও উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণও তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ ছিলেন না, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও দ্বিজসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যখন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভের দ্বারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের উপনয়ন হইত, তখনি এ দেশে ব্রাহ্মণের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল। কারণ, চারি দিকের সমাজ যখন অবনত তখন কোনো বিশেষ সমাজ আপনাকে উন্নত রাখিতে পারে না, ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে লইয়া আসে।

ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ অবশিষ্ট রহিল—যখন তাহার আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, তাহার নিকট ব্রাহ্মণত্ব দাবি করিবার জন্য, চারি দিকে আর কেহই রহিল না—তখন তাহার দ্বিজত্বের বিশুদ্ধ কঠিন আদর্শ দ্রুতবেগে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তখনি সে জ্ঞানে বিশ্বাসে রুচিতে ক্রমশ নিকৃষ্ট অধিকারীর দলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। চারি দিকে যেখানে গোলপাতার কুঁড়ে সেখানে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে একটা আটচালা বাঁধিলেই যথেষ্ট—সেখানে সাত-মহল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তুলিবার ব্যয় ও চেষ্টা স্বীকার করিতে সহজেই অপ্রবৃত্তি জন্মে।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজ ছিল, অর্থাৎ সমস্ত আর্যসমাজই দ্বিজ ছিল; শূদ্র বলিতে যে-সকল লোককে বুঝাইত তাহারা সাঁওতাল ভিল কোল ধাঙড়ের দলে ছিল। আর্যসমাজের সহিত তাহাদের শিক্ষা রীতিনীতি ও ধর্মের সম্পূর্ণ ঐক্যস্থাপন একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, কারণ, সমস্ত আর্যসমাজই দ্বিজ ছিল—অর্থাৎ আর্যসমাজের শিক্ষা একই রূপ ছিল। প্রভেদ ছিল কেবল কর্মে। শিক্ষা একই থাকায় পরস্পর পরস্পরকে আদর্শের বিশুদ্ধিরক্ষায় সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতে পারিত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হইতে

সাহায্য করিত এবং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হইতে সাহায্য করিত। সমস্ত সমাজের শিক্ষার আদর্শ সমান উন্নত না হইলে এরূপ কখনোই ঘটিতে পারে না।

বর্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না, এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।

আমাদের বর্তমান সমাজের ভদ্রসম্প্রদায়— অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ ও বণিকসম্প্রদায়— সমাজ যদি ইঁহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া গণ্য না করে তবে ব্রাহ্মণের আর উত্থানের আশা নাই। এক পায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না।

বৈদ্যেরা তো উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কায়স্থেরা বলিতেছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্য— এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখি না। আকার-প্রকার বুদ্ধি ও ক্ষমতা, অর্থাৎ আর্যত্বের লক্ষণে, বর্তমান ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ নাই। বঙ্গদেশের যে-কোনো সভায় পইতা না দেখিলে, ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থ সুবর্ণবণিক প্রভৃতিদের তফাত করা অসম্ভব। কিন্তু যথার্থ অনার্য অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বন্যজাতির সহিত তাঁহাদের তফাত করা সহজ। বিশুদ্ধ আর্যরক্তের সহিত অনার্যরক্তের মিশ্রণ হইয়াছে, তাহা আমাদের বর্ণে আকৃতিতে ধর্মে আচারে ও মানসিক দুর্বলতায় স্পষ্ট বুঝা যায়— কিন্তু সে মিশ্রণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে।

তথাপি এই মিশ্রণ এবং বৌদ্ধযুগের সামাজিক অরাজকতার পরেও সমাজ ব্রাহ্মণকে একটা বিশেষ গণ্ডি দিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে ব্রাহ্মণকে নহিলে তাহার সকল দিকেই বাধে, আত্মরক্ষার জন্য যেমন-তেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই। আধুনিক ইতিহাসে এমনও দেখা যায়, কোনো কোনো স্থানে বিশেষ প্রয়োজনবশত রাজা পইতা দিয়া এক দল ব্রাহ্মণ তৈরি করিয়াও লইয়াছেন। বাংলাদেশে যখন ব্রাহ্মণেরা আচারে ব্যবহারে বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছিলেন তখন রাজা বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সমাজের কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ যখন চারি দিকের প্রভাবে নত হইয়া পড়িতেছিল তখন রাজা কৃত্রিম উপায়ে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নির্বাণোন্মুখ মর্যাদাকে খোঁচা দিয়া জাগাইতেছিলেন। অপর পক্ষে, কৌলীন্যে বিবাহসম্বন্ধে যেরূপ বর্বরতার সৃষ্টি করিল তাহাতে এই কৌলীন্যই বর্ণমিশ্রণের এক গোপন উপায় হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাই হউক, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম রক্ষার জন্য, বিশেষ আবশ্যকতাবশতই, সমাজ বিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদিগকে সেরূপ বিশেষভাবে তাহাদের পূর্বতন আচারকাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ করিবার কোনো অত্যাবশ্যকতা বাংলা-সমাজে ছিল না। যে খুশি যুদ্ধ করুক, বাণিজ্য করুক, তাহাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসিত যাইত না— এবং যাহারা যুদ্ধ-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্পে নিযুক্ত থাকিবে তাহাদিগকে বিশেষ চিহ্নের দ্বারা পৃথক কবিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। ব্যবসায় লোকে নিজের গরজেই করে, কোনো বিশেষ ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে না— ধর্মসম্বন্ধে সে বিধি নহে; তাহা প্রাচীন নিয়মে আবদ্ধ, তাহার আয়োজন রীতিপদ্ধতি আমাদের স্বেচ্ছাবিহিত নহে।

অতএব জড়ত্বপ্রাপ্ত সমাজের শৈথিল্যবশতই এক সময়ে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া একাকার হইয়া গেছে। তাঁহারা যদি সচেতন হন, যদি তাঁহারা নিজের অধিকার যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন, নিজের গৌরব যথার্থভাবে প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হন, তবে তাহাতে সমস্ত সমাজের পক্ষে মঙ্গল, ব্রাহ্মণদের পক্ষে মঙ্গল।

ব্রাহ্মণদিগকে নিজের যথার্থ গৌরব লাভ করিবার জন্য যেমন প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, সমস্ত সমাজকেও তেমনি যাইতে হইবে; ব্রাহ্মণ কেবল একলা যাইবে এবং আর-সকলে যে

যেখানে আছে সে সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। সমস্ত সমাজের এক দিকে গতি না হইলে তাহার কোনো এক অংশ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যখন দেখিব আমাদের দেশের কায়স্থ ও বণিকগণ আপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজের সহিত যুক্ত করিয়া বৃহৎ হইবার, বহু পুরাতনের সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতকে সম্মিলিত করিয়া আমাদের জাতীয় সত্তাকে অবিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখনি জানিব আধুনিক ব্রাহ্মণও প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সমাজকে সজীবভাবে যথার্থভাবে অখণ্ডভাবে এক করিবার কার্যে সফল হইবেন। নহিলে কেবল স্থানীয় কলহবিবাদ দলাদলি লইয়া বিদেশী প্রভাবের সাংঘাতিক অভিঘাত হইতে সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, নহিলে ব্রাহ্মণের সম্মান অর্থাৎ আমাদের সমস্ত সমাজের সম্মান ক্রমে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম হইয়া আসিবে।

আমাদের সমস্ত সমাজ প্রধানতই দ্বিজসমাজ; ইহা যদি না হয়, সমাজ যদি শূদ্রসমাজ হয়, তবে কয়েকজনমাত্র ব্রাহ্মণকে লইয়া এ সমাজ য়ুরোপীয় আদর্শেও খর্ব হইবে, ভারতবর্ষীয় আদর্শেও খর্ব হইবে।

সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবি করিয়া থাকে, আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়ত্বসুখভোগ যে-সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রয় দিয়া থাকে সে সমাজ মরে, এবং নাও যদি মরে তবে তাহার মরাই ভালো।

য়ুরোপ কর্মের উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সর্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত— আমরা যদি ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হই তবে সে প্রাণ অপমানিত হইতে থাকিলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।

য়ুরোপীয় সৈন্য যুদ্ধানুরাগের উত্তেজনায় ও বেতনের লোভে ও গৌরবের আশ্বাসে প্রাণ দেয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় উত্তেজনা ও বেতনের অভাব ঘটিলেও যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। কারণ, যুদ্ধ সমাজের অত্যাবশ্যক কর্ম, এক সম্প্রদায় যদি নিজের ধর্ম বলিয়াই সেই কঠিন কর্তব্যকে গ্রহণ করেন তবে কর্মের সহিত ধর্ম রক্ষা হয়। দেশ-সুদ্ধ সকলে মিলিয়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে মিলিটারিজমের প্রাবল্যে দেশের গুরুতর অনিষ্ট ঘটে।

বাণিজ্য সমাজরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক কর্ম। সেই সামাজিক আবশ্যকপালনকে এক সম্প্রদায় যদি আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম, আপন কৌলিক গৌরব বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে বণিকবৃত্তি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অন্যান্য শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে না। তা ছাড়া কর্মের মধ্যে ধর্মের আদর্শ সর্বদাই জাগ্রত থাকে।

ধর্ম এবং জ্ঞানার্জন, যুদ্ধ এবং রাজকার্য, বাণিজ্য এবং শিল্পচর্চা— সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম। ইহার কোনোটাকেই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিকেই ধর্মগৌরব কুলগৌরব দান করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধও করা হয়, অথচ বিশেষ উৎকর্ষসাধনেরও অবসর দেওয়া হয়।

কর্মের উত্তেজনাই পাছে কর্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের এই আশঙ্কা ছিল। তাই ভারতবর্ষে সামাজিক মানুষটি লড়াই করে, বাণিজ্য করে, কিন্তু নিত্যমানুষটি, সমগ্র মানুষটি শুধুমাত্র সিপাই নহে, শুধুমাত্র বণিক নহে। কর্মকে কুলব্রত করিলে, কর্মকে সামাজিক ধর্ম করিয়া তুলিলে, তবে কর্মসাধনও হয়, অথচ সেই কর্ম আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সমাজের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিয়া, মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া, আত্মার রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে না।

যাঁহারা দ্বিজ তাঁহাদিগকে এক সময় কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন তাঁহারা আর ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য নহেন— তখন তাঁহারা নিত্যকালের মানুষ— তখন কর্ম তাঁহাদের পক্ষে আর ধর্ম নহে, সুতরাং অনায়াসে পরিহার্য। এইরূপে দ্বিজসমাজ বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই

রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন, অবিদ্যা মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে, অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করিবে। এই সংসারই মৃত্যুনিকেতন, ইহাই অবিদ্যা—ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ইহার ভিতর দিয়াই যাইতে হয়; কিন্তু এমনভাবে যাইতে হয়, যেন ইহাই চরম না হইয়া উঠে। কর্মকেই একান্ত প্রাধান্য দিলে সংসারই চরম হইয়া উঠে; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; অমৃত লাভ করিবার লক্ষ্যই ভ্রষ্ট হয়, তাহার অবকাশই থাকে না। এইজন্যই কর্মকে সীমাবদ্ধ করা, কর্মকে ধর্মের সহিত যুক্ত করা—কর্মকে প্রবৃত্তির হাতে, উত্তেজনার হাতে, কর্মজনিত বিপুল বেগের হাতে ছাড়িয়া না দেওয়া—এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা।

ইহাই আদর্শ। ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্মের নানা পাশ শিথিল করিয়া তাহাকে এক দিকে সংসারব্রতপরায়ণ অন্য দিকে মুক্তির অধিকারী করিবার অন্য কোনো উপায় তো দেখি না। এই আদর্শ উন্নততম আদর্শ, এবং ভারতবর্ষের আদর্শ। এই আদর্শে বর্তমান সমাজকে সাধারণভাবে অধিকৃত ও চালিত করিবার উপায় কী, তাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। সমাজের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া কর্মকে ও প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করিয়া তোলা—সেজন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। সমাজের সে অবস্থা জড়ত্বের দ্বারা, শৈথিল্যের দ্বারা আপনি আসিতেছে।

বিদেশী শিক্ষার প্রাবল্যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতায়, এই ভারতবর্ষীয় আদর্শ সত্বর এবং সহজে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিতে পারিবে না—ইহা আমি জানি। কিন্তু য়ুরোপীয় আদর্শ অবলম্বন করাই যে আমাদের পক্ষে সহজ এ দুরাশাও আমার নাই। সর্বপ্রকার আদর্শ পরিত্যাগ করাই সর্বাপেক্ষা সহজ, এবং সেই সহজ পথই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ এমন একটা আলগা জিনিস নহে যে, তাহা পাকা ফলটির মতো পাড়িয়া লইলেই কবলের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে।

সকল পুরাতন ও বৃহৎ আদর্শের মধ্যেই বিনাশ ও রক্ষার একটি সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ তাহার যে শক্তি বাড়াবাড়ি করিয়া মরিতে চায়, তাহার অন্য শক্তি তাহাকে সংযত করিয়া রক্ষা করে। আমাদের শরীরেও যন্ত্রবিশেষের যতটুকু কাজ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত অনিষ্টকর, সেই কাজটুকু আদায় করিয়া সেই অকাজটুকুকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরতন্ত্রে রহিয়াছে; পিত্তের দরকারটুকু শরীর লয়, অদরকারটুকু বর্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে থাকে।

এই-সকল সুব্যবস্থা অনেক দিনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া সমাজের শরীরবিধানকে পরিণতি দান করিয়াছে। আমরা অন্যের নকল করিবার সময় সেই সমগ্র স্বাভাবিক ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং অন্য সমাজে যাহা ভালো করে, নকলকারীর সমাজে তাহাই মন্দের কারণ হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় মানবপ্রকৃতি সুদীর্ঘকালের কার্যে যে সভ্যতাবৃক্ষটিকে ফলবান করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দুটো-একটা ফল চাহিয়া-চিন্তিয়া লইতে পারি, কিন্তু সমস্ত বৃক্ষকে আপনার করিতে পারি না। তাহাদের সেই অতীতকাল আমাদের অতীত।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অতীত যদি বা যত্নের অভাবে আমাদিগকে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, তবু সেই বৃহৎ অতীত ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না; সেই অতীতই ভিতরে থাকিয়া আমাদের পরের নকলকে বারংবার অসংগত ও অকৃতকার্য করিয়া তুলিতেছে। সেই অতীতকে অবহেলা করিয়া যখন আমরা নূতনকে আনি তখন অতীত নিঃশব্দে তাহার প্রতিশোধ লয়—নূতনকে বিনাশ করিয়া, পচাইয়া বায়ু দূষিত করিয়া দেয়। আমরা মনে করিতে পারি, এইটে আমাদের নূতন দরকার, কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আপসের যদি রফা নিষ্পত্তি না করিয়া লইতে পারি, তবে আবশ্যকের দোহাই পাড়িয়াই যে দেউড়ি খোলা পাইব তাহা কিছুতেই নহে। নূতনটাকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও নূতনে-পুরাতনে মিশ না খাইলে সমস্তই পণ্ড হয়।

সেইজন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে। শুষ্কভাবে

শুদ্ধ বিচারবিতর্কের দ্বারা সে প্রাণসঞ্চার হইতে পারে না। যেরূপ ভাবে চলিতেছে সেইরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে দিলেও কিছুই হইবে না। প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মহান ভাব ছিল, যে ভাবের আনন্দে আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন, সেই ভাবের আনন্দে, সেই ভাবের অমৃতে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে, সেই আনন্দই অপূর্ব শক্তিবলে বর্তমানের সহিত অতীতের সমস্ত বাধাগুলি অভাবনীয়রূপে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা জাদু করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রকৃতি আপনার কাজ আপনি করিতে থাকিবে। সেই প্রকৃতি যখন কাজ করে তখনি কাজ হয়—তাহার কাজের হিসাব আমরা কিছুই জানি না—কোনো বুদ্ধিমান লোকে বা বিদ্বান লোকে এই কাজের নিয়ম বা উপায় কোনোমতেই আগে হইতে বলিয়া দিতে পারে না। তর্কের দ্বারা তাহারা যেগুলিকে বাধা মনে করে সেই বাধাগুলিও সহায়তা করে, যাহাকে ছোটো বলিয়া প্রমাণ করে সেও বড়ো হইয়া উঠে।

কোনো জিনিসকে চাই বলিলেই পাওয়া যায় না—অতীতের সাহায্য এক্ষণে আমাদের দরকার হইয়াছে বলিলেই যে তাহাকে সর্বতোভাবে পাওয়া যাইবে তাহা কখনোই না। সেই অতীতের ভাবে যখন আমাদের বুদ্ধি-মন-প্রাণ অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে তখন দেখিতে পাইব, নব নব আকারে নব নব বিকাশে আমাদের কাছে সেই পুরাতন, নবীন হইয়া, প্রফুল্ল হইয়া, ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তখন তাহা শ্মশানশয্যার নীরস ইন্ধন নহে, জীবননিকুঞ্জের ফলবান বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ উদ্‌বেলিত সমুদ্রের বন্যার ন্যায় যখন আমাদের সমাজের মধ্যে ভাবের আনন্দ প্রবাহিত হইবে তখন আমাদের দেশে এই-সকল প্রাচীন নদীপথগুলিই কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন স্বভাবতই আমাদের দেশ ব্রহ্মচর্যে জাগিয়া উঠিবে, সামসংগীতধ্বনিতে জাগিয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে জাগিয়া উঠিবে। যে পাখিরা প্রভাতকালে তপোবনে গান গাহিত তাহারাই গাহিয়া উঠিবে, দাঁড়ের কাকাতুয়া বা খাঁচার ক্যানারি-নাইটিঙেগল নহে।

আমাদের সমস্ত সমাজ সেই প্রাচীন দ্বিজত্বকে লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যহ তাহার পরিচয় পাইয়া মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। এক সময় আমাদের হিন্দুত্ব গোপন করিবার, বর্জন করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা হইয়াছিল—সেই আশায় আমরা অনেক দিন চাঁদনির দোকানে ফিরিয়াছি ও চৌরঙ্গি-অঞ্চলের দেউড়িতে হাজরি দিয়াছি। আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, যদি আমাদের সমাজকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াই মহত্ত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, তবে তো আমাদের আনন্দের দিন। আমরা ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে চাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাতে যাঁহারা বাধা দিয়া অনর্থক কলহ করিতে বসেন, তর্কের ধুলায় ইহার সুদূরব্যাপী সফলতা যাঁহারা না দেখিতে পান, বৃহৎ ভাবের মহত্ত্বের কাছে আপনাদের ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের ব্যর্থ বাদবিবাদ যাঁহারা লজ্জার সহিত নিরস্ত না করেন, তাঁহারা যে সমাজের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছেন সেই সমাজেরই শত্রু। দীর্ঘকাল হইতে ভারতবর্ষ আপন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সমাজকে আহ্বান করিতেছে। য়ুরোপ তাহার জ্ঞানবিজ্ঞানকে বহুতর ভাগে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া বিহ্বল বুদ্ধিতে তাহার মধ্যে সম্প্রতি ঐক্য সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে—ভারতবর্ষের সেই ব্রাহ্মণ কোথায় যিনি স্বভাবসিদ্ধপ্রতিভাবলে অতি অনায়াসেই সেই বিপুল জটিলতার মধ্যে ঐক্যের নিগূঢ় সরল পথ নির্দেশ করিয়া দিবেন? সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে—ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে। বিধাতার আশীর্বাদে ব্রাহ্মণের পাদুকাঘাতলাভ হয়তো ব্যর্থ হইবে না। নিদ্রা অত্যন্ত গভীর হইলে এইরূপ নিষ্ঠুর আঘাতেই তাহা ভাঙাইতে হয়। য়ুরোপের কর্মীগণ কর্মজালে জড়িত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতির কোনো পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে নানা দিকে নানা আঘাত করিতেছে—ভারতবর্ষে যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার

অধিকারী আজ তাঁহারা ধর্মের দ্বারা কর্মকে জগতে গৌরবান্বিত করুন— তাঁহারা প্রবৃত্তির অনুরোধে নহে, উত্তেজনার অনুরোধে নহে, ধর্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত, ফলকামনায় একান্ত আসক্ত না হইয়া, প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন। নতুবা ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শূদ্র, সমাজ প্রত্যহ ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য যাহা অটল পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃঢ় ছিল তাহা দূরস্মৃত ইতিহাসের দিকপ্রান্তে মেঘের ন্যায়, কুহেলিকার ন্যায়, বিলীন হইয়া যাইবে এবং কর্মক্লান্ত একটি বৃহৎ কেরানিসম্প্রদায় এক পাটি বৃহৎ পাদুকা প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণপিপীলিকাশ্রেণীর মতো মৃত্তিকাতলবর্তী বিবরের অভিমুখে ধাবিত হওয়াকেই জীবনযাত্রানির্বাহের একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিবে।

আষাঢ় ১৩০৯

চীনেম্যানের চিঠি

‘জন চীনেম্যানের চিঠি’ বলিয়া একখানি চটি বই ইংরেজিতে বাহির হইয়াছে। চিঠিগুলি ইংরেজকে সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছে। লেখক নিজের বিষয়ে বলেন—

> ‘দীর্ঘকাল ইংলন্ডে বাস করার দরুন তোমাদের (ইংরেজদের) আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কথা কহিবার কিছু অধিকার আমার জন্মিয়াছে। অপর পক্ষে, স্বদেশ হইতে দূরে আছি বলিয়া আমাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার ক্ষমতা খোয়াইয়া বসি নাই। চীনেম্যান সর্বত্রই সর্বদাই চীনেম্যানই থাকে; এবং কোনো কোনো বিশেষ দিক হইতে বিলাতি সভ্যতাকে আমি যতই পছন্দ করি-না কেন, এখনো ইহার মধ্যে এমন কিছু দেখি নাই যাহাতে পূর্বদেশের মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ হইতে পারে।’

ইংরেজি ভাষায় লেখকের অসামান্য দখল দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইংরেজি শিক্ষায় ইনি পাকা হইয়াছেন—এইজন্য বিলাত সম্বন্ধে ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহাকে নিতান্ত অনভিজ্ঞ লোকের অত্যুক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

এই ছোটো বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও বল পাইয়াছি। ইহা হইতে দেখিয়াছি, এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য আছে। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণের মিল দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে; এশিয়া যে চিরকাল য়ুরোপের আদালতেই আসামী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিচারকেই বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য করিবে, স্বীকার করিবে যে আমাদের সমাজের বারো আনা অংশকেই একেবারে ভিতসুদ্ধ নির্মূল করিয়া বিলাতি এঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান-অনুসারে বিলাতি ইঁটকাঠ দিয়া গড়াই আমাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়, এই কথাটা ঠিক নহে--আমাদের বিচারালয়ে য়ুরোপকে দাঁড় করাইয়া তাহারও মারাত্মক অনেকগুলি গলদ আলোচনা করিয়া দেখিবার আছে, এই বইখানি হইতে সেই ধারণা আমাদের মনে একটু বিশেষ জোর পায়। প্রথমত ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে ইহাতেও আমাদের বল; দ্বিতীয়ত এশিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।

সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা জন্মিয়াছে, আমাদের স্বাধীন শক্তি—আমাদের চিরকালের শক্তি কোন্‌খানে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাই সন্ধান করিয়া সেইখানে আশ্রয় লইবার জন্য আমাদের মধ্যে একটা চেষ্টা জাগিয়াছে। বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, ইহা কেবল আমাদের মধ্যে নহে। য়ুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এশিয়াকেই সজাগ করিতেছে। এশিয়া আজ আপনাকে সচেতন ভাবে, সুতরাং সবলভাবে উপলব্ধি

করিতে বসিয়াছে। বুঝিয়াছে, আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানো—ইহাই মুক্তির উপায়। পরধর্মো ভয়াবহঃ, পরের অনুকরণেই বিনাশ।

বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতার সম্পদ আমাদের ইন্দ্রিয়মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। তাহার কল দ্রুত চলে, তাহার প্রাসাদ আকাশ স্পর্শ করে, তাহার কামান শতঘ্নী, তাহার বাণিজ্যজাল জগদ্‌ব্যাপী—ইহা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিকে স্তম্ভিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কিছু না হউক, বিপুলতার একটা গায়ের জোর আছে, সেই জোরকে ঠেলিয়া উঠিয়া মনকে মোহমুক্ত করা আমাদের মতো দুর্বলের পক্ষে বড়ো কঠিন। যদি বিপুলতাগ্রস্ত এই সভ্যতার দিকেই একমাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে তাহাতে আমাদের মানসিক দুর্বলতা কেবল বাড়িতেই থাকে, এই সভ্যতাকেই একমাত্র আদর্শ বলিয়া বোধ হয়, এবং নিজের সামর্থ্যকে ও সম্পদকে একেবারে নগণ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইহাতে স্বচেষ্টা পরাস্ত হয়, আত্মগৌরব দূর হয়, ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা থাকে না, এবং জড়ত্বের মধ্যে অনায়াসেই আত্মসমর্পণ করিয়া নিরাপত্তির আরামে নিদ্রার অচেতনতায় সমস্ত ভুলিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

বিশেষত আমাদের বর্তমান অবস্থা ধর্মে কর্মে বিদ্যাবুদ্ধিতে অত্যন্ত দীন। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে কেবল নিজের সেই দীনতার সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়ি।

এ অবস্থায় প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্মপ্রধান মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার পরে, এই শেষোক্ত সভ্যতাই আমাদের ছিল, সুতরাং শেষোক্ত সভ্যতার শক্তি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত হইয়া আছে ইহাই জানিয়া আমাদিগকে মাথা তুলিতে হইবে, আমাদিগকে আশা ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে। আমরা বর্তমান দুর্গতির মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র করিয়া রাখিলে, য়ুরোপীয় ব্যাপারের বৃহত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিকে দলন-পেষণ করিয়া তাহাকে আপনার চিরদাস করিয়া রাখিবে। সেই বুদ্ধির দাসত্ব, রুচির দাসত্ব আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। প্রাচীন ভারতের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া নিজেকে বড়ো করিয়া তুলিতে হইবে।

জড়পদার্থের অপেক্ষা মানুষ জটিল জিনিস, জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্ধর্ষতর, এবং বাহ্যসম্পদের অপেক্ষা সুখ অনেক বেশি দুর্লভ। সেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে সভ্যতা সুখ দিয়াছে, সন্তোষ দিয়াছে, আনন্দ ও মুক্তির অধিকারী করিয়াছে, সেই সভ্যতার মাহাত্ম্য আমাদিগকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ তাহা বস্তুপুঞ্জে এবং বাহ্যশক্তির প্রাবল্যে আমাদের ইন্দ্রিয়মনকে অতিমাত্র অধিকার করে না। সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের ন্যায় তাহার মধ্যে একটি নিগূঢ়তা আছে, গভীরতা আছে—তাহা বাহির হইতে গায়ে পড়িয়া অভিভূত করিয়া দেয় না, নিজের চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—সংবাদপত্রে তাহার কোনো বিজ্ঞাপন নাই।

এইজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তুর তালিকা-দ্বারা স্ফীত করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে নিজের কাছে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারি না বলিয়া আমরা পুষ্পকরথকে রেলগাড়ি বলিতে চেষ্টা করি এবং ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-দ্বারা কুটিল করিয়া ফ্যারাডে-ডারুইনের প্রতিভাকে আমাদের শাস্ত্রের বিবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস পাই। এই-সকল চাতুরী-দ্বারাতেই বুঝা যায়, ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আমরা ঠিক বুঝিতেছি না এবং তাহা আমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতেছে না। ভারতবর্ষকে কৌশলে য়ুরোপ বলিয়া প্রমাণ না করিলে আমরা স্থির হইতে পারিতেছি না।

ইহার একটা কারণ, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যেমন আমরা অত্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছি, প্রাচ্য সভ্যতাকে তেমন ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছি না। ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব, একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। ভারতবর্ষকে

কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে দেখিলেই তাহার সভ্যতা, তাহার স্থায়িত্বযোগ্যতা আমাদের কাছে যথার্থরূপে প্রমাণিত হয় না। এক দিকে প্রত্যক্ষ য়ুরোপ, আর-এক দিকে শাস্ত্রের কথা, পুঁথির প্রমাণ— এক দিকে প্রবল শক্তি, আর-এক দিকে আমাদের দোদুল্যমান বিশ্বাসমাত্র— এ-অবস্থায় অসহায় ভক্তিকে ভারতবর্ষের অভিমুখে স্থির করিয়া রাখাই কঠিন।

এমন সময় আমাদের সেই পুরাতন সভ্যতাকে যদি চীনে ও জাপানে প্রসারিত দেখি তবে বুঝিতে পারি, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহৎ স্থান আছে, তাহা কেবল পুঁথির বচনমাত্র নহে। যদি দেখি চীন ও জাপান সেই সভ্যতার মধ্যে সার্থকতা অনুভব করিতেছে, তবে আমাদের দীনতার অগৌরব দূর হয়, আমাদের ধনভাণ্ডার কোন্‌খানে তাহা বুঝিতে পারি।

য়ুরোপের বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়াছে, তাই আজ সভ্য এশিয়া আপনার পুরাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত। প্রাচ্যসভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেখানে তাহার বল সেইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্মে, তাহার বল সমাজে। তাহার ধর্ম ও তাহার সমাজ যদি আপনাকে ঠেকাইতে না পারে, তবে সে মরিল। য়ুরোপের প্রাণ বাণিজ্যে পলিটিক্‌সে, আমাদের প্রাণ অন্যত্র। সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এশিয়া উত্তরোত্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। এইখানে আমরা একাকী নহি; সমস্ত এশিয়ার সহিত আমাদের যোগ রহিয়াছে। চীনেম্যানের চিঠিগুলি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

লেখক তাঁহার প্রথম পত্রে লিখিতেছেন—

> ‘আমাদের সভ্যতা জগতের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন। অবশ্য, ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহা সব চেয়ে ভালো; তেমনি আবার ইহাও প্রমাণ হয় না যে, তাহা সব চেয়ে মন্দ। এই প্রাচীনত্বের খাতিরে অন্তত এটুকুও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের আচার অনুষ্ঠান আমাদিগকে যে একটা স্থায়িত্বের আশ্বাস দিয়াছে য়ুরোপের কোনো জাতির মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আমাদের সভ্যতা কেবল যে ধ্রুব তাহা নহে, ইহার মধ্যে একটা ধর্মনীতির শৃঙ্খলা আছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেবল একটা অর্থনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাই। তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো কি না, এ জায়গায় আমি সে তর্ক তুলিতে চাই না— কিন্তু এটা নিশ্চয়, তোমাদের সমাজের উপর তোমাদের ধর্মের কোনো প্রভাব নাই। তোমরা খৃস্টানধর্ম স্বীকার কর, কিন্তু তোমাদের সভ্যতা কোনোকালেই খৃস্টান হয় নাই। অপর পক্ষে আমাদের সভ্যতা একেবারে অন্তরে অন্তরে কনফ্যুশিয়ান। কনফ্যুশিয়ান বলাও যা আর ধর্মনৈতিক বলাও তা। অর্থাৎ, ধর্মবন্ধনগুলিকেই ইহা প্রধানভাবে গণ্য করে। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক বন্ধনকেই তোমরা প্রথম স্থান দাও, তাহার পরে যতটা পার তাহার সঙ্গে ধর্মনীতি বাহির হইতে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা কর।
>
> ‘তোমাদের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের তুলনা করিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে। সন্তান যতদিন পর্যন্ত না বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের ভার লইতে পারে, তোমাদের পরিবার ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আহার দিবার ও রক্ষা করিবার একটা উপায়স্বরূপ মাত্র। যত সকাল-সকাল পার ছেলেগুলিকে পাব্লিক স্কুলে পাঠাইয়া দাও, সেখানে তাহারা যত শীঘ্র পারে গৃহের প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্তিদান করিয়া বসে। যেমনি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় অমনি তাহাদিগকে রোজগার করিতে ছাড়িয়া দাও— এবং তাহার পরে অধিকাংশ স্থলেই বাপ-মার প্রতি নির্ভর যখনি ফুরাইল, বাপ-মার প্রতি কর্তব্যস্বীকারও অমনি শেষ হইল। তাহার পরে ছেলেরা যেখানে খুশি যাক, যাহা খুশি করুক, যত খুশি পাক এবং যেমন খুশি ছড়াক, তাহাতে কাহারও কথা কহিবার নাই— পরিবারবন্ধন রক্ষা করিবে কি না-করিবে তাহা সম্পূর্ণ তাহাদের ইচ্ছা। তোমাদের সমাজে এক-একটি ব্যক্তি এক জন এবং সেই এক জনেরা ছাড়া ছাড়া; কেহ কাহারও সহিত বন্ধ নহে, তেমনি কোথাও কাহারও

শিকড় নাই। তোমাদের সমাজকে তোমরা গতিশীল বলিয়া থাক—সর্বদাই তোমরা চলিতেছ। প্রত্যেকেই নিজের জন্য একটা নূতন রাস্তা বাহির করা কর্তব্য জ্ঞান করে। যে অবস্থার মধ্যে জন্মিয়াছ সেই অবস্থার মধ্যে স্থির থাকাকে তোমরা অগৌরব মনে কর। পুরুষ যদি পুরুষ হইতে চায় তবে সে সাহস করিবে, চেষ্টা করিবে, লড়াই করিবে এবং জয়ী হইবে। এই ভাব হইতেই তোমাদের সমাজে অপরিসীম উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বস্তুগত শিল্পাদির তোমরা উন্নতি করিতে পারিয়াছ। কিন্তু ইহা হইতেই তোমাদের সমাজে এত অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, এবং এইজন্যই আমাদের মতে ইহার মধ্যে ধর্মভাবের এই অভাব। চীনেম্যানের চোখে এইটেই বিশেষ করিয়া ঠেকে। তোমাদের মধ্যে কেহই সন্তুষ্ট নও—জীবনযাত্রার আয়োজনবৃদ্ধি করিতে সকলেই এত ব্যগ্র যে, কাহারও জীবনযাত্রার অবকাশ জোটে না। মানুষের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধকেই তোমরা স্বীকার কর।

‘পূর্বদেশীয় আমাদের কাছে ইহা বর্বরসমাজের লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। জীবনযাত্রার উপকরণবৃদ্ধির মাপে আমরা সভ্যতাকে মাপি না; কিন্তু সেই জীবনযাত্রার প্রকৃতি ও মূল্য দ্বারাই আমরা সভ্যতার বিচার করি। যেখানে কোনো সহৃদয় ও ধ্রুব বন্ধন নাই, পুরাতনের প্রতি ভক্তি নাই, বর্তমানের প্রতিও যথার্থ শ্রদ্ধা নাই, কেবল ভবিষ্যৎকেই লুব্ধভাবে লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা আছে, সেখানে আমাদের মতে যথার্থ সমাজই নাই। যদি তোমাদের আচার-অনুষ্ঠানের নকল না করিলে ধনে বিজ্ঞানে ও শিল্পে তোমাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া না যায়, তবে আমরা টক্কর না দেওয়াই ভালো মনে করি।

‘এ-সকল ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি তোমাদের ঠিক উল্টা। আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে। আমাদের মধ্যে নিয়ম এই যে, মানুষ যে-সকল সম্বন্ধের মধ্যে জন্মলাভ করে চিরজীবন তাহারই মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিবে। সে তাহার পরিবারতন্ত্রের অঙ্গ হইয়া জীবন আরম্ভ করে, সেইভাবেই জীবন শেষ করে, এবং তাহার জীবননির্বাহের সমস্ত তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠান এই অবস্থারই অনুযায়ী। সে তাহার পূর্বপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছে, তাহার পিতামাতাকে ভক্তি ও মান্য করিতে শিখিয়াছে এবং অল্প বয়স হইতেই পতি ও পিতার কর্তব্যসাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। বিবাহের দ্বারা পরিবারবন্ধন ছিঁড়িয়া যায় না, স্বামী পরিবারেই থাকে এবং স্ত্রী আত্মীয়কুটুম্ববর্গের অঙ্গীভূত হয়। এইরূপ এক-একটি কুটুম্বশ্রেণীই সমাজের এক-একটি অংশ। ইহার ভূমিখণ্ড, ইহার দেবপীঠ ও পূজাপদ্ধতি, আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার বিচারব্যবস্থা, এ-সমস্তই পরিবারের মধ্যে সরকারি। চীনদেশে নিজের দোষে ছাড়া কোনো লোক একলা পড়ে না। চীনে কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে তোমাদের মতো ধনী হইয়া উঠা সহজ নহে, তেমনি তাহার পক্ষে অনাহারে মরাও শক্ত; যেমন রোজগারের জন্য অত্যন্ত ঠেলাঠেলি করিবার উত্তেজনা তাহার নাই, তেমনি প্রবঞ্চনা এবং পীড়ন করিবার প্রলোভনও তাহার অল্প। অত্যাকাঙ্ক্ষার তাড়না এবং অভাবের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া, জীবনযাত্রার উপকরণ উপার্জনের অবিশ্রাম চেষ্টা ছাড়িয়া জীবনযাত্রার জন্যই সে অবসর লাভ করে। প্রকৃতির দানসকল উপভোগ করিতে, শিষ্টতার চর্চা করিতে এবং মানুষের সঙ্গে সহৃদয় নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিতে তাহার ভিতরের স্বভাব এবং বাহিরের সুযোগ দুইই অনুকূল। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ধর্মের দিকেই বল, আর মাধুর্যের দিকেই বল, তোমাদের য়ুরোপের অধিকাংশ অধিবাসীর চেয়ে আমাদের লোকেরা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। তোমাদের কার্যকরী এবং বৈজ্ঞানিক সফলতার মহত্ত্ব আমরা স্বীকার করি; কিন্তু স্বীকার করিয়াও, তোমাদের যে সভ্যতা হইতে বড়ো বড়ো শহরে এমন রূঢ় আচার, এমন অবনত ধর্মনীতি এবং বাহ্যশোভনতার এমন বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, সে সভ্যতাকে আমরা সমস্ত মন দিয়া প্রশংসা করা অসম্ভব দেখি। তোমরা

যাহাকে উন্নতিশীল জাত বল আমরা তাহা নই এ কথা মানিতে রাজি আছি, কিন্তু ইহাও দেখিতেছি, উন্নতির মূল্য সর্বনেশে হইতে পারে। তোমাদের আর্থিক লাভের চেয়ে আমাদের ধর্মনৈতিক লাভকেই আমরা শিরোধার্য করি, এবং তোমাদের সেই সম্পদ হইতে যদি বঞ্চিত হইতে হয় সেও স্বীকার, তবু আমাদের যে-সকল আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ধর্মলাভকে সুনিশ্চিত করিয়াছে তাহাকে আমরা শেষ পর্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

এই গেল প্রথম পত্র। দ্বিতীয় পত্রে লেখক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'আমাদের যাহা দরকার তাহাই আমরা উৎপন্ন করি, আমরা যাহা উৎপন্ন করি তাহা আমরাই খাই। অন্য জাতের উৎপন্ন দ্রব্য আমরা চাহি নাই, আমাদের দরকারও হয় নাই। আমাদের মতে সমাজের স্থিতি রক্ষা করিতে হইলে, তাহার আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। বৃহৎ বিদেশী বাণিজ্য সামাজিক ভ্রষ্টতার একটা নিশ্চিত কারণ।

'তোমরা যাহা খাইতে চাও তাহা তোমরা উৎপন্ন করিতে পার না, তোমাদিগকে যাহা উৎপন্ন করিতে হয় তাহা তোমরা ফুরাইতে পার না। প্রাণের দায়ে এমনতরো কেনাবেচার গঞ্জ তোমাদের দরকার যেখানে তোমাদের কারখানার মাল চালাইতে পার এবং খাদ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য কিনিতে পার। অতএব যেমন করিয়া হউক, চীনকে তোমাদের দরকার।

'তোমরা চাও আমরাও ব্যাবসাদার হই এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক যে স্বাধীনতা আছে তাহা বিসর্জন দিই; কেবল যে আমাদের সমস্ত কাজ কারবার উলটপালট করিয়া দিই তাহা নহে, আমাদের আচারব্যবহার, ধর্ম, আমাদের সাবেক রীতিনীতি, সমস্তই বিপর্যস্ত করিয়া ফেলি। এমত অবস্থায় তোমাদের দশাটা কী হইয়াছে তাহা যদি বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি, তবে আশা করি মাপ করিবে।

'যাহা দেখা যায় সেটা তো বড়ো উৎসাহজনক নহে। প্রতিযোগিতা-নামক একটা দৈত্যকে তোমরা ছাড়িয়া দিয়াছ, এখন আর সেটাকে কিছুতেই কায়দা করিতে পারিতেছ না। তোমাদের গত একশো বৎসরের বিধিবিধান কেবল এই আর্থিক বিশৃঙ্খলাকে সংযত করিবার জন্য অবিশ্রাম নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। তোমাদের গরিবেরা, মাতালেরা, অক্ষমেরা, তোমাদের পীড়া ও জরা-গ্রস্তগণ একটা বিভীষিকার মতো তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মানুষের সহিত সমস্ত ব্যক্তিগত বন্ধন তোমরা ছেদন করিয়া বসিয়া আছ, এখন স্টেট অর্থাৎ সরকারের অব্যক্তিক উদ্যমের দ্বারা তোমরা ব্যক্তির সমস্ত কাজ সারিয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ দায়িত্ববিহীনতা। তোমাদের কারবারের সর্বত্রই তোমরা ব্যক্তির জায়গায় কোম্পানি এবং মজুরের জায়গায় কল বসাইতেছ। মুনাফার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত— শ্রমজীবীর মঙ্গলের ভার কাহারোই নহে, সেটা সরকারের। সরকার সেটাকে সামলাইয়া উঠিতে পারেন না। সহস্র ক্রোশ দূরে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি কোথাও মাশুলের কোনো পরিবর্তন হয়, তবে তোমাদের লক্ষ লোকের কারবার বিশ্লিষ্ট হইবার জো হয়— যাহার উপরে তোমাদের হাত নাই তাহার উপরে তোমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। তোমাদের মূলধন একটা সজীব পদার্থ, সেটা খোরাকের জন্য সর্বদাই চীৎকার করিতেছে; তাহাকে আহার না জোগাইলে সে তোমাদের গলা চাপিয়া ধরে। তোমরা যে উৎপন্ন কর সেটা ইচ্ছামত নহে, সেটা অগত্যা— এবং তোমরা যে কিনিয়া থাক সেটা যে চাও বলিয়া তাহা নহে, সেটা তোমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে বলিয়া। এই-যে বাণিজ্যটাকে তোমরা মুক্ত বল, ইহার মতো বদ্ধ বাণিজ্য আর নাই। কিন্তু ইহা কোনো বিবেচনাসংগত ইচ্ছার দ্বারা বদ্ধ নহে, ইহা আকস্মিক খেয়ালের স্তূপাকার মূঢ়তার দ্বারা বন্দীকৃত।

'চীনেম্যানের চক্ষে তোমাদের দেশের ভিতরকার আর্থিক অবস্থা এইরকমই ঠেকে।

পররাষ্ট্রের সহিত তোমাদের বাণিজ্যসম্বন্ধ, সেও অত্যন্ত উল্লাসজনক নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধারণা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইবে তখন শান্তির সত্যযুগ আসিবে। কাজে দেখা গেল সমস্তই উল্টা। প্রাচীনকালের রাজাদের অত্যাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মযাজকদের গোঁড়ামির চেয়ে এই বাণিজ্যস্থান লইয়া পরস্পর টানাটানিতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর যেখানেই একটুখানি অপরিচিত স্থান ছিল, সেইখানেই য়ুরোপের লোক একেবারে ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর মতো হুংকার দিয়া পড়িতেছে। এখন য়ুরোপের এলাকার সীমানার বাহিরে এই লুণ্ঠনব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ ভাগাভাগি চলিতেছে ততক্ষণ পরস্পরের প্রতি পরস্পর কটমট করিয়া তাকাইতেছে। আজ হউক বা কাল হউক, যখন আর বাঁটোয়ারা করিবার জন্য কিছুই বাকি থাকিবে না, তখন তাহারা পরস্পরের ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়িবে। তোমাদের শস্ত্রসজ্জার এই আসল তাৎপর্য—হয় তোমরা অন্যকে গ্রাস করিবে, নয় অন্যে তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। যে বাণিজ্যসম্পর্ককে তোমরা শান্তির বন্ধন মনে করিয়াছিলে তাহাই তোমাদিগকে পরস্পরের গলা-কাটাকাটির প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে এবং তোমাদের সকলকে একটা বিরাট বিনাশব্যাপারের অনতিদূরে আনিয়া স্থাপন করিয়াছে।'

লেখক বলেন—

'পরিশ্রম বাঁচাইবার কল তৈরি করিতে তোমরা যে বুদ্ধি খাটাইতেছ তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে না। তাহাতে ধনবৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা যে মঙ্গলই আমার মতে এমন কথা মনে করিবার হেতু নাই। ধন কিরূপে ভাগ হয় এবং সেই ধনে জাতির চরিত্রের উপরে কী ফল হয়, তাহাই চিন্তার বিষয়। সেইটে যখন চিন্তা করি তখন বিলাতি পদ্ধতি চীনে ঢুকাইবার প্রস্তাবে মন বিগড়াইয়া যায়।

'এই তোমরা যতদিন ধরিয়া যন্ত্রতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে লাগিয়াছ ততদিনে তোমাদের শ্রমজীবীদিগকে সংকটে ফেলিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের কোনো একটা ভালো উপায় বাহির কর নাই। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে; কারণ টাকা করা তোমাদের প্রধান লক্ষ্য, জীবনের আর-সমস্ত লক্ষ্য তাহার নীচে। চীনেম্যানের কাছে এটা কিছুতেই উৎসাহজনক ঠেকে না। বিলাতি কারবারের প্রণালী যদি চীনদেশে ফালাও করিয়া তোলা যায় তবে তাহার চল্লিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে যে নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিবে, অন্তত আমি তো তাহাকে অত্যন্ত আশঙ্কার চক্ষে দেখি। তোমরা বলিবে, সে বিশৃঙ্খলা সাময়িক। আমি তো দেখিতেছি, তোমাদের দেশে তাহা চিরস্থায়ী। আচ্ছা, সে কথাও যাক, তাহাতে আমাদের লাভটা কী? আমরা তো তোমাদেরই মতো হইয়া যাইব! সে সম্ভাবনা কি অবিচলিতচিত্তে কল্পনা করা যায়? তোমাদের লোকেরা না-হয় আমাদের চেয়ে আরামে খায় বেশি, পান করে বেশি, নিদ্রা যায় বেশি—কিন্তু তাহারা প্রফুল্ল নয়, সন্তুষ্ট নয়, শ্রমানুরাগী নয়, তাহারা আইন মানে না। তাহাদের কর্ম শরীরমনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, তাহারা প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া, ভূমিখণ্ডের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া, শহরে এবং কারখানার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকে।

'আমাদের কবিগণ—লেখকগণ—ধনের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, নানাপ্রকার উদ্‌যোগের মধ্যে কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন নাই; কিন্তু মানবজীবনের অত্যন্ত সরল ও বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধগুলির সংযত সুনির্বাচিত সুমার্জিত রসাস্বাদনের পথে আমাদের মনকে তাঁহারা প্রবর্তিত করিয়াছেন। এই জিনিসটা আমাদের আছে—এটা তোমরা আমাদিগকে দিতে পার না, কিন্তু এটা তোমরা অনায়াসে অপহরণ করিতে পার। তোমাদের কলের গর্জনের মধ্যে ইহার স্বর শোনা যায় না, তোমাদের কারখানার কালো ধোঁয়ার মধ্যে

> ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তোমাদের বিলাতি জীবনযাত্রার ঘূর্ণি এবং ঘর্ষণের মধ্যে ইহা মরিয়া যায়। যে কেজো লোকদিগকে তোমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া থাক, যখন দেখি তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টায়, দিনের পর দিনে, বৎসরের পর বৎসরে তাহাদের জাঁতার মধ্যে আনন্দহীন অগত্যাপ্রেরিত খাটুনিতে নিযুক্ত— যখন দেখি তাহাদের দিনের উৎকণ্ঠাকে তাহারা স্বল্পাবশিষ্ট অবকাশের মধ্যে টানিয়া আনিতেছে, এবং পরিশ্রমের দ্বারা ততটা নহে যতটা শুষ্ক সংকীর্ণ দুশ্চিন্তাদ্বারা আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে— তখন এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈশ্যবৃত্তির সরলতর পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়া আমি সন্তোষ লাভ করি, এবং আমাদের যে-সকল চিরব্যবহৃত পথগুলি আমাদের অভ্যস্ত চরণের কাছে এমন পরিচিত যে তাহা দিয়া চলিবার সময়েও অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য আমাদের অবকাশের অভাব ঘটে না, তোমাদের সমুদয় নূতন ও ভয়সংকুল বর্ত্মের চেয়ে সেই পথগুলিকে আমি অধিক মূল্যবান বলিয়া গৌরব করি।'

ইহার পরে লেখক রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন—

> 'গবর্মেন্ট তোমাদের কাছে এতই প্রধান এবং সর্বত্রই সে তোমাদের সঙ্গে এমনি লাগিয়াই আছে যে, যে জাতি গবর্মেন্টকে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, তাহার অবস্থা তোমরা কল্পনাই করিতে পার না। অথচ আমাদেরই সেই অবস্থা। আমাদের সভ্যতার সরল এবং অকৃত্রিম ভাব, আমাদের লোকদের শান্তিপ্রিয় প্রকৃতি, এবং সর্বোচ্চে আমাদের সেই পরিবারতন্ত্র যাহা পোলিটিক্যাল, সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে এক-একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ, তাহারা আমাদিগকে গবর্মেন্ট-শাসন হইতে এতটা দূর মুক্তিদান করিয়াছে যে য়ুরোপের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন।
>
> 'আমাদের সমাজের গোড়াকার জিনিসগুলি কোনো রাজক্ষমতার স্বেচ্ছাকৃত সৃজন নহে। আমাদের জনসাধারণ নিজের জীবনকে এইরূপ শরীরতন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোনো গবর্মেন্ট তাহাকে গড়ে নাই, কোনো গবর্মেন্ট তাহার বদল করিতে পারে না। এক কথায় আইন জিনিসটা উপর হইতে আমাদের মাথায় চাপানো হয় নাই— তাহা আমাদের জাতিগত জীবনের মূলসূত্র, এবং যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই ব্যবহারে প্রবর্তিত হইয়াছে। এইজন্য চীনে গবর্মেন্ট যথেচ্ছাচারী নহে, অত্যাবশ্যকও নয়। রাজপুরুষদের শাসন তুলিয়া লও, তবু আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় পূর্বের মতোই চলিয়া যাইবে। যে আইন আমরা মান্য করি সে আমাদের স্বভাবের আইন, বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় তাহা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে— বাহিরের শাসন তুলিয়া লইলেও ইহার কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করি। যাহাই ঘটুক-না, আমাদের পরিবার থাকে, পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই গঠনটি থাকে, সেই শৃঙ্খলা কর্মনিষ্ঠতা ও মিতব্যয়িতার ভাবটি থাকিয়া যায়। ইহারাই চীনকে তৈরি করিয়াছে।
>
> 'তোমাদের পশ্চিমদেশে গবর্মেন্ট ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে কোনো মূলবিধান নাই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অন্তহীন আইন পড়িয়া আছে। মাটি হইতে কিছুই গজাইয়া উঠে না, উপর হইতে সমস্ত পুঁতিয়া দিতে হয়। যাহাকে একবার পোঁতা হয় তাহাকে আবার পোঁতা দরকার হয়। গত শত বৎসরের মধ্যে তোমরা তোমাদের সমস্ত সমাজকে উল্টাইয়া দিয়াছ। সম্পত্তি, বিবাহ, ধর্ম, চরিত্র, শ্রেণীবিভাগ, পদবিভাগ, অর্থাৎ মানবসম্বন্ধগুলির মধ্যে যাহা-কিছু সব চেয়ে উদার ও গভীর, তাহাদিগকে একেবারে শিকড়ে ধরিয়া উপড়াইয়া কালের স্রোতে আবর্জনার মতো ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইজন্যই তোমাদের গবর্মেন্টকে এত বেশি উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়— কারণ, গবর্মেন্ট নহিলে কে তোমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিবে? তোমাদের পক্ষে গবর্মেন্ট যত একান্ত আবশ্যক, সৌভাগ্যক্রমে

> আমাদের পূর্বদেশের পক্ষে তত নয়। আমার কাছে এটা একটা অমঙ্গল বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু দেখিতেছি, ইহা নহিলেও তোমাদের চলিবার উপায় নাই। তবু এত বড়ো কাজটা যাহাকে দিয়া আদায় করিতে চাও, সেই যন্ত্রটার অসামান্য অপটুতা দেখিয়া আমি আরও আশ্চর্য হই। যোগ্য লোক নির্বাচনের সুনিশ্চিত উপায় আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা দুরূহ সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তবু এটা বড়োই অদ্ভুত যে যাহাদের উপরে এমন একটা মহৎ ভার দেওয়া হয় তাহাদের ধর্মনৈতিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যের কোনোপ্রকার পরীক্ষার চেষ্টা হয় না।
>
> 'ইলেকশন ব্যাপারটার অর্থ কী? তোমরা মুখে বল, তাহার অর্থ জনসাধারণের দ্বারা প্রতিনিধিনির্বাচন— কিন্তু তোমরা মনে মনে কি নিশ্চয় জান না তাহার অর্থ তাহা নহে? বস্তুত এক-একটি দলীয় স্বার্থেরই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। জমিদার, মদের কারখানার কর্তা, রেল-কোম্পানির অধ্যক্ষ— ইহারাই কি তোমাদিগকে শাসন করিতেছে না? আমি জানি এক দল আছে তাহারা 'মাস্' অর্থাৎ জনসাধারণের প্রচণ্ড পশুশক্তিকেও এই কর্তৃপক্ষদের দলভুক্ত করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিতে চাহে। কিন্তু তোমাদের দেশে জনসাধারণও যে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ দল, তাহাদেরও একটা দলগত সংকীর্ণ স্বার্থ আছে। তোমাদের এই যন্ত্রটার উদ্দেশ্য দেখিতেছি, একটা গর্তের মধ্যে কতকগুলা প্রাইভেট স্বার্থের আত্মম্ভরি শক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া— তাহারা শুদ্ধমাত্র পরস্পর লড়াইয়ের জোরেই সাধারণের কল্যাণে উপনীত হইবে। ধর্ম এবং সদ্‌বিবেচনার কর্তৃত্বের উপর চীনেম্যানের এমন একটা মজ্জাগত শ্রদ্ধা আছে যে, তোমাদের এই প্রণালীকে আমার ভালোই বোধ হয় না। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র আমি এমন-সকল লোক দেখিয়াছি যাঁহারা তোমাদের ব্যবস্থাযোগ্য সমস্ত বিষয়গুলিকে সুগভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কৃত, বিচার পক্ষপাতশূন্য, উৎসাহ নিঃস্বার্থ এবং নির্মল, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাজ্ঞতাকে কোনো কাজে লাগাইবার আশাও করিতে পারেন না— কারণ, তাঁহাদের প্রকৃতি, তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের অভ্যাস, জানপাদিক ইলেকশনের উপদ্রব সহ্য করিবার পক্ষে তাঁহাদিগকে অপটু করিয়াছে। পার্লামেন্টের সভ্য হওয়াও একটা ব্যাবসা-বিশেষ— এবং ধর্মনৈতিক ও মানসিক যে-সকল গুণ সাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য আবশ্যক এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার গুণ তাহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়।'

আমি সংক্ষেপে চীনেম্যানের পত্রের প্রধান অংশগুলি উপরে বিবৃত করিলাম। এই পত্রগুলি পড়িলে প্রাচ্যসমাজের সাধারণ ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যে ঐক্য, তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, এই-যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা, সন্তোষ এবং সংযমের উপরে সমস্ত সমাজকে গড়িয়া তোলা, তাহার চরম সার্থকতার কথা এই চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। চীনদেশ সুখী, সন্তুষ্ট, কর্মনিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সেই সার্থকতা পায় নাই। অসুখে অসন্তোষে মানুষকে ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু সুখে সন্তোষে মানুষকে ক্ষুদ্র করে। চীন বলিতেছে, আমি বাহিরের কিছুতেই দৃক্‌পাত করি নাই; নিজের এলাকার মধ্যেই নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু এ কথা যথেষ্ট নহে। এই সংকীর্ণতাটুকুর মধ্যে সকল উৎকর্ষ লাভ করাকেই চরম মনে করিলে হতাশ হইতে হয়। জলধারা যদি সমুদ্রকে চায়, তবে নিজেকে দুই তটের মধ্যে সংহত সংযত করিয়া তাহাকে চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে এক জায়গায় আনিয়া বদ্ধ করিলে চলে না। মুক্তির জন্যই তাহাকে সংযত হইতে হয়, কিন্তু নিজেকে বন্দী করিলে তাহার চরম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়— তাহা হইলে নদীকে ঝিল হইতে হয় এবং স্রোতের অন্তহীন ধারাকে সমুদ্রের অন্তহীন তৃপ্তির মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় না।

ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হইবার জন্য

নহে। নিজেকে শতধাবিভক্ত অন্ধ চেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যবিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল। নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগদান করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, সুখশান্তিসন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল। যদি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই, জড়ত্ববশত সেই পরিণামকে উপেক্ষা করি, তবে বন্ধন কেবল বন্ধনই থাকিয়া যায়, তবে অতিক্ষুদ্র সন্তোষশান্তির কোনো অর্থই থাকে না। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ক্ষুদ্র নহে, তাহা ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভারতের ব্রহ্মবাদিনী বলিয়াছেন : যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। যাহার দ্বারা অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব? কেবলমাত্র পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহাতে আমার আত্মার বিকাশ হইবে না। সমাজ যদি আমাকে সম্পূর্ণ সার্থকতা না দেয়, তবে সমাজ আমার কে? সমাজকে রাখিবার জন্য যে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। য়ুরোপও বলে, 'ইনডিভিজ্যুয়াল'-কে যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষও অত্যন্ত অসংকোচে নির্ভয়ে বলিয়াছে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাহে নাই, সেইজন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ় তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ। সাংসারিক পরিপূর্ণতার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনাকে বেষ্টিত বদ্ধ করিত না, তাহার বিপরীতই করিত। যখন সমস্ত সঞ্চিত হইয়াছে, ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছে, যখন সেই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সংসারের মধ্যে আরাম করিবার—ভোগ করিবার—অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই সংসার পরিত্যাগের ব্যবস্থা; যতদিন খাটুনি ততদিন তুমি আছ, যখন খাটুনি বন্ধ তখন আরামে ফলভোগের দ্বারা জড়ত্বলাভ করিতে বসা নিষিদ্ধ। সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল, তাহার পরে আত্মার অবাধ অনন্ত গতি। তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে। সংসারের হিসাবে তাহা জড়ত্বের ন্যায় দৃশ্যমান, কিন্তু চাকা অত্যন্ত ঘুরিলে যেমন তাহাকে দেখা যায় না তেমনি আত্মার অত্যন্ত বেগকে নিশ্চলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মার সেই বেগকে চতুর্দিকে নানারূপে অপব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই আমাদের সমাজের কাজ ছিল। আমাদের সমাজে প্রবৃত্তিকে খর্ব করিয়া প্রত্যহই নিঃস্বার্থ মঙ্গলসাধনের যে ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়াই আমরা তাহা লইয়া গৌরব করি। বাসনাকে ছোটো করিলে আত্মাকেই বড়ো করা হয়, এইজন্যই আমরা বাসনা খর্ব করি—সন্তোষ অনুভব করিবার জন্য নহে। য়ুরোপ মরিতে রাজি আছে, তবু বাসনাকে ছোটো করিতে চায় না। আমরাও মরিতে রাজি আছি, তবু আত্মাকে তাহার চরমগতি পরমসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া ছোটো করিতে চাই না। দুর্গতির দিনে ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতোধারা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্' এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না—

মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে
রয়েছে ডোর।

সেইজন্য আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতেছে না; আমাদিগকে চতুর্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতনভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য যখন সচেষ্টভাবে উদ্যত হইব, তখনি মুহূর্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়া-

ছিলেন তাহা সফল হইবে এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন।

আষাঢ় ১৩০৯

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

ফরাসি মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উদ্ধৃত করি।

তিনি বলেন, আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কী এশিয়ায় কী অন্যত্র, এমন-কি প্রাচীন গ্রীস-রোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে বিচারে, তাহার অবয়ববিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়।

যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিতশাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচারব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্তম্ভগুলিতে, ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

এইরূপ একভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রূপ ফললাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রীস অতি আশ্চর্য দ্রুতবেগে এক অপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোনো জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড়ো আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রীক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না।

অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল; তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিঁকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হইয়া গেল।

প্রাচীন সভ্যতামাত্রেই একটা না একটা কিছুর একাধিপত্য ছিল। সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারি দিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত। এই ঐক্য, এই সরলতার ভাব সাহিত্যে এবং লোকসকলের বুদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত। এই কারণেই প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্রগ্রন্থে, ইতিহাসে, কাব্যে সর্বত্রই একই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জ্ঞানে এবং কল্পনায়, তাহাদের জীবনযাত্রায় এবং অনুষ্ঠানে এই একই ছাঁদ। এমন-কি গ্রীসেও জ্ঞানবুদ্ধির বিপুল ব্যাপ্তি সত্ত্বেও, তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আশ্চর্য একপ্রবণতা দেখা যায়।

য়ুরোপের আধুনিক সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভ্যতার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া যাও, দেখিবে তাহা কী বিচিত্র, জটিল এবং বিক্ষুব্ধ। ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকল-রকম মূলতত্ত্বই বিরাজমান; লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি, পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়, সকল অবস্থাই বিজড়িত হইয়া দৃশ্যমান; স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার সর্বপ্রকার ক্রমান্বয় ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই বিচিত্র শক্তি স্থির নাই, ইহারা আপনা-আপনির মধ্যে কেবলই লড়িতেছে। অথচ ইহাদের কেহই আর-সকলকেই অভিভূত করিয়া সমাজকে একা অধিকার করিতে পারে না। একই কালে সমস্ত বিরোধী শক্তি পাশাপাশি

কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহাদিগকে য়ুরোপীয় বলিয়া চিনিতে পারা যায়।

চারিত্রে, মতে এবং ভাবেও এইরূপ বৈচিত্র্য এবং বিরোধ। তাহারা অহরহ পরস্পরকে লঙ্ঘন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, সীমাবদ্ধ করিতেছে, রূপান্তরিত করিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। এক দিকে স্বাতন্ত্র্যের দুরন্ত তৃষ্ণা, অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতাশক্তি; মনুষ্যে মনুষ্যে আশ্চর্য বিশ্বাসবন্ধন, অথচ সমস্ত শৃঙ্খল মোচন-পূর্বক বিশ্বের আর-কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া একাকী নিজের স্বেচ্ছামতে চলিবার উদ্ধত বাসনা। সমাজ যেমন বিচিত্র, মনও তেমনি বিচিত্র।

আবার সাহিত্যেও সেই বৈচিত্র্য। এই সাহিত্যে মানবমনের চেষ্টা বহুধা বিভক্ত, বিষয় বিবিধ, এবং গভীরতা দূরগামিনী। সেইজন্যই সাহিত্যের বাহ্য আকার ও আদর্শ প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় বিশুদ্ধ সরল ও সম্পূর্ণ নহে। সাহিত্যে ও শিল্পে ভাবের পরিস্ফুটতা, সরলতা ও ঐক্য হইতেই রচনার সৌন্দর্য উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান য়ুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিসীম বহুলতায় রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অংশে প্রত্যংশেই আমরা এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহ ইহার অসুবিধাও আছে। ইহার কোনো একটা অংশকে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে হয়তো প্রাচীন কালের তুলনায় খর্ব দেখিতে পাইব— কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে ইহার ঐশ্বর্য আমাদের কাছে প্রতীয়মান হইবে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা পঞ্চদশ শতাব্দকাল টিঁকিয়া আছে এবং বরাবর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহা গ্রীক সভ্যতার ন্যায় তেমন দ্রুতবেগে চলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদে পদে নব নব অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখনো ইহা সম্মুখে ধাবমান। অন্যান্য সভ্যতায় এক ভাব এক আদর্শের একাধিপত্যে অধীনতাবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে কোনো-এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায়, এবং ঘাতপ্রতিঘাতে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখায়, য়ুরোপীয় সভ্যতায় স্বাধীনতার জন্ম হইয়াছে। ক্রমাগত বিবাদে এই-সকল বিরোধী শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। এইজন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিকূল পক্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

ইহাই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।

গিজো বলেন, বিশ্বজগতের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের সংগ্রাম। ইহা সুস্পষ্ট যে, কোনো একটি নিয়ম, কোনো এক প্রকারের গঠনতন্ত্র, কোনো একটি সরল ভাব, কোনো একটি বিশেষ শক্তি, সমস্ত বিশ্বকে একা অধিকার করিয়া, তাহাকে একটিমাত্র কঠিন ছাঁচে ফেলিয়া, সমস্ত বিরোধী প্রভাবকে দূর করিয়া শাসন করিবার ক্ষমতা পায় নাই। বিশ্বে নানা শক্তি, নানা তত্ত্ব, নানা তন্ত্র জড়িত হইয়া যুদ্ধ করে, পরস্পরকে গঠিত করে, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে না, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় না।

অথচ এই-সকল গঠন, তত্ত্ব ও ভাবের বৈচিত্র্য, তাহাদের সংগ্রাম ও বেগ— একটি বিশেষ ঐক্য একটি বিশেষ আদর্শের অভিমুখে চলিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ইহা সংকীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। জগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজের বিশেষ মূর্তি বর্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিভক্ত বিপুল এবং বহুচেষ্টাগত। য়ুরোপীয় সভ্যতা এইরূপে চিরন্তন সত্যের পথ পাইয়াছে, তাহা জগদীশ্বরের কার্যপ্রণালীর ধারা গ্রহণ করিয়াছে, ঈশ্বর যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সভ্যতার শ্রেষ্ঠতাতত্ত্ব এই সত্যের উপরেই নির্ভর করে।

গিজোর মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া— তিন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য বৃহদ্‌ব্যাপার ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই। সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব? কোন্‌ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব? অন্য সকল সভ্যতাই এক দেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতদিন ইন্ধন জোগাইয়াছে ততদিন তাহা জ্বলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে অথবা ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতাহোমানলের সমিধকাষ্ঠ জোগাইবার ভার লইয়াছে নানা দেশ নানা জাতি। অতএব এই যজ্ঞহুতাশন কি নিবিবে, না, ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে? কিন্তু এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্তৃভাব আছে— কোনো সভ্যতাই আকারপ্রকারহীন হইতে পারে না। ইহার সমস্ত অবয়বকে চালনা করিতেছে, এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাভবের উপরেই এই সভ্যতার উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে। তাহা কী? তাহার বহু বিচিত্র চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায়?

য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলন্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মতো হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

ইতিহাসের কোন্‌ গূঢ় নিয়মে দেশবিশেষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে তখন ধ্বংস অদূরবর্তী হয়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল— ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এক সময় আর্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম লইয়া পূর্বের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞানজড় শূদ্রসম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন আবিষ্ট।

ইংরেজের আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল, যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইল, তখনি ব্রাহ্মণধর্মের মূর্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধ মূর্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই ব্রাহ্মণধর্মও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতা নিত্যধর্মকে নানা স্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি, যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয় এ কথা একপ্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ সত্যভঙ্গ প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসি, ইংরেজ, জর্মান, রুশ, ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খৃস্টান মিশনারিদের মুখেও 'ভাই' কথার মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সুর লাগে না।

জগদ্‌বিখ্যাত পরিহাসরসিক মার্ক টোয়েন গত ফেব্রুয়ারি মাসের 'নর্থ আমেরিকান রিভিয়ু' পত্রে 'তিমিরবাসী ব্যক্তিটির প্রতি' (To The Person Sitting in Darkness) নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আধুনিক সভ্যতার ব্যাধিলক্ষণ কিছু কিছু চোখে পড়িবে। তীব্র পরিহাসের দ্বারা প্রখরশাণিত সেই প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা অসম্ভব। লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই; কিন্তু শ্রদ্ধেয় লেখক স্বার্থপর সভ্যতার বর্বরতার যে-সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রামাণিক। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং হানাহানি-কাড়াকাড়ির যে চিত্র তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহার বিভীষিকা তাঁহার উজ্জ্বল পরিহাসের আলোকে ভীষণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা যে য়ুরোপের সাহিত্য ও ধর্মকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিপলিং এক্ষণে ইংরেজি সাহিত্যের শীর্ষস্থানে, এবং চেম্বর্লেন ইংরেজ রাষ্ট্রব্যাপারের একজন প্রধান কাণ্ডারী। ধূমকেতুর ছোটো মুণ্ডটির পশ্চাতে তাহার ভীষণ ঝাঁটার মতো পুচ্ছটি দিগন্ত ঝাঁটাইয়া আসে—তেমনি মিশনরির করধৃত খৃস্টান ধর্মালোকের পশ্চাতে কী দারুণ উৎপাত জগৎকে সন্ত্রস্ত করে তাহা এক্ষণে জগদ্‌বিখ্যাত হইয়া গেছে। এ সম্বন্ধে মার্ক টোয়েনের মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।*

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

---

*The following is from the NEW YORK TRIBUNE of Christmas Eve. It comes from that Journal's Tokio Correspondent. It has a strange and impudent sound, but the Japanese are but partially civilized as yet. When they become wholly civilized they will not talk so:

'The missionary question, of course, occupies a foremost place in the discussion. It is now felt as essential that the Western Powers take cognizance of the sentiment here that religious invasions of Oriental countries by powerful Western organizations are tantamount to filibustering expeditions, and should not only be discountenanced but that stern measures should be adopted for their suppression. The feeling here is that the missionary organizations constitute a constant menace to peaceful international relations.'

Shall We? That is, shall we go on conferring our Civilization upon the People that

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন— তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা-মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দুক ও দমদম বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের দ্বারা যাহা পাইব তাহার দ্বারা আমরা কিছুই বড়ো হইব না।

পনেরো-ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা চাতুরি ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষণীয় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নহে? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই কি বলে না—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতো বধীৎ॥

Sit in Darkness, or shall we give those poor things a rest? Shall we bang right ahead in our old-time loud, pious way, and commit the new century to the game; or shall we sober up and sit down and think it over first? Would it not be prudent to get our Civilization-tools together, and see how much stock is left on hand in the way of Glass Beads and Theology, and Maxim Guns and Hymn Books, and Trade Gin and Torches of progress and Enlightenment (patent adjustable ones good to fine village with, upon occasion), and balance the books, and arrive at the profit and loss, so that we may intelligently decide whether to continue the business or sell out the property and start a new Civilization Scheme proceeds?

Extending the Blessings of Civilization to our Brother who sits in Darkness has been a good trade and has paid, well, on the whole; and there is money in it yet, if carefully worked— but not enough, in my judgement, to make any considerable risk advisable. The People that Sit in Darkness are getting to be too scarce— too scarce and too shy. And such darkness as is now left is really of but an indifferent quality and not dark enough for the game. The most of those People that Sit in Darkness have been furnished with more light than was good for them or profitable for us. We have been injudicious.

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা, এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য— তবে আমরা ভুল বুঝিব।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

বারোয়ারি-মঙ্গল

আমাদের দেশের কোনো বন্ধু অথবা বড়োলোকের মৃত্যুর পর আমরা বিশেষ কিছুই করি না। এইজন্য আমরা পরস্পরকে অনেক দিন হইতে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছি— অথচ সংশোধনের কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ধিক্‌কার যদি আন্তরিক হইত, লজ্জা যদি যথার্থ পাইতাম, তবে এত দিনে আমাদের ব্যবহারে তাহার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত।

কিন্তু কেন আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই, অথচ লজ্জা পাই না? ইহার কারণ আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। ঘা মারিলে যদি দরজা না খোলে তবে দেখিতে হয়, তালা বন্ধ আছে কি না।

স্বীকার করিতেই হইবে, মৃত মান্যব্যক্তির জন্য পাথরের মূর্তি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না; এই প্রকার মার্বল পাথরের পিণ্ডদানপ্রথা আমাদের কাছে অভ্যস্ত নহে। আমরা হাহাকার করিয়াছি, অশ্রুপাত করিয়াছি, বলিয়াছি 'আহা, দেশের এত বড়ো লোকটাও গেল!'— কিন্তু কমিটির উপর স্মৃতিরক্ষার ভার দিই নাই।

এখন আমরা শিখিয়াছি এইরূপই কর্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্কারগত হয় নাই, এইজন্য কর্তব্য পালিত না হইলে মুখে লজ্জা দিই, কিন্তু হৃদয়ে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বৃত্তি এক-রকম হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নানা কারণে নানা-রকম হইয়া থাকে। ইংরেজ প্রিয়ব্যক্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিয়া পাথরে চাপা দিয়া রাখে, তাহাতে নামধাম-তারিখ খুদিয়া রাখিয়া দেয় এবং তাহার চারি দিকে ফুলের গাছ করে। আমরা পরমাত্মীয়ের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্ম করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অল্প? ভালোবাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরেজ জানে, এ কথা কবর এবং শ্মশানের সাক্ষ্য লইয়া ঘোষণা করিলেও হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ইহার অনুরূপ তর্ক এই যে, 'থ্যাঙ্ক য়ু'র প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অকৃতজ্ঞ। আমাদের হৃদয় ইহার উত্তর এই বলিয়া দেয় যে, কৃতজ্ঞতা আমার যে আছে আমিই তাহা জানি, অতএব 'থ্যাঙ্ক য়ু' বাক্য-ব্যবহারই যে কৃতজ্ঞতার একমাত্র পরিচয় তাহা হইতেই পারে না।

'থ্যাঙ্ক য়ু' শব্দের দ্বারা হাতে হাতে কৃতজ্ঞতা ঝাড়িয়া ফেলিবার একটা চেষ্টা আছে, সেটা আমরা জবাব-স্বরূপ বলিতে পারি। য়ুরোপ কাহারও কাছে বাধ্য থাকিতে চাহে না— সে স্বতন্ত্র। কাহারও কাছে তাহার কোনো দাবি নাই, সুতরাং যাহা পায় তাহা সে গায়ে রাখে না। শুধিয়া তখনি নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবি আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী সে দান করিবে, যে গৃহী সে আতিথ্য করিবে, যে জ্ঞানী সে অধ্যাপন করিবে, যে জ্যেষ্ঠ সে পালন করিবে, যে কনিষ্ঠ সে সেবা করিবে— ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবিতে আমরা পরস্পর

বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রার্থী যদি ফিরিয়া যায় তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অশুভ, অতিথি যদি ফিরিয়া যায় তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ম কর্মকর্তার পক্ষেই শুভ। এইজন্য নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। আহূতবর্গের সন্তোষে যে-একটি মঙ্গলজ্যোতি গৃহ পরিব্যাপ্ত করিয়া উদ্ভাসিত হয় তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই পুরস্কার। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধানতম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণকারীই পায়— তাহা মঙ্গলকর্ম সুসম্পন্ন করিবার আনন্দ, তাহা রসনাতৃপ্তির অপেক্ষা অধিক।

এই মঙ্গল যদি আমাদের সমাজের মুখ্য অবলম্বন না হইত তবে সমাজের প্রকৃতি এবং কর্ম অন্য রকমের হইত। স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যকে যে বড়ো করিয়া দেখে পরের জন্য কাজ করিতে তাহার সর্বদা উত্তেজনা আবশ্যক করে। সে যাহা দেয় অন্তত তাহার একটা রসিদ লিখিয়া রাখিতে চায়। তাহার যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার দ্বারা অন্যের উপরে সে যদি প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট উৎসাহ তাহার না থাকিতে পারে। এইজন্য স্বাতন্ত্র্যপ্রধান সমাজকে ক্ষমতাশালী লোকের কাছ হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য সর্বদা বাহবা দিতে হয়; যে দান করে তাহার যেমন সমারোহ, যে গ্রহণ করে তাহারও তেমনি অনেক আয়োজনের দরকার হয়। প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই য়ুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে তাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক দিয়া দেখিলে যে দান করে তাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে।

কিন্তু স্বার্থের উত্তেজনা মানবপ্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তেজনা অপেক্ষা সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতিশাস্ত্রে বলে ডিমান্ড অনুসারে সাপ্লাই, অর্থাৎ চাহিদা-অনুসারে জোগান হইয়া থাকে। খরিদদারের তরফে যেখানে অধিক মূল্য হাঁকে ব্যাবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মূল্য বেশি সেই সমাজেই ক্ষমতাশালীর চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইহাই সহজ স্বভাবের নিয়ম।

কিন্তু আমাদের সৃষ্টিছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর-সব জায়গাতেই খাটে, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলট-পালট হইয়া যায়। ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবস্বভাবকে সহজ স্বভাবের ঊর্ধ্বে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনমানসম্ভোগ পর্যন্ত কোনো বিষয়েই তাহার চালচলন সহজরকম নহে। আর-কিছু না পায় তো অন্তত তিথিনক্ষত্রের দোহাই দিয়া সে আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলাকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া রাখে। এই দুঃসাধ্য কার্যে সে অনেক সময় মূঢ়তাকে সহায় করিয়া অবশেষে সেই মূঢ়তার দ্বারা নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। ইহা হইতে তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোন্‌ দিকে তাহা বুঝা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ। এইজন্য তাহার প্রবল চেষ্টা এমন-সকল উপায় অবলম্বন করে যাহাতে শেষ কালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে। এ কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরঞ্চ স্বার্থের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটি করাইয়া লইতে পারিলেই স্বার্থসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মান্তরের সদ্গতির লোভ দ্বারা মঙ্গলকাজ করাইবার চেষ্টা করিলে কেবল কাজই করানো হয়, মঙ্গল করানো হয় না। কারণ, মঙ্গল স্বার্থের ন্যায় অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য থাকে না। তখন ফললাভের

প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই উপায় সম্বন্ধে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্রহিতৈষা যে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে ততই সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। ইতিহাসকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া, ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্রমহিমাকে বড়ো করিবার চেষ্টা হয়; অন্ধ অহংকারকে প্রতিদিন অভ্রভেদী করিয়া তোলাকেও শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে— অবশেষে, ধর্ম, যিনি সকলকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন, তাঁহাকে সবলে আঘাত করিয়া নিজের আশ্রয়শাখাটিকেই ছেদন করা হয়। ধর্ম কলের মধ্যেও বিনষ্ট হন, বলের দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা আমাদের মঙ্গলকে কলের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি, য়ুরোপ স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্বক চাপিয়া রাখিতে গিয়া প্রত্যহই বিনাশ করিতেছে।

অতএব আমাদের প্রাচীন সমাজ আজ নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ জালের মধ্যে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ছিল। স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহা নহে, কারণ, সে নিয়মের বশবর্তী হইয়াও গুরুতর দুর্গতি ঘটে— কিন্তু সমাজকে সকল দিক হইতে মঙ্গলজালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টায় অন্ধ হইয়া সে নিজের চেষ্টাকে নিজে ব্যর্থ করিয়াছে। ধৈর্যের সহিত যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদর্শ সভ্যজগতের সমুদয় আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ, আমাদের পিতামহদের শুভ ইচ্ছাকে যদি কলের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম আমাদের সহায় হইবেন।

কিন্তু কল জিনিসটাকে একেবারে বরখাস্ত করা যায় না। এক-এক দেবতার এক-এক বাহন আছে— সম্প্রদায়-দেবতার বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-আনা লোককে অন্ধ অভ্যাসের বশবর্তী করিতে হয়। জগতে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওয়া যায় না। খৃস্টানজাতির মধ্যে আন্তরিক খৃস্টান কত অল্প তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানিতে পাইয়াছি— এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্ধ-সংস্কারবিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী হিন্দু যে কত বিরল তাহা আমরা চিরাভ্যাসের জড়তাবশত ভালো করিয়া জানিতেও পাই না। সকল লোকের প্রকৃতি যখন এক হয় না তখন এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অনেক বাজে মাল-মসলা আসিয়া পড়ে। যে-সকল বাছা-বাছা লোক এই আদর্শের অনুসারী তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলের ভাবটাকে প্রাণের দ্বারা চালিয়া লন। কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া প্রাণকে পিষিয়া ফেলে, প্রাণকে খেলিবার সুবিধা না দেয়, তবেই বিপদ। সকল দেশেই মাঝে মাঝে মহাপুরুষরা উঠিয়া সামাজিক কলের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন— সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলের অন্ধ গতিকেই সকলে প্রাণের গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অল্পদিন হইল, ইংরেজ-সমাজে কার্লাইল এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব বাহনটিই যখন সমাজদেবতার কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার চেষ্টা করে, যন্ত্র যখন যন্ত্রীকেই নিজের যন্ত্রস্বরূপ করিবার উপক্রম করে, তখন সমাজে ও সমাজের কলে মাঝে-মাঝে ঝুটোপুটি বাধিয়া যায়। মানুষ যদি সেই যুদ্ধে কলের উপর জয়ী হয় তো ভালো, আর কল যদি মানুষকে পরাভূত করিয়া চাকার নীচে চাপিয়া রাখে তবেই সর্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তরাল করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, জড় অনুষ্ঠানে জ্ঞানকে সে আধ-মরা করিয়া পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা য়ুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথায় কথায় লজ্জা পাই। আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার

কীর্তিস্তম্ভ নহে; ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘকালের যত্নসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেক সময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্‌কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব করি, কালের এই-সমস্ত অনাহূত আবর্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্বের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন-কি ঐশ্বর্যকে পর্যন্ত খর্ব করিয়া মঙ্গলকেই যে ভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন আর কোথাও হয় নাই। অন্য দেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে; কারণ, স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা ইংরেজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতিযোগিতা এই হানাহানির অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলন্ড ফ্রান্স জর্মানি রাশিয়া আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিরূপ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনোমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বল বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি সামঞ্জস্য এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে? তাহার আদর্শ এখন কোথায়? এখনকার কোন্‌ বণিকের আপিসে, কোন্‌ রণক্ষেত্রে? কোন্‌ কালো কোর্তায়, লাল কোর্তায়, বা খাকি কোর্তায় সে সজ্জিত হইয়াছে? সে ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের কুটীরপ্রাঙ্গণে শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর স্তিমিত ধ্যানাসনে, সে ছিল ধর্মপরায়ণ আর্য গৃহস্থের কর্মমুখরিত যজ্ঞশালায়। দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক, বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ গৌরবের অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা লজ্জা পাইতে প্রস্তুত নহি। সংসারের সর্বত্রই হরণ-পূরণের নিয়ম আছে। আমাদের বাঁ দিকে কমতি থাকিলেও ডান দিকে বাড়তি থাকিতে পারে। যে ওড়ে তাহার ডানা বড়ো, কিন্তু পা ছোটো; যে দৌড়ায় তাহার পা বড়ো, কিন্তু ডানা নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার মঙ্গল হয়—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে সে ভালো হয়। ভক্তি করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্তব্য।

কিন্তু তবে তো একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জীব না হয় তবে সে জীবনের ধর্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জন করিতে থাকে, কেবলই সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে—যদি মনে করি কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব—তবে শত বৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদের প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কতটুকু সময় লয়? প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে? ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কী লাভ?

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে এমন কথা উঠিতেও পারে! লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন

করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দানদক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোনো বাহ্য মূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক, তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। 'গোলে হরিবোল' ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেক সময় তুচ্ছ উপলক্ষে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক-না কেন, ঝড় জিনিসটা কখনোই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কত বার কত শত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের বিসর্জন হইয়া গেছে। পাথরের মূর্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায়? ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে? এই-সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভালো, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ, তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কী দেখিতে পাই? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয় তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে? তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড়ো করে না, তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না? তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দেয় নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে? শুনিয়াছি লর্ড পামারস্টনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। দূর হইতে আমাদের মনে এ কথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়? পামারস্টনের নামই কি ইংলন্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে, সর্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল? দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না—যদি না হইয়া থাকে তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমন কী কারণ আছে?

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোনো দরকার নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মতো, ছোটো বড়ো মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই সাদা পাথর দিয়া চাপা দিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয় তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয় তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভালো।

যাহা বিনষ্ট হইবার তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার তাহা ভস্ম হইয়া যাক। মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোটো এবং

বড়ো, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়োত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী তাহাই থাক্; যাহা মৃতদেহ, আজ বাদে কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধ স্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত, অথচ বৈরাগ্যের সহিত, শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি, এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভালো। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে বাছাই করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড়ো দুর্জয় নেশা। একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ একবার বড়োলোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরেনব্বইয়ের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে— সেই নেশার রোখ যতই চড়িতে থাকে ততই এই-সকল জিনিসের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেমনি য়ুরোপে মৃত বড়োলোক জমাইবার যে-একটা প্রচণ্ড নেশা আছে তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদুর মাখাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্সপিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্সপিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোনো সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎপরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণীসম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য? গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে সেও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক পারত্রিক কোনো ফললাভ করে এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্মে প্রাণবিসর্জনপর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে সেই স্মৃতি-পালন কহে না; স্মরণব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই রকম, এমন-কি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরমসাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলন্ডে যাইতেন তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিত নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে একটা যে-কোনো প্রকারের বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবনচরিত— জীবন যাহার যেমনি হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে তাহারই জীবনচরিত। কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত

সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই— তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন? টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।

কৃত্রিম আদর্শে মানুষকে এইরূপ নির্বিবেক করিয়া তোলে। মেকি এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে পাপপুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কী হইয়াছে? ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোনো জাতিবিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে, উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

য়ুরোপে তেমনি মাহাত্ম্যের মধ্যে জাতিবিচার উঠিয়া গেছে। যে ব্যক্তি ক্রিকেট-খেলায় শ্রেষ্ঠ, যে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ, যে দানে শ্রেষ্ঠ, যে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ, সকলেই গ্রেটম্যান। একই-জাতীয় সম্মানস্বর্গে সকলেরই সদ্‌গতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্ঘ্য মাহাত্ম্যের অপেক্ষা বেশি দাঁড়াইয়াছে। দলের হাতে বিচারের ভার থাকিলে এইরূপ ঘটাই অনিবার্য। যে আচারপরায়ণ সে ধর্মপরায়ণের সমান হইয়া দাঁড়ায়, এমন-কি, বেশি হইয়া ওঠে; যে ক্ষমতাশালী সে মহাত্মাদের সমান, এমন-কি, তাঁহাদের চেয়ে বড়ো হইয়া দেখা দেয়। আমাদের সমাজে দলের লোকে যেমন আচারকে পূজ্য করিয়া ধর্মকে খর্ব করে, তেমনি য়ুরোপের সমাজে দলের লোকে ক্ষমতাকে পূজ্য করিয়া মাহাত্ম্যকে ছোটো করিয়া ফেলে।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধুম গৃহদেবতা-ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষমাত্র নহে? ইহাতে ভক্তির চর্চা না হইয়া ভক্তির অবমাননা হয় না কি?

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে, বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয় বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মাল-মসলা কিছু কম হয় তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই, কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত তিনি মহতের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবেন ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ, কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে ভক্তিলাভ করেন নাই এ কথা কোনোমতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমাত্রেরই ভক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন তাঁহারা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের দেশে নিষ্ফল হইয়াছে? তাহা নহে। তিনি আপন মহত্ত্বদ্বারা দেশের হৃদয়ে অমর স্থান অধিকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। নিষ্ফল হইয়াছে তাঁহার স্মরণসভা। বিদ্যাসাগরের জীবনের যে উদ্দেশ্য তাহা তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সাধন করিয়াছেন; স্মরণসভার যে উদ্দেশ্য তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা স্মরণসভার নাই, উপায় সে জানে না।

মঙ্গলভাব স্বভাবতই আমাদের কাছে কত পূজ্য বিদ্যাসাগর তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অসামান্য

ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু সেই-সকল ক্ষমতায় তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার দয়া, তাঁহার অকৃত্রিম অশ্রান্ত লোকহিতৈষাই তাঁহাকে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নূতন ফ্যাশনের টানে পড়িয়া আমরা যতই আড়ম্বর করিয়া যত চেষ্টাই করি-না কেন, আমাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই শক্তি-উপাসনায় মাতে না। ক্ষমতা আমাদের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য। আমাদের ভক্তি শক্তির অভ্রভেদী সিংহদ্বারে নহে, পুণ্যের স্নিগ্ধনিভৃত দেবমন্দিরেই মস্তক নত করে।

আমরা বলি, কীর্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক তিনি নিজের কীর্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা করিলে তাহা হাস্যকর হয়। বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্তিদ্বারা অমরত্বলাভে সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে? হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার দেখা পাইব— অন্যত্র তাহাকে স্মরণ করিবার উপায় করিতে যাওয়া মূঢ়তা। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনোপ্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন 'গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে', তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্তিদ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কিসে হইতে পারে?

য়ুরোপে যে দল বাঁধিবার ভাব আছে তাহার উপযোগিতা নাই এ কথা বলা মূঢ়তা। যে-সকল কাজ বলসাধ্য, বহুলোকের আলোচনার দ্বারা সাধ্য, সে-সকল কাজে দল না বাঁধিলে চলে না। দল বাঁধিয়া য়ুরোপ যুদ্ধে বিগ্রহে বাণিজ্যে রাষ্ট্রব্যাপারে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। মৌমাছির পক্ষে যেমন চাক বাঁধা য়ুরোপের পক্ষে তেমনি দল বাঁধা প্রকৃতিসিদ্ধ। সেইজন্য য়ুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে, ব্যক্তিগত দয়াকে প্রশ্রয় দেয় না; দল বাঁধিয়া পূজা করিতে যায়, ব্যক্তিগত পূজাহ্নিকে মন দেয় না; দল বাঁধিয়া ত্যাগ স্বীকার করে, ব্যক্তিগত ত্যাগে তাহাদের আস্থা নাই। এই উপায়ে য়ুরোপ একপ্রকার মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যপ্রকার মহত্ত্ব খোয়াইয়াছে। একাকী কর্তব্য কর্ম নিষ্পন্ন করিবার উৎসাহ তাহার নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেককে প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য বলিয়া জানে। য়ুরোপে ধর্মপালন করিতে হইলে কমিটিতে বা ধর্মসভায় যাইতে হয়। সেখানে সম্প্রদায়গণই সদনুষ্ঠানে রত, সাধারণ লোকেরা স্বার্থসাধনে তৎপর। কৃত্রিম উত্তেজনার দোষ এই যে, তাহার অভাবে মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। দল বাঁধিলে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাখে; কিন্তু দলের বাহিরে, নামিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্তব্য ধর্মকর্মরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হয়; ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার জন্য সভা করিতে বা খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় না। এইজন্য সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটি সাত্ত্বিক ভাব বিরাজমান— এখানে ছোটোবড়ো সকলেই মঙ্গলচর্চায় রত, কারণ, গৃহই তাহাদের মঙ্গলচর্চার স্থান। এই-যে আমাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলভাব ইহাকে আমরা শিক্ষার দ্বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিস্তৃত এবং জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলতর করিতে পারি; কিন্তু ইহাকে নষ্ট হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না, য়ুরোপে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া ইহাকে লজ্জা দিতে এবং ইহাকে লইয়া লজ্জা করিতে পারি না— দলকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট ইহাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিতে পারি না। যেখানে দল বাঁধা অত্যাবশ্যক সেখানে যদি দল বাঁধিতে পারি তো ভালো, যেখানে অনাবশ্যক, এমন-কি অসংগত, সেখানেও দল বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া শেষকালে দলের উগ্র নেশা যেন অভ্যাস না করিয়া বসি। সর্বাগ্রে সর্বোচ্চে নিজের ব্যক্তিগত কৃত্য, তাহা প্রাত্যহিক, তাহা চিরন্তন; তাহার পরে দলীয় কর্তব্য,

তাহা বিশেষ আবশ্যকসাধনের জন্য ক্ষণকালীন, তাহা অনেকটা পরিমাণে যন্ত্রমাত্র, তাহাতে নিজের ধর্মপ্রবৃত্তির সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ চর্চা হয় না। তাহা ধর্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

কিন্তু কালের এবং ভাবের পরিবর্তন হইতেছে। চারি দিকেই দল বাঁধিয়া উঠিতেছে, কিছুই নিভৃত এবং কেহই গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীর্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টার মধ্যেই নিজেকে পুরস্কৃত করা, এখন আর টেঁকে না। শুভকর্ম এখন আর সহজ এবং আত্মবিস্মৃত নহে, এখন তাহা সর্বদাই উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে। যে-সকল ভালো কাজ ধ্বনিত হইয়া উঠে না আমাদের কাছে তাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, এইজন্য ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিত্যক্ত, আমাদের জনপদ নিঃসহায়, আমাদের জন্মগ্রাম রোগজীর্ণ, আমাদের পল্লীর সরোবরসকল পঙ্কদূষিত, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই কেবল সভাসমিতি এবং সংবাদপত্র-হাটের মধ্যে। ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতেছে, এবং লোকহিতৈষিতা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের তাড়া না খাইলে এখন আমাদের গ্রামে স্কুল হয় না, রোগী ঔষধ পায় না, দেশের জলকষ্ট দূর হয় না। এখন ধ্বনি এবং ধন্যবাদ এবং করতালির নেশা যখন চড়িয়া উঠিয়াছে তখন সেই প্রলোভনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ঠিক যেন বাছুরটাকে কসাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।

অতএব আমরা যে দল বাঁধিয়া শোক, দল বাঁধিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি, এখন তাহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মমত কিছুই হয় না। সকালে হয়তো শীতের আভাস, বিকালে হয়তো বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। দিশি হালকা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সর্দি লাগে, বিলাতি মোটা কাপড় গায়ে দিলে ঘর্মাক্তকলেবর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল দিশি ও বিলাতি কোনো নিয়মই পুরাপুরি খাটে না। যখন বিলাতি প্রথায় কাজ করিতে যাই, দেশী সংস্কার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অন্তঃপুরে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লজ্জায় ধিক্‌কারে অস্থির হইয়া উঠি—দেশী ভাবে যখন কাজ ফাঁদিয়া বসি তখন বিলাতের রাজ-অতিথি আসিয়া নিজের বসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দেয়। সভা-সমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না—চাঁদার খাতা খুলি, অথচ তাহাতে যেটুকু অংকপাত হয় তাহাতে কেবল আমাদের কলঙ্ক ফুটিয়া উঠে।

আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন অতিথি-অভ্যাগত দীনদুঃখী সকলের জন্যই ছিল। এখনো আমাদের দেশে যে দরিদ্র সে নিজের ছোটো ভাইকে স্কুলে পড়াইতেছে, ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে, বিধবা পিসি-মাসিকে সসন্তান পালন করিতেছে। ইহাই দিশি মতে চাঁদা, ইহার উপরে আবার বিলাতি মতে চাঁদা লোকের সহ্য হয় কী করিয়া? ইংরেজ নিজের বয়স্ক ছেলেকে পর্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, তাহার কাছে চাঁদার দাবি করা অসংগত নহে। নিজের ভোগেরই জন্য যাহার তহবিল তাহাকে বাহ্য উপায়ে স্বার্থত্যাগ করাইলে ভালোই হয়। আমাদের কয়জন লোকের নিজের ভোগের জন্য কতটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকে? ইহার উপরে বারো মাসে তেরো শত নূতন নূতন অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিলে বিলাতি সভ্যতার উত্তেজনাসত্ত্বেও গৃহীর পক্ষে বিনয় রক্ষা করা কঠিন হয়। আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিতেছি, এত বড়ো অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলাম, টাকা আসিতেছে না কেন—এত বড়ো ঢাক পিটাইতেছি, টাকা আসিয়া পড়িতেছে না কেন—এত বড়ো কাজ আরম্ভ করিলাম, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে কেন? বিলাত হইলে এমন হইত, তেমন হইত, হু হু করিয়া মুষলধারে টাকা বর্ষিত হইয়া যাইত—কবে আমরা বিলাতের মতো হইব?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো বহু দূরে। বিলাতি মতের

লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজ্জা নিবারণের বহুমূল্য বিলাতি বস্ত্র এখনো পাই নাই। সকল দিকেই টানাটানি করিয়া মরিতেছি। এখন সর্বসাধারণে চাঁদা দিয়া যে-সকল কাজের চেষ্টা করে, পূর্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন— তাহাতেই তাঁহাদের ধনের সার্থকতা ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থ সমাজকৃত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের জন্য উদ্‌বৃত্ত কিছুই পাইত না, সুতরাং অতিরিক্ত কোনো কাজ করিতে না পারা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল না। যে-সকল ধনীর ভাণ্ডারে উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকিত, ইষ্টাপূর্ত কাজের জন্যে তাহাদেরই উপর সমাজের সম্পূর্ণ দাবি থাকিত। তাহারা সাধারণের অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য মঙ্গলকর্মে প্রবৃত্ত না হইলে সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইত, তাহাদের নামোচ্চারণও অশুভকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরই বিলাতি ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহূত-রবাহূত-অনাহূতদিগকে কলার পাতায় অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত। ঐশ্বর্যকে মঙ্গলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য— ইহা নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা নহে, আমাদের সমাজে ইহা এতকাল পর্যন্ত প্রত্যহই ব্যক্ত হইয়াছে— সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থের কাছে আমাদিগকে চাঁদা চাহিতে হয় না। ধনীরাই আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষকালে অন্ন, জলাভাবকালে জল দান করিয়াছে— তাহারাই দেশের শিক্ষাবিধান, শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎসবরক্ষা ও গুণীর উৎসাহ-সাধন করিয়াছে। হিতানুষ্ঠানে আজ যদি আমরা পূর্বাভ্যাসক্রমে তাহাদের দ্বারস্থ হই, তবে সামান্য ফল পাইয়া অথবা নিষ্ফল হইয়া কেন ফিরিয়া আসি? বরঞ্চ আমাদের মধ্যবিত্তগণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের দ্বারবানগণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ি পার হইয়া প্রাসাদে ঢুকিতে দেয় না; ভ্রমক্রমে ঢুকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উদ্‌বৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগীরা ভারবিহীন স্বাধীন ঐশ্বর্যশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নহি। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতি ভোগীর অনুরূপ হওয়াতে খাটে-পালঙ্কে, বসনে-ভূষণে, গৃহসজ্জায়, গাড়িতে-জুড়িতে আমাদের ধনীদিগকে আর বদান্যতার অবসর দেয় না— তাহাদের বদান্যতা বিলাতি জুতাওয়ালা, টুপিওয়ালা, ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিলওয়ালার সুবৃহৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কঙ্কালসার দেশ রিক্তহস্তে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্তব্য এবং বিলাতি ভোগীর বিপুল ভোগ, এই দুই ভার একলা কয় জনে বহন করিতে পারে?

কিন্তু আমাদের পরাধীন দরিদ্র দেশ কি বিলাতের সঙ্গে বরাবর এমনি করিয়া টক্কর দিয়া চলিবে? পরের দুঃসাধ্য আদর্শে সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিবার কঠিন চেষ্টায় কি উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে? নিজেদের চিরকালের সহজ পথে অবতীর্ণ হইয়া কি নিজেকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবে না?

বিজ্ঞসম্প্রদায় বলেন, যাহা ঘটিতেছে তাহা অনিবার্য, এখন এই নূতন আদর্শেই নিজেকে গড়িতে হইবে। এখন প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইবে, শক্তির প্রতি শক্তি-অস্ত্র হানিতে হইবে।

এ কথা কোনোমতেই মানিতে পারি না। আমাদের ভারতবর্ষের যে মঙ্গল-আদর্শ ছিল তাহা মৃত আদর্শ নহে, তাহা সকল সভ্যতার পক্ষেই চিরন্তন আদর্শ এবং আমাদের অন্তরে বাহিরে কোথাও ভগ্ন কোথাও সম্পূর্ণ আকারে তাহা বিরাজ করিতেছে। সেই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া য়ুরোপের স্বার্থপ্রধান শক্তিপ্রধান স্বাতন্ত্র্যপ্রধান আদর্শের সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছে। সে যদি না থাকিত তবে আমরা অনেক পূর্বেই ফিরিঙ্গি হইয়া যাইতাম। ক্ষণে ক্ষণে

আমাদের সেই ভীষ্ম-পিতামহতুল্য প্রাচীন সেনাপতির পরাজয়ে এখনো আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যতক্ষণ আমাদের সেই বেদনাবোধ আছে ততক্ষণ আমাদের আশা আছে। মানব-প্রকৃতিতে স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যই যে মঙ্গলের অপেক্ষা বৃহত্তর সত্য এবং ধ্রুবতর আশ্রয়স্থল, এ নাস্তিকতাকে যেন আমরা প্রশ্রয় না দিই। আত্মত্যাগ যদি স্বার্থের উপর জয়ী না হইত তবে আমরা চিরদিন বর্বর থাকিয়া যাইতাম। এখনো বহুল পরিমাণে বর্বরতা পশ্চিমদেশে সভ্যতার নামাবলী পরিয়া বিচরণ করিতেছে বলিয়াই তাহাকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপে বরণ করিতে হইবে, আমাদের ধর্মবুদ্ধির এমন ভীরুতা যেন না ঘটে। য়ুরোপ আজকাল সত্যযুগকে উদ্ধতভাবে পরিহাস করিতেছে বলিয়া আমরা যেন সত্যযুগের আশা কোনো কালে পরিত্যাগ না করি। আমরা যে পথে চলিয়াছি সে পথের পাথেয় আমাদের নাই— অপমানিত হইয়া আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে। দরখাস্ত করিয়া এ পর্যন্ত কোনো দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড়ো হয় নাই, অধীনে থাকিয়া কোনো দেশ বাণিজ্যে স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, এবং ভোগবিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে বাণিজ্যজীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই। যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য সেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমৃত্যুর কারণ। আমাদিগকে দায়ে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া একদিন ফিরিতেই হইবে— তখন কি লজ্জার সহিত নতশিরে ফিরিব? ভারতবর্ষের পর্ণকুটীরের মধ্যে তখন কি কেবল দারিদ্র্য ও অবনতি দেখিব? ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্য ঐশ্বর্যবলে দরিদ্রকে শিব, শিবকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা কি আধুনিক ভারতসন্তানের চাকচিক্য-অন্ধ চক্ষে একেবারেই পড়িবে না? কখনোই না। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের নূতন শিক্ষাই ভারতের প্রাচীন মাহাত্ম্যকে আমাদের চক্ষে নূতন করিয়া সজীব করিয়া দেখাইবে, আমাদের ক্ষণিক বিচ্ছেদের পরেই চিরন্তন আত্মীয়তাকে নবীনতর নিবিড়তার সহিত সমস্ত হৃদয় দিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিব। চিরসহিষ্ণু ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে— গৃহে আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে, বাহিরে আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।

চৈত্র ১৩০৮

অত্যুক্তি

দিল্লি-দরবারের উদ্‌যোগকালে লিখিত

পৃথিবীর পূর্বকোণের লোক, অর্থাৎ আমরা, অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমাদের পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে ইহা লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই। যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের ভালোর জন্য উপদেশ দিতে আসেন তাঁহাদের কথা আমাদের নতশিরে শোনা উচিত। কারণ, তাঁহারা যে হতভাগ্য আমাদের মতো কেবল কথাই বলিতে জানেন তাহা নহে, কথা যে কী করিয়া শোনাইতে হয় তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমাদের দুটো কানের উপরেই তাঁহাদের দখল সম্পূর্ণ।

আচারে উক্তিতে আতিশয্য ভালো নহে, বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশ্যক, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে। তাহার ফল যে ফলে নাই তাহা বলিতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে আমাদের দেশ-শাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরুর উপদেশ না মানিতাম। ঘরে বাহিরে এত দিনের শাসনের পরেও যদি আমাদের উক্তিতে কিছু পরিমাণাধিক্য থাকে তবে ইহা নিশ্চয়, সেই অত্যুক্তি অপরাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র।

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসংগত বোধ হয়। যে প্রসঙ্গে আমাদের কথা আপনি বাড়িয়া চলে সে

প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ, যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে সে প্রসঙ্গে আমাদের মুখে কথা বাহির হয় না। আমরা মনে করি ইংরেজ বড়ো বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।

আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'সমস্ত আপনারই— আপনারই ঘর, আপনারই বাড়ি।' ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘরে ঢুকিতে পারি কি?' এ এক রকমের অত্যুক্তি।

স্ত্রী নুনের বাটি সরাইয়া দিলে ইংরেজ স্বামী বলে, 'আমার ধন্যবাদ জানিবে।' ইহা অত্যুক্তি। নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্ব্যচোষ্য খাইয়া এবং বাঁধিয়া এ-দেশীয় নিমন্ত্রিত বলে 'বড়ো পরিতোষ লাভ করিলাম', অর্থাৎ 'আমার পরিতোষই তোমার পারিতোষিক', তদুত্তরে নিমন্ত্রণকারী বলে 'আমি কৃতার্থ হইলাম'— ইহাকে অত্যুক্তি বলিতে পার।

আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে পত্রে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে-তাহাকে পত্রে 'প্রিয়' সম্বোধন করে— অভ্যস্ত না হইয়া গেলে ইহা আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত।

নিশ্চয়ই আরও এমন সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি, ইহারা পৈতৃক। দৈনিক ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি, ইহাই প্রাচ্যজাতির প্রতি ভর্ৎসনার কারণ।

তালি এক হাতে বাজে না, তেমনি কথা দুজনে মিলিয়া হয়। শ্রোতা ও বক্তা যেখানে পরস্পরের ভাষা বোঝে সেখানে অত্যুক্তি উভয়ের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন yours truly, সত্যই তোমারই, তখন তাঁহার এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সত্যপাঠটুকুকে তর্জমা করিয়া আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারই নহেন। বিশেষত বড়ো সাহেব যখন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন তখন অনায়াসে সে কথাটার ষোলো আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরও ষোলো আনা কাটিয়া লইতে পারি। এগুলি বাঁধা দস্তুরের অত্যুক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষাপ্রয়োগের অত্যুক্তি ইংরেজিতে ঝুড়িঝুড়ি আছে। immensely, immeasurably, extremely, awfully, infinitely, absolutely, ever so much, for the life of me, for the world, unbounded, endless প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগগুলি যদি সর্বত্র যথার্থভাবে লওয়া যায় তবে প্রাচ্য অত্যুক্তিগুলি ইহজন্মে আর মাথা তুলিতে পারে না।

বাহ্য বিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহিরের জিনিসকে আমরা ঠিকঠাকমত দেখি না, ঠিকঠাকমত গ্রহণ করি না। যখন-তখন বাহিরের নয়কে আমরা ছয় এবং ছয়কে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এ স্থলে অজ্ঞানকৃত পাপের ডবল দোষ— একে পাপ তাহাতে অজ্ঞান। ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন অসাবধান করিয়া রাখিলে পৃথিবীতে আমাদের দুটি প্রধান নির্ভরকে একেবারে মাটি করা হয়। বৃত্তান্তকে নিতান্ত ফাঁকি দিয়া সিদ্ধান্তকে যাহারা কল্পনার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তাহারা নিজেকেই ফাঁকি দেয়। যে-যে বিষয়ে আমাদের ফাঁকি আছে সেই-সেই বিষয়েই আমরা ঠকিয়া বসিয়া আছি। একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কানা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস খাইতেছিল সেই দিক হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে। আমাদের কানা চোখটা ছিল ইহলোকের দিকে— সেই তরফ হইতে আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে। সেই দিকের ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম। কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে।

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। অনেকে এরূপ চেষ্টাকে নিন্দা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে অন্যে তাহাকে বিচার করিবার অধিকারী। সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোনো উপকার

হইবে বলিয়া আশা করি না—কিন্তু অপমানের দিনে যেখানে যতটুকু আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যুক্তি অলস বুদ্ধির বাহ্য প্রকাশ। তা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে অসময়ে, উপলক্ষ থাক্ বা না-থাক্, চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করিব কাহাকে তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না কমিশনার-সাহেবের চাপরাশকে, না পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেন্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? আপিসকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষে যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন হয় তখন ভীতচিত্তে শুষ্ক ভক্তি ঢাকিবার জন্য অতিদান ও অত্যুক্তির দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্বাভাবিক নহে তাহাকে প্রমাণ করিতে হইলে লোকে অধিক চীৎকার করিতে থাকে—এ কথা ভুলিয়া যায় যে, মৃদুস্বরে যে বেসুর ধরা পড়ে না চীৎকারে তাহা চার-গুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই শ্রেণীর অত্যুক্তির জন্য আমরা একা দায়ী নই। ইহাতে পরাধীন জাতির ভীরুতা ও হীনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই অবস্থাটায় আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের প্রমাণ দেয় না। জলাশয়ের জল সমতল নহে এ কথা যখন কেহ অম্লানমুখে বলে তখন বুঝিতে হইবে, সে কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে। আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত, আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।

এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি। মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই; মুসলমান সম্রাট যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন। আজ রাজাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া দেশে বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর তখনকার চেয়ে চার-গুণ। যখন ইংলন্ডের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সাজ পরিতে বসেন তখন কলোনিগুলির সামান্য শাসনকর্তারা মাথার মুকুটে ঝলমল করেন, আর ভারতবর্ষের প্রাচীনবংশীয় রাজগণ তাঁহার চরণ-নূপুরে কিংকিণীর মতো আবদ্ধ হইয়া কেবল ঝংকার দিবার কাজ করিতে থাকেন—এবারকার বিলাতি দরবারে তাহা বিশ্বজগতের কাছে জারি হইয়াছে। হায় জয়পুর! যোধপুর! কোলাপুর! ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তোমাদের কোথায় স্থান তাহা কি এমন করিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা করিয়া আসিবার জন্যই এত লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাতের জলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলে? ইংরেজের সাম্রাজ্য-জগন্নাথজির মন্দিরে যেখানে কানাডা নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা স্ফীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক-সহকারে পান্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে সেখানে কৃশজীর্ণতনু ভারতবর্ষের কোথাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে—কিন্তু যেদিন বিশ্বজগতের রাজপথে ঠাকুরের অভ্রভেদী রথ বাহির হয় সেই একটা দিন রথের দড়া ধরিয়া টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সৌহার্দ্য—সেদিন কার্জনের নিষেধশৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষীয় রাজাদের মণিমাণিক্য লন্ডনের রাজপথে ঝলমল করিতে থাকে এবং লন্ডনের হাসপাতালগুলির 'পরে রাজভক্ত রাজাদের মুষলধারে বদান্যতাবৃষ্টির বার্তা ভারতবর্ষ নতশিরে নীরবে শ্রবণ করে। এই ব্যাপারের সমস্তটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি অত্যুক্তি, খাঁটি নহে।

প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেক সময়েই তাহাদের স্বভাবের ঔদার্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিস, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিক্যাল এজেন্টের রাহুগ্রাসে কবলিত; সাম্রাজ্যচালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই— হঠাৎ একদিন ইংরেজ সম্রাটের নায়েব পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভূলুণ্ঠিত পোশাকের প্রান্ত শিখ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন, আকস্মিক উপদ্রবের মতো একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্গীরিত হইয়া উঠিল— তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ।

এখনকার ভারতসাম্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে— তাহার রঙচঙ নাই, গীতবাদ্য নাই, তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধুলা, নাচগান, আমোদপ্রমোদ সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ— সে আনন্দ-উৎসবের উদ্‌বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের খাতা-সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র শিল্পশোভা আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারি দিকে প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত— তাঁহাদের তোরণদ্বারে যে নহবত বসিত তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটীরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ পরস্পরের আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধ্য, যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই-সকল বিনোদনব্যাপারে অপটু তাহার উন্নতির অনেক ব্যাঘাত ঘটে এই সমস্তই নিজেদের জন্য। যেখানে পাঁচটা ইংরেজ আছে সেখানে আমোদ-আহ্লাদের অভাব নাই; কিন্তু সে আমোদে চারি দিক আমোদিত হইয়া উঠে না। আমরা কেবল দেখিতে পাই— কুলিগুলা বাহিরে বসিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে পাখার দড়ি টানিতেছে, সহিস ডগকার্টের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশামাছি তাড়াইতেছে, এবং দগ্ধ ভারতবর্ষের তপ্ত সংস্রব হইতে সুদূরে যাইবার জন্য রাজপুরুষগণ সিমলার শৈলশিখরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছেন। মৃগয়ার সময় বাজে লোকেরা জঙ্গলের শিকার তাড়া করিতেছে এবং বন্দুকের দুটো-একটা গুলি পশুলক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নেটিভের মর্মভেদ করিতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্য একেবারে আনন্দহীন, সৌন্দর্যহীন— তাহার সমস্ত পথই আপিস-আদালতের দিকে— জনসমাজের হৃদয়ের দিকে নহে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা খাপছাড়া দরবার কেন? সমস্ত শাসনপ্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন্‌খানে যোগ? গাছে লতায় ফুল ধরে, আপিসের কড়িবরগায় তো মাধবীমঞ্জরী ফোটে না। এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মতো। এ ছায়া তাপনিবারণের জন্য নহে, এ জল তৃষ্ণা দূর করিবে না।

পূর্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে। সে-সকল দরবার কাহারও কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না; তাহা স্বাভাবিক। সে-সকল উৎসব বাদশাহ-নবাবদের ঔদার্যের উদ্‌বেলিত প্রবাহস্বরূপ ছিল। সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষে কোন্‌ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্‌ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত হাতে সম্রাটপ্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিসের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না?

তাই বলিতেছিলাম, আগামী দিল্লির দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এ দিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে— ও দিকে প্রাচ্যসম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া

কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশি হইবে না, যাহাও হইবে তাহার অর্ধেক আদায় করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সেদিন উৎসব করা চলে না যেদিন খরচপত্র সামলাইয়া চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইয়া উৎসব করিতে হইলে, নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের খরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নায়েব অল্প খরচে কাজ চালাইবেন বটে, কিন্তু আড়ম্বরটাকে স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য রাজাদিগকে খরচ করাইবেন। প্রত্যেক রাজাকে অন্তত কটা হাতি, কটা ঘোড়া, কজন লোক আনিতে হইবে, শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে। সেই-সকল রাজাদেরই হাতিঘোড়া-লোকলস্করে যথাসম্ভব অল্প খরচে চতুর সম্রাট-প্রতিনিধি যথাসম্ভব বৃহৎ ব্যাপার ফাঁদিয়া তুলিবেন। ইহাতে চাতুর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বদান্যতা ও ঔদার্য, প্রাচ্য সম্প্রদায়ের মতে যাহা রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয়, তাহা ইহার মধ্যে থাকে না। এক চক্ষু টাকার থলিটির দিকে এবং অন্য চক্ষু সাবেক বাদশাহের অনুকরণ-কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া এ-সকল কাজ চলে না। এ-সব কাজ যে স্বভাবত পারে সেই পারে, এবং তাহাকেই শোভা পায়।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বহুসহস্র টাকা খাজনা মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষের রাজকীয় উৎসব কী ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না, তাহারা বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্ত বালুকা সূর্যের মতো তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তপ্তবালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লি-দরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুধুমাত্র দম্ভপ্রকাশ সম্রাটকেও শোভা পায় না—ঔদার্যের দ্বারা, দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা, দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্তমান বাদশাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে—কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কী সম্মান, কী সম্পদ, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতিস্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শূন্যগর্ভ আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্য জাতির নিকট খর্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে-সকল কাজ ইংরেজি দস্তুরমতে সম্পন্ন হয় তাহা আমাদের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও সে সম্বন্ধে আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে বা রাজকীয় শুভকর্মাদিতে যে-সকল উৎসব-আমোদ হইত তাহার ব্যয় রাজাই বহন করিতেন, প্রজারা জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার উল্টা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নড়িলে-চড়িলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার খাতা বাহির হয়, রাজা-রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাবের রাজকীয় নিলামের দোকান জমিয়া উঠে। আকবর শাজাহান প্রভৃতি বাদশারা নিজেদের কীর্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন, এখনকার দিনে রাজকর্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ হইতে বড়ো বড়ো কীর্তিস্তম্ভ আদায় করিয়া লন। এই-যে সম্রাটের প্রতিনিধি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারায় কোথায় দিঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সেকালে বাদশারা, নবাবরা, রাজকর্মচারীগণও, এই-সকল মঙ্গল-কার্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এখন রাজকর্মচারীর অভাব নাই, তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু দানে ও সৎকর্মে এ দেশে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন তাঁহারা রাখিয়া যান না। বিলাতি দোকান হইতে তাঁহারা জিনিসপত্র কেনেন, বিলাতি সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন, এবং বিলাতের কোণে বসিয়া অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁহাদের পেনশন সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে লেডি ডফারিনের নামে যে-সকল হাসপাতাল খোলা হইল তাহার টাকা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের প্রজারাই জোগাইয়াছে। এ প্রথা খুব ভালো হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রথা নহে, সুতরাং এই প্রকারের পূর্তকার্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। না করুক, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, ইহাতে বলিবার কথা কিছু নাই। কিন্তু কখনও দিশি কখনও বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না। বিশেষত, আড়ম্বরের বেলায় দিশি দস্তুর এবং খরচপত্রের বেলায় বিলিতি দস্তুর হইলে আমাদের কাছে ভারি অসংগত ঠেকে। আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এই জন্যই ত্রিশ কোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিন্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কষাকষি-দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন— জানেন না যে, প্রাচ্য হৃদয় দানে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গল অনুষ্ঠানেই ভোলে। আমাদের যে উৎসবসমারোহ তাহা আহূত-অনাহূত-রবাহূতের আনন্দসমাগম, তাহাতে 'এহি এহি দেহি দেহি পীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা খাঁটি, তাহা স্বাভাবিক। আর পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙিনের দ্বারা কণ্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সংকীর্ণ, দয়াহীন দানহীন যে দরবার, যাহা কেবলমাত্র দম্ভপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি— তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়— আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্‌বেলিত হয় নাই।

এই গেল নকল-করা অত্যুক্তি। কিন্তু নকল, বাহ্য আড়ম্বরে মূলকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সাহেব যদি সাহেবি ছাড়িয়া নবাবি ধরে তবে তাহাতে যে আতিশয্য প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা কতকটা কৃত্রিম, অতএব তাহার দ্বারা জাতিগত অত্যুক্তির প্রকৃতি ঠিক ধরা যায় না। ঠিক খাঁটি বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেন্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সামনে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়িভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামি। আমরা কিছু প্রাচুর্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখো-না, আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি; ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই— এমন-কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা— হয় প্রচুররূপে নগ্ন নয় প্রচুররূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরনের— হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য নাই; তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটি চাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলংকার, সুতরাং তাহা অসংকোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই গভীরভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়; বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকূপের মধ্যে হাজারো লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে এক ঠেলায় অত্যুক্তির মাঝদরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট-হিসাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন। যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নাই! ও দিকে যে গণিতশাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে সেটা খেয়াল করেন নাই। হলওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কত রূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালোরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির উদাহরণ আরব্য উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড্ কিপলিঙের 'কিম্' এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা আছে, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র—তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক সত্য ছাড়া আর কোনো সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপলিঙ তাঁহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনই একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন যে, যেমন হলপ-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে তেমনি কিপলিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশ পাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রিটিশ পাঠককে এমনি ছল করিয়া ভুলাইতে হয়। কারণ, ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের প্রিয়। শিক্ষা লাভ করিবার বেলাও তাহার বাস্তব চাই, আবার খেলেনাকেও বাস্তব করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহার খেলার সুখ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভোজে খরগোশ রাঁধিয়া জন্তুটাকে যথাসম্ভব অবিকল রাখিয়াছে। সেটা যে সুখাদ্য ইহাই যথেষ্ট আমোদের নহে; কিন্তু সেটা যে একটা বাস্তব জন্তু, ব্রিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়। ব্রিটিশ খানা যে কেবল খানা তা নহে, তাহা প্রাণীবৃত্তান্তের গ্রন্থবিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোনো ব্যঞ্জনে পাখিগুলা ভাজা ময়দার আবরণে ঢাকা পড়ে, তবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে বসাইয়া রাখা হয়। বাস্তব এত আবশ্যক। কল্পনার নিজ এলাকার মধ্যেও ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের সন্ধান করে—তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বাস্তবের ভান করিতে হয়। যে ব্যক্তি অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে তাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহির করে, কিন্তু ভান করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্য হইতে বাহির হইল। কিপলিঙ নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করিলেন, কিন্তু নৈপুণ্যগুণে ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বুঝিল যে, এশিয়ার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই সরীসৃপগুলা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের এরূপ একান্ত লোলুপতা নাই। আমরা কল্পনাকে কল্পনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজন্য গল্প শুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে নিজে ভুলাইতে পারি; লেখককে কোনোরূপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্পনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের ছদ্ম-গোঁফ-দাড়ি পরিতে হয় না। আমরা বরঞ্চ বিপরীত দিকে যাই। আমরা বাস্তব সত্যে কল্পনার রঙ ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের দুঃখবোধ হয় না। আমরা বাস্তব সত্যকেও কল্পনার সহিত মিশাইয়া দিই, আর য়ুরোপ কল্পনাকেও বাস্তব সত্যের মূর্তি পরিগ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই স্বভাবদোষে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, আর ইংরেজের স্বভাবে ইংরেজের কি কোনো লোকসান করে নাই? গোপন মিথ্যা কি সেখানে ঘরে-বাহিরে বিহার করিতেছে না? সেখানে খবরের কাগজে খবর বানানো চলে তাহা দেখা গিয়াছে এবং সেখানে ব্যাবসাদার-মহলে শেয়ার-কেনাবেচার বাজারে যে কিরূপ সর্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে নানা চিত্রে নানা অক্ষরে দেশবিদেশে নিজেকে কিরূপ ঘোষণা করে তাহা আমরা জানি—এবং আজকাল আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি। বিলাতে পলিটিক্সে বানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো উত্তর দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ তুলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে-সকল দোষারোপ করিয়া থাকেন তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয় তবে শঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। সেখানকার পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট-সংগত ভাষায় এবং কখনো বা তাহা লঙ্ঘন করিয়াও বড়ো বড়ো লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা হইয়া থাকে। হয় এরূপ নিন্দাবাদকে অত্যুক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয় ইংলন্ডের পলিটিক্স মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদয় হয় যে, বরঞ্চ অত্যুক্তিকে সুস্পষ্ট

অত্যুক্তিরূপে পোষণ করাও ভালো, কিন্তু অত্যুক্তিকে সুকৌশলে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া তাহাকে বাস্তবের দলে চালাইবার চেষ্টা করা ভালো নহে— তাহাতে বিপদ অনেক বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে দুইপক্ষে উভয়ের ভাষা বোঝে সেখানে পরস্পরের যোগে অত্যুক্তি আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাতি অত্যুক্তি বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। এইজন্য তাহা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজের অবস্থাকে হাস্যকর ও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছি। ইংরেজ বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের ভালো করিবার জন্যই তোমাদের দেশ শাসন করিতেছি, এখানে সাদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, সম্রাটশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আকবর যাহা কল্পনা মাত্র করিয়াছিলেন আমাদের সাম্রাজ্যে তাহাই সত্যে ফলিতেছে।' আমরা তাড়াতাড়ি ইহাই বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসে স্ফীত হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের দাবির আর অন্ত নাই। ইংরেজ বিরক্ত হইয়া আজকাল এই-সকল অত্যুক্তিকে খর্ব করিয়া লইতেছে। এখন বলিতেছে, 'যাহা তরবারি দিয়া জয় করিয়াছি তাহা তরবারি দিয়া রক্ষা করিব।' সাদা-কালোয় যে যথেষ্ট ভেদ আছে তাহা এখন অনেক সময়ে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া নিতান্ত স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইতেছে। কিন্তু তবু বিলাতি অত্যুক্তি এমনই সুনিপুণ ব্যাপারে যে, আজও আমরা দাবি ছাড়ি নাই; আজও আমরা বিশ্বাস আঁকড়িয়া বসিয়া আছি, সেই-সকল অত্যুক্তিকেই আমাদের প্রধান দলিল করিয়া আমাদের জীর্ণচীরপ্রান্তে বহু যত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে— এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ 'হ্যাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া'— এক সময়ে ভারতে পৌরুষ রক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরানিগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টাপূর্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্যে দীক্ষিত করিয়াছে, আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মতো নিমগ্ন হইয়াছে— এই তো গেল বাণিজ্য এবং কৃষি। তাহার পর বীর্য এবং অস্ত্র, সে কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে, 'তোমরা কেবলই চাকরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যাবসা কর না কেন?' এ দিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা খাজনায় ও মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি। তবু কি বিলাতি অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলই দরখাস্ত জারি করিতে হইবে? হায়, ভিক্ষুকের অনন্ত ধৈর্য! হায়, দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ! রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে এতবড়ো একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে। অথচ পরদেশশাসন সম্বন্ধে এত বড়ো বড়ো নীতিকথার দম্ভপূর্ণ অত্যুক্তি আর কেহ কি কখনো উচ্চারণ করিয়াছে? কিন্তু এ-সকল অপ্রিয় কথা উত্থাপন করা কেন! কোনো একটা জাতিকে অনাবশ্যক আক্রমণ করিয়া পীড়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসংগত নহে, ইহা আমরা ক্রমাগত ঘা খাইয়া ইংরেজের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। নিতান্ত গায়ের জ্বালায় আমাদিগকে যে অশিষ্টতায় দীক্ষিত করিয়াছে তাহা আমাদের দেশের জিনিস নহে।

কিন্তু অন্যের কাছ হইতে আমরা যতই আঘাত পাই-না কেন, আমাদের দেশের যে চিরন্তন নম্রতা, যে ভদ্রতা, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? ইহাকেই বলে চোরের উপর রাগ করিয়া নিজের ক্ষতি করা।

অবশ্য, পরের নিকট হইতে স্বজাতি যখন অপবাদ ও অপমান সহ্য করিতে থাকে তখন যে আমার মন অবিচলিত থাকে এ কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেই অপবাদলাঞ্ছনার জবাব দিবার জন্যই যে আমার এই প্রবন্ধ লেখা তাহা নহে। আমরা যেটুকু জবাব দিবার চেষ্টা করি তাহা নিতান্ত ক্ষীণ, কারণ বাক্‌শক্তিই আমাদের একটিমাত্র শক্তি। কামানের যে গর্জন তাহা ভীষণ, কারণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার গোলাটা থাকে। কিন্তু প্রতিধ্বনির যে প্রত্যুত্তর তাহা ফাঁকা— সেরূপ খেলামাত্রে আমার অভিরুচি নাই।

ইংরেজ আমার এ লেখা পড়িবে না, পড়িলেও সকল কথা ঠিক বুঝিবে না। আমার এ লেখা আমাদের স্বদেশীয় পাঠকদের জন্যই। অনেক দিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতি সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সে সভ্যতা স্বার্থকে অভিভূত করিয়া বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য প্রেম শান্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।

পৃথিবীতে এক-এক সময়ে প্রলয়ের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া পড়ে। এক সময়ে মধ্য এশিয়ার মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল। এক সময়ে মুসলমানগণ ধূমকেতুর মতো পৃথিবীর উপর প্রলয়পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে কোণে ক্ষুধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে সেই কোণ হইতে জগদ্‌বিনাশী ঝড় উঠিবেই।

প্রাচীনকালে এই ধ্বংসধ্বজা তুলিয়া গ্রীক-রোমক-পারসীকগণ অনেক রক্ত সেচন করিয়াছে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থ বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্বপ্রযত্নে নানা আকারে নানা দিক হইতে আপনার ক্ষমতাকে ও স্বার্থকেই বলীয়ান করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাস্পৃহা কোনোকালেই নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না—এবং অধিকারলঙ্ঘনের পরিণামফল নিঃসংশয় বিপ্লব।

ইহা ধর্মের নিয়ম, ইহা ধ্রুব। সমস্ত য়ুরোপ আজ অস্ত্রে-শস্ত্রে দন্তুর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়বুদ্ধি তাহার ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতেছে।

আমাদের দেশে বিলাতি সভ্যতার এমন-সকল পরম ভক্ত আছেন যাঁহারা ধর্মকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতি সভ্যতাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বিকার যাহা-কিছু দেখিতেছ এ-সমস্ত কিছুই নহে—দুই দিনেই কাটিয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিনটা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে ধকধক শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সেইজন্যই পূর্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পাখি যেমন আপন নীড়ের দিকে ছোটে, তেমনি বায়ুকোণের রক্তমেঘ দেখিয়া পূর্বদেশ হঠাৎ আপনার নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিয়াছে; বজ্রগর্জনকে সে সার্বভৌমিক প্রেমের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি বলিয়া কল্পনা করিতেছে না। য়ুরোপ ধরণীর চারি দিকেই আপনার হাত বাড়াইতেছে; তাহাকে প্রেমালিঙ্গনের বাহুবিস্তার মনে করিয়া প্রাচ্যখণ্ড পুলকিত হইয়া উঠিতেছে না।

এই অবস্থায় আমরা বিলাতি সভ্যতার যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। আমরা যদি সংবাদ পাই যে, বিলাতি সভ্যতার মূলকাণ্ড যে পলিটিক্‌স সেই পলিটিক্‌স হইতে স্বার্থপরতা নির্দয়তা ও অসত্য, ধনাভিমান ও ক্ষমতাভিমান প্রত্যহ জগৎ জুড়িয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে, এবং যদি ইহা বুঝিতে পারি যে স্বার্থকে সভ্যতার মূলশক্তি করিলে এরূপ দারুণ পরিণাম একান্তই অবশ্যম্ভাবী, তবে সে কথা সর্বতোভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে—পরকে অপবাদ দিয়া সান্ত্বনা পাইবার জন্য নহে, নিজেকে সময় থাকিতে সংযত করিবার জন্য।

আমরা আজকাল পলিটিক্‌স অর্থাৎ রাষ্ট্রগত একান্ত স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটি মাত্র মুকুটমণি ও বিরোধপরতাকেই উন্নতিলাভের একটি মাত্র পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, আমরা পলিটিক্‌সের মিথ্যা ও দোকানদারির মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি, আমরা টাকাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো এবং ক্ষমতালাভকে মঙ্গলব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া

জানিয়াছি—তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোকহিতকর কর্ম ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। ইংরেজ গোয়ালা বাঁটে হাত না দিলে আমাদের কামধেনু আর এক-ফোঁটা দুধ দেয় না—নিজের বাছুরকেও নহে। এমনি দারুণ মোহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই মোহজাল ছিন্ন করিবার জন্য যে-সকল তীক্ষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিতে হইতেছে, আশা করি, তাহা বিদ্বেষবুদ্ধির অস্ত্রশালা হইতে গৃহীত হইতেছে না; আশা করি, তাহা স্বদেশের মঙ্গল-ইচ্ছা হইতে প্রেরিত। আমরা গালি খাইয়া যদি জবাব দিতে উদ্যত হইয়া থাকি সে জবাব বিদেশী গালিদাতার উদ্দেশে নহে—সে কেবল আমাদের নিজের কাছে নিজের সম্মান রাখিবার জন্য, আমাদের নিজের প্রতি ভগ্নপ্রবণ বিশ্বাসকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য, শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাঁহাদের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইবার মহাবিপদ হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবার জন্য। ইংরেজ যে পথে যাইতে চায় যাক, যত দ্রুতবেগে রথ চালাইতে চাহে চালাক, তাহাদের চঞ্চল চাবুকটা যেন আমাদের পৃষ্ঠে না পড়ে এবং তাহাদের চাকার তলায় আমরা যেন অন্তিম গতি লাভ না করি, এই হইলেই হইল। ভিখ আমরা চাহি না। উত্তরোত্তর দুর্লভতর আঙুরের গুচ্ছ অক্ষমের অদৃষ্টে প্রতিদিন টকিয়া উঠিতেছে বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, আমাদের আর ভিক্ষায় কাজ নাই—এবং এ কথা বলাও বাহুল্য, কুত্তাতেও আমাদের প্রয়োজন দেখি না। শিক্ষাই বল, চাকরিই বল, যাহা পরের কাছে মাগিয়া-পাতিয়া লইতে হয়, পাছে কবে আবার কাড়িয়া লয় এই ভয়ে যাহাকে পাঁজরের কাছে সবলে চাপিয়া বক্ষ ব্যথিত করিয়া তুলি, তাহা খোয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই। কারণ, মানুষের প্রাণ বড়ো কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা সে নিজেই বোঝে না। নিজের সেই অন্তরতর শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্য বিধাতা যদি ভারতকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে বর হইবে। এমন জিনিস আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের স্বায়ত্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না—সেই জিনিসটি হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সেও ভালো। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আমাদের খুব বেশি ব্যঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব নিজে যেন আহরণ করিতে পারি; খুব বেশি সাজসজ্জা না হইলেও চলে, মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়; এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জনের দ্বারায় পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাতেই দিব। এই যদি সম্ভব হয় তো হউক—না যদি হয়, পরে চাকরি না দিলেই যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাজে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারও উপর কোনো দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব—হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়।

কার্তিক ১৩০৯

মন্দির

উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে। সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরও যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্-রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের হৃদয় এখানে কী কথা গাঁথিয়াছে? ভক্তি কী রহস্য প্রকাশ করিয়াছে? মানুষ অনন্তের মধ্য হইতে আপন অন্তঃকরণে এমন কী বাণী পাইয়াছিল যাহার প্রকাশের প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

এই-যে শতাধিক দেবালয়—যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জ্বলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুণ্ঠিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাত যুগের ভাষাভারে আক্রান্ত। যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নবজীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্র বৎসর পরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা কোনো-একটি প্রাচীন নবযুগের মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ়নিহিত নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিল তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপুলতা, তাহার অপূর্বতা প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—সুতরাং মন যে কী বুঝিল, কী শুনিল, কী পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সময় পায় না—অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম মন্দিরভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়, দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে তাও বলিতে পারি না। মানুষের ছোটোবড়ো ভালোমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমনভাবে চলিতেছে তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম সেখানে দেয়ালে ইংরেজ-সমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগকার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইস্ট খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পলকা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বুঝি বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ, গির্জা সংসারকে সর্বতোভাবে মুছিয়া ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে; তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয়তো

লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরেজি শিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোনো আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে— তাও যে ধুলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে তাও নয়। গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম— সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলংকৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা সেই বহুদূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই— দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনোকালে নূতন নহে, কোনোকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান— অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল— সে কথা যথার্থ, মানুষ দীন নহে, হীন নহে; কারণ, মানুষের যে শক্তি— যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম, ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল; মানুষের ক্ষুদ্র কাজে-কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটোবড়োয় ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল, প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
—যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর-একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে— যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলই আবর্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে পড়িতেছে, পাপপুণ্য আলোকে ছায়ায়

সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে—সমস্ত বিচিত্র, সমস্ত চঞ্চল—ইহারই অন্তরে নিরলংকার নিভৃত, সেখানে যিনি এক তিনিই বর্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন—এই পরিবর্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গ-মর্ত্য, বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য—ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।

উপনিষদ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে! জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই। অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখির মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোটো পাখি যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্য পরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্যের যে নিশ্চিত সাহস তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটি পাখি, ডানায় ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে—ইহারা সখা, ইহারা এক বৃক্ষেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর-একজন সাক্ষী; একজন চঞ্চল, আর-একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে—তাহা দেবালয় হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই; তাহা দুই পাখিকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরের আরও যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকীরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে-আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমির মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ স্তব্ধভাবে নিয়ত আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছবৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া, আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে স্তব্ধরূপে সাক্ষীরূপে ভগবানকে প্রকাশ করিতেছে—নির্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটোবড়ো সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে—পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে। এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এক কালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা-দ্বারা একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পৌষ ১৩১০

ধম্মপদং

ধম্মপদং। অর্থাৎ, ধম্মপদ নামক পালি গ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ
শ্রীচারুচন্দ্র বসু-কর্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে, ‘ধম্মপদং’ তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদ-গ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে-সকল উপদেশ আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন; অন্তত এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই-সকল নীতিকাব্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাংলা অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন।

এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই-সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার করিয়া, সুসংবদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন— যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদং গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কী ধম্মপদে, কী গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি— সেইজন্য ধম্মপদং গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি।

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস এক ভাবের হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্বে অন্যত্র কোথাও বলিয়াছি। এইজন্য, যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মেলে না তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন কোনোদিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এ দেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের

যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কী লইয়া? পূর্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম কী তাহা লইয়া তর্কের সীমা নাই, এবং ভারতবর্ষে ধর্মের বাহ্য রূপ যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।

য়ুরোপীয় নেশনগণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য।

য়ুরোপে ধর্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীণভাবে কাজ করিয়াছে। ধর্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে।

আমাদের দেশে মোগল-শাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।

পলিটিক্‌স এবং নেশন কথাটা যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিক্‌স এবং নেশন কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এইজন্য ধর্মকে ইংরেজি রিলিজন রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময় ভুল করিয়া বসি। এইজন্য ধর্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য এ কথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে।

মানুষ মুখ্যভাবে কোন্‌ ফলের প্রতি লক্ষ করিয়া কর্ম করে তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। লাভ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়, কল্যাণ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আছে, সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়— যে ব্যক্তি লাভকেই মানে তাহার পক্ষে ঐ-সকল বাধার অস্তিত্ব নাই।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব? অন্তত ভারতবর্ষ লাভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে কী বুঝিয়া মানিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা তাহার ভালোমন্দ কর্ম কিছুই নাই। আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালোমন্দ সকল কর্মের উদ্ভব। অতএব গোড়ায় এই আত্ম-অনাত্মের সত্য-সম্বন্ধনির্ণয় আবশ্যক। এই সম্বন্ধ-নির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে আশ্চর্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাত্মের মধ্যে কোনো সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্তু যদি এক ছাড়া দুই না থাকে তবে তো ভালোমন্দের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু এত

সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে দুই করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্মের ভালোমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর-এক সম্প্রদায় বলেন, এই-যে সংসার আবর্তিত হইতেছে আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও দুঃখ পাইতেছি, এক কর্মের দ্বারা আর-এক কর্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিয়াছি—এই কর্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র শ্রেয়।

কিন্তু তবে তো সকল কর্ম বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয় যাহাতে কর্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ কর্ম শুভ, কোন্ কর্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম, তাঁহার আনন্দ, অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই সার্থকতার উপায়ও পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে খর্ব করিতে না পারিলে ভগবানের ইচ্ছাকে অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ করিয়াই কর্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাঁহারা অদ্বৈতানন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উদ্যত, যাঁহারা কর্মের অনন্ত শৃঙ্খল হইতে মুক্তিপ্রার্থী তাঁহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান, ভগবানের প্রেমে যাঁহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করেন তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হউক, সে তত্ত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যতদূর পর্যন্তই যাওয়া যাক, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই তত্ত্বকে কর্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড়ো কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসংগত-বোধে কোনোদিন ভীরুতা-বশত কথার কথা করিয়া রাখে নাই। এজন্য এক সময়ে যে ভারতবর্ষ মাংসাশী ছিল সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যে য়ুরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্তনের মূলে সুবিধাকেই লক্ষ্য করেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তিসহকারে ভারতবর্ষে আর্থিক কারণে গোমাংসভক্ষণ রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান-সত্ত্বেও অন্য-সকল মাংসাহারও, এমন-কি মৎস্যভোজনও ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতেই লোপ পাইয়াছে। কোনো প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিয়া পালিত হইতেছে যে, তাহা সুবিধার তরফ হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছিয়াছে ভারতবর্ষ কর্মকেও ততদূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্মের ভেদসাধন করে নাই। এইজন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্মমাত্রেরই চরম লক্ষ্য কর্ম হইতে মুক্তি—এবং মুক্তির উদ্দেশে কর্ম করাই ধর্ম।

পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাক, কর্মে আমাদের ঐক্য আছে; অদ্বৈতানুভূতির মধ্যেই মুক্তি বল, আর বিগতসংস্কার নির্বাণের মধ্যেই মুক্তি বল, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বল—প্রকৃতিভেদে যে মুক্তির আদর্শই যাহাকে আকর্ষণ

করুক-না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায় ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে। এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

য়ুরোপ কর্মকে কর্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপে কর্মসংগ্রামের অন্ত নাই—সেখানে কর্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে, কৃতকার্য হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। য়ুরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইতিহাস।

য়ুরোপ কর্মকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে। আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব; সেই স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অন্যের কর্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে কেবল সেইখানেই আইনের প্রয়োজন। এই আইনের শাসন ব্যতিরেকে সমাজের প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য য়ুরোপীয় সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি সেখানে কর্মই বস্তুত কর্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর-এক বাসনাকে, এক কর্ম হইতে আর-এক কর্মকে বহন করিয়া চলি, হাঁপ ছাড়িবার সময় পাই না—তাহার পরে সেই কর্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই-যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাতেই য়ুরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব খর্ব করিয়াছি। বাসনা যে কোনো দিনই শান্তিতে লইয়া যায় না, পরিণামহীন কর্মচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাত্ম্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। য়ুরোপ বলে, বাসনা যে কোনো পরিণামে লইয়া যায় না, তাহা নিরতই যে আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব। য়ুরোপ বলে, প্রাপ্তি নহে—সন্ধানই আনন্দ। ভারতবর্ষ বলে তোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল তাহাতে আনন্দ নাই বটে; কারণ সে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই, সে প্রাপ্তি আমাদিগকে অন্য প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া ভ্রম করি এবং তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শান্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই ভ্রমে তাহা হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করে, আমাদিগকে কোনো মতেই মুক্তি দেয় না। যে বাসনা সেই মুক্তির বিরোধী সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কর্মকে জয়ী করিব না কর্মের উপরে জয়ী হইব।

আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়ম-সংযম, আমাদের বৈরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত, সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে, 'আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি বুদ্ধিপূর্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য।'

সংস্কৃত ভাষায় 'ভব' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'হওয়া'। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। য়ুরোপ খুব করিয়া হইতে চায়, আমরা একেবারেই না-হইতে চাই।

এমনতরো ভয়ংকর স্বাধীনতার চেষ্টা ভালো কি মন্দ তাহার মীমাংসা করা বড়ো কঠিন। এরূপ অনাসক্তি যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, আসক্ত লোকের সংঘাতে তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে, এমন-কি, তাহাদের মারা যাইবার কথা। অপর পক্ষে বলিবার কথা এই যে, মরা-বাঁচাই সার্থকতার চরম পরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীনতার বিশেষ একটি আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় প্রায় তাহার আত্মহত্যার জো হইয়াছিল—যদিই সে মরিত

তবু কি তাহার গৌরব কম হইত? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটা লোক প্রাণ দিল, আর-একজন তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল— তাই বলিয়া কি উদ্ধারচেষ্টাকে মৃত্যুপরিণামের দ্বারা বিচার করিয়া ধিক্‌কার দিতে হইবে? পৃথিবীতে আজ সকল দেশেই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্মের দৌরাত্ম্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে; আজ ভারতবর্ষ যদি— জড়ভাবে নহে, মূঢ়ভাবে নহে— জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধমুক্তির আদর্শকে শান্তির জয়পতাকাকে এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত তবে, অন্য সকলে তাহাকে যতই ধিক্‌কার দিক, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার স্থান নহে। মোট কথা এই, য়ুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না, এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়— রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গবর্মেন্টের দ্বারে ভিক্ষাকার্যের মধ্যেই আবদ্ধ— আর কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই। সমস্ত দেশে পাঁচ জন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধম্মপদং গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আশা করি, তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইবেন না। একে একে বৌদ্ধশাস্ত্রসকলের অনুবাদ বাহির করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কলঙ্কমোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভালো হয়— যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে তবে অন্যায় হয়, কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে— এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে-সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলে আছে—

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।

চারুবাবু ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন— 'মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই কর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।' যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন 'ধর্মসমূহ মনঃপূর্বঙ্গম, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়' তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা করিতেন। 'মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলিলে ভালো অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥

ইহার অনুবাদে আছে—

'আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।'

'এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না', বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অনুবাদ নহে; বোধ হয় 'যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না' বলিলে মূলের অনুগত হইত। অর্থসংগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না; যথা, 'আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে, তাহাদের বৈর শান্ত হয়।'

এই গ্রন্থে মূলের অন্বয়, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অনুবাদ থাকাতে ইহা পাঠকদের ও ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলে পালিভাষা অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক, সম্প্রতি ত্রিবেণী কাপিলাশ্রম হইতে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী কর্তৃক ধম্মপদং সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থখানিও এই ধর্মশাস্ত্র-প্রচারের সাহায্য করিবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

বিজয়া-সম্মিলন

বাংলাদেশে কতকাল হইতে কত বিজয়া দশমীর পরে ঘরে ঘরে প্রীতিসম্মিলনের সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেছে, কিন্তু অদ্য এখানে এই-যে মিলনসভা আহূত হইয়াছে, আশা করি, আমাদের দেশের ইতিহাসে এই সভা চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আশা করি, আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়া-সম্মিলন যে-একটি নূতন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, সেই জীবনধারা কোনো দুর্দিনে কোনো সুদূরকালেও যেন শীর্ণ না হয়; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মিলন-উৎস বিধাতার সংকেতমাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমাদের পাপে কোনো অভিশাপ কোনো দিন তাহাকে যেন শুষ্ক না করে।

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম; এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে-উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়; সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণমণ্ডিত এই-যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালি জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন— এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে। সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুলধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পুণ্য হইয়াছে, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংগত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়।

আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধবসম্মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।

যাহা আমাদের চিরপরিচিত তাহাকে আমরা যথার্থভাবে চিনি না, এমন ঘটনা আমাদের নিজের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে একান্তই জানি বলিয়া মনে করি— হঠাৎ একদিন ঈশ্বর আমাদের চোখের পর্দা সরাইয়া দেন— অমনি দেখি যে তাহাকে এতদিন বুঝি নাই, দেখি যে আজ তাহার সমস্ত তাৎপর্য একেবারে নূতন করিয়া উদ্দীপ্ত হইল। সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম— এতদিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই, যাহাকে সিংহাসনের উপরে বসাইবার তাহাকে আমাদের ঘরের দাওয়ার উপরে বসাইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি, যে মিলন আমাদিগকে বর দান করিবে, জয় দান করিবে, অভয় দান করিবে, সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্যরস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে— তাহা কেবল তৃপ্তি নহে, তাহা শক্তি দান করে।

বন্ধুগণ, আজ আমাদের চোখের পর্দা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেছে সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্তা বাংলায় কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি : জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায়, কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম— বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেইজন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল— আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেইজন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে, আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না— আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে— সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল। বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি, আমরা ধন্য হইলাম।

বন্ধুগণ, এতদিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র, একটা ভাবমাত্র ছিল— আশা করি, আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যাহাকে আমরা সত্যরূপে না লাভ করি তাহার সহিত আমরা যথার্থ ব্যবহার স্থাপন করিতে পারি না, তাহার জন্য ত্যাগ করিতে পারি না, তাহার জন্য দুঃখ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে যতই কথা শুনি, যতই কথা কই, সমস্তই কেবল কুহেলিকা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই-যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে— যাহা আমাদের পিতা-পিতামহগণকে বহুযুগ হইতে লালন করিয়া আসিয়াছে, যাহা আমাদের অনাগত সন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্তি অমৃতবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া

চলিয়াছে, আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই সর্বতোভাবে ভালোবাসিতে পারি— কেবলমাত্র ভাবরসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিয়া না দিই। আমরা যেন ভালোবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালোবাসি, তাহাকেই আমরা সকল দিক দিয়া এমনি করিয়া সাজাই, সকল দিক হইতে এমনি করিয়া সেবা করি, এবং সেই আমাদের সেবার সামগ্রী প্রাণের ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই না।

আমি যে একা আমি নহি, আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময় চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি, এই একান্ত সত্য যতদিন আমরা না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইয়াছি— ততদিন কেবলই আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেরানি সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার বিসর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কী? তাহার কারণ, তাহারা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালির সহিত এক বলিয়া অনুভব করিয়াছে। যতদিন তাহারা নিজেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিত ততদিন তাহারা ভুল জানিত। ইহাই মায়া। এই মায়াই তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে, অপমানিত করিয়াছে। মানুষ যে মৃত্যুকে ভয় করে সেও এই ভ্রমবশতই করে। সে মনে করে, আমি বুঝি স্বতন্ত্র, সুতরাং মৃত্যুতেই আমার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সহিত মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিলেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়, কারণ তখন আমি জানি সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই জাপানের শত সহস্র বীর দেশের জন্য অনায়াসে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। আমরা যে নিজের প্রাণটাকে টাকার থলিটাকে একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া বসিয়া থাকি, নিজেকে একা বলিয়া জানাই ইহার একমাত্র কারণ। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই 'আমি' বলিয়া জানিতে পারি তবে আমার ভয়কে, আমার লোভকে, দেশের মধ্যে মুক্তিদান করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারি, অসাধ্য সাধন করিতে পারি। তখন যে নিতান্ত ক্ষুদ্র সেও বৃহৎ হয়, যে নিতান্ত দুর্বল সেও সবল হইয়া উঠে। আজ কতকাল পরে আমরা বাংলাদেশে এই সত্যের আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য যাহার কাছে যাহা প্রত্যাশা করি নাই তাহাও লাভ করিলাম। সেইজন্য আমরা আপনাতে আপনি বিস্মিত হইয়াছি। সেইজন্য আজ আমাদের বাঙালির চিত্তসম্মিলনের ক্ষেত্র হইতে যাঁহারা পৃথক হইয়া আছেন তাঁহাদের ব্যবহার আমাদিগকে এমন কঠোর আঘাত করিতেছে— যাঁহারা ভয় পাইতেছেন, দ্বিধা করিতেছেন, সকল দিক বাঁচাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের অবজ্ঞা এমন দুর্নিবার বেগে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাসে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারা বিলাস-উপকরণের জন্য লজ্জিত হইতেছেন, যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিয়া জানিতাম তাঁহারা কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, যাঁহারা বিদেশী আড়ম্বরের অগ্নিশিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই সাংঘাতিক প্রলয়দীপ্তি আর প্রলুব্ধ করিতেছে না। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ, আমরা সত্য বস্তুর আভাস পাইয়াছি, সেই সত্যের আবির্ভাবমাত্রেই আমরা বৃহৎ হইয়াছি, বলিষ্ঠ হইয়াছি।

এখন ঈশ্বরের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা করি, এই সত্য যেন ক্রমশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, এই সত্যকে যেন আবার একদিন আমাদের শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলিত হইতে না দিই, অদ্যকার সংঘাতজনিত উত্তেজনা যখন একদিন শান্ত হইয়া আসিবে তখনো যেন জীবনের প্রতিদিন এই সত্যকে আমরা অপ্রমত্তচিত্তে সকল কর্মে ধারণ ও পোষণ করিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে, আজ

স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না; কোনো আইন পাস হউক বা না-হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না-করুক, আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তানসন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্রবহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টকসংকুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না— দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়ো না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালোমন্দ লাভক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্‌যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয় তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে বিজ্ঞভাবে বিবেচকভাবে বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই— তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে— সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক— একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান॥

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান॥

কার্তিক ১৩১২

রাজা প্রজা

প্রকাশ : ১৯০৮

রাজা প্রজা (১৯০৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত, সে কারণে বর্তমান খণ্ডে 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইংরাজ ও ভারতবাসী

> There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself.
>
> —Matthew Arnold

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা-কোনো ছিদ্র থাকে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশি। ইংরাজরাও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল, এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ 'জন্'-পুংগব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরাজ সর্বত্রই খাড়া ইংরাজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার জো নাই।

এই-যে মনোহারিত্বের অভাব, এই-যে অনুচর-আশ্রিত-বর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই-যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরাজ সে ছিদ্র যত্নপূর্বক রোধ করে, যেখানে যত পথঘাট আছে সর্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশংকার অংকুরটি পর্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে-একটি নৈতিক বিঘ্ন আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দম করিয়া তুলিতেছে—কখনো কখনো অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশত কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন একজন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে, পাছে পাখিতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়! পাখি পলাইতেছে বটে, কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো খেয়াল নাই।

আমাদের কোনো শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশংকা নাই, কেবল বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওয়ালার যে কোনো লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজ সর্বত্রই ইংরাজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লন্ডের সহিত ইংরাজের যে-সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে-সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে, ইংরাজের সহিত ইংরাজি-শিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইঁটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।

আমরা যে সকল জায়গায় সুবিচারপূর্বক পাটকেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে-পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ন্যায় কোনোটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন। শাসনকর্তা খবরের কাগজের কোনো-একটা প্রবন্ধবিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্যন্ত জেলে দিতে পারে, কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে-সমস্ত ছোটো ছোটো কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কী প্রতিকার করা হইল।

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা-যোগে ইংরাজরাজের আর সর্বত্রই গতিবিধি আছে, কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয়তো সে জায়গাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরাজের মেরুদণ্ড কোনোখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরাজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই-যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে, ইহার সহিত 'পীপ্‌ল্'এর কোনো যোগ নাই; এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওয়ালার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভালো; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে যে চতুর লোকে রঙ করিয়া দিয়াছে। তবে তো আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে-চতুর লোকটাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ঐটেই ইংরাজের দোষ— সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনোক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না— যে পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ তো জড়যন্ত্র নহে যে তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন-কি, পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয়, তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ-চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ্ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ-পূর্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীরমনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহারা দয়া করে না, উপকার করে; স্নেহ করে না, রক্ষা করে; শ্রদ্ধা করে না, অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে। এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না।

আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরাজ-কৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে

কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোনোক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে-পত্রে কথায়-বার্তায় ইংরাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরাজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না; অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুংকার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনঃক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয়তো যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্র ভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপর পক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠান মাত্রেই আপস ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড়ো বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই, গবর্মেন্ট ইচ্ছা করিলেই একটা-কিছু করিতে পারে না; সে আপনার বৃহত্ত্বে অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলা কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনোটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না; যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মতো কোনো-একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেন্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃতপক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপ সংকটে পড়িতে হয় ইল্‌বার্ট বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল করিয়া লাইন পাতিতে হইবে। ধৈর্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায়, তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলন্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই, এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার যুক্তি দ্বারা প্রস্তাববিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবা মাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্বাংশে দুর্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেন্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না, শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি, তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সে স্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভালো। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা, সরটা, মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভালো।

ডিপ্লম্যাসি-অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম এই, নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি-দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই, কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা দুয়ো দিবার, বাহবা লইবার এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুশি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভর্ৎসনার পর সংগত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেন্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন-একটা অসদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কর্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভালো হইতেছে না। গবর্মেন্টও বাহ্যত যেমনই হউক, মনে মনে যে এ সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কী। ব্রিটিশ চরিত্র, হাজার হউক, মনুষ্যচরিত্র তো বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব-প্রথম সংকট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণসম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড়ো কঠিন। শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরেজি তর্জমা এবং এন্‌সাইক্লোপীডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক-সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না। কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেত-কৃষ্ণে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর; আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা-প্রকৃতিতে হয়তো রাত্রির মতো একটা গভীরতা, মাধুর্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ কথা বলিয়াও কোনো ফল নাই যে, কালো গোরুতেও সাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যেও হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ-সকল ওরিয়েন্টাল উপমা-তুলনায়। কথাটা এই যে, কালো রঙ দেখিবা মাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ-অভ্যাস-আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন-সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলই প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে, তাহাকে যে জিনবনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায়, সে-সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে, সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংস্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু ঐ সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন স্টিমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরেজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলন্ডে পালাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধুলা ধৌত করিয়া আসেন, এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এইজন্য যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে জাতিকে শাসন করিতেছেন সে জাতিকে ভালো না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ

বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া, সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক তো, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরেজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরও একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলোইন্ডিয়ান-সমাজ এ দেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। যদিও-বা কোনো ইংরাজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তা গুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবা মাত্র ইংরাজসমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতিসমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলঙ্ঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজদুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলোইন্ডীয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়া-জনক। সেজন্য তাঁহাদের কী দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্টদোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরাজরা যেভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলা-কহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে-সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে-সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা নবাগত ইংরাজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল, এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না, এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতি ইংরাজ আসিয়া দেখে যে আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের 'পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি, কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা-ভ্রাতা-স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট, কর্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালি কর্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্‌কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কী অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়, সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে—কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায়-বাঁধানো বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি এক মুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে। আমরা কি ইংরাজের মতো স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন। আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী, অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়। ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

কিন্তু সে কথা ইংরাজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে—ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু-শব্দটা মনে উদয় হইবা মাত্র তৎসংবলিত দৃঢ়বদ্ধমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরাজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ছোটো-হাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণবৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের, বিশেষত শিক্ষিত 'বাবু'দের প্রতি ইংরাজের অরুচি উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরিবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কী প্রতিশোধ লইতে পারি। আমরা ইংরাজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম। আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরাজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দন করিবার ছোটো বড়ো কতপ্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরাজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরাজি কাগজ ভারতশাসনকার্য দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। আর, আমরা ইংরাজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ-পর্যন্ত ভারত-অধিকার-কার্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরাজের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। দেড় শত বৎসর পূর্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয়, তখন এখনকার তো আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের নখদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরাজ 'সিডিশন'-দমনের জন্য সর্বদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোনো অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ, উহা অতিসাবধানতা মাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজকার্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। বরং উদাসীনভাবেও কর্তব্য-পালন করা যায়, কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্যক্ষমতার অতীত।

তথাপি অমানুষিক ক্ষমতাবলে সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করিলেও, সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম আপনার সম-ঐক্য অন্বেষণ করা। এমন-কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যতপ্রকার সুবিধা থাক্, সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য, আমাদের কলাবিদ্যা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায়-প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত, কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরাজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি, ইহারা ময়দানবের বংশ। ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিন্তমনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি, ইংরাজের মুল্লুকে

আমাদের আর কিছু ভয় করিবার, চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিস এবং উকিলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের এক ভাগ যেরূপ নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে, এমন-কি মনের গভীরতর মূলে, ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়। ইংরাজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র, কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে জোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র, কিন্তু পাইতেছি না। ইংরাজের সকল কার্যের ফলভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম এবং অর্থ আছে; আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোনো মাহাত্ম্য এবং কোনো সুবিধা নাই। বর্তমান কালের ভারত-রাজনীতির সেই কি সর্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে।

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে তো দেখানো গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্তমান। কোনো কোনো সহৃদয় ইংরাজও সেজন্য অনেকসময় চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব, যাহা অসাধ্য, তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কী।

কিন্তু বৃহৎ কার্য, মহৎ অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে। এই ভারতজয়-ভারতশাসনকার্যে ইংরাজের যে-সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সেগুলি কি সুলভ গুণ। সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন। আর, পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তাগুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে।

ইংরাজ কবিগণ গ্রীস ইটালি হাঙ্গেরি পোলান্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন। আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ-পর্যন্ত মহাত্মা এডুয়িন আর্নল্‌ড্‌ ব্যতীত আর কোনো ইংরাজ কবি কোনো প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন না। বরঞ্চ শুনিয়াছি, নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোনো কোনো বড়ো কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরাজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই, আধুনিক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্‌লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরাজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরাজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এড্‌মন্ড গস্‌ বলিতেছেন :

> এই-সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকা-সমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো বোধ হয়। চারি দিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড। সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান, এবং সবুজবর্ণ টিয়াপাখি, চিল এবং কুম্ভীর, এবং লম্বা ঘাসের নির্জন ক্ষেত্র। এই মরুসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারানীর কার্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্বদেশীয় ধনসম্পদ্‌পূর্ণ বর্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলন্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

ইংরাজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ তো এমন নয়। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষ কি এত তফাত।

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলন্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ কী পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ

তাহা কী পরিমাণে পূরণ করিতেছে, এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলন্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল বিচালি জোগাইতে কোনো আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিংদুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই, এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকে একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই-সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজি উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ। তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র। কত বারংবার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনো মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই— অর্থাৎ সে স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর, হতভাগ্য ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোনো আভাসমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অংকপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলন্ডের প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সের-দরে টাকার দরে সিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রের লেখকগণ ইংলন্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন। ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি। যেমন রৌদ্র তেমনি ধুলা। কেবলই পাখার বাতাস এবং বরফ-জল না খাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্‌ণ প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, এবং বরফ সর্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরাজকে কী দিতে পারে।

হায় হতভাগিনী ইন্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না, তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়। তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো, খসখসের পর্দা টাঙাইয়া জল সেচন করো, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোলো, তোমার সিন্দুকটা খোলো, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় করো, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ির নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝংকার-সহকারে দু-কথা পাঁচ-কথা শুনাইয়া দিতেছ। কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে, আরামে থাকে, একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক।

ইংরাজ রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন-নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে

যে প্রেম ও শান্তি-স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তীগণ সে চেষ্টা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্যাস্তের দিক হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে; এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক প্রার্থনা করি। আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে; বল পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোনো ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু এখনো এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম-পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে-একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়-মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান পার্সি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রিসভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করে না— কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু একজন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরও কঠিন এইজন্য যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা-প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল, উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা-কহা করি। আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ— ইংরাজরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষ্যা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে; কিন্তু আকবর যে-একটি প্রেমের অদর্শে খণ্ড-ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা, শাসনের দ্বারা এক করা যায় না; অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালোবাসিতে হয়— আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস মোতাইন করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তিস্থাপন করায় দুর্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আকবরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না, এবং সূর্যাস্তভূমির কবিগণ অলীক অহংকার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত, সুগভীর আক্ষেপের সহিত, স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিতবর্গেরও উপকার হয়। ইংরাজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব জাত্যহংকার কি যথেষ্ট নাই। কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন। এখনো কি নম্রতাশিক্ষা ও প্রেমচর্চার সময় হয় নাই। সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনো কি ইংরেজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মতো অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ-সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেইজন্য

বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মতো দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ সম্বন্ধে দুই-এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে, কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লন্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন, নব্য বাঙালিদের অনেকগুলা ভালো লক্ষণ আছে; কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি, সিম্প্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যেভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরাজের কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন 'তৃষার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল' আমাদের রাজা তখন 'তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল'। আধখানা বেল সময়বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই একসঙ্গে দূর হয় না। ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেন্ট অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয়, কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন-কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশদেশান্তরের সকলপ্রকার ভোজ্য এবং সকলপ্রকার পানীয় অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্তী ঐ বিদেশী বাঙালিটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মতো ভাবখানা কেন।

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয়তো সুখী হইবেন, অতিদুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিম্প্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেক ক্ষণ ঊর্ধ্বে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি— তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ। তোমরা নাহয় কল চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ, কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিদ্যার ক-খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদিগকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অন্ধ মূঢ়তা-বশত। হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের য়ুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি করো, আপিস করো, দোকান করো, নাচো খেলো, মারো ধরো, হুটোপাটি করো এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে-শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা সে জানে যে এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন— তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্যের আলোক-উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি-দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে— বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরাজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে-একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তিতর্কবিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি-কাব্যপুরাণ-ইতিহাসদর্শনের প্রাচীন গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্‌কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালোমন্দবিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

এক প্রকারের কালি আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালিতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়, আবার শুভদৈবক্রমে নব-সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা তো সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি—যদি পূর্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ দেহ সভ্যতার জ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর-প্রাপ্ত হওয়াই সদ্‌গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বর্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এই :

ইংরাজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরাজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গি এমন-কি ভাষাটা পর্যন্ত ইংরাজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় এ কথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরাজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়, আমরা তোমাদেরই মতো, এবং যেখানে অন্যতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেন-তেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে-পর্যন্ত না পৃথিবীতে দর্জির দোকান বসিয়াছিল সে-পর্যন্ত তাঁহাদের বেশভূষা অশ্লীলতানিবারণী সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মতো দর্জির এস্‌টাব্লিশ্‌মেন্ট এখনো খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে না এবং তাহার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতা-বৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরাজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরাজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলই তাঁহাদিগকে

পর্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেটশাস্ত্রে একটু ত্রুটি হওয়া, ইংরাজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা— ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরাজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরও বেশি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরাজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায়-প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমত দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোনো ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দার-পোড়োটিকে বিলাতি বেশভূষা-আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্ভুত কুরুচি, এই হাস্যজনক অসংগতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মবেশী এশিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসংগতি-নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না।

এই তো গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় যাক, মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরাজের সহিত অনৈক্য তো আছেই, আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরাজের মতো হইয়া ইংরাজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে ভ্রাতারা ইংরাজের মতো সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সংকোচবোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার জো নাই। আমি যে নিজগুণে ঐ-সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রজাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থই এই— জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরাজের কাছে একরকম করিয়া বলা যে, সাহেব, ঐ বর্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর, আমি যখন কতকটা তোমাদের মতো চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড়ো আশা আছে যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিংবা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়।

কর্ণ যখন অশ্বত্থামাকে বলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কী যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বত্থামা বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ সেইজন্যেই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না! আচ্ছা, তবে আমার এই পইতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি শেক্‌হ্যান্ড্‌-পূর্বক বলে এবং এস্কোয়ার-যোজনা-পূর্বক লেখে যে, আচ্ছা, তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মতো তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন-কি, তুমি দেখা করিলে এক-আধবার তোমার ‘কল রিটার্ন’ করা যাইতেও পারে— তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না বলিব— ইহারই জন্য আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম; যতক্ষণে না আমার সমস্ত স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রঙ মাখিয়া এক্‌সেপ্‌শন সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি তো বলি, সেই আমাদের একমাত্র ব্রত। সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব; নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে-সভায় ইচ্ছা

প্রবেশ করিব— ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সহজ উপায়ে কোন্‌ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে! বড়ো কঠিন কাজ; সেইজন্য অন্য-সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ-সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক্ক হইয়া যায়। সে মনে করে, সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে; তাহার আর রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই— বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসারে উদ্‌যোগপর্বের পূর্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা বড়োই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক্ক অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড়ো কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি। কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই-বা কাজ চলে এবং কতটুকুই-বা ফল হয়।

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই। আমরা দলাদলি ঈর্ষ্যা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে, দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদ্‌যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক, কাজ আরম্ভ হইতে-না-হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন রিপোর্ট ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কী সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোনো আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে; বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে— তাহারা কী মনে করিবে।

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞাভরেই হউক বা যে কারণেই হউক, তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে

পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো— বিদেশে থাকিয়া জর্মান যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে, স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ তেমন করে নাই। ইংরাজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে, কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই।

অতএব ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরাজকে ইংরাজি-ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি। জানি যে, ইংরাজ পীপ্‌ল্‌-নামক একটা পদার্থকে জুজুর মতো দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জড়ো করিয়া পীপ্‌ল্‌ সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরাজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কী করিব ভাই, এমন না করিলে উহারা যদি কোনো কথায় কর্ণপাত না করে তবে কী করা যায়। উহারা কেবল নিজের দস্তুরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরাজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরাজের মতো ভান করিয়া, আড়ম্বর করিয়া, তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্বাপেক্ষা ভালো কথা এই যে আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধ-টুকরা অনুগ্রহ না দেন তো না-ই দিলেন।

কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড়ো ভয় আছে— আমরা মৃৎপাত্র; ঐ কাংস্যপাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক, আত্মীয়তাপূর্বক শেক্‌হ্যান্ড্‌ করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড়ো কঠিন। আমরা দুর্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁষি— সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে— তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড়ো বেশি; এত বেশি যে, সে অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরাজি মন্দ বল না, তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইয়া উঠে। যে বহিরাংশে ইংরাজের অনুগ্রহদৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্যসাধনে প্রবৃত্তি হয়; যে দিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সে দিকটা অন্ধকারে অনাদরে আবর্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে দিকের কোনোরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড়ো স্বাভাবিক— সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, আর ঐ যে রাঙা সাহেব টম্‌টম্‌ হাঁকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টম্‌টম্‌ থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়া বলে, বাবু, তোমার কাছে দেশালাই আছে, তখন ইচ্ছা করে— দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক-ভাইটি মাঠাকরুনকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিত দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, পাছে সেই বর্বরের সহিত আমার কোনো যোগ, কোনো সংস্রব, কোনো সুদূর ঐক্য বড়োসাহেবের কল্পনাপথে উদিত হয়।

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁষিব না তখন অহংকারের সহিত বলি না, বড়ো বিনয়ের সহিত, বড়ো আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্বেই আমার সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ হইবে— আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্বদাই

উড়ু-উড়ু করিতে থাকিবে এবং আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়োই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরাজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ বন্ধুত্বপ্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে; তবু আমরা নত হইয়া, প্রণত হইয়া, ছল করিয়া, কল করিয়া, একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজসমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। এমন স্থলে, এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য।

আরও একটা কারণ আছে। ইংরাজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিঃস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং জঠরানল কেবল সম্মানবর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে, সেইসঙ্গে কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেক্‌হ্যান্ড্‌ নহে, চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মতো আনাগোনা করি তো তৃতীয় দিনে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়োই হীন হইয়া পড়ে। এ দিকে অভিমান করি যে, ইংরাজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না; ও দিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরাজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেলপ্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরাজের সঙ্গে তো আমাদের দেখাশুনার কোনো সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ঐ যে লোকটা পাগড়ি-চাপকান পরিয়া শঙ্কিতগমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মতো অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থতমত খাইয়া কথা কহিতেছে, উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে।

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে, বিনা আদরে, সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়— তাহাতে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ইংরাজ এ দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে— তাহার অনেকটা কি আমাদেরই হীনতাবশত নহে। সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরাজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব, সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যসকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনো দেখিব, অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না— বরং, যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পূরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত, সম্মানের সহিত, রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে আশা করিব, সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা প্রভাবচিন্তা ইংরাজের প্রসাদ-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশ-খ্যাতি পরিহার করিয়া, ইংরাজ আকর্ষণের প্রবল মোহ

হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া নিবিষ্টমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্ধ্বে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরের কাছে মান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না এবং ‘ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ’ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করিবে। এ কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল যে দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়। যদি হ্যাট কোট পরিয়া ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজের দ্বারস্থ হইয়া ইংরাজিতে নিজেকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তর্জমা করিয়া কোনো সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে হ্যাট কোট ধরিবে, সন্তানদিগকে বহুচেষ্টায় বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবান মহলে বেশি আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।

শিখদিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে; পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্ট রূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে। তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক, সহসা চৈতন্য হইবে—এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই। তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না; তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে, আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারি দিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন, যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ দেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।

১৩০০

রাজনীতির দ্বিধা

সাধারণত ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড়ো বড়ো গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্তি পায়, অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায়, যাঁহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মতো মৃদুস্বভাব তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষী বিশেষ।

য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে, এ পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খৃস্টানদের নিকট খৃস্টান, অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়, তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখৃস্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখৃস্টান যদি দুর্বুদ্ধিবশত উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্তত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্প্‌খাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবুর্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খৃস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃস্টানের গালে খৃস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে; কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খৃস্টানের হাতে। ট্রুথ নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন, সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেইসঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে; এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসংকোচে বলিলাম— নিকৃষ্টতর নহে; নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে— অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গ্যুলা ইংরেজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরেজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে, ইংরেজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোনো ইংরেজ যে সে কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরেজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরেজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে, ধর্মনীতি আজকাল বড়ো বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁতখুঁত করিলে কাজ চলে না। ইংরেজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে। নর্মান দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরেজ বংশধর ভিন্নজাতির প্রতি জবরদস্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্বল, রুগ্‌ণ প্রকৃতি। কিসের ম্যাটাবিলি, কেই-বা লবেঙ্গ্যুলা! আমি ইংরেজ, আমি তোমার সোনার খনি, তোমার গোরুর

পাল- লুঠিতে ইচ্ছা করি— ইহার জন্য এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো-একটা দুরন্তপনা ধরা পড়িলেই বা এত উচ্চৈঃস্বরে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন।

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায়, বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত লুব্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোটো এবং দুর্বলতর বালকের হাতে মোয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া বসে, হৃতমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন-কি, হয়তো ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোয়া লয় না, ছল করিয়া লয়, এবং যদি ধরা পড়ে তো কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোনো দরিদ্রপল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখে, চারি দিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পান্থদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোকরাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু স্বীকার করে না যে, ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতন কালের চৌর্যবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণ ব্যাপারের মধ্যে পূর্বকালের সেই নির্লজ্জ অসংকোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের সম্বন্ধে নিজের চেতনা জন্মিয়াছে, সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্বের মতো তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে এরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্বদা ঘটিয়া থাকে। দস্যু বিস্তর জন্মে, কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না— অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এ দিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইস্ট্ খেলে, স্ত্রীসমাজে মধুরালাপ করে— কেহ সন্দেহমাত্র করে না যে, এই সাদা কামিজ কালো কোর্তার মধ্যে রবিনহুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির-আবরণ-মুক্ত সেই উৎকট রুদ্র মূর্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু য়ুরোপের সমাজমধ্যেই যে-সমস্ত ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার আছে তাহাদেরও উত্তাপ বড়ো অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিত্ব বাড়িতে পারে, কিন্তু বলের বলত্ব কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এ-সব কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্বল নবশতাব্দীর সুকুমারহৃদয় শিশু সেন্টিমেন্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। এখানে সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উলঙ্গ তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য।

এইজন্য আমাদের কর্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্বতা হয়— আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরেজ সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই, ইংলন্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে,

সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ত দিতে হয়। যখন দস্যু ব্লেক সমুদ্র দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইভ ভারতভূমিতে ব্রিটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, তখন নীতির কৈফিয়ত দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরেজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর, কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা থাকিলেও নিদেন গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া পড়ে, নয় ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনি সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনি সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরেজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।

আমরাও সেইজন্য ইংরেজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সেজন্য ইংরেজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গি যখন লুটপাট করিত, ঠগি যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত, তখন তোমাদের কন্‌গ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়। কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোনো ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মারহাট্টা এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারও মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কন্‌গ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরেজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্মের কাহিনী বলিলে যদি বা সে না মানে তবু তার একটা ধর্মসংগত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভালো জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব, যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্যবিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে তাহারা যথার্থপক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে, ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এ দিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নাই, ও দিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না, এ এক বিষম সংকট। জাতির পক্ষে নিজের জীবনরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে, নিজেদের ধর্মের আদর্শ ক্রমশ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্মকে সর্বপ্রযত্নে বলবান না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে, এবং সভ্যতার উন্নতি-সহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্, মোটা বেতনের ইংরেজ কর্মচারীকে এক্স্‌চেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পব্‌লিক ওআর্ক্‌স্‌ কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষফন্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

এক দিকে ইংরেজ কর্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপর দিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এ দিকে আবার পঞ্চবিংশতি কোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্মনীতি এমন সংকটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনীড় পক্ষীসমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরেজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সংগত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে, অথচ না করিয়াও এড়াইবার জো নাই, সেই সময়ে ধর্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোনো যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে, ধর্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক ধরিয়া যায়।

ভারত মন্ত্রীসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভ্য ভাবে গতিকে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমস্ত ইংরেজ রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায়-অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য, ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেমনি সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত মন্ত্রীসভায় ল্যাঙ্কাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন। কম্‌লি নেহি ছোড়তা— বিশেষত কম্‌লির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন পাস করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেও মান থাকে না, এ দিকে আবার কৈফিয়তও তেমন সুবিধামত নাই। নবাবের মতো বলিতে পারি না যে, আমার যে অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব। ও দিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবার অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন, অথচ এই সংকটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়—ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে।

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসায় এবং গবর্মেন্ট যদি-বা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সংকোচ বোধ করে, ছোটো ছোটো কর্তারা কোনো সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলা শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের মতো দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারস্বর প্রয়োগ করিতে থাকে। ভালো, যেন আমরাই চুপ করিলাম, কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করো, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো বা তাহার জয় হয়, কখনো বা তাহার পরাজয় হয়; কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লন্ড যখন ব্রিটানিয়ার নিকট কোনো অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন এক দিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্য দিকে ইংলন্ডের ধর্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরেজের ধর্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরেজের রাজকার্যে ল্যাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যতদিন ইংরেজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান

ইংরেজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে, আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

১৩০০

অপমানের প্রতিকার

একদা কোনো উচ্চপদস্থ বাঙালি গবর্মেন্ট কর্মচারীর বাড়িতে কোনো কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রথার কথা উঠিল। ইংরেজ প্রোফেসর কহিলেন, যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরেজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহুল্য জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাঁহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পুরুষবাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপকমহাশয় আর-একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে কথা কেবলমাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে, পরন্তু ইংরেজের মুখে অত্যন্ত অসংগত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরমদূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরেজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারির দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য-অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহারা যদি নিমন্ত্রণসভায় আরামে ও স্পর্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই ঘটনা আজ বছর-দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন, তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজ-কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরেজের আদালতে সেই-সকল হত্যাকাণ্ডে এক জন ইংরেজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই-সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরেজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবনহনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরেজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরেজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য করে।

ইংরেজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে। কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক— আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমাদের বলক্ষয় হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দিষ্ট সম্ভ্রম এবং

অকারণ ভয় শতসহস্র সৈন্যের কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে কোনোদিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্তে ইংরেজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সম্ভ্রম দৃঢ় হয়; মনে ধারণা হয়, আমার প্রাণে ইংরেজের প্রাণে অনেক তফাত। অসহ্য অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্থলেও ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত ইংরেজের মনে আছে কি না জোর করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা দুঃখিত হন। সেটাকে একটা 'গ্রেট মিস্টেক', এমন-কি, একটা 'গ্রেট শেম' মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা লঘু শাস্তি যদি আইনে নির্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয়-হত্যাপরাধে ইংরেজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে জাতি সম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরেজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসংগতি ও দ্বিধা থাকে, এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষত যখন স্বভাবতই ইংরেজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর 'প্রাণের পবিত্রতা' স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতমভগ্নাংশপরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব, একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরযন্ত্রগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ সহকারে এ-সমস্ত দুর্বলতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপর্যুপরি এই-সকল ঘটনায় দেশের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের সূক্ষ্মবিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজেরই প্রাণদণ্ড হয় না, এই তথ্যটি বারংবার এবং অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন লক্ষ করিয়া তাহাদের মনে ইংরেজের অপক্ষপাত ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সুতীব্র সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মূঢ়তার কেন দোষ দিই। গবর্মেন্ট অনুরূপ স্থলে কী করেন। যদি তাঁহারা দেখেন কোনো ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট অধিকাংশসংখ্যক আসামিকে খালাস দিতেছেন তখন তাঁহারা এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবত উক্ত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট অন্য ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পর, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় সূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় না করিয়া আসামিকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্মবুদ্ধি এবং সতর্ক ন্যায়পরতার জন্য সত্বর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য; অথবা যদি দেখিতে পান যে, কোনো পুলিস-কর্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামি বহুলসংখ্যায়

খালাস পাইতেছে তখন তাঁহারা এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবত এই পুলিস-কর্মচারী অন্য পুলিস-কর্মচারী অপেক্ষা সৎপ্রকৃতির—ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য স্বহস্তে সৃজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্রসকল সংশোধন করিয়া লন না, অতএব পুরস্কারস্বরূপে অচিরাৎ ইঁহার গ্রেড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা ন্যায় ও ধর্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিদিত নাই, গবর্মেন্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্মেন্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে, আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া একটা ইংরেজও উপযুক্ত দণ্ডার্হ হয় না এ কেমন কথা।

বারংবার আঘাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। তাই ‘ব্যাবু’-অভিহিত অস্মৎপক্ষীয়েরা এ-সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারতরাজ্য-পরিচালক বাষ্পযন্ত্রের ‘বয়লার’স্থিত তাপমান মাত্র—আমাদের নিজের কোনো শক্তি নাই, ছোটো বড়ো বিচিত্র লৌহচক্রচালনার কোনো ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চঞ্চল পারদবিন্দু হঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়। কিন্তু এঞ্জিনিয়ার-সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্তব্য নহে। তিনি একটি ঘুষি মারিলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষণভংগুর পদার্থটি ভাঙিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তি-নভূত হইয়া যাইতে পারে—কিন্তু বয়লার-গত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্র-চালনকার্যের একটা প্রধান অংগ। ইংরেজ অনেক সময় বিপরীত উগ্র মূর্তি ধারণ করিয়া বলে, প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ তোমরা কে। তোমরা তো আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরেজনবিশ।

প্রভু, আমরা কেহই নহি। কিন্তু তোমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অনুমান করিতেছি, তোমরা আমাদিগকে নিতান্তই সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর না, এবং সামান্য জ্ঞান করা কর্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্য হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে, এবং এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। এই শিক্ষিতসাধারণের অন্তরে কখন কিরূপ আঘাত-অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করা গবর্মেন্টের রাজনীতির একটা প্রধান অংগ হওয়া উচিত। লক্ষণে যতদূর প্রকাশ পায়, গবর্মেন্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাই। প্রথমত, একটা অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় ব্যগ্র হইয়া থাকে। যেজন্যই হউক, দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, এই-সকল ঘটনায় আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্মাহত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের বটে, কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল, সাক্ষ্য এতই পিচ্ছল, এবং দেশীয়-চরিত্র-জ্ঞান মমত্বহীন অবজ্ঞাকারী বিদেশীয়ের পক্ষে এতই দুর্লভ যে, অনিশ্চিতফল মকদ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মতো বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকারী উত্তেজনা আছে, আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকদ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা-জন্য আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী, তখন মধ্যে মধ্যে নির্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিষ্কৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারংবার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরেজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্‌কার শেলের ন্যায় স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি য়ুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই বিচারে মুক্তি পাইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার সহস্রবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া লাথি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্তৃপুরুষদের কোনোপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কী করিলে এ-সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই-যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই ধিক্‌কারের যোগ্য। কারণ, এ কথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না; সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।

উদাহরণস্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট-কর্তৃক মুহুরি মারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক, ডিস্ট্রিক্ট্-ম্যাজিস্ট্রেট বেল-সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উন্নতচেতা সহৃদয় ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি যে মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্ধর্ষ ইংরেজপ্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালি-ঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্বলিত তখন ক্রোধানল সামান্য কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা বাঙালিরও হয় ইংরেজেরও হয়। অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিজাতি-বিদ্বেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু ফরিয়াদির পক্ষের বাঙালি ব্যারিস্টারমহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন, মুহুরি-মারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল-সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা। এ কথা বলিতে পারি, মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল-সাহেব যথার্থ ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না, এই কথাটি ধ্রুবসত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরেজকে বেশি করিয়া দোষার্হ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুন আইনমতে মুহুরির যে-কোনো প্রতিকার প্রাপ্য তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র পরিমাণে আহা-উহা করার এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোনো কারণ দেখি না। বেল-সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্তী সমস্ত লোকের আচরণ হেয়, এবং খুলনার বাঙালি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অন্যায় মিশ্রিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অনুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটিয়াছিল। সেখানে ম্যুনিসিপালিটির খেয়া-ঘাটের কোনো ব্রাহ্মণ কর্মচারী পুলিস-সাহেবের পাখা-টানা বেহারার নিকট উচিত মাশুল আদায় করাতে পুলিস-সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন, বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সেই অপরাধী ইংরেজের কোনোরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখা-টানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপদ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণ-বশত বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট প্রবল ইংরেজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙালি অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন সেই কারণটি আমাদের জাতির মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আমরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকারসাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে। গবর্মেন্ট কোনো আইনের দ্বারা, বিচারের দ্বারা, তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরেজ-কর্তৃক অপমান-বৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোনো ইংরেজের প্রতি ইংরেজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু ইংরেজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণবশত একজন ইংরেজ সহজে আর-একজন ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অনুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সানুনাসিক স্বরে এত অধিক কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ, তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না। আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট 'চাষা বেটা' প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে। ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কন্‌স্টেবল, কন্‌স্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেন্টের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবি করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কন্‌স্টেবল যথেচ্ছাচারী রাজা এবং কন্‌স্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ—তেমনি আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতি মুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও, মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই-সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি, এবং সেই কারণেই ইংরেজ ইংরেজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরেজ গবর্মেন্টের

নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

১৩০১

সুবিচারের অধিকার

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন, অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়, কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দুসংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো কালে কোনো বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোনো বিবাদ নাই— বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেন্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোনো এক পূজা উপলক্ষে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয় রক্ষা করিতে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চিরনিয়মানুমোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটিমাত্র সামান্য বাদ্য যোগে কোনোমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবর্দস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কি না সন্দেহ। এমন করিয়া, যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন, অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর কোনোপ্রকার চিকিৎসা নাই, কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জন করিয়া, নৃত্য করিয়া, রোগীকে মারিয়া ধরিয়া, প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরেজ হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ ব্যাধির যদি সেইরূপ আদিম প্রণালী মতে চিকিৎসা শুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেন্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড হ্যারিস পর্যন্ত সকলেই বলিতেছেন, এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী। ইংরেজ-গবর্মেন্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কন্‌গ্রেসের প্রতি গবর্মেন্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কন্‌গ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোনো পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেন্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গবর্মেন্টের সুশাসনে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেন্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেন্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে, এমন অভিপ্রায় গবর্মেন্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে গবর্মেন্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্বদাই দেখিতে পাই, দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমান-বিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষ্যানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি গবর্মেন্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকাই সম্ভব, কিন্তু একমাত্র গবর্মেন্টের পালিসির দ্বারাই গবর্মেন্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোনো-প্রকার অসাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্যরাজ্যের অনুচর উনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেন্টের স্বর্গলোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে-সকল খবর লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন এবং লর্ড হ্যারিস জানেন; কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে, কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন, তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে; আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি, আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকি আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে গবর্মেন্টের উচ্চ-উপাধিধারী কোনো শ্রদ্ধেয় ইংরেজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দু-বিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমানজাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরেজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্ত সঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে, ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরেজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে ‘ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো’ রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে; কিন্তু বউ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচারকার্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না।

যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্বে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইন সহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলি না যে, গবর্মেন্টের এইরূপ পলিসি; কিন্তু কার্যবিধি স্বভাবত, এমন-কি অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পাবে— যেমন নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেন্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেন্ট যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতম ইংরেজ কর্মচারীদের কার্য স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য হইতেছি এবং ইংলন্ডবাসী অপক্ষপাতী ইংরেজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি। এই-সকল ব্যবহারে ইংরেজ এতদূর পর্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে যে, ভারত-রাজতন্ত্রের বড়ো বড়ো ভূধরশিখর হইতেও রাজনীতিসম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয় স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায় হইয়া কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই-সকল কারণে ইংরেজদের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে— গবর্মেন্টের ইহাতে কোনো হাত নাই।

কেবল ইহাই নহে। কন্‌গ্রেস অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরেজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন, ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনো একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্য সে জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেই সূত্রে যখন হিন্দুমুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতি ইংরেজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না, তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাতসহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরেজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীতচিত্তে একটা রাজনৈতিক সংকট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনায় 'ইংরেজের আতঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত ভীতির কারণ তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে, গবর্মেন্ট নামক যন্ত্রটি যেমনি নিরপেক্ষ থাক্ গবর্মেন্টের ছোটোবড়ো যন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারংবার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল, এখনো প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই— ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই, গবর্মেন্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা, এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার প্রয়োজন কী ছিল।

গবর্মেন্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই, সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন সমুদ্রতরঙ্গ সেখানে থামে নাই, সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে, কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে, সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কী করিয়া। যাহারা বারংবার নিহত পরাহত হইয়াছে, অথচ কোনোকালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে। ইংরেজ যে আমাদের মর্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরেজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্ধিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনো আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা-স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিল-বন্ধন ভঙ্গপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে। আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে। যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ; আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না—কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি তাহা সমূলক কি না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক, প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনোই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। কারণ, মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

১৩০১

কণ্ঠরোধ

সিডিশন-বিল পাস হইবার পূর্বদিনে টাউনহলে পঠিত

অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা, তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হউক-না কেন, যে ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না এবং যে ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা, আমরা কোন্ ভাব হইতে কী কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি সুদুঃসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত না দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদ্গীরিত, তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই। কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট; কারণ, কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কা-বেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্বল জীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমন স্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী, যাঁহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন, তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাগ্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন— দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন। সে সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাক বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ', তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে, কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা ভয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদিগকে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরেজ আমাদের একেশ্বর রাজা এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এ দেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন— ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতিদূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ, প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারত-লক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়— সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

বাহিরে প্রবল শত্রু সম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

কিন্তু আমরা আমাদিগকে জানি। আমরা যে কোনো অংশেই ভয়ংকর নহি সে বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল। এবং যতক্ষণ সে বিশ্বাস আমাদের নিজের মনে নিঃসংশয়ভাবে দৃঢ় থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ংকারিতাও সর্বতোভাবে দূরীকৃত।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায়, বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ংকর! আশ্চর্য! ইহা আমরা পূর্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম, গবর্মেন্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না— আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!

একদিন শুনিলাম, অপরাধীবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফ্‌তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেন্ট সাক্ষীসাবুদ বিচারবিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর! ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

আজ পর্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোনো অন্ধিসন্ধি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় তারের খবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্‌-এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের মাথার উপরে কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জবর্দস্ত শাসনের ঘন ঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন-আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম— ভিতরে কী ঘটিয়াছে জানি না, কিন্তু বেশ দেখিতেছি ব্যাপারটি সহজ নহে; মারহাট্টারা বড়ো ভয়ংকর জাত।

এক দিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্য দিকে রাজ কারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে। আমরা এতই ভয়ংকর!

আমরা এতকাল বিপুলা পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুর্যোগে মেঘাবৃত অপরাহ্ণে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভর ভূমি জানি না কোন নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, তাঁহার সেই মুহূর্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বহুকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেন্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দেশ্য আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার শক্তি ও নীতির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু সেইসঙ্গে নিজের প্রতিও তাহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয়— আমি না জানি কী!

সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সান্ত্বনা আছে। কারণ, সম্পূর্ণ নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক তেমনি তাহাকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া এ কথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়তো আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল মূঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেন্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে, আমরা মশা নহি, অন্তত মরা মশা নহি।

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ একটা শক্তির সঞ্চার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের

বিষয় এ কথা অস্বীকার করা এমন সুস্পষ্ট কপটতা যে, তাহা পলিসিস্বরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবঞ্চনাস্বরূপে নিষ্ফল। অতএব গবর্মেন্টের তরফ হইতে আমাদের কোনোখানে সেই শক্তির স্বীকার দেখিতে পাইলে নিরাশ চিত্তে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু হায়, এ গর্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক, শুক্তির মুক্তার ন্যায় ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি; উপযুক্ত ধীবররাজ আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্বটুকু নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজেদের রাজমুকুটের উপরে স্থাপন করিবেন। ইংরেজ নিজের আদর্শে পরিমাপ করিয়া আমাদিগকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে সম্মান হয়তো আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু। আমাদের যে বল সন্দেহ করিয়া গবর্মেন্ট আমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছেন সে বল যদি আমাদের না থাকে তবে গবর্মেন্টের গুরুদণ্ডে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব, সে বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নায় তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা তো আমাদিগকে জানি, কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে, তাহা বিস্তারিত পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই, তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী। আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোনখানে ধোঁয়াইয়া উঠে, তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ংকরত্বের আর কোনো লক্ষণ নাই; কেবল একটি আছে—আমরা অজ্ঞাত। আমরা স্তন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব, আমরা শান্ত সহিষ্ণু উদাসীন। কিন্তু তবু আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ আমরা প্রাচ্য, আমরা দুর্জ্ঞেয়।

সত্য যদি তাহাই হইবে তবে, হে রাজন্, আমাদিগকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ। যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন। যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি, তাহা রোধ করিয়া ফল কী।

সিপাহিবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে। সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে। সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যা রাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কেয়ূর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে, কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে জাগ্রত লোকটির হাতে পাহারা দিবার প্রণালীও তিনি স্থির করিবেন; সে সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা এবং সম্ভবত তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্বল উদ্যমের মধ্যে দুশ্চেষ্টা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র ব্যর্থ অথচ বিপদসংকুল বাচালতা কেন। সে কেবল প্রবলের ভয় দুর্বলের পক্ষে কী ভয়ংকর তাহাই স্মরণ করিয়া।

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতরশ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ডহস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়; কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল। অপরাধ করিল, দণ্ড পাইল; কিন্তু

ব্যাপারটা কী আজ পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না। একটা ছোটোবড়ো কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ এই মূক নির্বাক প্রজাসম্প্রদায়ের মনের কথা কিছু বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবায়িত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতংকচকিত ইংরেজি কাগজ কেহ বলিল, ইহা কন্‌গ্রেসের সহিত যোগবন্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা; কেহ বলিল, মুসলমানদের বস্তিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক; কেহ বলিল, এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়োলাট সাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান, এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু। রুদ্ধবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর খরধার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরেজের একান্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব করে না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব; ইংরেজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সংগে সংগে বাড়িয়া উঠিবে। কারণ, সে বিধির নিয়ম; পিনালকোডে তাহার কোনো নিষেধ নাই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রধান অমংগল নহে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অশুভ আছে।

মানবচরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই, তাহা আমরা ইংরেজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যাচরণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে, তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরেজ আপন প্রজাদিগের অধীন দশা হইতে সেই হীনতার কলংক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্বল তাঁহারা সবল, ইহা তাঁহারা পদে পদে স্মরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্যন্তও ভুলিতে দিয়াছিলেন যে আমরা মনে করিয়াছিলাম, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোনো কারণ নাই। দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনো গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্বদা অনুভব করা রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য অবস্থার পার্থক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃংখলটাকে সর্বদা ঝংকার না দিয়া সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধবন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতা-

সূত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী ছিলাম। আমরা দুর্বল জাতির হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্তহৃদয়ে উন্নতমস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদিচ উচ্চতর রাজকার্যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না তথাপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া, স্পষ্টবাক্যে সমালোচনা করিয়া, আপনাদিগকে এই বিপুল ভারতরাজ্যশাসনকার্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অন্য ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানিতাম, আমাদের স্বদেশ-শাসনের বিপুল ব্যাপারে আমরা অকর্মণ্য নিশ্চেষ্ট নহি; ইহার মধ্যে আমাদেরও কর্তব্য, আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসনকার্যের উপর যখন প্রধানত আমাদের সুখদুঃখ আমাদের শুভ অশুভ নির্ভর করিতেছে, তখন তাহার সহিত আমাদের কোনো মন্তব্য কোনো বক্তব্য বন্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা আমাদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষত আমরা ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরেজি সাহিত্য হইতে ইংরেজ কর্মবীরগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভসাধনে আমাদের নিজের স্বাধীন অধিকার থাকার যে পরম গৌরব তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই, রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে; যে সম্বন্ধের মধ্যে আদানপ্রদানের একটি সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল, ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে; রাজার প্রতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয়।

এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো কোনো জবর্দস্ত ইংরেজ লেখক বলেন, যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজশাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গির যে বিচিত্র লীলা মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া! দুই শত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ!

১৩০৫

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌

বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে, এইরূপ বড়ো বড়ো মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ-সকল মতলব টেঁকে না; কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি, আমাদের দেশের

কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ 'এম্পায়ারে' একাত্ম হইবার অধিকার দাও-না।

কথার ছল ধরিয়া তো কোনো অধিকার পাওয়া যায় না। এমন-কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাঁহারা আমাদের উপরওয়ালা তাঁহারাই ইম্পীরিয়ল্‌বায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করি না।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কী। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি ইম্পীরিয়লিজ্‌মের বুলি আওড়াক বা নাই আওড়াক, তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে তো অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেননা, হাজার হইলেও দয়াধর্ম একেবারে ছাড়া কঠিন। লজ্জাও একটা আছে। কিন্তু একটা বড়োগোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় 'শিকার' তবে সে ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত আহত নিরীহ পাখির তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষে যে ব্যক্তি পাখির ডানা ভাঙিয়া দেয় সে ব্যক্তি শিকারির চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখির তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষীকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারির দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর নানা দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া ফিন্‌ল্যান্ড পোল্যান্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কী পর্যন্ত চাপ দিতেছে তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্যন্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবর্দস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌-নামক একটা সর্বাঙ্গীণ বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যান্ড ফিন্‌ল্যান্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কার্জনও সেইভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোলো।

কোনো শক্তিমানের কানে এ কথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেননা, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ, সে স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিসর্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলন্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'; কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।

হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি তো দূরে থাক্‌।

আমাদের বেলায় বিচার্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌মের পক্ষে প্রতিকূল—অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে-সকল কারণ আছে সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মতো অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌ মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই ‘হিয়ুম্যানিটি’!

ভারতবর্ষের কোনো স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজসভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় ‘ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌’, তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল রোড্‌স্‌ একজন ইম্পীরিয়ল্‌বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে-সকল কাজকে চৌর্য মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল খুন ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজ্‌ম্‌-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইজন্য আমাদের কর্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড়ো রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্মস্থান পিষ্ট হয় তবে ধর্মের দোহাই দিলে কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয় এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনিয়ান্‌গণ যখন দুর্বল মেলিয়ান্‌দের দ্বীপটি অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল গ্রীক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌তত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন এবং যে পলিটিক্‌সের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

> *Athenians.* But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can and the weak grant what they must. . . . And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.
>
> *Mel.* It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves?

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

১৩১২

রাজভক্তি

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারও রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরাল, নটেশাকটি মুড়াল।

ব্যাপারখানা কী। একটি কাহিনী মাত্র। রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা, দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে বহু নৈপুণ্য ও সমারোহ সহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে কিছু একটা পলিসি, কিছু একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন। রূপকথার রাজপুত্র কোনো সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়াছিলেন; আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল।

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মতো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজাসনে যাঁহারা বসেন তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বস্তুত ইংলন্ডে রাজত্ব করিবার সুযোগ কাহারও নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষ যে অধীন রাজ্য তাহা ইংরেজ এখানে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এ দেশে কর্তৃত্বের দম্ভ, ক্ষমতার মত্ততা, সহসা সংবরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ রাজার পক্ষে এই নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতে আসেন তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এ দেশের পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা কোনোকালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা এক মুহূর্তেই হর্তাকর্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতন-লব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন সে ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরেজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনাগোনার রাজত্ব না হইত, যদি এ দেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় ইংলন্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য

এ দেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে 'আমরা কর্তা'— এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, এ কথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন-কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব তাহাও তাহারা স্পর্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক-না কেন, সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙ্ক্ষা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটি সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্নম্য ঔদ্ধত্যে বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে, স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে, কিন্তু তাহাকে ভালোবাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতেই থাকে। প্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবিটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ; সে সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে— তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবর্দস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না, অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তি সম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক-একবার রাজভক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জনের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড কার্জন কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা 'খোঁয়ারি'-গ্রস্ত মাতালের মতো আজ যে অবস্থায় আছে তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্যলোলুপতা বোধ করি ভারতবর্ষের আর কোনো শাসনকর্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাটসাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্বতন বাদশাহের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন, এবং স্পর্ধাপূর্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজমাত্রই বুঝিতেন, দরবার স্পর্ধাপ্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দসম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজশাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎ-নবাব দিল্লির প্রাচ্য-ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়া এবং বদান্যতাকে সওদাগরি কার্পণ্য দ্বারা খর্ব করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বস্তুত ইংরেজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারের দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যহৃদয় পীড়িত হইয়াছে, লেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র ফল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্মৃতিতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে, তাহাতে উল্টা ফল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেইজন্য দিল্লির দরবারে ড্যুক্ অফ কনট্ থাকিতে কার্জনের দরবার-তক্ত-গ্রহণ ভারতবর্ষীয়মাত্রকেই বাজিয়াছিল। এরূপ স্থলে ড্যুকের উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে, কার্জন নিজের দম্ভ প্রচার করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক দরবারে ড্যুক্ অফ কনটের উপস্থিতি

ঘটাইয়াছিলেন। আমরা বিলাতি কায়দা বুঝি না, বিশেষত দরবার ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য তখন এ উপলক্ষে রাজবংশের প্রকাশ্য অবমাননা অন্তত পলিসি-সংগত হয় নাই।

যাই হোক, ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত—বোধ করি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এ দেশকে হৃদয় দেয়ও নাই, এ দেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমন ব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন, আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না—মনে রাখিবার কিছু রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, এ কথা সত্য। হিন্দু ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ এ কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দেবসম্বন্ধ না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন হউক না, মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম—ইহা পুঁথিতে লিখিবার, কালেজে পড়াইবার নহে—ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিফলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গললাভ করি সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই-সকল উপলক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্বলতা, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ। শক্তিপ্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে, গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজ্য করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে। ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে, যন্ত্র একটা উপলক্ষমাত্র—যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে; কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা, যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর কিছুই হইতে পারে না। জড়ের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অনুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মতো এতবড়ো মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্তিমান না দেখিয়া বাঁচে কিরূপে। আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়; যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয়। অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে, মঙ্গলের প্রত্যক্ষস্বরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি; নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই— রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই— আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ কথা সত্য। কিন্তু সেইজন্য রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাশার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালোবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছে না বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহু রাজার দুঃসহ ভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপে মর্মে মর্মে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিক মাত্র, ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে, যাহারা পেটের দায়ে নির্বাসনে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে, যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধই নাই— অহরহ পরিবর্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়সম্পর্কশূন্য আপিসি-শাসন নিরন্তর বহন করা যে কী দুর্বিষহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান, আমি এই-সকল ক্ষুদ্র রাজা, ক্ষণিক রাজা, অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য— বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রের নয়। ভারতবর্ষ যাঁহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজা; হ্যালিডে রাজা নয়, ফুলর রাজা নয়, পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলন্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলন্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক রাখিব না, এ স্পর্ধা ধর্মরাজ কখনোই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না— ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য, সুশাসনই বল, শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস-সর্প ফণা তুলিতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল। আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে— রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, এ কথা মনেও করিয়ো না। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক, ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কী চায়। ইহা জানিয়ো হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে

বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শান্তি নহে, মানুষ তৃপ্তি চাহে, এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ। আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়—আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যুনিটিভ পুলিস এবং জোর-জুলুমের কর্ম নহে।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই-সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো, এই-সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো; ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরমশক্তিমত্তার কাছে এই-সমস্ত তর্জন গর্জন, এই-সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই-সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র। ইহারা যদি বা তোমাকে পীড়া দেয়, তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ায় গৌরব; যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে, সেইজন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ তাহা কখনোই নহে। তুমি যাহা হইবে, যাহা করিবে, অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্রপরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে তখন, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল্‌ কালভুজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, লুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না। তুমি

আত্মানং বিদ্ধি।
আপনাকে জানো।

এবং

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও। যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

১৩১২

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না। সাবেক কাল যখন হাজির নাই তখন একতরফা বিচারে যাহা হইতে পারে তাহাই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো বা সেকালের ভাগ্যে যশ জোটে, কখনো বা একালের জিত হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল সুখের ছিল কি ইংরেজের আমল সুখের, গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ নিষ্পত্তি হইতে পারে না। নানা সূক্ষ্ম জিনিসের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে, সে-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যে কালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মস্ত প্রভেদ ছোটোবড়ো আর-সমস্ত প্রভেদের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়ো তেমনি নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর। আমাদের এই ছোটো প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া দেখিতে চাই।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে অনেক। এ কথাটা এতই সোজা যে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোনো সূক্ষ্ম তর্কের প্রয়োজন হয় না।

বাদশা যখন ছিলেন তখন তিনি জানিতেন, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই; এখন ইংরেজ জাত জানে, ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবার মাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল। এখন অত্যাচার নাই, কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর-একটা গোটা হাতিকে সর্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটিমাত্র দেবতার পুজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে, এবং যে ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয়তো অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপড়িও যদি দেওয়া যায় তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্য হউক-না কেন, তলে তলে ব্যাপারখানা বড়ো কম হয় না। তবে কিনা, এই একটা একটা করিয়া পাপড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু, এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। মোগলের চেয়ে ইংরেজ ভালো কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কি না, অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বৃথা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেও একটা লাভ।

মনে করো, এই যে আমরা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড়ো বড়ো চাকরি প্রায় ইংরেজের ভাগ্যে পড়িতেছে, ইহার প্রতিকারটা কোন্‌খানে। আমরা মনে করিতেছি, বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে।

কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যাহার বিরুদ্ধে নালিশ আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদশাহের আমলে আমরা উজির হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি— এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে ইহার কারণ কী। অন্য গূঢ় বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে তো স্পষ্টই দেখিতেছি। ইংলন্ড সমস্ত ইংরেজকে

অন্ন দিতে পারে না— ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে জোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তম এডোআর্ড যথার্থই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, অন্নের যদি বড়ো বড়ো গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে তবে তোমার রাজ্য টেঁকে কী করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, তাই তো, আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন।

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত, এবং অন্যের লুব্ধ হস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে 'আমার রাজ্য' বলিয়া জানে। এ রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্বতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্তা এ সম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসহস্রমুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিষ্ফল, এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মোট কথা— একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভালো রাজা হইলেও এরকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড়ো কঠিন। মুখ্যত অন্য দেশের এবং গৌণত আপনার স্বার্থ যে দেশকে একসঙ্গে সামলাইতে হয় তাহার অবস্থা বড়োই শোচনীয়। যে দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কী করিয়া। না-হয় চুরি ডাকাতি বন্ধ হইল, না-হয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুবিচারই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়।

অতএব কন্‌গ্রেসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক-না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।

১৩১২

পথ ও পাথেয়

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে, তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল— আরব্য উপন্যাসে এমনি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এতবড়ো একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনোদিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন-একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমিষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সেজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে, অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই

অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করে না, কিন্তু সংকটের দিনে তাহার মতো শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধুলা উড়াইয়া আমাদের চারি দিকের আবিল আকাশকে আরও অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোনোপ্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগ প্রকাশের উত্তেজনা সংবরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি, তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, ‘আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুক দলের কীর্তি, এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি, এ-সব ভালো হইতেছে না; আমি তো জানিতাম, এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে।’

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এইপ্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয়, সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষত আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালোমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই। অতএব দুর্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভালো।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের ’পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা। তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবের দিকে বিচলিত করিবে না। অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের নির্দয়তা প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটাকে আমরা যেমনি দোষাবহ বলিয়া মনে করি-না কেন সে সম্বন্ধে মতপ্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন। সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন একপ্রকার অসংগত।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন-না, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই। বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন এ কথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে। এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলা সহজ যে, তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভালো হইত।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালি, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি, কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না, এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোঁটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলাদেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রুমিত্র কাহারও কোনো সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই এ-পর্যন্ত কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা

যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো-বা পর কখনো-বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালি বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে, যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ কথাটা সত্য যে, বাংলাদেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে-প্রকার অগ্নিমূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ বুদ্ধিবিকাশের দিনে যাহাকে আমার ভালো লাগে না তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসংগত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাই না। কিন্তু কেমন করিয়া কী ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কী, সেটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয় তবে দয়া করিয়া এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধভাববশত যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদি-বা গ্রাহ্য না-ও করেন, আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন্ বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এইপ্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো, কপালের চেয়ে ঠান্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কী করিব, কী করিতে চাই, সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল। সেই আগুন স্বভাবধর্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্‌খানে কেরোসিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হোক, কার্যকারণের পরস্পরের যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক-না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকান্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে-সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃত ভাবে ব্যাপ্ত যে, কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনোই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরও প্রবল ও প্রকান্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্তমান সংকটে রাজপুরুষদের কী করা কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে, ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কথা আরও একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে, সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এক দিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্তি ধরিতেছে, অন্য দিকে দুর্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনো পথ না পাইয়া প্রতিদিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোটো নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে—মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালোই, যদি না-ও হয় তবু দুঃসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোনো সান্ত্বনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেন্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি—এ-সমস্ত কিছুই নয়, এ কেবল দুই-পাঁচজন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি তো এ প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত, এরূপ ফুৎকারবায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেন্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত, দেশের বর্তমান অবস্থায় কোথায় কী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সংকটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, গবর্মেন্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক্‌, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে, লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতি-বায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কার্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্বলকে ধর্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয়—এ তো ধর্ম মানা নয়, এ ভয়কে মানা।

অল্পদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রাম-পল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া, নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 'মার্শাল ল' শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া

ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্বরতাও এইজাতীয়। এই-সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্মবুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয়, তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে-সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুণ্ঠিত তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যে-সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই-সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত, সংকটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামি করে তাহা নহে, সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ংকর হইয়া উঠে, তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান জিনিসটা যে কতই বড়ো এবং কত দিকেই যে তাহার অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত সে কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধ-গ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন-একটি সুমহৎ কর্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে, তাহার মাহাত্ম্য যেন এক মুহূর্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোনোপ্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো-না-কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যেদিন আর্যজাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মতো অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের আর্য-অনার্য-সম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের

উপক্রমণিকা-গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে। বিধাতা কি তাহা শিশুর ধূলাঘর-নির্মাণের মতোই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভারগম্ভীর মেঘমন্দ্রের মতো ধ্বনিত হইয়া এশিয়ার পূর্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলীয় জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর জাপান পর্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার পরে এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর-এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোনো-একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র। ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোনো চিরপরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধবিচ্ছিন্নতায় চতুর্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শংকরাচার্য সেই-সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিকজ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল তখন চৈতন্য নানক দাদূ কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে— রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে—ইহারা পরস্পর গ্রথিত, ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই—ইহারা সকলেই রহিয়াছে, ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক, ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর-কোনো দেশেই এতবড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই; এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই; একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর-কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক, প্রতাপ বিস্তার করুক— ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক— ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খৃস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম, কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে— ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম, অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না— ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাতবিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না— করিলেও, কোনোমতেই কৃতকার্য হইবেন না এ কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়; তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ংকর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরমপ্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ-অধৈর্য-অহংকারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারতবিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন। ভারতের মহাজাতীয়-উদ্‌বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, এ কথা আপনারা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিবেন, তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্মনির্দেশশূন্য স্পর্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না; নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি হৃদয় এবং কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায়, কোনো-একটা বিশেষঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া এক মুহূর্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়— নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, হৃদয়াবেগকে একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে, আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমত বিচার করিয়া লওয়া বড়ো কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূল কারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে-দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনোই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই, তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল,

নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আর-কিছু না হউক সে জাহাজের খোলের তক্তাগুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না, যদি-বা পূর্বে ছিল এমন হয়, তবে নিশ্চয়ই কোনো-এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে বসিয়া সেগুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আলগা তক্তার উপরে আর-একটা আলগা তক্তা ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া আঘাত করিতে থাকে, ঐ দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিস নয়। আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি। ভিতরে যখন এমন-সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া, ঢেউ বাঁচাইয়া, স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়।

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি, তখন আমাদের দেশের কোনো দুর্বলতা কোনো ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধমাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে, এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এইপ্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর-কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি, সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিংবা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, তখন তাহার মতো মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এইপ্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরমদুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারংবার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাই হোক, যেমন করিয়াই হোক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোনোদিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সংকীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠান্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই শুরু

করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরও অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না। তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে। সে মনে করে, যে মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোটো কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া জানে; যেখানে তাহার অভাব দেখে, সেখানে সে কোনো সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চক্‌মকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প, তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক; তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে তখনি প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপ-রচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চক্‌মকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি, তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে, এমন করিয়া কখনোই ঘরে আলো জ্বলিবে না, কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। এ কথা ভুলিয়া যায় যে, এই অস্বাভাবিক সুলভতা এক দিকে মূল্য কমাইয়া আর-এক দিক দিয়া এমন করিয়া কষিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের-হিতসাধন-বুদ্ধি-নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মতো দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভালো জিনিসের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্য জ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধনপ্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-সস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলই বাড়াইয়া চলিতেই চায়, তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলই সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার

বেশি, সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোটো নজরের লোক, তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলই ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে—কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু এমন করিয়া কোনো কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্‌বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম, কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্মের বাধাবিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই তো কর্মসাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে তাহার চেয়ে বড়ো। এইজন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে, কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে; কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্মোৎসাহী প্রভুকে বর্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে; ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাঁহার তো সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে স্টীমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন ওঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে, তখন আমরা উত্তর করি, এ-সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই; সময়কালে আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে, মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে, কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবলই এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ পর্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয়তো আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভ ফল প্রত্যাশা করিবার নাই।

নাই, এমন কথা আমি কখনোই মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কি করিতে হইবে। কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষীণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াই দেয়; যে-সকল সত্যকর্মে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন-সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই-সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে, অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। ‘হৃদয়াবেগ’ জিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলই অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে, তখন তাহা বিষের মতো কাজ করে; তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে-একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম,

ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতা-নির্দিষ্ট আমাদের সেই বিনা চেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো-বা বন্দনা করিতাম, কখনো-বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল— আগেকার মতো পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না; কিন্তু আশ্চর্য এই, আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব; এখনো ভাবিতেছি, ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে; উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কী করিয়া। ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারে না; মত্ততা বলে, আমার সিঁড়ির দরকার নাই, আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্যসাধন তো সকলেই পারে, অসাধ্যসাধনে আমরা এখনি জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজই করিতে চায়, সে ছোটো হইতে বড়ো কিছুকেই অবজ্ঞা করে না, কোনো কর্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচে না। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায়, সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমান মাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে, 'আমি হাঁটিয়া চলিব না, আমি ডিঙাইয়া চলিব।' অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষেই যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; ধৈর্যের প্রয়োজন নাই, অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই; সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি, পরের শক্তির প্রতি গতকল্য যেমন অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনো যথাবিহিত কর্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল, এখনো সেই চেষ্টাই বর্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল খেতের ধারেও যায় নাই। বাপ চাষ করিত, তাহারা দিব্য খাইত। বাপ যখন মরিল তখন খেতে নামিতে বাধ্য হইল; কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে— তাহারা স্থির করিল, মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ কথা সহজে না শিখি যে, দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে, তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য বা অজ্ঞান-বশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু-একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়; তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়। তখন ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতিসুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি— এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ

চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখ আরও কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়; ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে এ কথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তিদ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমত বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম—

নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে—

তখন লর্ড কার্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশী পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যতবড়ো কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভালো, প্রতিকূলতা ভালো, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন-কোনো ইন্দ্রজাল ভালো নহে যাহা এক রাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে 'আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই।' কিন্তু হায়, মনে নাকি ভয় আছে যে, এক মুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, সেইজন্য, এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায়, আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারি দিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের-প্রতি-বিশ্বাসবিহীন দুর্বলতা স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভবুদ্ধিকে অমান্য করিয়া, অতিসত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতিদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব, ইহা কখনো হইতেই পারে না, এ কথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট-ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি, দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য-সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ

হইয়া উঠে। সেইজন্যই স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি; দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতিকুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি; এমন-কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপ্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন; আমরাও মত প্রচার করিতে চাই, কিন্তু আর-সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে। ভেদের লক্ষণই তো চারি দিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনোমতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই— কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এ দেশের পরাধীনতা মাথা ধরার মতো ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মতো ইংরেজ-গবর্মেন্ট্-রূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে; ঐটেকেই যে-কোনোপ্রকারে হোক টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহূর্তে আমরা হালকা হইব। এত সহজ নহে। ইংরেজ-গবর্মেন্ট আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণ মাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মতো অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগ সত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজর্ল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে।

এমনতরো নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি, কিন্তু বিধাতার চোখে ধুলা দিতে পারিব না। বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কি না সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য তো নানাপ্রকারে থাকে— যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কি না। সুইজর্ল্যাণ্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে, কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা জাতি ধর্ম সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া তো নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখি না। চক্ষু বুজিয়া এ কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে, আমাদের আর-সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া এক মনে এক প্রাণে এক স্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিবে।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা

যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই— পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন-না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না! অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অংগ নহে। এইজন্য যেমনভাবেই থাক্, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পীড়া দিবেই, কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনি ঐ দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার— নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ঐ জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণে যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ কথা নিশ্চয় বলা যায়, জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজ-শাসন-নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার 'পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটন-মূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা কবিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে, এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতর রূপে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

এ কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনি এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

'ততদিনে যেমন করিয়াই হউক একটা-কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই— আপাতত এই ভাবেই চলুক' এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রস্টি যেমন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামত যেমন-তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না, তেমনি দেশ যখন বহু লোকের এবং বহু কালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতরো নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনোই কর্তব্য হইতে পারে না। কর্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারংবার বলিয়াছি এবং বারংবার বলিব— শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানাদিগভিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো, কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো— এমন উদার

করিয়া এত দূরবিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনোই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না— আমরা জয়ী হইবই— বাধার উপরে উন্মাদের মতো নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে, অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া। কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্যসিদ্ধির সত্যসাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মতো সঞ্চিত করিয়া তুলিব; আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তিচালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝংকার শুনা যাইতেছে, দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাকেই অত্যন্ত বড়ো করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসংগীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ দেশের সিংহদ্বারে কত বড়ো বড়ো রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; অদ্যকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে। ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরমমহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে— ভক্তসাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারি দিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব, এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে— এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল— এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনো দেশেই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না— কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না। যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার করে সেই-সকল ক্ষণকালীন-বায়ুদ্বারা-স্ফীত সংবাদপত্রের মর্মরধ্বনি, সেই বিলাতের টাইম্‌স্‌ অথবা এ দেশের টাইম্‌স্‌ অফ ইন্ডিয়ার বিদ্বেষতীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মতো আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে, আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি এ দেশে উচ্চারিত হয় নাই— যে বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে। সেই-সকল শান্তিগম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব যাহাতে শত্রুমিত্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে, ক্ষমার বীর্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না; তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব। দুঃখবেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহভাব দূর করিয়া দিব; জানিয়া এবং না জানিয়া

বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব; নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি, তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য, সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন—

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্—

তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে—

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্—

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্যরক্ষার যিনি সেতু ইঁহারই নাম সত্য।

১৩১৫

সমস্যা

আমি 'পথ ও পাথেয়'-নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোন্‌টা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কী তাহা লইয়া তো কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং এক দিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর-এক দিক দিয়া বার বার অংকুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াই রূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মতো ছড়াইয়াছে, আগুনের মতো জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন ভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালংকারের ঝংকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসংগত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অল্পের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না—ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হোক, যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদেরও আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না তখন আমরা পরস্পর কী কথা বলিতেছি, কী ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধপক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয়তো প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে এ কথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে। অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো-বা লড়াই করিয়া চলিতে

হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোটো কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড়ো হোক এবং যতই ভালো হোক, বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না। কোন্‌ ব্যক্তির চেক-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্‌ ব্যক্তির চেক ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সংকটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে, ভালো করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যতবড়ো কথাই বলি-না কেন, তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কী সে কথা আলোচনা উপলক্ষে আমরা যদি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মতো সে কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিতমত ঋণের দাবি শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপে ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার-আদালতের ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভূয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে খণ্ডবিখণ্ড করাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মতো তাহা মানুষকে অকর্মণ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেইজন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে, যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড়ো বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নীচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্য অধিকতর হিউম্যান, অর্থাৎ মানবচরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে— কারণ, উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধূলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন, আর রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানবচরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা এ কথা মানুষ কোনোদিনই স্বীকার করিতে পরে না; এইজন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, এ কথা সত্য যে, মানব ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, 'রেখে দাও তোমার ধর্মকথা।' বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু

তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না; বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। ম্যুটিনির পর যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে নির্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; রাগের সময় এইপ্রকার সংকীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক, অর্থাৎ মাথা গনতিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক, কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে, অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিং-এর ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ বাস্তববর্জিত ভাব-বাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিণী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড়ো সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি, তবে নারায়ণ যতই একলা হোন এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন, তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, যথার্থ বাস্তব যে কোন্‌ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শান্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে এ কথা আমরা স্বীকার করিব না।

‘পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমত, ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত ব্যাপারটা কী। অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজ তাড়ানো বা আর কিছু? দ্বিতীয়ত, সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া।

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কী তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে, বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে, তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই; তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব হর্তাকর্তা ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যত-কিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে—কাগজগুলাকে উচ্ছেদ করো, সুরেন্দ্রবাঁড়ুজ্যে-বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসংকোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মতো ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্ত গরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে ভারতের-পেনসন-ভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই। যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসংবরণ করিতে হইবে না, আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শমদমনিয়মসংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশবিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলদর্পে অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে এবং ইংরেজের

প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না। অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর কোনো উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না, তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনাল কোডই ভারতবর্ষে শান্তি-বর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে, কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ংকর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপাকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার, এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্ধামাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসংগত চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর। বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানবহৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে, তখনি বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে—কারণ, তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল, ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে, তাহাতে তোমাদের কোনো হাতই নাই—তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না—যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা—তবে সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলি মেলের সংবাদরচয়িতা এবং পায়োনিয়র-ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে, তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে আবর্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই দুর্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য। যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না; দুর্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে—স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই। বাধাহীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্বলেরই দুঃখের কারণ হয়।

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে, কেবল দুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে সমস্ত কল্পনাকে সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড়ো কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড়ো বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ংকর ভ্রমে পড়িয়া থাকি, সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ কথা আরও অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

'আচ্ছা, ভালো কথা, তুমি কোন্‌টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর' এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু সেই সমস্যাটি যে কী তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূরদেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যন্ত যে জিনিসটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে, সেটি কী। সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিমদেশের যে-সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে-সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না; তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে, যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক্ তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা বিদ্যা রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনি মিলিয়া গেছে তখনি বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলন্ডে একদিন স্যাকসন্ নর্মান ও কেল্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে, জেতা জাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সংগত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনো এই সহজ ঐক্যকেই মানে— নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হোক-না কেন, সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসীমাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনি শুরু হইল সেই মুহূর্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্যের সঙ্গে অনার্যের বিরোধ

ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্যসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য-উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজ্যকে নির্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ দেশে মানুষের যে সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমন ভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয়, কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলই চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কী উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কী উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না, কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে—অর্থাৎ কী করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না, মানুষের পক্ষে এতবড়ো অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয়, প্রভেদকে সুনির্দিষ্ট গণ্ডিদ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া যাওয়া—পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা আঘাতকেও বাঁচায়, তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো-একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয়মূর্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনো দেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন স্তূপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু, কি বিজ্ঞানে কি সমাজে, শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ; কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইঁটকাঠ চুনসুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এইজন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে, কিন্তু রচনাকার্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট,

প্রাণময় রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া, যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকদল এক জায়গায় আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে, ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন এই নাড়ি-ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই অসমাঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে তাহা কেবল আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে; তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়। যে-কোনো পদার্থে সজীব সর্বাঙ্গীণতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই। তাহাকে কোন্ জিনিস দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড়ো হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে, যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন-কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, কেবলমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালোও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস-আদালত এবং নিতান্তই আইনকানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলই কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে, তাহা কর্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলই রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভালো করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য, ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল আছে, সে কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়া পরা বিলাস-বিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এ পার ও পার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্মাবসানে বিলাতি অবকাশের আরামের আয়োজন, এ সমস্ত আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে

তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই-সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের যাহার দুইবেলার অন্ন পুরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ তাহাদের অন্তঃকরণ নির্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে, ঐ দেখো এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে, ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে-সব কেরানি পনেরো কুড়ি টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে, মোটা মাহিনার বড়ো সায়েব ইলেকট্রিক পাখার নীচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে, কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায়, নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। এ কথা যখন নিশ্চিত যে অল্পে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর, তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারি দিকের লোকে কী খায় পরে, কেমন করিয়া দিন কাটায়, তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনোই করিতে পারে না। বিশেষত এক-আধজন লোক তো নয়—কেবল তো একটি রাজা নয়, একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তাসম্পর্ক-শূন্য অপর জাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে, এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, এক পক্ষে বড়ো বড়ো বেতন, মোটা পেনশন এবং লম্বা চাল, অন্য পক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধ পেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ—অবস্থার এই অসংগতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য। এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আজ আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে এক দিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর-এক দিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিঁকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন-না-একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্তমান ছিল, অর্থাৎ যে সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না; তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয় এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে।

এ কথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা, কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না, এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সংগে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সংগে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে। হাতের সংগে পা, পায়ের সংগে মাথা যখন একেবারে পৃথক হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিসটা কাহার।

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন

আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না, পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে সকল বড়ো বড়ো কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। এ কথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনোদিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না; বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মতো পড়িয়া থাকিলে তবু টিঁকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে, কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও, যে একটিমাত্র বাহ্যবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া কিছুকাল মারামারি কাটাকাটির পর তাহার একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে-সকল প্রবলজাতি সময়ে অসময়ে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড অভিনয়ের দর্শকদের মতো দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন-একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে— এমন-কি, ইংরেজ-রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত, প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ রাজত্ব কী করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কী করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, এই অতি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি 'না আমরা চাই না', তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে; কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক, কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই-না কেন, এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। এ কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে—দেশের যে-একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে; যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে; কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব, এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে, অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না। তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া, ইংরেজ-রাজত্ব সকলপ্রকার সুশাসন সত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই, ইংরেজ শাসন হইতেই ঘটিত তাহা হইলে কোনোপ্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান—আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি—এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে, কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্‌বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান কর্ম আচারব্যবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বড়ো বড়ো রাজপথ এক-একটা ছোটো ছোটো মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে; আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি, কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেক দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে, আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি। আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা

করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল ‘ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ’ করিয়া বসিয়া আছি—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য অবজ্ঞা সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংকুচিত হইতেছে। এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে, যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো—কোনো নৈরাশ্যে, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ, এ কথা আমরা স্বীকার করিব না; কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্‌বোধিত করিতেছে তাহা তখনি বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতিবর্ণ নির্বিচারে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই-যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি—এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে, ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে; অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারি দিকে ধারাবর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার

দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে, এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য। ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য; তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

১৩১৫

সমূহ

প্রকাশ : ১৯০৮

গদ্যগ্রন্থাবলীর একাদশ খণ্ড রূপে প্রথম প্রকাশকালে ‘সমূহ’ গ্রন্থে পূর্ব-প্রকাশিত ‘আত্মশক্তি” (১৯০৫)-র ‘স্বদেশী সমাজ’, “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের ‘পরিশিষ্ট’ এবং ‘সফলতার সদুপায়’ প্রবন্ধ কয়টি সংকলিত হয়েছিল। তদনুযায়ী প্রবন্ধ কয়টি বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে ‘আত্মশক্তি’ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

দেশনায়ক

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে তবে তখনি ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না— তবে ক্ষণে ক্ষণে এক-একটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে-সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।

একবার দেশের চারি দিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মতো এমন কঠোর সত্য, এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কী আছে। তাহার সঙ্গে খেলা চলে না— তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কী, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই। সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণকঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া না থাকে তবে, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে। যাহা খাঁটি নহে তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন। ইংরেজ জাত যে এ সম্বন্ধে জহরি, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কী করিয়া। আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্‌যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধালাভ করিবে কী উপায়ে। আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবি করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কী করিয়াছি। দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে তাহারা সুখেই আছি; যাহাদের অবকাশ আছে তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কী। ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবার চর্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর, হয় বিধাতা নয় গবর্মেন্ট করিবেন— এই ধারণাকেই আমরা সর্ব উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কার্যে ব্রতী হইতে পারি, এ কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না— সেইজন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারও সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়ি বৎসর হইল প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়িতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষে যে গান রচিত হইয়াছিল তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারও নীর—

আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ—
পরের 'পরে অভিমান!

ওগো আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধরে মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু।
যদি মান চাও, যদি প্রাণ চাও,
প্রাণ আগে করো দান।

সেদিন হইতে কুড়ি বৎসরের পরবর্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহ বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইয়া তো হাত খোলসা করিয়াছি, আজ তো আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি তো ভালোই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবি রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মতো বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথায় কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছলছল করিয়া আসে কেন। আমরা কেন মনে করি, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তর এ কথা জগতের ইতিহাসে সর্বত্র প্রসিদ্ধ—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

কেবল কি আমরাই—এই দুরত্যয় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া সমান করিয়া না দেয় তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব, এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, 'তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব!' এ-সমস্ত কি অভিমানের কথা!

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও কি অভিমান মনে আসে, মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারও কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে শুরু করিয়াছি। আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না—আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ এক রাত্রির অতিথির মতো আসিল; তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্তপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। যে বাঘ একবার মনুষ্যমাংসের স্বাদ পাইয়াছে সে যেমন কোনোমতে সে প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেমনি করিয়া বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈব দুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব। সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই-যে অবিচ্ছিন্ন জালনিক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি।

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এমনি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও যে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব এমন তো কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ সবল তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুন নখরাঘাত সত্ত্বেও বিনা প্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন এক ভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাটে বাটে গ্রামে পল্লীতে আমরা এক ভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনো আমরা সম্পূর্ণ আপস করিয়া লইতে পারি নাই; এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে-সকল জাতি মরিয়াছে তাহারা এমনি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীয় জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কী। এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালী-যোগে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম তাহা যথেষ্টপরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব-অভ্যাসবশত সরিষার তেল বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিই; তা ছাড়া যেখানে জলকষ্ট সেখানে মাছের প্রাচুর্য নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিনকোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে এক দিনে নহে, দিনে দিনে সমস্ত দেশের জীবনীশক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায় তখনো শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে তখন, যে মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া প্লেগ ওলাউঠা দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনা শোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে আমাদের ঘরবাড়িতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এমনি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না।

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় দুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি তো করো, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ। আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে। ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিসের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। ইতিমধ্যে চোখের সামনে যখন স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে তখন দারোগার শৈথিল্য সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের

কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনালাভ করা যায়। আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি। আমরা যে মরিতেছি। আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি তাহাই করিবার জন্য এখনি আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয় তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি ইহা কখনোই সত্য নহে, এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানা স্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—'কী করিব, কেমন করিয়া করিব।' আজ আমরা কর্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেই দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইস্টীম উচ্চস্বরে বাঁশি বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশি বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্‌বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্ব স্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না, কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ-সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গল-সাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশনটা আজ খুব-একটা বড়ো ব্যাপার নহে। আমরা তাহাকে ছোটো করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোটো করিয়াছি। এই পার্টিশনের আঘাত উপলক্ষে আমরা সমস্ত বাঙালি মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেমনি ফিরিয়া চাহিলাম অমনি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে। কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন ও প্রোটেস্ট, বয়কট ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশনই বৃহৎ হইয়া উঠিত—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম, পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষা-সর্ক্যুলর আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে। আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে তো তাহাকে বড়ো করাই হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ, আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা

সকল ক্ষতি সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ঐ লইয়া যদি আজ পর্যন্ত কেবলই বিরাট সভার বিরাট ব্যর্থতায় দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এ-পার হইতে সমুদ্রের ও-পার পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটোকে ক্রমাগতই বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোটো হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়— আমরা যাঁহাকে নায়কপদে বরণ করিব তাঁহাকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের কুটীরপ্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিন-যাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না। তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত, গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন কবে আমাদের কার সহিত কী ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই, তাহা ঈশ্বরদত্ত— স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো-বা অনুকূল কখনো-বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্‌কার অনুভব করা কি এতই কঠিন।

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ করো। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই— তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অদ্য আমরা শান্তসমাহিত পবিত্র চিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি তবে প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণহস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘন ঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন আমি সে দলের লোক নই সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য। আজ পর্যন্ত যাঁহারা দেশহিতব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা রাজপথের শুষ্ক বালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি। ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্যবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া

থাকে অবশেষে তাহাদের মাছ পাওয়া নয়, ঐ আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা হইয়া যায়। ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য নায়কদিগকে দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত তবে তাঁহারা নিশ্চয় তাহাকে সেই দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কী, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্তব্য চালনা করা—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম-সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি, নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্বমোচন হইয়াছে। কখনোই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়; তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুর মতো কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ংগম হইবে তখন, যাহারা পথে ছুটিয়াছিল তাহারাই মাঠে চলিবে; আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে তাহারা বাটেরও নয়, মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও সকল আশার, সকল সদ্‌গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

১৩১৩

সভাপতির অভিভাষণ

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন আমি তাহার অযোগ্য, এ কথার উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। বস্তুত এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য সময় হইলে এতবড়ো দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সংকটকালে যখন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমির—যখন রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয়সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অদ্যকার দিনে সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয়তো ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দিকেই পুঞ্জীভূত—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ করিয়া আজ আর কাপুরুষের মতো ফিরিয়া

যাইতে পারিলাম না, এবং বিশ্বজগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে 'য একঃ' যিনি এক, 'অবর্ণঃ' মানবসমাজের বিবিধ জাতির মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিরাজমান, যিনি 'বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন, 'বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ' বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি সমস্ত পরিণামেও যিনি, 'স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' সেই দেবতা তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে সুমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন—একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া, অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি, এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটিবশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে, আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া, সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই, আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্বাসনে গেলে পর ভরত যেভাবে রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়মজোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষস্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই, সম্প্রতি কন্‌গ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখনও তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন, যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহতভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ীর মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবনধর্মের অতিচাঞ্চল্যে কন্‌গ্রেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্‌গ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে, কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কন্‌গ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া যাইব এবং সেইসঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া যায় এবং সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে কাজ করিতে হইবে সে কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনোমতেই চলে না। এমন-কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও

জয়লাভ করিতে হইবে; জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। লেবার পার্টি, সোশ্যালিস্ট্‌ প্রভৃতি এমন-সকল দলও রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানা দিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে, এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই-সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতির লোককে একত্রে লইয়া, শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে, বড়ো বড়ো রাজ্য ও সাম্রাজ্য-চালনার কার্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কন্‌গ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বল লাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না, এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ, ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে, তেমনি আমাদের মতসংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর হইবে—নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ-পর্যন্ত কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যতদিন পর্যন্ত দেশের লোক উদাসীন থাকাতে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের দ্বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধি-

নির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ, শুধু নির্বাচনের নহে, কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের কার্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক-এক দল যদি এক-একটি সাম্প্রদায়িক কন্‌গ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কন্‌গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কন্‌গ্রেস সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা— বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই কী লাভ হইবে।

এ-পর্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায় এমন-কি আমোদের জন্য দল বাঁধিয়া, যখনই অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিসটাকে হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা-অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে, তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে। যে সরষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই সরষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কী উপায়।

বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরও বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকট যে দুর্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায়। পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়; এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না; কারণ, এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই-যে তপোভঙ্গের উপলক্ষকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে— আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারংবার ক্ষমা করিতে হইবে, পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উষ্ণবাক্যের বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে, তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জন-মূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না— আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই

উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেন্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনো দিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি এ কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মতো। আমাদের পুরাণে কলঙ্কভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেন্ট, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হউক অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হউক, অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভালো তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্টপরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড কর্মঋণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন, দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহু ভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে, তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মতো উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্যকারণপরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য স্থান আছে, অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্বপ্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না, সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মতো, বাধা

ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে। এই তো আমাদের নূতন দল; এ তো আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করিব, আবার পরক্ষণেই সুখেদুঃখে ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, এক্‌স্ট্রিমিস্ট্‌ বা চরমপন্থী বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে সকলের চেয়ে বড়ো এবং মূল এক্‌স্ট্রিমিস্ট্‌ কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে, এক দিক চরমে উঠিলে অন্য দিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য-বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃষিতচঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল, তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন— যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরম পন্থা নহে। ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই। এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হইতে পারে।

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না, তিনি চরমের দিকেই চলিতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবলই দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব তো এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই, বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে— আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি। সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবর্তিক্রিয়া, যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স্‌ অ্যাক্‌শন। এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরও একটা দুই যোগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বৈদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্বল স্নায়ুতেও প্রবলভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড়ো কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এ দিকে যখন লর্ড্‌ কার্জন, মর্লি, ইবেট্‌সন; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস ও পুলিস-রাজকতা; নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি— তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেইসঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে— প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের যায় নাই— এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায়

লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ, সংবরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্যে পুলিসের সামান্য পাহারাওআলা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেন্ট তো একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা তো রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতামত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে সময়ে প্রবীণ সারথির প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনও যদিচ ইহাদের উচ্চ গ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না; কিন্তু তখন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালে পা ফেলে; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনই এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারাওআলার যষ্টি যে কোন্ ভালোমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ংকর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়। চতুর্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেন্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন। তখন লজ্জানিবারণের কমিশন, রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়— যাহারা আর্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে। অথচ এই-সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সংবরণ করাকেও ত্রুটিস্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্য পক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমত সংবরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে।

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। এক্‌স্ট্রীমিস্ট্ নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে-একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালির দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতি ও কর্তৃজাতির মর্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে এক্‌স্ট্রীমিস্ট্ দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি— তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো-একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর-কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে?

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে, ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম-জিনিসটা কেবল স্বার্থপর ধর্মযাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে

বলিয়া থাকে, এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায়স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন, এক্‌স্ট্রিমিজ্‌ম্‌ বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ দুষ্টের দল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে, অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাতশান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিস নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুর ভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মতো আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদান-প্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কন্‌গ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে—আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মতো দেখিতে পাইতেছিলাম না; তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেইজন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে, আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এইভাবেই আরও অনেক দিন চলিত। এমন সময় লর্ড্‌ কার্জন যবনিকার উপর এমন-একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালি, আমরা যে এক! বাঙালি কখন যে বাঙালির এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ী কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে, তাহা তো পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম, সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়া ছিল, ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল—তাহারও চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম—এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য-আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সংকীর্ণ উপলক্ষকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, উপলক্ষটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক, ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে-একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জন ব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনোই সহিতে

পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্রোধ কখনোই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ যতই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড়ো দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বার বার গলাইয়া এই-যে ছাপ দেওয়া হইতেছে, ইহা তো কোনোদিন আর মুছিবে না। এই রাজ-মোহরের ছাপ আমাদের দুঃখ সহার দলিল হইয়া থাকিবে। দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিস পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। কতদিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনোই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ কথাটা সত্য বটে। অমনি সেইসঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড়ো চাকরিপিপাসু বাংলাদেশেও এমন-একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না; উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না; সত্য যখন ঘরের একটি কোণে একটু শিখার মতো দেখা দেন তখনই ঘর-ভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্বে দেশের বড়ো প্রয়োজনের সময়েও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম, কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব সে কেবল দুটি-একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণহস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড়ো কারখানা স্থাপন করিব, বাঙালির এমন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি। তাহা সত্ত্বেও বাঙালি একটা বড়ো মিল খুলিয়াছে, তাহা ভালো করিয়াই চালাইতেছে, এবং আরও এইরূপ অনেকগুলি ছোটোবড়ো উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে, অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য।

কিন্তু যেমন এক দিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম, এতবড়ো শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। স্টীম নানা দিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত— এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভালো করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালোরূপে প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তখন বুঝিতে হইবে,

সে রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে, তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন এক দিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে, কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই এক দিনের উদ্‌যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন-কি, যে টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কী-যে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মতো আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে— আমরা দিতে চাই, আমরা কাজ করিতে চাই— কোথায় দিব, কী করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই— তখনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো-একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্মিত না হয়, তখনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবেই হইতে থাকে, তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মভ্রষ্ট উদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষও তেমনি অসংগত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি, আমি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি; কেহ বা বলি, আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ-সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে, ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেল্‌ফ্‌-গবর্মেন্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্‌ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসল ভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিই বল জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্নসকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান। কর্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংস না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না, এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, মুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাযুজ্যমুক্তিই ভালো না স্বাতন্ত্র্যমুক্তিই শ্রেয়, শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে। কিন্তু সাযুজ্যই বল আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই, অর্থাৎ তাহা কর্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে-সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্বল, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র, সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্যসত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন— তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে, এবং কর্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারংবার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের

অনিষ্টই হইবে। বর্তমান ভারত-শাসন ব্যাপারে একটা উৎকট হিস্টিরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত।

যাহার হাতে বিরাট শক্তি আছে সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মতো দুর্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত, প্রবলই হউক আর দুর্বলই হউক, যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায়, এ কথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনই ভুলি ইহার সত্যতাও তখনই সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম বলিতে কী বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন দিকে সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে এ কথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয় পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেইজন্যই দেখিতে পাই, গবর্মেন্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত-না বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্মেন্টের প্রসাদভোগী পঞ্চায়েত যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড়ো উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্মেন্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রীসভায় যখন সম্প্রদায়-বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয়, আমার উপকারে কাজ নাই, তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না— আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম, দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে, আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেন্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে, নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে; আমরা মা-কালীর কাছে মহিষ মানত করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে, কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবি করিবেন তখন বলিব— মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লও গে। আমরাও কথার বেলায় বড়ো বড়ো করিয়াই বলিব, কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাত দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে জিনিসটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরেজ গবর্মেন্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য এ কথাও সত্য, ইংরেজও যতদূর সম্ভব এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই।

আমাদের ত্রিশ কোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে। সেইজন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেইজন্যই পনেরো বৎসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে-চড়িলেই প্যুনিটিভ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে মনে তাহাদের ধিক্‌কার বোধ হয় না এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। সেইজন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালিকেই বাদ দিয়া মর্লি সেটাকে 'সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট্‌' বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই, ইংরেজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য, তখন ইহার পাল্টাই দিবার জন্য আমরাও উঁহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গি করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা তো সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের শুমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অংকটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে 'হাঁ'কে 'না' করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

এক পক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমরাও কি সেই ভুলটাই করিব; পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা তো কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়; অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশীবর্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ইহারই দুঃখ তো আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন, জেলের দারোগা; লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে; তাহাতে আরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন। কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না, দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব—ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না—সেজন্য অপরাজিতচিত্তে প্রস্তুত হইব; কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে; তাহা সংযমীর দ্বারা, যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সংকোচ-বশত আমি এ কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি; দুঃখ দেবতারই প্রকাশ। সেইজন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্বলকেই হয় স্পর্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্বত্র ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি, তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ

করিব। উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে। প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে; কারণ, কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে, সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্প-শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাংক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারি দিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোটো ছোটো সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কী কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে— নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না— অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না। পাটের খেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গো-পালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারি দিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান

হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়। এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো উদ্‌যোগ নাই, কেবলমাত্র দুর্বল জাতির দাবি এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ, সে সভা দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্‌ সত্যের এবং কোন্‌ শক্তির বলে।

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তার-বশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালো বৈ মন্দ হয় না— কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল। ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়োই হউক, তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে, গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে-সকল ধনীগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি-তদন্ত-জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর-ঐক্য-মূলক সাহস নাই। তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত। যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ-প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপ্‌থিরিয়া রাজযক্ষ্মা টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্‌স্‌প্লয়্‌টেশন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই,

স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীন কালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব। ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ—এগুলি কি আকস্মিক। এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে। সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি, সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়, তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল—রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে। আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস-বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্মে সর্ব বিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলই দূরে চলিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে আর-একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল-সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক-অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে-একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবন্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকল দিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি; আমরা টিঁকিতে পারিব কেমন করিয়া।

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয়পরিমাণে কেবল শহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বন্ধ, তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশী উদ্‌যোগটা তো শহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা।

জগদ্দল পাথর বুকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ পুলিসের বাস্তব মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন। বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন। স্বদেশী-প্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালির সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে এ কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লীসচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা— একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন। কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে। রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা। পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চ পদ লাভ করিয়া এ পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

এ কথা যেন না মনে করি যে দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধান-কালে সংবাদ পাইলাম, পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর্‌, আমি কলিকাতা হইতে বড়ো কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী। পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিঁকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয়, কিন্তু ক্ষীণ রোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারংবার ভাবিতে হইয়াছে— আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে। ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, ‘ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন।’ তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন, ‘বাপু, অন্যকে দোষ দিব কী, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।’

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট্‌ পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এ দিকে প্রজার দুর্বলতা-সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস-কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কাঁচ পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন

বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া।

অবশেষে বর্তমান কালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্‌বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানে না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয়-যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন-কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলাদেশের প্রভিন্‌শ্যাল্‌ কন্‌ফারেন্স যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন, তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ হইতে নানা ধমনীযোগে জীবন-সঞ্চারের বলে কন্‌গ্রেস দেশের স্পন্দমান-হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ মর্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্বকয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে-কয়টি এই :

প্রথম, বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে

আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশ্যন। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিঁকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয়, কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে তবে বুঝিতে হইবে, দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না, অথবা ঐ সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব; যে-সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব; তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ। নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে, এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব। কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্ক-বিতর্ক বিরোধ! কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ-সমস্তই আমাদের, এ-সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে—আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ, এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে-প্রতিষ্ঠিত বীর্যে-বিধৃত জাতীয় সমাজ, এ আমাদেরই কীর্তি। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সমস্তই আমাদের চিন্তা চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্তপদভারে কম্পমান।

১৩১৪

সদুপায়

বরিশালের কোনো-এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেক স্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে দুই ভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা— রাগ প্রকাশ করাটা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কী। সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন-কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেই দিকে লক্ষ রাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অ-পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি, সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান-অংশ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ব-বশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায় তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য-দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারকারবার করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই, এবং বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড়ো নহে; এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সারভাগ শুষিয়া লয় নাই, সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান— সেখানে মুসলমানসংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি-না কেন, এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক-না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল। না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার-সাধনের কাছে আর-কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে-হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না, কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতা-সাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ কথা সত্য নহে। এমন-কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চ মঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কী ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন।

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনও এক মুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, 'দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।' আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, 'ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই, কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না; অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।'

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না, উল্টা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে। আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওআলার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না, এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসা-বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় 'ভাই' শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমলসুরে বাজে না— যে কড়িসুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি, কেবল গানের দ্বারা, কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাস্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন, এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি।

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরেজি-পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই-সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়; অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই-সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি, সেখানকার কোনো-একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে সেইসঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদ্‌দারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা। ইঁহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই-সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না।

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না! 'যাহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না'—দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন-কি ক্ষতিস্বীকার করিয়াও বিলাতি সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য-ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে, ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্‌-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের

লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমন-কি কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া, মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য-সাধন বলে না।

এ-সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনোপ্রকার আপসে অধিকারপ্রাপ্তির মূল্য বোঝে না, তাহারা জোরকেই মানে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন— তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমরা তো প্রাচ্য নই, আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে, আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব, এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতাকে চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না, অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এইপ্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে, মঙ্গলের দিকে, ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী নুন খাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়, নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার, আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি-মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গলসাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, তখনই সে বুঝিবে, আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তখনই সে বুঝিবে, বন্দেমাতরম্‌-মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটোবড়ো সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারি উড়িয়া অথবা অন্য যে-কোনো ইংরেজিশিক্ষায়-পশ্চাদ্‌বর্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনই সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব, ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি, কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনোই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্যপদার্থ মানুষ—সেই সত্যপদার্থ মানুষের হৃদয়বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব; স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উল্টা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা

কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে। দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব। শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভার গ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্ন ভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্ঠিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন-যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্‌যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।[১] এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা-বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান; এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহংকার করে। কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে। সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। কোনো-একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। একটা-কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নব নব সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ দুর্গম— দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে, অহংকারবিসর্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

১৩১৫

---

[১] কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ করিয়া রেলগাড়িতে বোমা ছুঁড়িবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায়, এই লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট

রাজা প্রজা সমূহ

১৯০৮ সালের মধ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থান পেয়েছে আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজা প্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮) এবং স্বদেশ (১৩০৮) গ্রন্থে; ১৯০৮ বা তার পূর্ববর্তীকালে রচিত অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ, যা উল্লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থে সংকলিত হয় নি. সেগুলি ‘পরিশিষ্ট’ অংশে মুদ্রিত।

সার লেপেল গ্রিফিন

কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই। কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার লেপেল গ্রিফিন জুন মাসের ফর্টনাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে-একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি-একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে। ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনই হউক, বাঙালিদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোনো ফল না হউক, আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এইরকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কন্‌গ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানা কারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল, এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই-একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজ দেখে। এজন্য গ্রিফিন-সাহেব ধন্য।

তিনি আরও ধন্য যে, তিনি কোনো যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি। অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি অক্ষমতা এবং অপরিপক্বতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরেজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্বল ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি জিনিসটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে বেচারার কিচিমিচিপূর্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এতপ্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে, অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। গ্রিফিন যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন-সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙালি দুর্বল, অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙালির কোনো স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙালি জিলা-শাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙালি মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে। যদি তাহাদের কোনো অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব গড়া যায়, কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরেজ পুরুষের লেখায় যদি-বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্যাদা থাকে; কারণ, যে লোক সৌভাগ্যবান এবং ক্ষমতাবান তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে। আমাদের মতো যাহারা দুর্ভাগ্য, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই, সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরেজি বড়ো কাগজে বাহির হইয়া থাকে, এবং সেইসঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন বাঙালিকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্বে নিজেদের পার্লামেন্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেন্টের মেম্বর নির্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরেজ-মন্ত্রীসভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

১২৯৯

ইংরেজের আতঙ্ক

১৮৫৫ খৃস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল— পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার উপলক্ষে হান্টার-সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান-সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহুসংখ্যক ভিন্নজাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরূপ অবস্থায় সামান্য সূত্রপাতেই বিপদের আশঙ্কাটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তখন পরিণামের প্রতি লক্ষ করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না— অতিসত্বর সবলে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মে। যখন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণ এইরূপ কোনো কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনি গবর্মেন্টের মাথা ঠান্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। হান্টার বলেন, এরূপ উত্তেজনার সময় ভারত-গবর্মেন্টকে প্রায়ই ঠান্ডা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজ-রাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমতো আইনের সংশোধন, পুলিসের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান-সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনো নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা যাহা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে তো তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যাল্‌কাটা রিভিয়ু পত্রের কোনো ইংরেজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহাতে কেবল দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসীবর্গকে একেবারে সর্ব-সমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবর্মেন্টকে অনুরোধ করিলেন।

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না। আমাদের সংস্কৃতশাস্ত্রে আছে— শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব-আশঙ্কা হয় সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না— নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু যে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন, ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।

ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনি সেটা আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়— তখনি ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

ইংরেজ হঠাৎ কন্‌গ্রেসের মূর্তি দেখিয়া প্রথমটা আচমকা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশত স্বদেশী জুজুকে যতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরেজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কন্‌গ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কন্‌গ্রেসের আর-কোনো ক্ষমতা থাক বা না থাক, গলার জোর আছে— তাহার শব্দ সমুদ্রপার পর্যন্ত গিয়া পেঁচিছে।

সুতরাং এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে— এবং পাঠকদের নিকট সে কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্‌স্‌ তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্‌স্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

হিন্দুজাতির প্রতি পলিটিক্‌সের প্রভাব যে তেমন প্রবল নহে কন্‌গ্রেসই তাহার প্রমাণস্থল হইবার উপক্রম করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই কন্‌গ্রেস অর্থাভাবে দরিদ্র এবং উৎসাহাভাবে দুর্বলের মতো প্রতিভাত হইতেছে। ইংরেজও সম্প্রতি কিছু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর-একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরেজের ধারণা হইল না।

কারণ, ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছে যে, স্বদেশ ও স্বজাতি-রক্ষার জন্য যে হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি-রক্ষার জন্য চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা স্বদেশ আত্মসম্মান মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য, এ কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।

এই কারণে গোরক্ষণী সভাটা ইংরেজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। ফলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমণোপলক্ষে পশ্চিম-ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্য লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে— এখন গোরক্ষকগণ রক্ষা পাইলে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে বটে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না। যে-সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে-সকল কথা যদি প্রকাশ হইত তবে কী হইত। যে প্রকাশ করিত তাহাকে সম্ভবত নির্দিষ্ট রাজ-অট্টালিকায় রাজপ্রহরীগণ-কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত। গোরুও সময়ে সময়ে সকরুণ হম্বারব করে, বাঙালিও সময়ে সময়ে দেশী-বিদেশী ভাষায় আর্তনাদ করিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিম-ভারত একেবারে মূক।

তবে বাহির হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গাজিপুরের জজ ফক্‌স্‌-সাহেব

ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যাসম্বন্ধীয় মকদ্দমার আপীল হাইকোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

ফক্স্‌-সাহেব হিন্দু নহেন; গোজাতির এবং গোবৎসল জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত থাকিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। গোসম্প্রদায়ের প্রতি যদি তাঁহার কোনো পক্ষপাত থাকে সেও কেবল খাদকভাবে।

দ্বিতীয়ত, এই গোহত্যাসম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতি গবর্মেন্টের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে, এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণও বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এমন-কি, বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রও এইরূপ উপদ্রবগুলিকে সতেজে দমন, সবলে দলন করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এরূপ স্থলে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার অপেক্ষা এরূপ মকদ্দমা ইংরেজ বিচারক বিশেষ সতর্কভাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

এমন অবস্থাতেও যদি গবর্মেন্ট ফক্স্‌-সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হন তবে তো তাঁহার হাতে সামান্য শসা-চুরির মকদ্দমাও রাখা উচিত হয় না।

এই-সকল লক্ষণ দেখিয়াই মনে হইতেছে, গবর্মেন্ট কিছু বেশি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভয় পাইলেই আমাদের সর্বনাশ।

কিন্তু ভয় করিতে আরম্ভ করিলে কোথাও নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই। ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়াও ভয় হয়, আবার মূর্খ করিয়া রাখিলেও ভয় আছে।

ইংরেজি শিখিয়া আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি, এবং সাধারণ অভাবমোচনের উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্রপাত হয়। আবার যেখানে ইংরেজি শিক্ষা নাই সেখানে যে কোন্‌ অন্ধসংস্কারের কৃষ্ণবর্ণ বারুদে কোন্‌খান হইতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু গবর্মেন্টের ভয়টা দেখিতে ভালো নহে। কড়া শাসন অর্থাৎ যখন বিচারপ্রণালীর মধ্যে ন্যায় অপেক্ষা বলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়, এবং যখন চতুর্দিক হইতে খোঁচাখুঁচি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি দেশের লোককে ভয় পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখনি বুঝিতে পারি গবর্মেন্টের হৃৎস্পন্দন কিছু অযথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেরূপ উগ্রতায় গবর্মেন্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না, কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

মণিপুরেই গবর্মেন্টের নিজবুদ্ধিদোষে বিভ্রাট ঘটুক আর ভারতের অন্যত্রই হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ-আক্রোশ-বশত ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হউক, গবর্মেন্টের সর্বদা মনে রাখা উচিত, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা এবং অবিচলিত অপক্ষপাত এবং প্রশান্ত ন্যায়পরতা।

কিন্তু গবর্মেন্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিন্দু-মুসলমান-বিপ্লবে বড়োকর্তা ল্যান্স্‌ডাউন, মেজোকর্তা ক্রস্‌থোয়েট, এবং জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটোকর্তাগুলি সকলেই এক পলিসি অবলম্বন করিয়া একভাবে কাজ করিতেছেন কি না জানি না। সার ওয়েডার্‌বর্ন্‌ লিখিয়াছেন, এই-সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেন্টের কিছু হাত আছে; ল্যান্স্‌ডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।

আমরা বলি, গবর্মেন্টের পলিসি যেমনই থাক, ইংরেজ কর্মচারীগণ গবর্মেন্টের যন্ত্র নহে, তাহারা মানুষ। আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের বিরাগ অনুরাগ মতামত খাটাইবার যথেষ্ট অবসর আছে। কন্‌গ্রেস এবং শিক্ষিত বাবুদের আচরণে তাহাদের যদি এমন ধারণা হয় যে হিন্দুমুসলমানদিগকে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক, তবে তাহারা ছোটোবড়ো এত উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্বেষবীজ বপন করিতে পারে যে, গবর্মেন্টের পরম উদার সদভিসন্ধি তাহার নিকট হার মানে।

গবর্মেন্টের আইন কাহাকেও ঘৃণা করে না, ভয় করে না, পক্ষপাত করে না; কিন্তু ইংরেজ করে। পায়োনিয়র ইংলিশ্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরেজি কাগজগুলো যখন কন্‌গ্রেসের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ

করে এবং বাবুদের প্রতি সরোষ অবজ্ঞা-বর্ষণের চেষ্টা করে তখন ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে অবিচলিতচিত্তে থাকে তাহা নহে। এই-সমস্ত বিদ্বেষভাব সর্বসাধারণ ইংরেজের মধ্যে প্রতিদিন ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে, এবং যাহার হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে যে নানা উপায়ে কার্যত সেই ভাবকে প্রকাশ করে এবং একটা গোপন পলিসি অবলম্বন করিয়া কন্‌গ্রেস প্রভৃতিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেন্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল ইংরেজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই-সমস্ত ব্যাপারগুলি ঘটিতেছে।

১৩০০

রাজা ও প্রজা

সিভিলিয়ান রাডীচি-সাহেব আইনলঙ্ঘনপূর্বক উড়িষ্যার কোনো-এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফ্‌টেনান্ট গবর্নর ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব অন্যায়কারীকে এক বৎসরের জন্য নিগৃহীত করিয়াছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলে ব্রিটিশ-শাসনাধীনে এরূপ ঘটনা আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণের নিকট এই ন্যায়বিচারটি আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই কারণে মূঢ়মতি সাধারণ কিছু সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনতিকাল পরেই ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব যখন যথাসময়ে এলিয়ট-সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট আসিয়া ম্যাক্‌ডোনেলের বিচার লঙ্ঘন-পূর্বক রাডীচিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন আবার মূঢ়মতি সাধারণ সবিশেষ শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্তার ইচ্ছা কর্ম। কর্তাই জানেন এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন, আমরা কেবল অন্ধকারে অনুমান করিয়া মরিতেছি মাত্র। এমন হইতে পারে যে, সিভিলিয়ানের প্রেস্টিজ সিভিলিয়ান রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক হইল না। কারণ, এই ঘটনায় সাধারণের নিকট ম্যাক্‌ডোনেলের, এমন-কি গবর্মেন্টের প্রেস্টিজ নষ্ট হইল।

অনুমান করিতে গিয়া নানা লোক নানা কথা বলিতেছে; তাহার সব কথাই মিথ্যা হইতে পারে। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, গবর্মেন্টের পলিসি গবর্মেন্টই জানেন, আমরা সেই পলিসির দ্বারা পরিচালিত অন্ধ পুত্তলিকা মাত্র।

সেই কারণে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ান্যায়-বিচারে আমরা যে অকস্মাৎ অতিমাত্র হর্ষশোক প্রকাশ করিয়া থাকি সে আমাদের মোহবশত। যেখানে কর্তার ইচ্ছা কর্ম, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব এবং মর্জির উপরে আমাদের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করিতেছে, সেখানে ভালো এবং মন্দ, ন্যায় এবং অন্যায় উভয়ই আকস্মিক ক্ষণিক ঘটনা

মাত্র। ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, এলিয়ট-সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে; আমরা নিতান্তই উপলক্ষ।

তথাপি আঘাতে ব্যথিত এবং আদরে সুখী না হইয়া আমরা থাকিতে পারি না। কিন্তু কিরূপ হইলে আমাদের যথার্থ সুখের এবং জাতীয় গৌরবের কারণ হয় তাহা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

সে আর কিছুই নহে; যখন আমাদের সাধারণের মধ্যে ন্যায়ান্যায়বোধ এমন সুতীব্র এবং সচেতন হইয়া উঠিবে যে অপমানে অন্যায়ে আমরা সকলে মিলিয়া যথার্থ বেদনা বোধ করিতে থাকিব এবং সেই ন্যায়ান্যায়বোধের খাতির রক্ষা করা গবর্মেন্টের একটা পলিসির মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইবে তখন আমরা যথার্থ আনন্দ করিতে পারিব।

সাধারণত ধর্মবুদ্ধি কর্মবুদ্ধি লোকনিন্দা সব-ক'টায় মিলিয়া আমাদিগকে কর্তব্যপথে চালনা করে। আমাদের গবর্মেন্টের কর্তব্যনীতি অনেকটা পরিমাণে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেছে, প্রজাদিগের ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত তাহার যোগ অতিশয় অল্প।

সকলেই জানেন, ধর্মবুদ্ধির সহিত কর্মবুদ্ধির বিরোধ বাধিলে অনেক সময় শেষোক্ত শক্তিটিরই জয় হইয়া থাকে, সেই দ্বন্দ্বের সময় বাহিরের লোকের ন্যায়ান্যায়বোধ ধর্মের সহায় হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে। যখন দেখিব প্রজার নিন্দা-নামক শক্তি গবর্মেন্টের রাজকার্যের মধ্যে আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে তখন আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।

এই প্রজানিন্দা না থাকাতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজের কর্তব্যবুদ্ধি ক্রমে অলক্ষিতভাবে এত শিথিল ও বিকৃত হইয়া আসে যে, ইংলন্ডবাসী ইংরেজের নৈতিক আদর্শ হইতে তাহাদের আদর্শের বিজাতীয় প্রভেদ হইতে থাকে। সেই কারণে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এক দিকে আমাদিগকে ঘৃণা করে, অপর দিকে স্বদেশীয় ইংরেজের মতামতের প্রতিও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে— যেন উভয়েই তাহার অনাত্মীয়।

ইহার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে; তাহার মধ্যে একটি কারণ এই যে, ইংলন্ডে যে সমাজনিন্দা ইংরেজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে ভারতবর্ষে তাহা অত্যন্ত দূরবর্তী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ তাহার প্রভাব বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহার উপরে আবার আমাদের সহিত ইংরেজের অনেকটা স্বার্থের সম্পর্ক এবং আমাদের প্রতি তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই, সুতরাং এখানে কর্তব্যবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ইংরেজের পক্ষে নানা কারণে কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য স্বার্থের সহিত, ক্ষমতাগর্বের সহিত, পরাধীন দুর্বল জাতির নৈতিক আদর্শের সহিত, পরজাতিশাসনতন্ত্রের বিবিধ কুটিলতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ইংরেজের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে, তাহাকে অনেক সময় ইংলন্ডের ইংরেজ ভালো করিয়া চেনে না।

কোনো কোনো প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এই নূতন পদার্থটিকে ইংলন্ডে ভালোরূপে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিভাবলে দেখাইতেছেন, এই নূতন পদার্থের নূতনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্‌লিঙের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাবলে তিনি ইংরেজের কল্পনাচক্ষে প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালার মতো দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলন্ডের ইংরেজকে বুঝাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্ট একটি সার্কাস কম্পানি। তাঁহারা নানাজাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্যজগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন। একবার সতর্ক অনিমেষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেই সব-কটা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতীক্ষ্ম কৌতূহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথা-পরিমাণে চাবুকের ভয় এবং অস্থিখণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে এবং কিয়ৎপরিমাণে পশু-

বাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কাস রক্ষা করা দুষ্কর হইবে এবং অধিকারীমহাশয়ের পক্ষেও বিপদের সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বলে প্রবল মনুষ্যজন্তুদিগকে শাসনে সংযত রাখিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির নির্দেশে তাহাদিগকে নিরীহ নৃত্যে প্রবৃত্ত করার ছবিটি ইংরেজের কাছে কৌতুকজনক মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা। ইহাতে ইংরেজের মনে নৃতনত্বের কৌতূহল এবং স্বজাতিগর্বের সঞ্চার করে, এবং আসন্ন বিপদকে শাসনে রাখিবার যে-একটি সুতীব্র আনন্দ আছে তাহাও ইংরেজ-প্রকৃতির নিকট পরম উপাদেয় রূপে প্রতীয়মান হয়।

এ দিকে ইংলন্ডে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের দলও দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সাহিত্যও বিস্তারলাভ করিতেছে। ইংলন্ডের ভূমিতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের মত ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া শাখাপল্লবিত হইতেছে। এই স্থলে ন্যায়ানুরোধে এ কথাও বলিয়া রাখা উচিত, অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভারতকার্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া নিঃসহায় ভারতবাসী-দের প্রতি পরম হিতৈষিতাচরণ করিতেছেন।

এই-সকল কারণে স্বদেশস্থ ইংরেজের মধ্যেও একদল সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে যে-সকল কর্তব্য পালন করিয়া চলেন তাহার অধিকাংশই প্রাচ্যদেশীয় ভিন্নজাতীয় জীব-সকলের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে কুইক্সটোচিত বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় কি না, তাহাতে দ্বীপবাসী সভ্যজাতির বোধশক্তির সংকীর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় কি না এবং সম্ভবত তাহাতে ভিন্নজাতীয় জীবের অনিষ্ট হয় কি না। হার্বার্ট্ স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকের মত এই যে, সভ্যতার তারতম্য অনুসারে নৈতিক আদর্শের তারতম্য কেবল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা নহে, অভিব্যক্তির নিয়মে তাহা আবশ্যক।

এই-সকল মতের সত্যাসত্য অন্য সময় বিচার হইবে; আপাতত এইটুকু বলিতে পারি, ইহার ফল আমাদের পক্ষে বড়ো পীড়াজনক। বেহারপ্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনোকালেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে। উহাদিগকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিতে হইবে। এ-সকল কথা পূর্বাপেক্ষা আজকাল যেন অধিকতর মুক্তকণ্ঠে বলা হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই, যদি-বা স্বীকার করা যায় যে স্বাধীনতাপ্রিয় য়ুরোপের কর্তব্যনীতি চিরপরাধীন প্রাচ্যদেশে সর্বথা উপযোগী নহে, তথাপি যখন আমাদের রাজা য়ুরোপীয় তখন প্রাচ্যদেশের স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এই প্রাচ্যদেশে স্বাভাবিক নিয়মে যে রাজ্যতন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া উঠিত তাহা বর্তমান ইংরেজ-রাজ্যতন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকারের হইত। হয়তো এক দিক হইতে দেখিতে গেলে রাজার যথেচ্ছ প্রতাপ এখনকার অপেক্ষা অধিক মনে হইত, তেমনি আবার অন্য দিকে রাজার প্রতাপ খর্ব করিয়া প্রজাদের ইচ্ছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত। স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কেবল স্বাভাবিক নিয়মেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইংরেজ হাজার ইচ্ছা করিলেও কেবল পলিসির দ্বারা তাহা ঘটাইতে পারে না।

অতএব ইংরেজ আমাদের সহিত কেবল ইংরেজের মতোই ব্যবহার করিতে পারেন; যদি ইচ্ছাপূর্বক তাহা বিকৃত করেন তবে সে কেবল দুর্ব্যবহার হইবে, কোনোকালেই ভারতবর্ষীয় ব্যবহারে পরিণত হইতে পারিবে না। তাঁহাদের নিজের আদর্শ তাঁহারা ভাঙিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্থলে গড়িবেন কী এবং গড়িবেন কী করিয়া। মাঝে হইতে চিরাভ্যস্ত স্বদেশী আদর্শ-চ্যুত ইংরেজ আমাদের পক্ষে বড়ো-একটি ভয়ংকর প্রাণী হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। রাড্‌ইয়ার্ড্ কিপ্‌লিং প্রভৃতি লেখকের লেখার মধ্যে যে-একটি বলদর্প-মিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস অনুভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয়, মানব মধ্যে মধ্যে সভ্যতার শততন্তুনির্মিত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম আরণ্য প্রকৃতির বর্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অ্যাংলো-

ইন্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে-এক সুতীব্র ক্ষমতা-মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতাদম্ভ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ-আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে; তাহা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।

দ্বিতীয় কথা এই, আজকালকার উপন্যাসে লেখকেরা প্রাচ্য প্রকৃতিকে পাশ্চাত্যদেশের নিকট যতটা রহস্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন তাহার অনেকটা কাল্পনিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহস্র যোগ আছে। অন্তরের সাদৃশ্য অনেক সময় বাহ্য বৈসাদৃশ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র। আধুনিক লেখকগণ সেই বাহ্য বৈসাদৃশ্যগুলির নূতনত্বকে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থে রঞ্জিত অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে থাকেন এবং সুগভীর সাদৃশ্যগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টাও পান না ক্ষমতাও রাখেন না।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলন্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

এরূপ অবস্থায় আমাদের ন্যায়ান্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরেজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরেজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

সম্প্রতি তাহার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ইংরেজের কোনো অন্যায় দেখিলে ভারতবর্ষ আপন দুর্বল কণ্ঠে সভ্যতা ও নীতির দোহাই পাড়িতে থাকে। সেজন্য ইংরেজ রাগ করে বটে, কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকিতেও হয়।

তথাপি এখনো সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। আমাদের সম্বন্ধে সকল সময়ে সকল অবস্থায় নীতি মানিয়া চলাকে ইংরেজ দুর্বলতা-স্বীকার বলিয়া দেখে। আমাদের প্রতি অপরাধ করিয়া তাঁহাদের কেহ ন্যায়বিচারে দণ্ডনীয় হয় ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন, ভারতবর্ষীয়ের নিকট ইহাতে ইংরেজের জোর কমিয়া যায়।

রাজপুরুষদিগের মনের ভাব ঠিক করিয়া নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু বোধ করি রাডীচি-সাহেবের অসময়ে পদোন্নতি উপরি-উক্ত পলিসিবশত। বিশেষত যখন দেখা যায় এমন ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে তখন সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। গবর্মেন্ট যেন নীরবে বলিতেছেন যে, তোমাদিগের কাহাকেও অন্যায় উৎপীড়ন ও অপমান করিয়া কোনো কর্তৃপুরুষের লাঞ্ছনা হইতে পারে ইহা মনে করাই তোমাদের পক্ষে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধায় পদাঘাত করিবার জন্য যদি-বা প্রথা উল্লঙ্ঘন, যদি-বা রাজশাসনের অনাদর করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। ইংরেজ ন্যায়পরতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ধর্মবিচারেরও অতীত।

সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্প্রতি দুই-একটি ঘটনায় দেখা গিয়াছে, গবর্মেন্ট কেবল ইংরেজ নহে, নিজের কর্মচারীমাত্রকেই ন্যায়বিচারের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে চাহেন। বালাধন-হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমায় ইংরেজ জজ হইতে বাঙালি পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত যে-কেহ লিপ্ত ছিল, হাইকোর্টের বিচারে যাহারা প্রত্যেকে প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই বাংলা-গবর্মেন্টকর্তৃক পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছে।

আমরা বাহিরের লোক, রাজনীতির ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। হয়তো ইহার মধ্যে কোনো গোপন কারণ থাকিতে পারে। হয়তো কর্তার এমন ধারণা হইতে পারে যে, বালাধনের মকদ্দমায় স্থানীয় জজের বিচার অন্যায় হয় নাই— যেমন করিয়া হউক, গোটা পাঁচ-সাত লোকের ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের এমন সংস্কার হইতে পারে যে, আদালতে টিঁকিবার যোগ্য প্রমাণ না থাকিলেও ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং সে সত্য স্থানীয় বিচারকই কেবল নির্ণয় করিতে পারে, হাইকোর্টের জজের পক্ষে অসাধ্য।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রকাশ্যে যাহাদের ব্যবহার নিন্দিত হইয়াছে, সাধারণের নিকটে যাহারা অন্যায়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক তাহাদিগকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিলে জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়জ্ঞানের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। সকলকে বলা হয়, তোমাদের কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনোরূপ কৈফিয়ত দিবার কোনো আবশ্যক দেখি না; তোমরা ভালোই বল মন্দই বল তাহাতে গবর্মেন্টের কোনো মাথাব্যথা নাই— আমাদের ভারি স্ট্রং গবর্মেন্ট।

যে গবর্নর প্রজার মর্মবেদনার উপর, প্রজার ন্যায়ান্যায়বোধের উপর জুতার গোড়ালি ফেলিয়া ফেলিয়া চলেন এবং সেই মচ্‌মচ্‌-শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন, তিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ায় স্ট্রং গবর্নর।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বল প্রকাশ পায়, না, আমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্বলতার সূচনা করে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। গবর্মেন্টের এরূপ উদ্ধত অবজ্ঞায় ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়বোধ এমন প্রবল নহে যে, তাহার নিকট সংকোচ অনুভব করা যায়। বরঞ্চ এই চিরনিপীড়িত জাতির নিকট নিঃসংকোচ স্বেচ্ছাচারই যথার্থ বলের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

আমরা যদি রাজপুরুষগণকে এমন কথা বুঝাইতে পারি যে. ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিলে সেটাকে আমরা বাহাদুরি জ্ঞান করি না, অন্যায় যতই বলিষ্ঠ দেখিতে হউক আমাদের প্রাচ্য স্বভাবেও তাহা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সুদৃঢ় নিরপেক্ষ ভাবে সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি যথোচিত ন্যায়দণ্ড বিধান করিবার সাহস না থাকা আমাদের নিকট দুর্বলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে, তবে আমাদের সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে ইংরেজ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, কারণ সে আদর্শের সহিত তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধান-চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টের ন্যায়পরতা কদাচ স্বার্থ পলিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হইবে না, অটল পর্বতের ন্যায় প্রজাহৃদয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন ইংরেজের সদ্‌ব্যবহার শুভদৈবক্রমে ক্ষণিক অনুগ্রহের ন্যায় আমাদের নত মস্তকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে না, সম্মানের ন্যায় আমাদের নিকট আহরিত হইবে; আজ যাহা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছি তখন তাহা অধিকারের ন্যায় গ্রহণ করিব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে— উপদেশ সহজ, কিন্তু উপায়টা কী। তাহার উত্তরে বলিতে হয়, কোনো যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না; তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে, প্রত্যেককে প্রাণপণ করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ভ্রাতা এবং সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়াচরণের অটল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নিজের ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভালো কথার ন্যায় এ কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন, এবং অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতন সুদীর্ঘ প্রকাশ্য পথ ছাড়া স্থায়ী কল্যাণের আর কোনো নূতন সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৩০৯

প্রসঙ্গ-কথা

১

কলিকাতায় প্লেগ-রেগ্যুলেশন যে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠে নাই সেজন্য আমাদের নব বঙ্গাধিপের প্রতি বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যমদূতের উৎপীড়নের সহিত রাজদূতের বিভীষিকার যোগ হইলে প্রজাগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু সেইটে নিবারণ হইয়াছে বলিয়াই যে একমাত্র আনন্দ তাহা নহে; ইহা অপেক্ষা গুরুতর সুখের কথা আছে।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করিয়া দেখিয়াছি, প্রজারা যখন কোনো-একটা বিষয়ে একটু বেশি জিদ করিয়া বসে তখন গবর্মেন্ট তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন— পাছে প্রজা প্রশ্রয় পায়।

সেইজন্য আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যে-সমস্ত কোলাহলকে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন নাম দিয়া থাকেন তাহাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আমরা সদুপায় বলিয়া মনে করি না। কারণ, গবর্মেন্ট এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণ যখন এই-সকল অ্যাজিটেশন্‌ওআলাকে আপনাদের বিরুদ্ধদল বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন তখন তাঁহাদের সংগত প্রস্তাবেও কর্ণপাত করিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধা হয়। মনে হয়—এ কথা পাছে সাধারণে মনে করে যে, আমরা দায়ে পড়িয়া হার মানিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকজন উদ্ধত লোকের বাক্‌শক্তি-দ্বারা চালিত হইলাম, পাছে কেহ ভুলিয়া যায় যে ভারতবর্ষে আমাদের ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।

অ্যাজিটেশন্‌কারীগণও ভিতরে ভিতরে তাহার আভাস পাইয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহারে এরূপ অনুমান করা যায়। কারণ, এবারে যে নিদারুণ আইনের দ্বারা নাটুহরণ-ব্যাপার ঘটিল সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের বাগ্মীসভাসমূহ অভূতপূর্ব বিজ্ঞতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন। আমরা গোল করিতে বসিলেই পাছে গবর্মেন্টের মন আরও বিগড়িয়া যায় হয়তো এ আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল।

যাহাই হউক, বর্তমান ব্যাপারে আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গবর্মেন্ট প্রজাদের মন রক্ষা করিতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই। গবর্মেন্ট এবং এ-দেশী ইংরেজ-সম্প্রদায় বলিতেছেন যে, প্রজারা যখন পুব-দেশী, এবং পরিবারমণ্ডলীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে উহাদের যখন এতই দৃঢ় সংস্কার, তখন সেটা বিবেচনা করিয়া এবং যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কাজ করাই রাজার কর্তব্য।

আমাদের বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, প্লেগ-দমন একমাত্র ভারতবর্ষের হিতের জন্য নহে। তাহাতে ইংরেজের ভয় আছে, বাণিজ্যের ক্ষতি আছে। এরূপ স্থলে প্রজাদের পুব-দেশী সংস্কার বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হওয়ায় প্রাচীলক্ষ্মীর সকরুণ নেত্রযুগল আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন অকস্মাৎ সৌভাগ্য আমরা আশাও করি নাই। কারণ, যে দুর্ভিক্ষ-ভূকম্প-মহামারীর প্রলয়পীড়নে অন্য কোনো দেশ আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ নৈরাশ্যে উদ্দাম হইয়া উঠিত, ভারতবর্ষ তাহা অবিচলিত ধৈর্য-সহকারে সহ্য করিয়াও কর্তৃপক্ষের করুণা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশের এই পরম দুঃসময়ে গবর্মেন্ট উপর্যুপরি তাঁহার কঠোরতম বিধি ও শাসনের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা সৃজন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমা ধৈর্য ও সমবেদনা—ফৌজ কেল্লা ও গুলিগোলার অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল।

পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবর্দস্তি—ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে, বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এবার প্যুনিটিভ পুলিস, নাটু-নিগ্রহ, সিডিশন-বিলের দ্বারা গবর্মেন্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্প-সংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না।

মারীগ্রস্ত পুনা যখন গোরা সৈন্যের আতঙ্কে মুহুর্মুহু কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল তখন কর্তৃপক্ষ সেই আর্তনাদকে প্রজার স্পর্ধা বলিয়া গণ্য করিলেন। তখন তাঁহারা প্রবলজনোচিত ঔদার্য অবলম্বন করিলেন না; সকরুণচিত্তে এটুকু বিবেচনা করিলেন না যে, দুর্ভাগাগণের অন্তিমশয্যা হইতে অন্তত একটা অসংগত বিভীষিকা দূর করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। স্বীকার করিলাম, গোরা সৈন্যগণ শিষ্ট শান্ত সংযত এবং দেশীয় লোকদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু দেশের মূঢ় লোকের যদি এমন-একটা সুদৃঢ় অন্ধ সংস্কার জন্মিয়াই থাকে যে, গোরা সৈন্য দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং শ্রদ্ধা-অভাবে দেশীয় লোকের প্রতি অবিবেকী, তবে সেই চরম সংকটের সময় বিপন্ন ব্যক্তিদের একটা অনুনয় রক্ষা করিলে, দুর্বলতা নহে, মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত।

দেখিলাম, গবর্মেন্টের উত্তরোত্তর রাগ ও জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যত বেদনা শাসনকর্তা সেখানে তত আঘাত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভারতবর্ষের আদ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল, কোথাও গোপনে গুমরিয়া উঠিল। এ দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে এরূপ ক্ষুব্ধ অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিল। ভাবিলাম, শংকরের অপেক্ষা তাঁহার ভূতপ্রেতগুলার ভয় বেশি—এবং ভারত-গবর্মেন্টের যেরূপ মেজাজ তাহাতে প্লেগ অপেক্ষা প্লেগ-রেগ্যুলেশন বেশি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। সতর্ক থাকিলে প্লেগের হস্ত অনেকে এড়াইবে, কিন্তু রেগ্যুলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।

এমন সময় বুড্‌বর্ন্‌-সাহেব মাভৈঃধ্বনি ঘোষণা করিলেন। বুঝিলাম, বাংলাদেশে রাজার অভ্যুদয় হইয়াছে; এখানে রেগ্যুলেশন-নামক এঞ্জিনের শাসন নহে, রাজার রাজ্য। ইহাতেই রাজ-ভক্তি জাগিয়া উঠে। রাজার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার সহিত একভাবে মিলিতে পারে ইহা জানিতে পারিলে রাজাকেও মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করি এবং আপনার প্রতিও মনুষ্য বলিয়া শ্রদ্ধা জন্মে।

এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, আজকাল কিপ্‌লিং প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণের উপন্যাসে ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীবর্গ যেরূপ বর্ণে চিত্রিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের মধ্যে এ-দেশীয়দের বিরুদ্ধে ক্রমশই যে-একটা সাম্প্রদায়িক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিঘাতস্বরূপে উত্তরোত্তর ভারতবাসীর মনে ইংরেজ ও সর্বপ্রকার ইংরেজি প্রভাবের প্রতিকূলে যে-একটা পরাঙ্মুখভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, অল্পে অল্পে তাহার প্রতিকার-সাধন করিতে পারেন পশ্চিমের ম্যাক্‌ডোনেল, এবং আশা করি আমাদের বুড্‌বর্ন্‌-সাহেবের ন্যায় ক্ষমা-ধৈর্য-পরায়ণ সহৃদয় শাসনকর্তৃগণ। কঠিন আইন ও জবর্দস্তিতে সম্পূর্ণ উলটা ফল ফলিবে, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

এখন, এমন-একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজ এবং দেশী উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার, অন্যায় বিচার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

কিন্তু ক্ষমতা যাহার হস্তে বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে। আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে। উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে।

কিন্তু দুই দিক বিচার করা কাজটা কঠিন, বিশেষত দুই দিকের মধ্যে এক দিক যখন নিজের দিক। তথাপি নীতিতত্ত্ববিৎমাত্রেই বলিয়া থাকেন, পরের অপেক্ষা নিজেকে কঠিন বিচারাধীনে

আনিলে নিজের পক্ষেই মঙ্গল। ঈসপের কথামালায় আছে—কানা হরিণ পরপারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাস খাইত, তাহার নিজ পারের দিক হইতেই ব্যাধের শর তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল। নিজের দিকে সকলে কানা, এইজন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ সেই দিকেই প্রবল হইয়া উঠে।

আমাদেরও সেই দশা, ইংরেজেরও তাই। যাহা সর্বাগ্রে আমাদের নিজের কর্তব্য তাহার প্রতি আমরা উদাসীন এবং গবর্মেন্টের কর্তব্যের প্রতি আমাদের শত চক্ষু এবং সহস্র জিহ্বা। ইংরেজেরও প্রজার সামান্যমাত্র চাঞ্চল্যের প্রতি রুদ্র রূপ, কিন্তু নিজে যে প্রতিদিন ঔদ্ধত্য ও অবমাননার দ্বারা প্রজাসাধারণকে নানা আকারে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন তাহার বিষময়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য থাকাতে তাহা প্রশ্রয় পাইয়া বিরাটমূর্তি ধারণ করিতেছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা একটা উদাহরণ দিতেছি। অনিচ্ছার কারণ এই, বারংবার নিজেদের এই-সকল হীনতার দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে সংকোচ বোধ হয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনা যায়, গোরা সৈন্য শিকার-উপলক্ষে এ দেশী গ্রামবাসীর হত্যার কারণ হইয়া পড়ে। মান্দ্রাজে ঘণ্টাকুলের হত্যা ব্যাপারে দেশীয় দ্বাররক্ষীর মহত্ত্ববিবরণ এমন জড়িত রহিয়াছে যে, তাহা বিস্মৃত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সুকঠিন।

দেশীয় লোককে হত্যা করিয়া এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে কেবল বহুকাল পূর্বে একজন ইংরেজের ফাঁসি হইয়াছিল। অভিযুক্তগণ খালাস পাইয়াছে। অবশ্য, সেটা প্রমাণ এবং ইংরেজ জজ ও জুরির বিচার ও বিশ্বাসের কথা। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা বারংবার না ঘটিতে পারে গবর্মেন্ট তজ্জন্য কোনো বিশেষ বিধান করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহাতে করিয়া কোনো পোলিটিকাল কুফল সঞ্চিত হইতেছে না এমন কে বলিতে পারে।

সম্প্রতি ব্যারাকপুরে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি ভদ্রলোক তিনজন গোরা সৈন্যের দ্বারা যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। অবশ্য ইহার বিচার হইবে এবং দোষীগণ দণ্ড পাইবে এমনও আশা করা যাক। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ-চালিত কোনো খবরের কাগজে এই নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষে কিছুমাত্র বিরক্তি খেদ অথবা রোষ প্রকাশ হইয়াছে? প্রমাণের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া আদালতের হস্ত হইতে দোষী নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ-সাধারণের ক্ষুব্ধ ন্যায়ানুরাগ যদি এই পাপকার্যকে লেশমাত্র লাঞ্ছিত না করে তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়।

অথচ হাওড়ায় কোনো-একটি য়ুরোপীয়-হত্যা লইয়া সেই-সকল ইংরেজি কাগজের ইংরেজ পত্রপ্রেরকগণ কিরূপ উত্তেজনা ও আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন।

হাওড়ার এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং তাহার বিচার কঠিন ও দণ্ড সুকঠোর হইবে না এমন আশঙ্কাও কেহ মনে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু উভয় হত্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। জনসাধারণ যখন অমূলক অথবা সমূলক আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠে তখন তাহারা যেরূপ ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তাহা অন্য দেশের তুলনায় এ দেশে কিছুই নহে। সেইরূপ উত্তেজিত অবস্থায় যে দুই-একটা অন্যায় হত্যা সংঘটিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কী আছে। কিন্তু ব্যারাকপুরে বিনা কারণে যে হত্যা ঘটিয়াছে তাহার মূলে বহুকালের স্পর্ধা ও প্রশ্রয় আছে—প্লেগ ঘটিত উত্তেজনা ক্বচিৎ-সম্ভাব্য, কিন্তু শেষোক্ত কারণ-জনিত দুর্ঘটনা ধারাবাহিক। তাহার বিষবীজ সংক্রামক এবং স্থায়ী।

একটি গোরা পুনা-রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল, তাহার বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনজনের গায়ে গুলি লাগে। আঘাত অতি সামান্য, এবং সে হিসাবে অপরাধ গুরুতর নহে। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যে-একটা নিষ্ঠুর অবজ্ঞা অবহেলা আছে তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক, এবং কর্তৃপুরুষের পক্ষেও চিন্তার কারণ হওয়া উচিত ছিল। অপরাধী স্বীকার করিয়াছে যে, 'He fired at a coffee shop sweeper for a lark'—অর্থাৎ, সে কেবলমাত্র মজা করিয়া একজন কফি-দোকানের ঝাড়ুদারকে গুলি করিয়াছিল। এই গুলি ঝাড়ুদারের গাত্রে

অধিক দূরে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু এইরূপ মজা ভারতবর্ষের মর্মের মধ্যে গভীররূপে নিহিত হইয়া থাকে।

এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, যে জাতি অতিমাত্রায় নিরীহ তাহাকে পদে পদে আঘাত ও অপমান হইতে রক্ষা করিতে কোনো গবর্মেন্টই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই-সকল ক্ষুদ্র বিপদ হইতে নিজের পৌরুষই নিজেকে উদ্ধার করে। ইহার জন্য কাহারও কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়ার মতো লজ্জা আর নাই।

সেইজন্য ছোটোখাটো উপদ্রব এবং অপমানের কথায় নিজেদেরই প্রতি ধিক্‌কার জন্মে। সেতারার স্কুল-মাস্টারের কুণ্ঠিত সেলাম সাহেবের পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়ায় যে-একটা লাঞ্ছনা ও নালিশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা লজ্জাজনক জ্ঞান করি। প্রত্যক্ষ অপমান যে দেশে সুমন্দগতিতে সুদূর নালিশে গিয়া গড়ায় সে দেশের অপমানেরও শেষ নাই।

কিন্তু যাহারা সুদীর্ঘ কাল শান্তভাবে সহ্য করে তাহারাই যে অকস্মাৎ একদিন তাহাদের চিরসঞ্চিত নীরব নালিশ অন্তর্জ্বালার সহিত উদ্‌গীর্ণ করিতে পারে এ কথা সকলেই ভুলিয়া যায়—এমন-কি তাহারা নিজেরাও পূর্বে হইতে বলিতে পারে না। এইজন্য যখন তাহারা হঠাৎ সামান্য উপলক্ষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তখন তাহাদের নিরর্থক আচরণ অত্যন্ত অসংগত বলিয়া বোধ হয়। লোকে ভুলিয়া যায়, বহুকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনা অবিচার অবিশ্বাস অপমান হঠাৎ একটা তুচ্ছ মন্ত্র-বলে বিরাট আকার ধারণ করিয়া উঠে। মনে হয়, সে যেন একটা আকস্মিক অতিপ্রাকৃত দৈবসৃষ্টি, কেহ যেন পূর্বে হইতে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু তাহা আকস্মিক নহে, অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিশয় মন্দগতিতেই প্রাকৃত নিয়মের রাজপথ দিয়া সে চলিয়া আসে, তাহার মৌন দীনভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না।

পূর্বদেশীয়দের এই নীরব সহিষ্ণুতা যাহাতে পশ্চিমদেশীয়দিগকে অলক্ষ্যে অসতর্কতা ও ঔদ্ধত্যে লইয়া যায়, ইহাই প্রাচ্য প্রজা ও পাশ্চাত্য রাজা উভয়েরই পক্ষে বিপদের মূল। ইহা হইতেই গোরা সৈন্যদের মজার খেলা ও কালা আদমিদের অকস্মাৎ উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়।

যাহা হউক, এইরূপ সংঘটন এবং সংঘর্ষে প্রজাদের আন্তরিক সন্তাপ যে কিরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা পরিমাণ করিবার উপায় নাই। যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড়, এবং ‘শুয়ের নিগর’ সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কী প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না. এবং যে ইংরেজসমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত।

আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এইপ্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব। তাঁহারা আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বদাই আমাদের মর্মস্থানকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন। এমন-কি, তাঁহাদের মধ্যে এমন মূঢ়চেতারও অভাব নাই যাঁহারা অসহ্য অবজ্ঞার আঘাতে প্রজাহৃদয়ে অপমানক্ষত সর্বদা জাগাইয়া রাখাই রাজনৈতিক হিসাবে কর্তব্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা পথে চলিতে চাবুক তুলিয়া সেলাম শিখাইতে শিখাইতে অগ্রসর হন।

ইহাকেই বলে প্রজাবিদ্রোহ এবং নিয়ত এই বিদ্রোহেই প্রজার হইয়া প্রজাপতির কালাগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ইংরেজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন। প্রজাদের সংবাদপত্র সভাসমিতি এবং বাগ্মীবর্গ আছে, রুদ্রমূর্তি রাজা মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বাগরোধ করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু প্রজাপতির সভা নিঃশব্দ নীরব এবং তাঁহার বিচার সুচির কিন্তু সুনিশ্চিত।

১৩০৫

২

পরজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ যে স্বাভাবিক এবং কিয়ৎপরিমাণে তাহার সার্থকতা আছে এ সম্বন্ধে সম্প্রতি ইংরেজি স্পেক্টেটর পত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

একটা জাতি বাঁধিয়া তুলিতে অনেক সময় যায়। আজ যাহারা ইংরেজ-জাতি বলিয়া খ্যাত তাহারা জুলিয়স সীজরের আক্রমণকাল হইতে এড্‌ওঅর্ড দি কন্‌ফেসরের রাজত্বকাল পর্যন্ত হাজার বৎসর ধরিয়া পরিপাক পাইয়া তবে প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে কেল্‌ট্‌ রোমান অ্যাঙ্গ্‌ল্‌ জুট ডেন স্যাক্‌সন নর্মান প্রভৃতি বিচিত্র ভিন্ন জাতি এক ঐতিহাসিক চুল্লির উপরে চড়ানো ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ ও বিরোধ ঘুচিয়া যখন তাহারা ঘনভাবে এক হইয়া উঠিল তখন তাহারা ব্রিটিশ-জাতিরূপে গণ্য হইল।

এত দীর্ঘকালনির্মিত জাতীয়তা পরের সংঘাত হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই উদ্যত হইয়া থাকে। ধর্মনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সম্বন্ধে তাহার সংস্কারসকল এমন একান্ত বিশেষত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করে যে, তাহার মধ্যে বহির্জাতির প্রবেশপথ থাকে না।

ভারতবর্ষের হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করেন। সে তর্ক অসংগত নহে।

জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতি রূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক, ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।

য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনো-কালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে, সে কথা ঠিক নহে।

বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্ত্র এবং সংস্কার, আচার এবং অনুশাসন, হিন্দুদিগের জন্য এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে। তাহার সকল কক্ষগুলি সমান নহে, মাঝে মাঝে দেয়াল উঠিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এই বিপুলতার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য আছে।

এই অট্টালিকার মধ্যে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা আদৌ এক-বংশীয় নহে। দক্ষিণের দ্রাবিড় হইতে হিমালয়ের নেপালি পর্যন্ত নানা বিচিত্র জাতি বহুকালে ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে।

বরঞ্চ যে-সকল জাতি মিশ্রিত হইয়া ইংরেজ-মহাজাতি রচিত হইয়াছে তাহারা মূলত ভিন্ন-গোত্রীয় নহে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিসদৃশ-জাতি-পরম্পরা যেমন একত্র মিশ্রিত হইয়াছে জগতে এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই।

স্পেক্টেটর যে স্বাভাবিক পরজাতিবিদ্বেষের কথা বলিয়াছেন আদিম আর্যদের মধ্যে তাহা প্রচুরপরিমাণেই ছিল। আদানপ্রদান আচারবিচার, এমন-কি জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চায় তাঁহারা আপনাদিগকে অনার্যদের সংস্রব হইতে দূরে রক্ষা করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ এক বহুদিনব্যাপী প্রকাণ্ড যুদ্ধ। রামায়ণ-মহাভারতের সুবিশাল ছন্দঃস্রোতের মধ্যে এই প্রাণপণ যুদ্ধের প্রলয়কল্লোল এখনো ধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু চারি দিকের সহিত চিরকাল লড়াই করা চলে না। ক্রমে বিরোধচেষ্টা শিথিল হইয়া আসে এবং অল্পে অল্পে সন্ধি স্থাপিত হয়। এবং এইরূপে ধীরে ধীরে আর্য-অনার্যের মাঝখানের ব্যবধান ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিল এবং ক্রমে অনার্যদের সংস্কার, তাহাদের পূজাবিধি, তাহাদের দেবতা অভিমানী আর্যাবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবর্তিত করিয়া তুলিল।

সেইজন্যই আজ হিন্দুজাতি জ্ঞানে অজ্ঞানে, আচারে অনাচারে, বিবেকে এবং অন্ধ কুসংস্কারে এমন একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদিচ সকল বিষয়েই আর্য-অনার্যের মধ্যবর্তী সীমা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন-কি আমাদের বর্ণ আকার আয়তনে রক্তমিশ্রণেরও সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি স্বাতন্ত্র্যরক্ষাজন্য বহুকালব্যাপী সেই যুদ্ধচেষ্টা আজিও হিন্দুসমাজের আদ্যন্তমধ্যে সজাগ হইয়া আছে।

তবে, পূর্বেকার সেই আর্য-অনার্যের সংগ্রাম অদ্য হিংস্র উগ্রতা পরিত্যাগ করিয়াছে বটে। কিন্তু তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে।

তাহার এক কারণ, আমাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে, প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে যখন আমরা মিলিতেছিলাম তখনো শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ কেহই সম্পূর্ণ হার মানিতে চাহে নাই।

এই কারণে যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকর জাতি হিন্দুত্ব-নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই। আমরা যেমন এক তেমনি বিচ্ছিন্ন।

এই দুর্বলতার প্রধান কারণ, আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি। যাহারা আমাদের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, যাহাদিগকে আমরা কিছুতেই খেদাইয়া রাখিতে পারি নাই, আমাদের বেড়া-দেওয়া উদ্যানের মধ্যে যে-সকল আগাছা আপনি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে অনবধান অথবা অভ্যাসের জড়ত্ব-বশত আমাদের সহিত এক হইয়া গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা কি শারীরসংস্থানে কি বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের সশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্যসভ্যতায় বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্যধর্ম আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

এই বহু দেবদেবী, বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধলোকাচার-সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।

কিন্তু আমাদের এই বিকারের জন্য তত ক্ষোভ নাই বিচ্ছেদের জন্য যত। এক্ষণে ধর্মে আচারে বিশ্বাসে ও শিক্ষায় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদ ক্ষীণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, বহুকালের সংঘর্ষে পরস্পরের মধ্যে অনেক অদলবদল হইয়া আর্য অনার্যতর এবং অনার্য আর্যতর ভাবে এক হইয়া আসিয়াছে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে। কিন্তু তবু বিচ্ছেদ ভাঙে না।

অর্থাৎ, ঐক্যের যা ক্ষতি তাহাও ঘটিয়াছে এবং অনৈক্যের যা দোষ তাহাও বর্তমান।

এক্ষণে এই দুটাই সংশোধন করা আমাদের কাজ। নতুবা আমাদের উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। নতুবা আমাদের শিক্ষা মিথ্যা, আমাদের আন্দোলন নিষ্ফল, আমাদের কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণকালের ক্ষীণ উদ্যম।

এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমান কালের মহাপুরুষ।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অনুভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা-দ্বারা বিভক্ত। আমাদের স্থানীয় আচার, স্থানীয় বিধি, স্থানীয় দেবদেবীগণ বাহিরের আক্রমণ ও সংশোধন হইতে নিরাপদভাবে সুরক্ষিত হইয়া এক দিকে ক্ষুদ্র অসংগত, অন্য দিকে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভিতরকার অনার্যতা, অদ্ভুত লোকাচার ও অন্ধ সংস্কারে শাখাপল্লবিত হইয়া আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সর্বসাধারণ মানবজাতির রাজপথকে আমাদের নিকট হইতে অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমরা প্রাদেশিক,

আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্‌যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। এক কথায় বৃহৎক্ষেত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার যে সফলতা তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই।

এক্ষণে ইংরেজ-রাজত্বে আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। বহুদিনের বিরোধ দ্বন্দ্বের মধ্যে যে-একটি প্রাচীন ঐক্যগ্রন্থি আমাদের নাড়িতে নাড়িতে বাঁধিয়া গিয়াছে সেইটেকেই প্রবল করিয়া আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধুলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে-একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ঐ অনৈক্যের ধুলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ, সেইটেই সর্বাপেক্ষা লঘু, এবং সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু এ ধুলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারি দিকের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে—সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যখন কোনো প্রবল সংঘর্ষে, কোনো নূতন শিক্ষায় একটা জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন সে নিজেরই মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সে জানে যে, ধার করিয়া চলে না। যদি পৈতৃক ভাণ্ডারে মূলধন থাকে তবেই বৃহৎ বাণিজ্য এবং লক্ষ্মীলাভ, নতুবা চিরদিন উঞ্ছবৃত্তি।

আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল বিচিত্র ও সুদৃঢ় ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে, যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ধূমকেতুর মতো দুই-চারিজন মাত্র গর্ববিস্ফারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।

অতএব এক দিকে আমাদের দেশীয়তা, অপর দিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি, উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।

মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ক্ষুদ্র হিঁদুয়ানিকে আর্য-উদারতার দিকে প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাহা যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ-আশার কারণ দেখিতেছি।

উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই, অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয়, অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা হৃদয়ের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাঁধিয়াছে, অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে, ইহা ভারতে আর-একটি অভিনব সম্প্রদায় রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে।

বারান্তরে আর্যসমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভিন্ন জাতির সহিত সংস্রব ইংরেজের যেমন ঘটিয়াছে এমন আর-কোনো য়ুরোপীয় জাতির ঘটে নাই। কিন্তু ইংরেজের পরজাতিবিদ্বেষ সমান সুতীব্র রহিয়াছে। ইহা তাহাদের জাতীয়তার অত্যুগ্র বিকাশের পরিচয়স্থল।

বিদেশ হইতে আগত বিজাতি ইংলন্ডে অথবা ইংরেজ-উপনিবেশে বাসগ্রহণে উদ্যত হইলে

ইংরেজের মনে যে বিরোধভাবের উদ্রেক করে স্পেক্টেটর সেই সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু পরদেশে গিয়া তদ্দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের উদ্ধত বিমুখ ভাবও সুবিখ্যাত। এমন-কি, য়ুরোপের মহাদেশবাসীগণ সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা হয় না।

আহারবিহারে আচারে ও ভাবে দ্বীপবাসী ইংরেজের সহিত মহাদেশবাসী য়ুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ, কিন্তু সেই প্রভেদগুলিও সাধারণ ইংরেজের মনে অবজ্ঞা এবং প্রতিকূল ভাব আনয়ন করে। তাহাদের জাতিসংস্কার এত দৃঢ় এবং সুকঠিন।

ইহার উপরে যখন পরজাতির সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ জন্মিবার লেশমাত্র সম্ভাবনা ঘটে তখন ইংরেজের অসহিষ্ণুতা যে অত্যন্ত বর্ধিত হইবে ইহা স্বাভাবিক।

ইংলন্ড-প্রবাসী জর্মান ইতালীয় ও পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ইংরেজ অধিবাসীদের মনে যে শত্রুতার উদ্রেক করে তাহা যে কেবলমাত্র সুমহৎ জাতীয়ভাবের প্ররোচনায় তাহা বলিতে পারি না, উহার মধ্যে স্বার্থহানির আশঙ্কাই প্রবলতর।

একে বিজাতীয়, তাহার উপরে স্বার্থের সংঘর্ষ—এইরূপ স্থলে খৃস্টীয় ধর্মনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের উচ্চতর আদর্শ টেঁকাই কঠিন হয়। ইহাতে যে অন্ধতা আনয়ন করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারশ্মি তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।

অল্পদিন হইল ভূতপূর্ব ভারত-স্টেট-সেক্রেটারি সার হেন্‌রি ফাউলার পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন, 'ওআরেন হেস্টিংস এবং লর্ড ক্লাইভের কার্যবিধি যদি পার্লামেন্টের বিচারাধীন হইত তবে সম্ভবত ভারতসাম্রাজ্য আমরা পাইতাম না।' তাঁহার এই বাক্যে পার্লামেন্টে খুব-একটা উৎসাহ-সূচক করতালি পড়িয়াছিল।

এ কথাটার কি এই অর্থ যে, যেখানে স্বার্থ স্বজাতির এবং দুঃখ পরজাতির সেখানে অত বিচার-আচার করিলে চলে না। পার্লামেন্টের মতো প্রকাশ্য বৃহৎ সভায় এ কথার উচ্ছ্বসিত অনুমোদন কি ধর্মনীতির মূলসূত্রের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা-প্রদর্শন নহে।

ধর্মনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা পরজাতির প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা হইতেই প্রসূত। ক্লাইভ ও হেস্টিংস যাহাদের প্রতি প্রতারণা মিথ্যাচার ও নিদারুণ উপদ্রব করিয়াছিলেন তাহারা অনাত্মীয়, তাহারা কেহই নহে, এ কথা পার্লামেন্টের সদস্যবর্গের মনের মধ্যে অন্তত অস্পষ্টভাবেও ছিল।

সাধারণত ধর্মনীতিবোধ তাঁহাদের যে অল্প তাহা বলিতে সাহস হয় না। কারণ, বল্‌গেরীয় ও আর্মানিদের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার, ক্যুবান্‌দের প্রতি স্পেনের কঠোরতা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সভাগণ প্রবলপক্ষের প্রতি উৎসাহ-করতালি বর্ষণ করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়ের প্রতি হেস্টিংসের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতিবোধ যে এমন সহসা সবেগে বিপর্যস্ত হইয়া যায় তাহার কারণ স্বার্থজনিত অন্ধতা এবং পরজাতি—বিশেষত প্রাচ্য পরজাতির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুগভীর অবজ্ঞাপরতা।

যে অবজ্ঞা ফাউলার-সাহেবকে প্রকাশ্য স্পর্ধার সহিত নির্লজ্জ নীতিবিরুদ্ধ বাক্য বলাইয়াছে সেই স্পর্ধা এবং সেই অবজ্ঞাই ভারতবর্ষীয় পাখাকুলিদের সম্বন্ধে কালস্বরূপ, সেই অবজ্ঞাই সমস্তিপুরে দরিদ্রের বিবাহ-উৎসবে হত্যাকাণ্ডের হাহাকার তুলিয়াছিল, সেই অবজ্ঞাই গোরা-বিভীষিকা-গ্রস্ত মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয় হইতেও কর্তৃপুরুষদিগকে বধির করিয়া রাখিয়াছিল।

ইংরেজের নীতিবোধ এইরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, ইহা অসম্ভব নহে যে, যে ইংরেজ ফস্‌ করিয়া ঘুষা লাথি অথবা গুলি চালাইয়া ভারতবর্ষীয় জনসংখ্যা হ্রাস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই স্বজাতিসমাজের সে শুভ্র মেষশাবকবিশেষ; অতএব একজন দেশী হত্যাকারীকে ইংরেজের

যেরূপ খুনি বলিয়া মনে হয়, তাহাকে সেরূপ খুনি বলিয়া মনেই হয় না— সুতরাং এমন লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া একটা আইনসংগত হত্যাকাণ্ড বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে।

আমাদের প্রতি চাঁদের কলঙ্কের দিকটা ফেরানো আছে, কিন্তু তাহার বিপরীত পৃষ্ঠটা হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে নিজের নিকট দেদীপ্যমান— অতএব ঠিক কলঙ্কের বিচার করিতে হইলে একেবারে আমাদের তরফে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, কিন্তু তাহার মতো দুঃসাধ্য কাজ আর নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড ক্লাইভ পরজাতির সম্বন্ধে যেমনই হোন, স্বজাতির সম্বন্ধে তাঁহারা মহৎ। ইংরেজ কবি হুড জিরাফ-জন্তুকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

'So very lofty in thy front— but then
So dwindling at the tail!'

অর্থাৎ, সম্মুখের দিকে তুমি এত সমুচ্চ, কিন্তু তবু লাঙ্গুলের দিকে এতই খর্ব! ইংরেজ-জিরাফের লাঙ্গুলের দিকটা পরজাতির দিকে পড়িয়াছে বলিয়া যে তাহার স্ব-জাতি তাহাকে সেই দিকেই পরিমাপ করিবে ইহা কখনো সম্ভবপর হইতে পারে না।

কিন্তু পররাজ্য অধিকার করিয়া স্বজাতি ও বিজাতিকে এক ন্যায়দণ্ডে তুলিত করিবার কঠিন অধিকার ইংরেজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থের অনুরোধে সেই ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহাতে উৎসাহকরতালি-বর্ষণের কোনো কারণ দেখি না। তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্পর্ধাপ্রকাশের বিষয় লেশমাত্র নাই।

ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুণ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাজ্ঞীর প্রজা, এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী, এমন-সকল সৌভ্রাত্র্যমধু-মাখা কথা শুনা যায়। ইংরেজ-মহারানীর অধিকারবিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই, কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এইপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে-একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলন্ড উপলব্ধি করেন না— তাঁহার সম্মুখভাগের মহত্ত্ব লাঙ্গুল-বিভাগে খর্বতার কোনো খবরই রাখে না। অথচ ঐ খর্ব দিকটার লাঙ্গুল আস্ফালন-ব্যাপারে ন্যূন নহে। দমন-শাসন-তাড়ন-তর্জনে সর্বদাই সে চঞ্চলিত। তাহার চক্ষু নাই বলিয়া চক্ষুলজ্জাও নাই।

চক্ষুলজ্জা যে নাই ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজে সর্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্তিপুর-ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা 'শালিমার ট্র্যাজেডি' নামে সমুচ্চস্বরে বারংবার ঘোষিত হইতে লাগিল। তাহাতেও খেদ নাই; কিন্তু দুর্বিনীত নেটিভের হস্তে প্রবাসী ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদ্-গ্রস্ত হইতেছে বলিয়া যে-সমস্ত প্রেরিতপত্র বাহির হইতেছিল তাহা পাঠ করিয়া যদি আমাদের শঙ্কার উদয় না হইত তবে বড়ো দুঃখেও হাসিতে পারিতাম। আমরা হাসিতে সাহস করিলাম না, কিন্তু অদৃষ্ট একটা ভীষণ কৌতুকের সৃষ্টি করিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজ-কর্তৃক কতকগুলি দেশীয় লোকের বীভৎস হত্যা পরে পরে সংঘটিত হইল— ইংরেজ সম্পাদকগণ একেবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন। ইংরেজ সম্পাদকগণকে যিনি কাল্পনিক নেটিভ-ভীতি দ্বারা মুখর করিয়া তোলেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট, এবং যিনি সাংঘাতিক প্রতিবাদের দ্বারা তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট।

১৩০৫

৩

আমাদের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জি-সাহেব তাঁহাদের স্বদেশের শীতল বায়ুতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গরম এখনো তাঁহাকে ছাড়ে নাই। ইতিমধ্যে এক ভোজ উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির বাঙালি কমিশনারদের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গণ্য ব্যক্তির মধ্যে আমল দেন নাই।

তাঁহার সেই বক্তৃতার রিপোর্টে দৈবাৎ রিপোর্টার একটা ভুল করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে ইংরাজমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ স্থান পান নাই'; রিপোর্টার 'প্রতিনিধি ইংরাজ' না লিখিয়া 'ভদ্র ইংরাজ' লিখিয়াছিল।

কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে ভদ্র ইংরাজ নাই এ কথা শুনিলে কলিকাতার ইংরাজ-হৃদয়ে পাছে আঘাত লাগে সেইজন্য তাড়াতাড়ি সমুদ্রপার হইতে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাঙালি কমিশনারদের যে গালি দিয়াছেন সেজন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই।

অবশ্য, বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন, কিন্তু সিভিল সার্ভিস ও মিলিটারি বিভাগে যে রাজপুরুষেরা ভারতশাসন করিতেছেন তাঁহারাই যে সকলে লাটের পুত্র বা রাজবংশীয় তাহাও নয়। তাঁহারা যে একদা স্বদেশী সমাজের উন্নত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী হইতে খসিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছেন তথ্যতালিকা লইলে এমনটা প্রকাশ হইবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞেয় নহেন; তাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা যোগ্য লোক; এবং তাঁহারা যদিও ইংলন্ড হইতে আসিবার সময় শুদ্ধমাত্র স্বনামটুকু লইয়া আসেন, তথাপি যাইবার সময় অনেকে তাহার সহিত উপাধি জুড়িয়া যাইতে পারেন।

কোনো ইংরাজ ভদ্রলোক লিখিতেছেন—

Sir James Westland is a Scotsman, and I have in my possession an old directory for the year 1843, which gives the names of the principal residents in the rural districts of Scotland. The name of Westland, however, is conspicuous by its absence.

এ কথা সত্য হইলেও ইহাতে আমরা কোনো দোষ দেখি না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় কন্‌গ্রেস প্রভৃতি সভামণ্ডলীর মধ্যে পৈতৃক ধনে ধনী এবং বৃহৎ উপাধিতে ভূষিত লোকের সন্ধান করেন এবং না পাইলে উপেক্ষা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কন্‌গ্রেসেই কী আর ম্যুনিসিপ্যাল পৌরসভাতেই কী, সুযোগ্য বাঙালি ভদ্রলোকের অভাব নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নলিনবিহারী সরকার, মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, ইঁহারা কোনো কালে লেফ্‌টেনান্ট গবর্নর হইতে পারিবেন না সন্দেহ নাই; কিন্তু না পারিবার কারণ এই যে, ইংরাজ-আমলে ভারতশাসনের উচ্চতর অধিকার-সকল হইতে আমরা বঞ্চিত।

আমাদিগকে যেটুকু অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সহ্য না হয়, যদি সেটা ফিরাইয়া লইবার মতলব থাকে, তবে লও—কিন্তু গালিমন্দ কেন।

ঈসপের কথামালায় নেকড়ে বাঘ যখন মেষশাবকটিকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে তখন বলে, তুমি আমার ঝর্নার জল নষ্ট করিয়াছ। মেষ বলে, প্রভু, তুমি উপরের জল খাও, আমি নীচের জল খাইতেছি, তোমার জল আমি নষ্ট করিলাম কেমন করিয়া। বাঘ বলে, তুই না করিস তোর বাপ করিয়াছিল। তাহার পর এক চপেটাঘাত।

আমরা মেষশাবকেরও অধম। প্রভেদ এই যে, বাঘের পক্ষে যেটা ছুতা ছিল ম্যাকেঞ্জি-সাহেবের পক্ষে সেইটেই আসল কথা। এতদিন সেটা চাপিয়া গিয়াছিলেন; খানার পরে পরিতৃপ্তমনে বন্ধু-

সভায় সেটা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য-ঝর্নায় ম্যাকেঞ্জি-সাহেবদের অনেক নীচের জলে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকি। কিন্তু সেও অসহ্য। ম্যাকেঞ্জি-সাহেব তাঁহার ভোজাবসানের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কলিকাতার কর্তৃত্বভার অসাবধানে আমাদের হাত হইতে অনেকটা খসিয়া পড়িয়াছে। হায়! এটুকুর প্রতিও লোভ! যাহা স্বহস্তে দান করিয়াছ তাহার প্রতিও লোলুপ দৃষ্টি! বিস্তর নীচে আছি, এবং অত্যন্ত অল্প জল পাই; আমাদের দেশী স্পর্শে তোমাদের উচ্চ শিখরের জল তো আমরা ঘোলা করি নাই।

নেকড়ে বাঘ মনে মনে বলেন, উচ্চ হোক নীচ হোক, প্রভুত্বের স্বাদমাত্রই তোমাদিগকে দিতে চাহি না। তাহার পর মুখে বলেন, 'তোমরা অযোগ্য, ইন্ডিয়া-ক্লাবে বৈঠক কর, তোমরা স্বদেশের প্রতিনিধি নও।'

বেসরকারি ইংরাজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ চলে। আমরা অনেক সময় রাগের মুখে পরস্পরের প্রতি করুণবাক্য প্রয়োগ করি না। কিন্তু যাঁহারা ভারতশাসনকার্যে রাজস্থানীয় এতদিন তাঁহারা প্রজাসাধারণকে প্রকাশ্যে রূঢ়ভাষায় অপমান করেন নাই।

আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে তাহা না হইতে পারে, প্রচুর স্নেহ আছে এমন অভিমানও হয়তো না করিতে পারি, কিন্তু তাঁহারা বাক্‌সংযম করিয়া গেছেন। তাহার একটা কারণ, তাঁহারা যে উচ্চ পদের উন্নত শিখরে থাকেন সেখান হইতে একটি ছোটো কথা বর্ষণ করিলেও নীচের লোকের মাথার পক্ষে তাহা গুরুতর হইয়া উঠে—এরূপ অসমকক্ষ আক্রমণ বীরোচিত নহে। ইংরাজি ভাষায় যাহাকে cowardliness অর্থাৎ কাপুরুষতা বলে ইহাও তাহাই। আর-একটা কারণ এই যে, কথার কলহ তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক এবং অযোগ্য; কারণ, তাঁহার হাতে ক্ষমতা আছে। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। সে ক্ষমা কাজের ক্ষমা না হইলেও, অন্তত বাক্যের ক্ষমা হওয়া উচিত।

রাজনীতির হিসাবেও বাক্‌সংযমের সার্থকতা আছে। রাজকার্য সকল সময়ে প্রজার অনুকূলে যায় না। অতএব মাঝে মাঝে যখন কঠিন আইন বা অপ্রিয় করবৃদ্ধি প্রজার উপরে জারি করিতে হইবে তখন দুর্বাক্য-দ্বারা সেটাকে আরও তিক্ত করিয়া তুলিলে রাজাপ্রজার মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনাহূত বাড়াইয়া তোলা হয়।

স্বাধীন ইংলন্ডে পার্লামেন্টে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ-বচসা হইয়া থাকে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। কিন্তু সেখানে জনসাধারণে যাহা চায় রাজশক্তি তাহার বিরুদ্ধে যায় না। এইজন্য দেশ যে কী চায় তাহা নানা দলের আন্দোলনে সম্পূর্ণ আলোচিত হইয়া স্পষ্ট আকার ধারণ করে। এ দেশে আমরা যাহা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি না তাহাও রাজা আমাদিগকে গিলিতে বাধ্য করেন—আমাদের মতামত ইচ্ছানিচ্ছার দ্বারা রাজশাসন নিয়মিত হয় না। এখানে সম্পূর্ণই কর্তার ইচ্ছা কর্ম—সে স্থলে গায়ে পড়িয়া প্রজাসাধারণ বা সম্প্রদায়বিশেষকে রূঢ় কথায় ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা না সুশোভন, না রাজনীতিসংগত।

তিক্ত বড়িকে মিষ্ট-আকারে গেলানো রাজনীতির নৈপুণ্য। রাজশাসনের পথকে যত সংঘাত-সংঘর্ষ-হীন করিয়া তোলা যায় ততই রাজ্যের পক্ষে এবং শাসনকর্তাদের পক্ষে মঙ্গল। অবশ্য রাজ্যশাসন সম্পূর্ণ যন্ত্রসাধ্য নহে, তাহার মধ্যে রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত আপনি আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ হইলে শাসনকার্যের গৌরব নষ্ট হয়।

আজকাল ইংরাজ-শাসনে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ম্যাকেঞ্জি-সাহেব যখন বাংলার রাজপদে ছিলেন, যখন একেবারে অনেকগুলা অপ্রিয় বিধির প্রস্তাব উপলক্ষে সমস্ত দেশ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, সেই সংকটের সময়, দেশের সেই দুর্ভাগ্যের সময়, সেই কঠোর বিলগুলি পাস করিবার সময় ম্যাকেঞ্জি-সাহেব বঙ্গভূমির ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহল-জ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।

বিল তো পাস হইবেই। বিল-স্রষ্টাদের ইচ্ছার কোনো বাধা নাই। কিন্তু যত নির্বিরোধে হয়

ততই ভালো। যদি প্রজার ক্ষতস্থানে ছুরি চালাইতেই হয় সেটা যাহাতে যথাসম্ভব অল্প বেদনায় সমাধা হয় সেই চেষ্টাই উচিত; যাঁহার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ আছে তিনি সে জায়গাটা অনাবশ্যক আঘাতে ব্যথিত রক্তবর্ণ করিয়া তোলেন না।

কিন্তু উচ্চ পদের যে স্বাভাবিক শান্তি সংযম ও ক্ষমা তাহা ম্যাকেঞ্জি-সাহেব দেখান নাই। তিনি নিজে রুগ্‌ণ ছিলেন এবং রাজকার্যকেও রোগাতুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অদ্য শাসনকার্য হইতে অবসর লইয়া ভারতভাণ্ডার হইতে বৃত্তিভোগ করিতে করিতেও তাঁহার ভূতপূর্ব প্রজাগণের প্রতি বিষোদ্গার করিতেছেন।

ইহাতে অমিশ্র কুফল ছাড়া আর কিছু দেখি না। ম্যুনিসিপ্যাল-বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ভূতপূর্ব বঙ্গাধিপ এ সম্বন্ধে যতই চুপ করিয়া থাকেন ততই ভালো। তিনি বিলাতে বসিয়া খানার পরে অসংযত বক্তৃতা করিয়া উপদ্রব বাড়াইয়া তুলিতেছেন। তিনি কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে বাঙালিবিদ্বেষ ও স্বজাতিপক্ষপাত দেখাইয়া কেবল যে আত্মমর্যাদা লাঘব করিতেছেন তাহা নহে, শাসনকার্যকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।

গবর্মেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আত্মবিস্মৃতি ও ধৈর্যচ্যুতি আমরা বর্তমান কালের একটা কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করি। ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে উত্তরোত্তর যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা যদি রাজপুরুষদিগকেও স্পর্শ করে, তাঁহারাও যদি এ অবস্থার প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া একটা দলভুক্ত হইয়া পড়েন, তবে আমাদের পক্ষে সেটা সংকটের অবস্থা।

সেই রকমের যেন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অবশ্য স্বজাতিপ্রেম সকল সময়েই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকাল যেন ভারতবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি ইংরাজ ক্রমশই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ইংরাজি খবরের কাগজের নাড়ীতেও যখন বেগ প্রকাশ পায় তখন গবর্মেন্টেরও চক্ষু লাল এবং গাত্র উত্তপ্ত দেখিতে পাই। ইংরাজি খবরের কাগজে বাঙালিদের প্রতি যে সুতীব্র অসহিষ্ণুতা দেখা যায় গবর্মেন্টের আচরণেও নানা আকারে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অন্তত ম্যাকেঞ্জি-সাহেব সে ভাবটি চাপিয়া রাখেন নাই। তিনি যদিচ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, ইংরাজি খবরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন না, তথাপি ইংরাজ প্লান্টার প্রভৃতিকেও সুমিষ্ট স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন; অথচ যে নিরন্ন জাতি আজ পর্যন্ত তাঁহার মুখের অন্নজল জোগাইতেছে তাহাদের ভদ্রমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহার মুখে একটি মিষ্টবাক্য জুটিল না!

যাহা হউক, আমরা এমন দুরাশা করি না যে ম্যাকেঞ্জি-সাহেব বিলাতে বসিয়া—

রচিবেন মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি, নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় এক্ষণে তিনি বিশ্রাম লাভ করুন; এখনো অন্তর্জ্বালার উত্তেজনায় তাঁহাকে যেন বাঙালিবিদ্বেষ উদ্গীর্ণ করিতে না হয়।

১৩০৫

৪

শ্রীযুক্ত বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায়-বিরচিত 'দি পভার্টি-প্রব্লেম্‌স্‌ ইন ইন্ডিয়া'-নামক সর্বসমাদরযোগ্য সারবান গ্রন্থে লর্ড ফ্যারারের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; এইখানে তাহার পুনরুদ্ধার করি :

> The persons who carry on our trade on the outskirts of civilization are not distinguished by a special appreciation of the rights of others. . . . When a difficulty arises between ourselves and one of the weaker nations, these are the persons whose voice is most loudly raised for acts of violence, of aggres-

sion, or of revenge. . . . Our dealings in the Far East, and elsewhere have not always been such as would do credit to an honest merchant.

অর্থাৎ, যে-সকল ব্যক্তি সভ্যতার বহিরঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য বিস্তার করিয়া থাকে তাহারা অন্যের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবত্তার জন্য বিখ্যাত নহে। যখনি আমাদের সহিত কোনো দুর্বলতর জাতির একটা সংকট বাধিয়া উঠে তখন ইহাদেরই কণ্ঠস্বর পীড়ন আক্রমণ ও প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য সর্বোচ্চে ধ্বনিত হইয়া উঠে। দূরপ্রাচ্যদেশে এবং অন্যত্র অনেক সময় আমাদের আচরণ যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সাধুপ্রকৃতি বণিকের যোগ্য নহে।

রাজকর্মচারীগণ ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ইংরাজই বাণিজ্যজীবী। তুচ্ছতম উৎপাত উপলক্ষেই তাঁহারা গুরুতর আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। কারণ, ভারতশাসনকার্যকে নিজেদের স্বার্থসাধন-হিসাব ছাড়া আর-কোনো হিসাবে দেখিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। তাঁহাদের মুখ হইতে এমন কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, এ ভারতবর্ষটা টুপিওআলারই ভারতবর্ষ। পাগড়িওআলা ও খালিমাথাগুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চা-বাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাটজোগানের পাইকর, এবং ল্যাঙ্কাশিয়রের খরিদ্দার।

রাজনীতির মঞ্চ সুপ্রশস্ত; তাহা দেশে এবং কালে—ধর্মে এবং অর্থে সুদূরব্যাপী, তাহার উপরে যাঁহারা অধিষ্ঠিত হইয়া দূরবিস্তীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পর্যালোচনা করেন তাঁহাদের পক্ষে প্রভূতপরিমাণ ধৈর্য ও বিচক্ষণতা আবশ্যক; তাঁহারা তুচ্ছ ও বৃহৎ ব্যাপারের আপেক্ষিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও মহৎ সার্থকতার প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু ইংরাজ বণিকগণ ভারতবর্ষকে যেখান হইতে নিরীক্ষণ করেন সে জায়গাটা যতই উচ্চ হউক তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ, তাহা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লাভক্ষতির উপর দাঁড়াইয়া; একটু নাড়া খাইলেই তাহা দুলিয়া উঠে। গত বর্ষে ভূমিকম্পে কারখানাঘরের চিমনিগুলা হাতির শুঁড়ের মতো যেমন করিয়া দুলিয়াছিল, বড়োলাটসাহেবের প্রাসাদ এমন দোলে নাই।

ভারতবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি ইংরাজের মতের এবং ভাবের প্রভেদ অনেকেই লক্ষ করিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে মহাজন কর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া দলবদ্ধ সাঁওতালগণ গবর্মেন্টের নিকট দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়া যে দুর্যোগ ঘটাইয়াছিল তদুপলক্ষে মনস্বী সার উইলিয়ম হান্টার সাহেব লিখিতেছেন :

The Anglo-Indian community is naturally liable to apprehensions and hasty conclusions incident to a small body of settlers surrounded by an alien and a greatly more numerous race. . . . With the government rests the heavy responsibility of counteracting the natural tendency to panic on the part of the public.

হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ কেহ দেখিল না, তাহাদের নালিশ কেহ বুঝিল না, যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া তাহারা দাবানলপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদের অরণ্যবাসভূমি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন রাজসৈন্যগণ তাহাদিগকে গুলিবর্ষণে দলে দলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল।[১] অবশেষে এই হত্যাকাণ্ড যখন প্রচুর সাঁওতাল-রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিল তখন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণ কিরূপ ধুয়া তুলিলেন?

হান্টার-সাহেব এ সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিয়ু-নামক বিখ্যাত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ‘গ্রাম্যবঙ্গবৃত্তান্ত’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

In short, no one knew anything about the wrongs or the peaceful industry of the Santals. They were simply 'adult tigers' or 'bloodthirsty savages' and the reviewer, dismissing the ordinary plan of punishing only the actual rebels

---

[১] দ্রষ্টব্য ইংরেজের আতঙ্ক, পৃ ২৯২

as insufficient, adopts a proposal to deport across the seas, not one or two ringleaders, but the entire population of the inflicted districts.

এইরূপ অসংগত এবং অসংযত ভাষা ইংরাজ-চালিত পত্রে মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়াছে এবং নিশ্চয়ই কালে কালে আরও শুনা যাইবে। তাহার কারণ হান্টার-সাহেব পূর্বেই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা আতঙ্ক; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, সাধারণ মনের সেই উদ্দাম আতঙ্কের প্রতিকূলে রূঢ়ভাবে ধৈর্যরক্ষা করা গবর্মেন্টের গুরুতর কর্তব্যের অঙ্গ।

আতঙ্ক যে কিরূপ দৃঢ়বদ্ধমূল এবং কতদূর অন্ধ মূঢ়তার দ্বারা বেষ্টিত তাহা সম্প্রতি-প্রকাশিত কোনো ইংরাজ পত্রের একটি প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের গবর্মেন্ট যখন ভারতবর্ষের উপর দ্বাদশাদিত্যের মূর্তিধারণ করিয়া উঠিয়াছিলেন তখন কলিকাতার বস্তিবাসী ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকাশ্য ইংরাজবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি ঠিক তাহার উল্টা ভাব দেখিয়া ইংরাজ সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জুজুর ভয় যুক্তির দ্বারা যায় না। সম্প্রতি একজন ইংরাজ আগন্তুককে দেখিয়া কোনো বস্তির অধিবাসীগণ ছোটোলাট-ভ্রমে তাঁহাকে প্রচুর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে উক্ত পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে দেশের সাধারণের মনে ইংরাজ-রাজভক্তি প্রবল, কিন্তু— উহার মধ্যে জুজু-আকারে একটা 'কিন্তু' রহিয়া গেছে— কিন্তু বোধ করি কুমন্ত্রীদের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে তাহারা বিগড়িয়া যায়।

সাহেবের হৃদয়াকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল না। একটা কালো রঙের খটকা রাখিয়া দিলেন। একটা কুমন্ত্রী কোনো-একটা জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। এ প্রশ্ন একবার মনে উদয় হইল না যে, এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন। হঠাৎ কেনই-বা তিনি জাগিয়া উঠেন, আবার হঠাৎ ছুটিই-বা লন কেন।

জুজুর থিয়োরি ছাড়িয়া দিলেও এই রহস্যের যে একটা অত্যন্ত সরল মীমাংসা আছে সেটা কেন সাহেবের মাথায় প্রবেশ করিল না। কেন তিনি ভাবিলেন না— বর্তমান বঙ্গাধিপকে দেশের লোক যথার্থ রক্ষক বলিয়া অনুভব করিয়াছে, তাঁহারই সহৃদয়তা দেশের হৃদয়কে ইংরাজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু বোধ করি যাহাদের অতিশয় বুদ্ধি, সরল মীমাংসাই তাহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গম। একটা কোথাও কিছু গোল আছে এটা বোধ করি বুদ্ধিমানের কথা। কারণ, গোল যদি দৈবাৎ বাহির হইয়া পড়ে তবে বুদ্ধিমান তাঁহার বুদ্ধির জয়ঢাক বাজাইতে পারিবেন, যদি বাহির না'ই হয় সেটা যে কোনো-একটা জায়গায় নাই তাহার অপ্রমাণ করিবে কে।

আরও একটা কথা আছে। নিজেদের যে লেশমাত্র দোষ নাই এ কথা মনে করিতে আরাম আছে— এবং ইংরাজ আরাম ভালোবাসে। দেশের জনসাধারণ কেনই-বা ইংরাজের প্রতি কোনো অবস্থায় কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব বহন করিবে তাহা ইংরাজ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না; কারণ, তাঁহারা অতিশয় প্রিয়চারী, তাঁহাদের স্বভাষায় যাহাকে বলে অ্যামিয়েব্‌ল্‌। অতএব তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব তাঁহাদের দোষে জন্মিতেই পারে না। তবে কেন এমনতরো ঘটে। নিশ্চয়ই কোনো-একটা কুমন্ত্রী আছে। বাস্‌। ইংরাজের বুদ্ধিতে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল।

এই মূঢ় অন্ধতা যদি কেবলমাত্র ইংরাজ সম্পাদকদের মধ্যে বদ্ধ থাকিত তাহা হইলেও আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আজকাল ইংরাজ সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্ত পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বোম্বায়ের দুর্ঘটনাবলীতে দেখা গিয়াছে, বোম্বাই-কর্তৃপক্ষদিগের মেজাজ 'টাইম্‌স্‌ অফ ইন্ডিয়া'র মেজাজ হইতে বড়ো তফাত নয়। তেমনি উদ্ধত অবিবেচনা, অবজ্ঞাপূর্ণ কঠোরতা, দেশীয় লোকের গভীরতম বেদনা এবং করুণতম আবেদনের প্রতি নিরতিশয় উপেক্ষা।

তা ছাড়া, দেশীয় লোকদের ব্যবহারে যদি কোনোপ্রকার অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায় সেজন্য

তাহারাই একমাত্র দোষী, গবর্মেন্টও এই প্রকারের একটা আরামদায়ক মূঢ় সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজ, সে সামান্য সৈন্যই হউক বা জিলার কর্তাই হউন, কখনোই দোষী হইতে পারে না, তাহাদের আচরণে পীড়া অনুভব করাই পীড়িতের পক্ষে বেয়াদবি; তাহাদের দুর্ব্যবহারের সকল কথাই মিথ্যা; অতএব নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কুমন্ত্রী আছে।

অতএব ধরো নাটু-ভাইদুটোকে। দাও তিলককে জেলে। দেশী সম্পাদকগুলাকে এক-একটা তৃণের মতো উৎপাটন করিয়া আনো। কুমন্ত্রী থাকিতেই হইবে, কারণ, ইংরাজ অতিশয় প্রিয়চারী, ভারি অ্যামিয়েব্‌ল্‌!

এ-সমস্ত, ফলাফলবিচারী ধৈর্যশীল গবর্মেন্টের মতো ব্যবহার নহে; এ ঠিক দৈনিক ইংরাজি কাগজের দ্রুতলিখিত গরম গরম ঝাঁঝালো প্রবন্ধকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করা। মনে হয় যেন দায়িত্ববিহীন বেসরকারি ইংরাজ-সমাজের উদ্‌বেলিত অসহিষ্ণুতা গবর্মেন্টকেও অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অশোভনরূপে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

গবর্মেন্টের এই-সমস্ত আধুনিক লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি মনস্বী রাজনীতিজ্ঞগণের গবর্মেন্ট সমুদ্রতীরে শৈলতটের মতো উদার অটল এবং ক্ষমাশীল ছিল। তাঁহাদের সময়ে ঝড় কম যায় নাই, এবং তরঙ্গিত ইংরাজসমাজ দেশটাকে হাঁ করিয়া গিলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল; তখন উন্নত কঠিন গবর্মেন্ট তাহাদিগকে ঠেকাইয়াছিল।

মনে হইতেছে, যেন কালক্রমে সেই উন্নত তীর অল্পে অল্পে ক্ষইয়া আসিতেছে, জলের সহিত সমতল হইতেছে; ঝড়-ঝাপটের দিনে তুফানকে অটলভাবে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার চলিয়া যাইতেছে। অথচ ফুৎকারমাত্রেই তুফান উঠিয়া পড়ে এবং কেন-যে এই সমুদ্র সর্বদাই ফেনিল বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন তাহার রহস্য জলবায়ুতত্ত্বের রহস্যের মতোই দুর্বোধ।

আসল কথা, ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সিমলা দার্জিলিং নৈনিতাল নীলগিরি জাঁকিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে পূর্বাপেক্ষা ইংরাজ নারীদের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়াতে তাহার দুইটি ফল দেখা যায়—প্রথমত দেশীয়দের সহিত ব্যবধান দৃঢ়তর, দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কাজকর্ম কোনোমতে সারিয়া ফেলিয়া আপনাদের সেই মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার প্রলোভন স্বাভাবিক। সেই মণ্ডলীর সহিত অবশিষ্ট ভারতবর্ষের প্রভেদ ইংরাজের কাছে অত্যন্ত অধিক এবং অরুচিকর।

এই কারণে ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজের সম্পর্ক উত্তরোত্তর তেলে-জলের মতো হইতেছে। এবং নিজেরাই আপনাদের সুখ-সান্ত্বনা-আরামের একমাত্র উপায় হওয়াতে পরস্পরের নিকট পরস্পরের গৌরব অতিশয় বাড়িয়া উঠিতেছে।

এরূপ কুটুম্বিতা যখন স্বাভাবিক তখন ইহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার জো নাই। আমরা কেবল সরকারি ও বেসরকারি ইংরাজ কেমন করিয়া একাকার হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি মাত্র।

এখন যে-কোনো বিধান বা রাজনীতি ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-সাধারণের অপ্রিয় তাহাতে হাত দিতে গেলেই সামাজিক চক্ষুলজ্জাটা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। টেনিস-কোর্ট নৃত্যশালা শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা অসামান্য বলশালী লোকের কর্ম। তর্কদ্বন্দ্বে বা কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ অনেক সময় স্বমতরক্ষার উত্তেজনাস্বরূপ হয়—কিন্তু খেলায় আমোদে আহারে বিহারে নারীকণ্ঠে বা স্ত্রীকটাক্ষে অনুক্ত এবং অর্ধোক্ত মতামতগুলি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ।

তা ছাড়া যে শাসনকর্তা রাজোচিত ঔদার্যের সহিত আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে নারাজ না হন, ইংরাজ-মহলে তাঁহার প্রতি একটা অত্যন্ত কঠিন অপবাদ প্রচার হয়। বলে যে, তিনি ভারতবর্ষীয় আন্দোলনকারীদের দ্বারা চালিত হইতেছেন। ইংরাজের পক্ষে এমন দুর্বলতা আর কী হইতে পারে।

কিন্তু অপবাদকারীরা এ কথা ভুলিয়া যায় যে, দুর্বলের কথায় কান দেওয়া দুর্বলতার ঠিক বিপরীত—তাহাই সবলের লক্ষণ। আজকাল শাসনকর্তাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে ইংরাজ-সমাজের দ্বারা চালিত না হওয়া; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে দুর্বলতা। পাছে এমন কথা উঠে যে কন্‌গ্রেসের দলবদ্ধ কাতরতায় ভুলিল সেই মনে করিয়া কোনো উদারনীতি-প্রবর্তনে দ্বিধা বোধ করা, ইহাই দুর্বলতা; ইংরাজ পত্রসম্পাদকের সহিত রাজসিংহাসন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া, ইহাই দুর্বলতা। এখনকার ভারত-শাসন-ব্যাপার ভারতবর্ষীয় ইংরাজের সামাজিকতাজালে আপাদমস্তক জড়িত এবং সেইজন্যই দুর্বল। সেইজন্য প্রেমনীতি-ক্ষমানীতির উপরে ভারতসাম্রাজ্যকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যে কেবল রহিত হইতেছে তাহা নহে, তাহা প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত উপহসিত হইতেছে। সর্বপ্রকার বিচার বিবেক বিধান লঙ্ঘন করিয়া আকস্মিক জবর্দস্তি-দ্বারা দুঃখিত প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই প্রবলের ধর্ম—এবং ক্ষমা, ধৈর্য, অবিচলিত অপক্ষপাত, অথবা দুর্বলের প্রতি, প্রজার প্রতি, নিরুপায়ের প্রতি পক্ষপাত দুর্বলের লক্ষণ বলিয়া প্রতিদিন কীর্তিত হইতেছে।

১৩০৫

৫

বরিশাল হইতে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে একটি আলোচনাপত্র আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা জানি, ইংলন্ডে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য অনেক সভা আছে। এবং সময়ে সময়ে ‘কর্‌ন্‌ ল’ প্রভৃতি বিশেষ বিধি লইয়া ইংলন্ডের অনেক উদ্যমশীল মহাত্মা অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত স্বদেশকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন।

তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বারংবার বাধা সত্ত্বেও নিরস্ত হয় না, এবং আমাদেরই বা অল্প বিঘ্নে কেন হয়। অবশ্য, উদ্যমশীলতায় তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে একটা কারণ; কিন্তু যথার্থ কারণ, তাঁহারা আশালতার বীজ নিজের জমিতে বপন করিতেছেন, আকাশকুসুমপ্রত্যাশী হতভাগ্য আমাদের মতো বাতাসে উড়াইয়া দিতেছেন না।

গবর্মেন্টের সহিত তাঁহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া গবর্মেন্টের হাত-পা'কে কার্যক্ষম করিয়া তুলে। তাঁহাদের পক্ষে দেশকে বিশেষ মতে দীক্ষিত করা এবং সেই মতের দ্বারা গবর্মেন্টকে চালিত করা একই কথা।

কিন্তু আমাদের কন্‌গ্রেস গবর্মেন্টের দ্বারের বাহিরে। তাহার কেবল ভিক্ষার অধিকার আছে। সেই ভিক্ষার মধ্যে এমন আশার মহত্ত্ব বা কর্মের গৌরব কিছুই নাই যাহাতে দেশকে দীর্ঘকাল উৎসাহিত করিয়া রাখিতে পারে।

আমরা নিশ্চয় জানি, অনুগ্রহস্বরূপে আজ যাহা লাভ করিব কাল তাহা হারাইবার কোনো বাধা নাই। দয়া করিয়া আজ যদি আমাদিগকে কেহ স্বায়ত্তশাসন দিলেন ভাবিলাম এক পরমার্থ লাভ হইল, আবার কর্তাদের মধ্যে কাল যদি সেটাকে কেহ পঙ্গু করিয়া দেন তবে আমরা কেবল বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিয়া মরিব।

আমাদের অদৃষ্টে ভারতের রাজশক্তি অনেকটা পদ্মানদীর মতো। আজ পাঁচ বৎসরে আমাদের কপালে যেখানে পলি পড়িল পরের পাঁচ বৎসরে সেখানে বালি পড়িতে এবং তাহার পরের পাঁচ বৎসরে ভাঙন ধরিতে কোনো বাধা নাই। এই চরের উপর যদি আমরা কন্‌গ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করি তবে আমরা মূঢ়। কন্‌গ্রেস যদি নিজ শক্তিতে দেশের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে পারে তবেই সে দেশের হৃদয়ের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যদি বিচিত্র মেজাজের প্রভুপরম্পরার নিকট কনস্টিট্যুশনাল লাঙ্গুল-আন্দোলনকেই সে আপন কর্তব্য

জ্ঞান করে, তবে অদ্য রুটির টুকরা এবং কল্য লাঠির গুঁতা খাইয়া পথের প্রান্তে পঞ্চত্ব লাভই তাহার অদৃষ্টে আছে।

এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে অনেক নীচত্ব আপনি আসিয়া পড়ে। স্বাধীনক্ষমতাদৃপ্ত প্রভুর মন জোগাইতে গেলেই কপট নম্রতা, মিথ্যা আস্ফালন, সত্যগোপন এবং আত্মপ্রবঞ্চনা— দুর্বলপক্ষ স্বতই অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেও অবলম্বন করিয়া বসে। ইহাতে ক্রমশ যে হীনতা আসে ভিক্ষালব্ধ অধিকারখণ্ডে তাহা পূরণ করিতে পারে না।

এইজন্য আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, গবর্মেন্ট অবজ্ঞাসহকারে কন্‌গ্রেসের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে শাপে-বর দিতেছেন। আমাদিগকে যথার্থ পথে প্রেরণ করিতেছেন। সে পথ আত্মশক্তির পথ। ভিক্ষা যদি পূরণ করিতেন তবে আমাদিগকে কঠিন কর্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সহজ দেশহিতৈষিতার সুকোমল হীনতাপঙ্কের মধ্যে, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা, অমূলক কৃত্রিম উন্নতি, এবং অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।

এ কথা আমরা অন্তরের মধ্যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এতদিন কী করিলাম, ইহাতে ফল কী হইতেছে। এতকাল যাহা বর্ষে বর্ষে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি সবই যদি ইংরাজ-রাজ আমাদের জীর্ণ আঁচল পূর্ণ করিয়া দান করেন তবু কি আমরা যথার্থ বড়ো হইব, অন্তরের মধ্যে সার্থকতা অনুভব করিব। এই-সমস্ত প্রশ্ন এবং এই-সকল সংশয় বর্ষে বর্ষে আমাদের উৎসাহ নির্বাণ করিয়া আনিতেছে।

কন্‌গ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই আমাদিগকে দেশের হিতানুষ্ঠানে খানিকটা দূর করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। চাকা যে কেবলমাত্র তেল ও ঠেলার দ্বারা চলে তাহা নহে, নিজের গতিবেগও তাহাকে চালনা করে। সেইরূপ, কার্যচক্র লোকের আকর্ষণে যেমন চলে নিজের কর্মগতিতেও তেমনি বেগ প্রাপ্ত হয়— কাজের দ্বারা কাজ অগ্রসর হয়।

কিন্তু কাজের ভার যখন পরের উপর, কেবল প্রার্থনার অধিকার আমাদের— এবং সেই পরও যখন প্রতিকূল— তখন, কিছু-যে কাজ হইতেছে তাহা অনুভব করিব কেমন করিয়া। এই লক্ষ্মীছাড়া ভিক্ষাকার্যে আমাদের উৎসাহ কিসে সজীব রাখিবে।

সমালোচ্য পত্রখানির এক জায়গায় আভাস আছে যে, নূতনত্বের হ্রাস হওয়াতে আমাদের উৎসাহ ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে জগতের রহস্য অধিকতর প্রসারিত হইয়া যায় তেমনি কাজ যত সম্পন্ন হয় উদ্যমের নূতনত্ব ততই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যেখানে কাজ নাই, কেবলই আয়োজন, সেখানে উৎসাহের নবীনতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা অসাধ্য। ভিক্ষাচর্যা যতই নৈপুণ্যসহকারে নব নব কৌশলে নিষ্পন্ন হউক, তাহাকে কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

প্রতি বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া, অন্তত একটা-কিছু কাজ আমরা নিজেরা যদি করিতে পারি, তবে সেই কৃতকার্যতার উৎসাহে পরবৎসরের কন্‌গ্রেস আপনি সজীব হইয়া উঠিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কাজের উল্লেখ করিতে পারি। বোম্বাইয়ের পার্শি মহাত্মা শ্রীযুক্ত টাটা ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানপরীক্ষাশালার জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন তাহার সহিত সমস্ত ভারতের যোগসাধন করা কেবল কন্‌গ্রেসের ন্যায় কোনো বিশ্বভারত-সম্মিলনী সভার দ্বারাই সাধ্য।

উক্ত পরীক্ষাশালা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টাটার অর্থসাহায্য-দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যদি টাটা-সাহেবের এই প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন তবে কন্‌গ্রেসের জন্ম সার্থক হয়।

এইরূপ শিল্প বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই আমাদের সুগভীর দৈন্য আমাদের দেশের লোকের মুখ তাকাইয়া আছে। সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া তিনটে দিনের একটা দিনও সে কথার কোনো উল্লেখ হয় না, এমন মহৎ সুযোগ কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির রুদ্ধ লৌহদ্বারের উপর মাথা কুটিয়াই ফাটিয়া যায়— ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহের কারণ কী আছে জানি না।

ফ্রান্স জর্মানি ইটালি প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশসকল স্বরাজ্যের বাণিজ্য-উন্নতি সাধনের জন্য যে-সকল শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন তাহা যদি সে-সকল দেশের পক্ষেও অত্যাবশ্যক হয়, তবে আমাদের দেশে তাহার যে কিরূপ প্রয়োজন বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের এ অভাব কে পূরণ করিবে। রাজা যদি নাই করে তবে কি আমরা বসিয়া থাকিব এবং আবেদন করিব।

আমাদের রাজা বিদেশী; তাঁহারা যে রাজকর সংগ্রহ করেন তাহা মাহিনাপত্র পেন্‌শন্‌ কম্পেন্‌সেশন যুদ্ধবিগ্রহ শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়। সে-সমস্ত বিস্তর বাজে-খরচ খাটো করিয়া দেশের ধন দেশের স্থায়ী হিতসাধনে ব্যয় করিবার জন্য কন্‌গ্রেস বহুবৎসর চীৎকার করিলেও রাজার কিরূপ মর্জি হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেই অনিশ্চিত আশ্বাসে সুদীর্ঘকাল বক্তৃতাদি না করিয়া আমরা যদি সমস্ত ভারতের সমবেত চেষ্টায় একটা উপযুক্ত শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি তবে তাহাতেই কন্‌গ্রেসের গৌরব বাড়িবে। বিদেশী রাজা নানা কারণে অনেক কাজ করিতে পারে না, স্বদেশী কন্‌গ্রেস সেই কাজগুলি সম্পন্ন করুক। আমাদের রাজা যাহা পারে না বা করে না, কন্‌গ্রেস তাহাই নিজের সাধ্যমত করিবে, ইহাই তাহার ব্রত হউক। বিদেশী তো আমাদের অনেক করিয়াছে, এখন স্বদেশী কী করিতে পারে তাহাই দেখাইবার সময় আসিয়াছে— বৎসর বৎসর এখন আর সেই অভ্যস্ত পুরাতন ভিক্ষার বুলি হতাশ্বাস কণ্ঠে পরের ভাষায় পরের দ্বারে ঘোষণা করিয়া লেশমাত্র সুখ হয় না।

যেমন আত্মীয়ের মৃত্যু দর্শনে আমাদের মনে একটা সুগভীর বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সেই বৈরাগ্য আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও মোহবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, সম্প্রতি আমাদের মনে সেইরূপ একটা রাজনৈতিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমরা যখন অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলাম সেই সময় হঠাৎ আমাদের গবর্মেন্টের যেরূপ চেহারা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, আমরা তাঁহাদের আপনার নহি। এবং তৎপূর্বে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে, রাজ্যের বিধিব্যবস্থা সমস্তই পাকা। কিন্তু হঠাৎ যখন দেখিলাম তাহাও দ্বিধাবিদীর্ণ হইল, এবং তাহার মধ্যে দুই নাটু-ভ্রাতা কোথায় তলাইয়া গেলেন, তখন রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে-একটা অটল শ্রদ্ধা ও নির্ভর এতদিন লালিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অপঘাতমৃত্যু হইল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আদ্যোপান্তে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের মনে একটা সুগভীর রাজনৈতিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, মোহ ছুটিয়াছিল; বুঝিয়াছিলাম নিজের চেষ্টায় যতটুকু হয় তাহারই উপর যথার্থ স্থায়ী নির্ভর।

এই বৈরাগ্য, এই চৈতন্য পরম হিতকর। ইহাতে আমাদের যথার্থ অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি এবং আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা নিজের দিকে ফিরিয়া আসে। ভিক্ষাবৃত্তির অনিশ্চিত আশ্বাসের প্রতি একান্ত ধিক্‌কার জন্মে। কিন্তু সেদিনের কঠিন শিক্ষা আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই যেন ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে শিক্ষা ভুলিবার নয়; অন্তত দেশের দুই-চার জনের মনেও তাহা মুদ্রিত থাকিবে; এবং সেই শিক্ষা কন্‌গ্রেস ও কনফারেন্সকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই ধিক্‌কৃত ভিক্ষাবৃত্তির অনন্ত লাঞ্ছনার পথ হইতে স্বচেষ্টায় স্বকার্যসাধনের দিকে নিঃসন্দেহ ফিরাইয়া আনিবে। তাহা যদি না আনিতে পারে তবে একদা এই কন্‌গ্রেসকে লজ্জা নৈরাশ্য ও অপমৃত্যুর হাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

১৩০৫

মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এক-সম্প্রদায় জমিদারের মুখপাত্র হইয়া কন্‌গ্রেস-পক্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, দেশের যাহারা 'ন্যাচারাল লীডার' বা স্বাভাবিক অধিনেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে।

রাজত্ব কাহার হইবে ইহা লইয়া অনেক দেশে অনেক লড়াই হইয়া গিয়াছে। কুরুপাণ্ডবের মধ্যেও একটা খুব বড়োরকম তর্ক হইয়াছিল যে, রাজ্যে কাহার স্বাভাবিক অধিকার। উভয় পক্ষ হইতে যে-সকল সূক্ষ্ম এবং স্থূল, তীক্ষ্ম এবং গুরুতর মারাত্মক যুক্তি প্রয়োগ হইয়াছিল মহাভারতে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দাদা ধৃতরাষ্ট্র বড়ো বটে কিন্তু তিনি অন্ধ, সেইজন্য কনিষ্ঠবংশে রাজ্যের ভার পড়িয়াছিল। আমাদের জমিদার-কৌরবপক্ষীয়ের যদি স্বাভাবিক অন্ধতা না থাকিত তবে কনিষ্ঠ কন্‌গ্রেস-পাণ্ডবগণের নেতৃত্ব-সিংহাসনে দাবি থাকিত না।

যাহা হউক, গৃহবিবাদে মঙ্গল নাই। কতকটা সুখের বিষয় এই যে, এ বিবাদ একটা মৌখিক অভিনয় মাত্র। মুখুজ্জেমহাশয় মনে মনে বেশ জানেন যে, বাঁড়ুজ্জেমহাশয় কম লোক নহেন, কিন্তু সরকারের কাছে সে কথা বলিয়া সুবিধা নাই। তাঁহাদের বলিতে হয়, হুজুরেরা যে কন্‌গ্রেসকে দু চক্ষে দেখিতে পারেন না, আমাদেরও ঠিক সেই দশা।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, গান্ধারী সেই আক্ষেপে নিজের চোখে কাপড় বাঁধিতেন, কারণ তিনি সাধ্বী ছিলেন। গবর্মেন্ট যদি কাহারও প্রতি অন্ধ হন তবে মুখুজ্জেমহাশয়ের কর্তব্য চোখে কাপড় বাঁধা, কারণ তাঁহারা খয়ের-খাঁ।

কেবল রাজভক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটু পাকা চালও আছে। উপরওআলা রাজপুরুষেরা আজকাল যখন স্পষ্টত নূতন জনসভাসকলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন এ কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সরকার যদি মুখুজ্জেমহাশয়দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাঁড়ুজ্জেমহাশয়রা আর এত বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না। আমরা স্বভাবতই বড়োলোক, তোমরাও আমাদিগকে বড়ো করিয়া রাখো, কন্‌গ্রেস আপনি ছোটো হইয়া যাইবে। আমরা স্ফীত আছি বটে, কিন্তু আরও স্ফীত হইতে পারি, তোমরা আর-একটু ফুঁ দাও যদি। তাহা হইলে ঐ চাকরি-বঞ্চিত নৈরাশ্যপীড়িত কৃশ কন্‌গ্রেসটাকে আরও অনেকটা ক্ষীণ দেখিতে হয়।

কন্‌গ্রেসকে নির্বাসনে দিয়া নিজেরা পরিপুষ্ট হইবার জন্য জমিদার-সমাজ এ একটা দ্যূতক্রীড়ার সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সময় বুঝিয়া যে অক্ষ ফেলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অকপট নহে ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। এইবার পৌরাণিক তুলনাটাকে খতম করিয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করি।

প্রশ্ন এই যে, আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা কে। উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, 'লীডার' ইংরেজি শব্দ যদিচ আমাদের অভ্যস্ত এবং তাহার বাংলা অনুবাদও সুকঠিন নহে, এবং সৈন্যগণের নেতা, ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নেতৃত্বের ভাব আমাদের নিকট পরিচিত বলিয়া জনসাধারণের নেতা শব্দটা আমাদের কানে খট্‌ করিয়া বাজে না, কিন্তু জিনিসটা এখানকার নহে। এই নেতৃত্বের কোনো ঐতিহাসিক নজির নাই, সুতরাং কাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ চিরপ্রথাসংগত তাহা হঠাৎ বলা যায় না।

প্রথম কথা এই যে, জনসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ এ দেশে ছিল না। গ্রাম ছিল, পল্লী ছিল, পরিবার ছিল, পঞ্চায়ত ছিল, মোড়ল ছিল, কর্তা ছিল, কিন্তু জনসাধারণ ছিল না, এবং তাহার অধিনেতা আরও দুর্লভ ছিল।

এক্ষণে ইংরাজের দৃষ্টান্ত শিক্ষা এবং একেশ্বর রাজত্বের বিপুল পক্ষপুটের তা লাগিয়া জন-

সাধারণ যদি ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করে, সে আপনার মাথা আপনি লইয়া আসিবে। গবর্মেন্ট জোর করিয়া মুখুজ্জেমহাশয়দিগকে তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিলে আর-কিছু না হউক, তাহা তাঁহাদের কথিতমত ন্যাচারাল, অর্থাৎ স্বাভাবিক হইবে না।

এমন-কি, জনসাধারণ-নামক বিরাট বিহঙ্গমের মুণ্ডটাই সব-প্রথমে চঞ্চুদ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ডিম্ব বিদারণ করিয়া আলোকপথে দেখা দেয়, পুচ্ছ অংশ পরে বাহির হইয়া পড়ে। আমরা এখন সেই অবস্থায় আছি। জনসাধারণের মুণ্ড যাঁহারা তাঁহারাই সম্প্রতি বহুকলরবসহকারে প্রকাশমান, তাঁহাদেরই চঞ্চুযুগল মুক্তিপথের কঠিন আবরণ-অপসারণে প্রবৃত্ত, অবশিষ্ট অংশ এখনো বাধাদ্বারা গুপ্ত। মুখুজ্জেমহাশয়েরা যে সেই পুচ্ছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন তাহা না হইতে পারে। তাঁহারা জনসাধারণ নহেন, তাঁহারা বিশিষ্টসাধারণ; মাটিতে তাঁহাদের বাসা নহে, উচ্চ শাখায় তাঁহাদের নীড়; কিন্তু তাঁহারা যতই মহৎ হউন-না কেন, জনসাধারণের মুখপাত্র নহেন।

অবশ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়, যাঁহার হস্তে ক্ষমতা অধিক অনেক লোক তাঁহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এবং দেশাচারে ক্ষমতা এমনি খণ্ড খণ্ড বিভাগ করিয়া দিয়াছে যে, যত বড়োই লোক হউন, তাঁহার ক্ষমতা পদে পদে সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে জমিদার জমিদারমাত্র। তিনি জুলুম করিয়া খাজনা আদায় করিতে পারেন, কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। তাঁহারই একজন দীন প্রজা সমাজে হয়তো তাঁহা অপেক্ষা প্রতাপশালী। এইজন্য জাতি ও সমাজ লইয়া রাজা-মহারাজাকেও হিমসিম খাইতে হয়।

ইংলন্ডে ইহা সম্ভবপর নহে। একজন ইংরাজ বড়ো জমিদার তাঁহার কোনো দীন প্রজা অপেক্ষা সমাজে খাটো হইতে পারেন না। তাঁহার ধনসম্পদ ও ক্ষমতা সমাজে তাঁহাকে উচ্চাসন দেয়। তাঁহার অধীনস্থ কোনো ফার্মার (বাংলার জোতদারের সমতুল্য ব্যক্তি) সোসাইটিতে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব সে স্থলে একজন ইংরাজ বড়ো জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে সর্বতোভাবে মর্যাদালাভ করিতে পারেন।

কেবল তাহাই নহে। ইংলন্ডে উপাধিধারী প্রাচীন জমিদারবংশ আছে। শুনা যায়, এই-সকল প্রাচীন উপাধিধারীর প্রতি মুগ্ধভাব ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহার কারণ, এই-সকল লর্ড প্রভৃতি উপাধির সহিত অধিনায়কতার ভাব দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল। পূর্ব-ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ শান্তিস্থাপন এবং সর্বপ্রকার সাধারণকার্যের নেতৃত্বে ইঁহারাই এক কালে প্রধান ছিলেন। এখন যদিচ ইহাদের কার্যকারিতা হ্রাস হইয়া ইঁহারা অনেকটা অলংকারের কাজ করিতেছেন, তথাপি কালপরম্পরাগত সেই সম্মানপ্রবাহ তাঁহাদিগকে সমাজের অগ্রভাগে বহন করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে তাহার অনুরূপ আদর্শ ব্রাহ্মণমণ্ডলী। কিন্তু ভ্রান্ত উপমা খাটাইয়া আমাদের জমিদারবর্গ আপনাদিগকে ইংলন্ডের সেই লর্ডশ্রেণীর সহিত তুলনীয় জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গি অনুকরণেরও চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা অ্যারিস্টক্র্যাট্‌স্‌।

অ্যারিস্টক্র্যাট শব্দের বাংলাই পাওয়া যায় না। প্রাচীন 'অভিজাত' শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত। 'কুলীন' শব্দ সর্বজনবিদিত। কিন্তু কৌলীন্য বিলাতিভাবের অ্যারিস্টক্র্যাসি নহে।

আমাদের দেশে ধনের সম্মান য়ুরোপের ন্যায় তেমন অধিক নহে। এমন-কি, যে-সকল জাতির মধ্যে ধনী মহাজন বিস্তর আছে তাহারা সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

আমাদের দেশে রাজা-রায়বাহাদুরদের দেখিয়াও লোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে না। তাহার একটা কারণ এই যে, এই-সকল পদবী-দ্বারা উপাধিধারীগণ সমাজে এক ইঞ্চি উপরে উঠিতে পারেন না। বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে যাহাদের সহিত তাঁহাদের আদানপ্রদান চলে তাহাদের কেহ হয়তো যাত্রার দলে বেহালা বাজায়—এমন-কি কেহ হয়তো কন্‌গ্রেসের উপাধিহীন প্রতিনিধি। ইংলন্ডীয় সমাজে যাঁহারা উপরকার দশজনা বলিয়া বিখ্যাত নিচেকার দশ লক্ষের সহিত তাঁহাদের ব্যবধান দুর্গম। এইজন্য সেই দশ লক্ষের ভক্তি সেই রহস্যাবৃত দশজনার দিকে ধাবিত হইতে

থাকে। আমাদের দেশে গবর্মেন্টের খেতাব দশ লক্ষের সন্নিধান হইতে সেই দশজনাকে কাঁটাগাছের মতো বেড়িয়া রাখিতে পারে নাই। বৈবাহিকমহাশয়েরা আভিজাত্যের ব্যূহ চারি দিক হইতেই ভেদ করিয়া দেন।

আবার রাজা-রায়বাহাদুর-বংশের শাখা-প্রশাখা আত্মীয়-কুটুম্ব ভাগিনেয়-ভ্রাতুষ্পুত্র খুড়তুত-মাসতুত ভাইরা মিলিয়া উক্ত বংশকে বংশমর্যাদার বহুদূর বাহিরে ব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বটের উচ্চ শাখা যেমন তাহার নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না, যতই অদ্ভুত এবং যতই গুরুতর হউক তাহাদিগকে রাত্রিদিন ঘনিষ্ঠভাবে বহন করিতে থাকে, তেমনি আমাদের দেশে নিম্নগামী দূরতম এবং দীনতম কুটুম্বস্বজনকেও ত্যাগ করিবার জো নাই; যদি-বা তাহাদিগকে অন্ন হইতে বঞ্চিত করা যায় তথাপি সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মে লৌকিকাচারে তাহাদের স্পর্শক্রামকতা হইতে আপন আভিজাত্যকে বাঁচাইয়া চলিবার কোনো উপায় নাই। এইরূপে উচ্চ পদবী বাহিরকে ভিতর হইতে এবং ভিতরকে বাহির হইতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সাধারণ এবং অসাধারণের মাঝখানে মায়াগণ্ডি কিছুতেই টিঁকে না।

আমাদের দেশে কঠিন জাতিভেদ যেমন এক দিকে ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান স্থাপন করিয়াছে তেমনি অন্য দিকে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, রাজটিকালাঞ্ছিত ও খেতাববঞ্চিতদিগকে সমান করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বংশের একটা মোহ আছে বটে। কিন্তু বর্তমান ধনী জমিদারদের মধ্যে নাটোর প্রভৃতি দুই-এক ঘর ছাড়া প্রাচীন বংশ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে যেরূপ সম্পত্তিবিভাগ তাহাতে ধনগৌরবকে প্রাচীন করিয়া তোলা একপ্রকার অসাধ্য; দায়ভাগের শতঘ্নীপ্রহারে সে দেখিতে দেখিতে শতধাবিভক্ত হইয়া অকালে পঞ্চত্ব এমন-কি পঞ্চাধিকত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই তো গেল গৌরবের কথা। কিন্তু আমাদের দেশে ধনের গৌরব অদ্যাপি যথেষ্ট জাগে নাই বটে তবু তাহার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অতএব যাঁহাদের হাতে ধন আছে তাঁহারা প্রয়োজনসাধন করিয়া সাধারণের আনুগত্য আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে নেতা হইবার সেই একটা সোনার রাস্তা আছে।

কিন্তু আমাদের অভিজাতগণ যাহাকে রাজপথ জ্ঞান করেন তাহা রাজা হইবার পথ। অন্য পথের শেষে দেশের কল্যাণ ও সাধারণের হৃদয় থাকিতে পারে কিন্তু খেতাবের খনি নাই, এইজন্য সে পথে বড়োলোকের জুড়িগাড়ি প্রায় দেখা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা সকলের প্রতীত হইবে। স্যর আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ হয়তো ভালো লোক এবং বড়োলোক, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়োলোক, এবং সকলের বেশি, তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রফ্‌ট্‌-সাহেব ভারত ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন, সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নির্মাণে ধনীগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন; আর, বিদ্যাসাগর ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না! ইঁহারা দেশের ন্যাচারাল লীডর! আমাদের স্বাভাবিক চালক! ইঁহারা কোন্‌ দিকে আমাদিগকে চালনা করিবেন? আমাদের দেশের মহোচ্চ মহদাশয়দিগের দিকে নহে, ইংরাজ মেজোসাহেব সেজোসাহেব ছোটোসাহেবের দিকে; আমাদের দীনহীন দেশের সহস্র অভাবমোচনের দিকে নহে, সাহেবের নিকুঞ্জবনে গড়ের বাদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দিকে। সাহেব রাজকর্মচারীরা বিলাতে চলিয়া গেলে দেশীয় ধনীগণ তাঁহাদের প্রতিমা স্থাপন করিবেন ইহাতে আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু দেশীয় পূজ্যগণের জন্যও যদি সেই পরিমাণে কিছু ত্যাগস্বীকার করেন তবে দেশের নায়কত্বে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দাবি থাকে।

সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবী-লাভের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন, ও কোনো চেষ্টা করিতেন কি না, তাহা আমরা ভালোরূপ জানি না। তখন নবাব-দরবারের প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত; অতএব তাহা লাভের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ

নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য—অর্থাৎ দিঘি-খনন, মন্দির-স্থাপন, বাঁধ-নির্মাণ, এই-সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাব-লাভকে নহে। দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই-সকল হিতকার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না, ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না। রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ইঁহারা তৎকালীন নবাব-দত্ত বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা উজ্জ্বল নহেন, ইঁহারা বিচিত্র কীর্তি-দ্বারা লোকসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আপন অক্ষয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তখন জনগণের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে খেতাব লাভ করিতেন তাহা আধুনিক দেশী বিলাতি সর্বপ্রকার খেতাবের অপেক্ষা অনেক উচ্চ, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আর্তানাম্ ইহ জন্তূনাম্ আর্তিচ্ছেদং করোতি যঃ
শঙ্খচক্রগদাহীনো দ্বিভুজঃ পরমেশ্বরঃ।

কীর্তিস্থাপনের দ্বারা লোকহিতসাধন অথবা সাধারণের নিকট খ্যাতিলাভ এখনকার ধনীগণের নিকট তেমন স্পৃহনীয় নহে।

আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদের কাহিনীতে পড়া যায় যে, চুম্বকশৈলের আকর্ষণে দূর হইতে জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেক ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিত, তেমনি আমাদের যে-সকল ধনী জমিদার আপন আপন ভূখণ্ডের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন, দানধ্যান ক্রিয়াকলাপ এবং লোকহিতকর বিচিত্র স্থায়ী কীর্তি-দ্বারা এই জীর্ণ দেশটাকে একপ্রকার জুড়িয়া রাখিয়া বহুলোকবহনকার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, প্রবল ইংরাজ-রাজার সমুচ্চ চুম্বকশৈল অলক্ষ্যে অনায়াসে তাঁহাদিগকে দেশের লোকের নিকট হইতে ছিঁড়িয়া যেন একমাত্র নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। সমস্ত পূজা অর্চনা দানদক্ষিণা সাহেবের অভিমুখে, সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি সম্মানসমাদর সাহেবের হস্ত হইতে। সেকালে রাজার আকর্ষণ এবং স্বদেশী সাধারণের আকর্ষণ অন্তত সমান ছিল—নবাব-বাদশারা আমাদের ধনী জমিদারগণকে দেশের কাছ হইতে এমন করিয়া টানিয়া গ্রাস করিতে পারে নাই; কর্তব্য-অকর্তব্যের আদর্শ, স্তুতি-নিন্দার চরম দণ্ড-পুরস্কার-বিধান দেশের লোকের হাতে ছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, সেকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বসাধারণের সহিত যে হিতানুষ্ঠানসূত্রে বদ্ধ ছিলেন একালে তাহাও নাই, আবার নিজেদের মধ্যে একটা অভিজাতমণ্ডলী বন্ধন করিয়া সম্প্রদায়গত মহত্ত্বকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষণ ও পোষণ তাহারও সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য-দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইঁহারা বিলাতের লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইঁহারা বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন, ইঁহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবর্মেন্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন—ভুলিয়া যান যে, সেই সংকীর্ণ রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।

পুরাকালের বড়ো জমিদারগণ রাস্তাঘাট করিয়া সাধারণের অভাবমোচন, যাত্রাগান প্রভৃতি উৎসবের দ্বারা সাধারণের আমোদ-বিধান, এবং গুণী পণ্ডিত ও কবিদের প্রতিপালন-দ্বারা দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণ ও পালন করিতেন। তাঁহারাই আমাদের দেশে দানশীলতার ও সমাজহিতৈষার উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে ত্যাগস্বীকারে পরাঙ্মুখতা যে লজ্জাকর তাহা তাঁহারাই দেশের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণ-পালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।

যখন আমাদের রাজা বিদেশী, এবং তাঁহাদের রুচি ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র, তখন দেশী ভাষা

ও সাহিত্যের অবহেলা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা জীবিকাসংগ্রামে প্রবৃত্ত, বাংলা ভাষার দিকে তাকাইবার সময় তাঁহাদের নাই। সর্বত্রই দেশের ধনীগণ স্বদেশীয় তরুণ সাহিত্যের পালনকর্তা। আমাদের বিদেশীশাসিত দেশে সাহিত্যের পক্ষে ধনীদের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক।

কিন্তু মুখ্যজমিদারগণ—জমিদার-সভার প্রধান প্রতিনিধিবর্গ ইংরাজি শেখেন, ইংরাজি লেখেন, ইংরাজি বলেন। পিতাকেও চিঠি লিখিতে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন, ইংলন্ডের অভিজাতবর্গের মতো আমরা রক্ষণশীল; কিন্তু মাতৃভাষাকেও তাঁহারা রক্ষা করেন না। দেশের জনসাধারণের ন্যায় দেশের ভাষাও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ নহে।

তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—এমন কিছুতে তাঁহাদের উৎসাহ নাই রাজার নিকট যাহার কোনোপ্রকার আদর না থাকে, যাহা কেবলমাত্র দেশের।

দেশীয় রুচি এবং শিল্প এখনও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের আদর পায়, কিন্তু তাহাও ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিলাতি রুচির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি পণ্য তাঁহাদের গৃহ হইতে দেশের শিল্পকে অবমাননা-সহকারে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে।

সংক্ষেপত, এ দেশে পূর্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব-অবলম্বনে ছিল না—তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুটি, তাঁহারা দিতেছেন প্রস্তর; বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ, তাহার বিদ্যাদৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর তাঁহারা স্বদেশপ্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।

সাহেবের জন্য তাঁহারা অনেক করেন, কিন্তু সাহেবরা চেষ্টা করিলেও, তাঁহাদিগকে দেশীয় সাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা করিতে পারিবেন না। কারণ, ইংরাজ-রাজা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন না। যদি তাঁহারা আপন পুরাতন উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহেন, তবে গবর্মেন্ট্-প্রাসাদের গম্বুজটার দিকে অহরহ ঊর্ধ্বমুখে না তাকাইয়া নিম্নে একবার দেশের দিকে, সাধারণের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।

১৩০৫

অপর পক্ষের কথা

ভাদ্রমাসের ভারতীতে ‘মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে’ প্রবন্ধের লেখক বাঁড়ুজ্জেমশায়দের হইয়া যে ওকালতি করিয়াছেন তাহা পক্ষপাতবিহীন নহে। ইংরাজ-প্রসাদ-বুভুক্ষু উপাধিভিক্ষুকদের পক্ষে আমি কোনো কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু লেখক অন্যপক্ষীয়দের প্রতি যে-সমস্ত গুণের আরোপ করিয়াছেন তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই।

এ কথা সত্য হইতে পারে এখনকার জমিদারবর্গ রাজপুরুষদের অত্যন্ত ন্যাওটো হইয়া পড়িয়াছেন, দেশের লোকের দিকে তাঁহারা তাকান না স্বদেশীয়ের নিকট হইতে খ্যাতিলাভের জন্য এবং স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক বদান্যতা-বশত পুরাকালের জমিদারগণ যে-সকল কীর্তিকলাপ স্থাপন করিতেন, এখনকার জমিদারগণ তাহাতে উৎসাহ বোধ করেন না।

কেন করেন না। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাহার কতকটা হেতু দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজের প্রভাব আমাদের দেশে এত অধিক প্রবল হইয়াছে যে, তাহা সকল প্রভাবকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে আমরা গণ্য জ্ঞান করি না। দেশের লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার কোনো স্বাদ নাই।

মুসলমানদের আমলে আমরা স্বদেশকে তুচ্ছ বোধ করিতাম না। কারণ, বিজেতারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদেরও নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ছিল। অন্তত আমাদের উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল না।

কিন্তু ইংরাজ-রাজার সঙ্গে আমাদের প্রভেদ সর্ব বিষয়ে এত অত্যধিক, তাহাদের বুদ্ধিবল যন্ত্রতন্ত্র বিলাসবিভূতি সর্বদাই আমাদের পক্ষে এত দুরায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় যে, অলক্ষিতভাবে আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

যে অনিবার্য শ্রদ্ধার অভাবে ইংরাজ অনেক সময় আমাদের প্রতি সদ্‌বিচার করিতে পারে না সেই শ্রদ্ধার অভাবে স্বদেশের লোকও আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছে।

সেইজন্য আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোক এবং বিলাত-ফেরতরা সাধারণ লোকদের হইতে আপনাদিগকে যেন স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। বাহ্য বেশভূষা আচার-ব্যবহারেও তাঁহারা আপনাদের পার্থক্য কিছু যেন অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সহিত জাহির করিয়া রাখিতে চান।

কতকটা পার্থক্য যে আপনিই হইয়া পড়ে সে কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। ইংরাজি-শিক্ষিত এবং ইংরাজিতে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে কেবল শিক্ষার তারতম্য তাহা নহে, শিক্ষার শ্রেণীভেদ বর্তমান। পরস্পরের বিশ্বাস সংস্কার রুচি এবং চিন্তা করিবার প্রণালী ভিন্ন রকমের হইয়া যায়। এবং ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তি আপনাদিগকেই শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ এবং অপরসাধারণকে অশিক্ষিত এবং পশ্চাদ্‌বর্তী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

জ্ঞানস্পৃহা ও রসবোধ, বুদ্ধি এবং কল্পনা, সাহস ও বাহুবল, অধ্যবসায় ও আত্মসম্মানে য়ুরোপীয় জাতির যে এক মহোচ্চ আদর্শ ইংরাজি শিক্ষা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছে তাহার যদি কোনো আকর্ষণ না থাকিবে তবে আমাদের শিক্ষাকে ধিক্‌!

সেই আকর্ষণ আমাদিগকে অনেক সময় ছদ্মবেশ এবং আত্মপ্রতারণায় লইয়া যায়। কেবল ইংরাজি শিখিয়াই আমরা যেন ইংরাজের মহত্ত্বকে কতকটা আপনার বলিয়া মনে করি, এবং যাহারা ইংরাজি শেখে নাই তাহাদিগকে কতকটা বাহিরের লোকের মতো করিয়া দেখি। ইংরাজের মহত্ত্ব যে ঐতিহাসিক, তাহা যে বংশপরম্পরাগত, কর্মগত, চরিত্রগত—ইংরাজের ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান যে সেই ইতিহাস, সেই চরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—তাহা যে শুদ্ধমাত্র স্কুলে অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পাস হইতে নহে—ইহা আমরা চোখ বুজিয়া ভুলিতে ইচ্ছা করি। এবং ইংরাজের স্কুলে পড়িয়াছি বলিয়াই আমরা নিজেকে ইংরাজশ্রেণীয় জ্ঞান করি।

এইরূপ ইংরাজের টানে দেশ হইতে পৃথক হইয়া যাইবার যে ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহা কোনো এক পক্ষের মধ্যে বন্ধ নহে; তাহা নানা আকারে নানা দিক হইতে প্রকাশ পায়। মুখুজ্জেমশায় এবং বাঁড়ুজ্জেমশায় কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

আজকাল জমিদারবর্গ ইংরাজের মুখ না তাকাইয়া, উপাধির দিকে লক্ষ না রাখিয়া দেশহিতকর কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান না—দেশের লোকের স্তুতিনিন্দা তাঁহাদের কাছে এতই ক্ষুদ্র হইয়া গেছে।

তেমনি আমাদের দেশে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া সর্বদা সভামঞ্চের উপরে আরোহণ করেন তাঁহাদেরও ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না। বরঞ্চ আমাদের জমিদারদিগকে দেখিতে শুনিতে ঠিক আমাদের দেশের লোকের মতো, কিন্তু আমাদের জননায়কদের অনেকেই যে দেশের মুরুব্বি বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করেন সে দেশকে আচারে ব্যবহারে জীবনযাত্রায় অহরহ অপমানিত করেন। ইংরাজরাহুকর্তৃক জমিদারদের যদি অর্ধগ্রাস হইয়া থাকে, ইঁহাদের একেবারে পূর্ণগ্রাস।

জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্মেন্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা যাহা করেন তাহাও ইংরাজের প্রতি লক্ষ রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরাজি, তাহার প্রণালী ইংরাজি, তাহার প্রচার ইংরাজিতে। ইংরাজ-দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে ইঁহারা আপনাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না।

এই স্থলে আমাদের কোনো বন্ধুর লেখা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমরা উদ্ধৃত করি—

> ‘স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশপ্রীতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। দুই-তিন বার কন্‌গ্রেস হইবার পর একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, ‘ভারতবর্ষ’ একটা মহাদেশ; এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের যত্নে যদি সমস্ত দেশ মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বর্তমান কন্‌গ্রেস-ওআলাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না তাহা নিশ্চয় বলা যায়। ইঁহাদের উদ্যম-আলোচনা-আন্দোলনের ফলে চাই-কি আমাদের অনেক অভাব-অবিচার দূর হইতে পারে, কিন্তু রাজার নিকট সুবিচারপ্রাপ্তি কিংবা দুই-এক স্থলে রাজার সহিত সমান অধিকার-প্রাপ্তিই যদি কন্‌গ্রেসের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্য যে অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী তাহা বলিতে বাধ্য হইব। কন্‌গ্রেসওআলারা যদি সুসজ্জিত পট্টাবাসের পরিবর্তে হোগলার চালা, চেয়ারের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাদুর, পেন্টুলুনের পরিবর্তে ধুতি, এবং ইংরাজির পরিবর্তে ভারতবর্ষীয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয়েন তাহা হইলে বর্তমান কন্‌গ্রেস দ্বারা দেশের কোনো স্থায়ী উপকার সম্ভবপর নহে।’

মুখে মুখে কথা বিকৃত হয় এবং ভূদেববাবু ঠিক কী কথাটা বলিয়াছিলেন তাহা জানি না। আমাদের মনে উদ্দেশ্য যাহাই থাক্‌, তাহা যতই সংকীর্ণ হউক, কিন্তু অনুষ্ঠান যদি বৃহৎ হয় তবে উদ্দেশ্যও আপনি বাড়িয়া চলে। সূচির মুখে সুতা পরাইতেও যদি বাতি জ্বালি তবে সেই বাতিতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া উঠে। তেমনি যে উদ্দেশ্যেই কন্‌গ্রেস হউক, তাহা স্বভাবতই আপন উদ্দেশ্যকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া দেশের বৃহৎ মঙ্গলের অবতারণা করিবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু যে-সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও আমাদের ভাবিবার কথা। আমরা মাছ ধরিতে চাই, কিন্তু জলের সহিত সংস্রব রাখিতে চাই না; আমরা দেশের হিত করিব, কিন্তু দেশকে আমরা স্পর্শ করিব না!

দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয়? দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া। ইংরাজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসংগত।

কিন্তু, ভিন্নভাষী ভারতকে এক করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ভাষা ইংরাজি হওয়া উচিত এমন তর্ক যাঁহারা এ স্থলে উত্থাপন করিবেন তাঁহারা আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। যেখানে ইংরাজি বলা দরকার সেখানে অবশ্য ইংরাজি বলিবে। কিন্তু তোমার ভাষাটা কী? তোমার লেখাপড়া ধ্যানধারণা মন্ত্রতন্ত্র সমস্তই ইংরাজিতে কি না? জনসভার বাহিরে দেশের সহিত তুমি কিরূপ সংস্রব রাখিয়া চল? ইংরাজি ভাষায় যেটুকু কর্তব্য তাহা যেন সাধন করিলে, কিন্তু দেশী ভাষায় যে কর্তব্যপুঞ্জ পড়িয়া আছে, যাহা কাগজে রিপোর্টের জন্য নহে, যাহা সমুদ্রপারে উদ্‌বেলিত হইবার জন্য নহে, যাহার ফলাফল যাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শুদ্ধমাত্র আমাদের দেশী-মণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ, তাহাতে হাত দিতে তোমার মন উঠে? গবর্মেন্টের সম্মান যাঁহাদের কর্তব্য-বুদ্ধির আশ্রয়দণ্ড তাঁহাদিগকে তোমরা নিন্দা কর, কিন্তু ইংরাজ-করতালির এলাকার বাহিরে যাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধি পদনিক্ষেপ করে না তাঁহারাই কি প্রচুর সম্মানের অধিকারী!

কন্‌গ্রেস যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের মিলন-সভা, কন্‌ফারেন্স তেমনি সমস্ত বাংলার। সেই সমগ্র বাংলার মিলনক্ষেত্রে বাঙালির কী অভাব, বাঙালির কী কর্তব্য, সেও যদি আমরা ইংরাজি ভাষায় বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারি তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়। এই প্রমাণ হয় যে, দেশকে যাঁহারা চালনা করিতে চাহেন তাঁহারা, হয় দেশী ভাষা জানেন না, নয়, কর্তব্যের ক্ষতি করিয়াও ইংরাজি ভাষা ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের অভিমান চরিতার্থ হয় না।

অতএব ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যায়, জমিদারের চরিত্রে যে ঘুণ ঢুকিয়াছে আমাদের

জননায়কদের চরিত্রেও সেই ঘুণ। ইংরাজের কৈশিকাকর্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে। ইংরাজকে বাদ দিলে আমাদের কর্তব্যে স্বাদ থাকে না, সম্মানে গৌরব থাকে না, বেশভূষায় মর্যাদা থাকে না; আমাদের দেশের লোকের খ্যাতি অপেক্ষা গবর্মেন্টের খেতাব, আমাদের দেশের লোকের আশীর্বাদ অপেক্ষা বিলাতি কাগজের রিপোর্ট আমাদের কাছে শ্রেয়।

ইংরাজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরাজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়। যাঁহারা স্বদেশ অপেক্ষা আপনাকে অনেক ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, যাঁহারা স্বদেশের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে লজ্জাবোধ করেন তাঁহারাও স্বদেশকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, স্বীকার করি। কিন্তু সেটুকু না করিয়া যদি তাঁহারা নিজের দেশকে নিজের উপযুক্ত জ্ঞান করেন এবং নিজেকে স্বদেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে তাহাতে তাঁহাদেরও আত্মসম্মান থাকে এবং দেশকেও সম্মান করা হয়।

১৩০৫

আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ

মুখ গোপন করিয়া কেবল পুচ্ছটুকু বাহির করিলে পরিচয়ের সুবিধা হয় না। যে বাঙালি পায়োনিয়রে পত্র লিখিয়া কেবল 'আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কেমন করিয়া জানিব তিনি কে।

জানিতে কৌতূহল হইতে পারে; কারণ, তিনি যে-সে লোক নহেন সবিনয়ে এমনতরো আভাস দিয়াছেন। তিনি না উকিল, না মোক্তার, না ইস্কুলমাস্টার![1] অহো, তিনি এত মস্ত লোক! তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় বড়ো হইতে হয় নাই; নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক এবং হয়তো অসম্ভব; যে ইংরাজি চিঠিখানা কাগজে ছাপা হইয়াছে সেও হয়তো-বা তাঁহার নিজের রচনা নহে, হয়তো তাঁহার সেক্রেটারি লিখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার এত অবজ্ঞা এবং বর্তমান সুলভ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার এত বিদ্বেষ।[2]

উকিল স্কুলমাস্টার এবং গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ শিক্ষিত সন্দেহ নাই, শিক্ষাই তাঁহাদের প্রধান সম্মান এ কথা কবুল করিতে হয়; অতএব আল্‌ট্রা বলিতেছেন, ধিক্ তাঁহাদিগকে! অতএব আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভগণই দেশের স্বাভাবিক অধিনেতা। কারণ, শিক্ষা বল, বুদ্ধি বল, অভিজ্ঞতা বল, আত্মনির্ভরই বল, কিছুতেই তাঁহাদের লেশমাত্র প্রয়োজন নাই—দেশেতে তাঁহাদের 'স্টেক' গাড়া আছে।

তবে আমাদের এই আল্‌ট্রার এত সংকোচ কিসের। যদি ইনি উকিল না হন, যদি ইনি স্কুলমাস্টার অথবা স্কুলমাস্টারের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত কেহও না হন, তবে কোন্ লজ্জার অনুরোধে আপনার এতবড়ো নিষ্কলঙ্ক নামটা গোপন করিলেন। যদি তিনি জাত-সিংহই হন তবে শিকারের পূর্বে একবার গর্জনসহকারে নিজের নামটা ঘোষণা করিয়া দিলেন না কেন—দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কলেজের কক্ষ হইতে আদালতের প্রাঙ্গণে, ম্যুনিসিপ্যাল সভা হইতে কন্‌গ্রেসের পান্ডালে পর্যন্ত কম্পান্বিত হইতে থাকিত।

---

[1] 'Have vakils, attorneys, pleaders, mukhtars, and schoolmasters a greater stake in the country than the zemindars?'

[2] 'The self-elected delegates who make up that body (Congress) are lawyers, to whom notoriety means more fees, disappointed office-seekers, and ex-students from Government colleges, whose vanity is gratified by the honour—whatever may be its value—of being a Congress delegate. Their number is, I fear, likely to increase under the present system of practically free education.'

যদি অবাধে নামটা প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে দেশের সমস্ত গণিতশাস্ত্রবিৎ উকিল স্কুল-মাস্টার ও গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ খড়ি পাতিয়া আঁক পাড়িয়া একবার গণনা করিতে বসিত তাঁহার ‘নোবিলিটি’ কতদিনকার, একবার মাপিয়া দেখিত হতভাগ্য দেশের বক্ষঃস্থলে তাঁহার ‘স্টেক’ কতদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

হায় বঙ্গদেশ, তোমার উচ্চতাবিহীন সমতল ভূমিতে ‘নোবিলিটি’, প্রাচীন আভিজাত্য টিঁকিতে পারে না। তোমার নানাস্রোতঃসংকুল পলিমাটিতে আজ যেখানে স্থল কাল সেখানে জল, আজ যেখানে গ্রাম কাল সেখানে নদী, আজ যিনি উকিল কাল তিনি জমিদার, বাপ যাহার জমিদার পুত্র তাহার স্কুলমাস্টার মাত্র, অদ্য যে present system of practically free education-কে অবজ্ঞা করে তাহারই পৌত্র বি.এ. পাস-পূর্বক বিবাহের হাটে উচ্চ দরে বিকাইয়া যায়।

বৌদ্ধ সাধু মশাটিকে মারিতেও কুণ্ঠিত হন, পাছে সেই মশা তাঁহার কোনো পূজনীয় পূর্বপুরুষের নূতন সংস্করণ হয়, পাছে হয়তো সেই বংশে অদূর ভবিষ্যতে তিনিও জন্মলাভ করেন। আমাদের দেশেও যাঁহারা প্রভাতে জাগিয়া অকস্মাৎ আপনাদিগকে অ্যারিস্টক্র্যাট বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা উকিল-মোক্তার-স্কুলমাস্টারের প্রতি চপেটাঘাত উদ্যত করিবার পূর্বে যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন যে, হয়তো তাঁহাদের অনতিদূরবর্তী পূজনীয় পূর্বপুরুষ উকিল মোক্তার অথবা তদনুরূপ কেহ ছিলেন, অথবা অনতিদূরবর্তী ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই ‘আত্মা-বৈ’ উকিল-মোক্তার হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা হইলে তাঁহারা এই-সকল শিক্ষিত ও সুযোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি যথোচিত ভদ্রোচিত বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ-মহাশয়েরা অত্যন্ত সুখী। তাঁহাদের গায়ে কথা সহে না। সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁহাদের সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিল। অন্যায় করিয়াছিল কি ন্যায় করিয়াছিল তাহা তর্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাহেবের নিকট সোহাগ লইতে গিয়াছেন। দুই বাহু মেলিয়া পায়োনিয়রের কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিতেছেন, ‘দেশের আর-সকলে উকিল অ্যাটর্নি ইস্কুলমাস্টার এবং কলেজের ছাত্র, তাহারা শিক্ষিত, দেশের উপরে তাহাদের কোনো অধিকার নাই— বিশাল ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আমাদেরই কয়েকজনের খোঁটা গাড়া আছে, We the ultra-conservatives, আমরা জমিদার, আমরা নোবিলিটি— কিন্তু সাহেব, উহারা কেন আমাদিগকে খারাপ কথা বলে।’ আহা, কী আদর! পায়োনিয়রের কোল হইতে ইংলিশ্‌ম্যানের কোলে কত সান্ত্বনা! এক দিকে সোনার-গোট-পরা হৃষ্টপুষ্ট তৈলচিক্কণ আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ প্রৌঢ় শিশুটি, অন্য দিকে কালো-কোর্তা-পরা গুপ্তহাস্যকুটিলমুখ রক্তবর্ণ ইংরাজ সম্পাদক— অশ্রুপরিষিক্ত বাৎসল্যের কী অপরূপ দৃশ্য! কী সুপবিত্র স্নেহসম্মিলন!

আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে তাঁহাদের স্বদেশীয়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া পায়োনিয়রের বক্ষোদেশে মুখ গোপন করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ‘সাহেব, এও কি হয়! তোমরা কি কেহ নও! কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটি কেবল দিশি লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল। আমরা যে-সম্প্রদায়ের লোক, আমরা কি ইহা সহ্য করিতে পারি!’[১] তাঁহাকে এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, তোমরা যে দশশালা বন্দোবস্তে দেশের কর্তা হইয়া উঠিয়াছ তাহাই বা চিরদিন থাকে কেন। ইংরাজ যে রক্তপাত-দ্বারা দেশ জয় করিয়াছে এবং দেশ রক্ষা করিতেছে তাহা কি কেবল তোমাদের মতো অলস বিলাসীদের মুখে নিরাপদে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য। ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে পেন্‌শন না দিয়া কেন এক-এক টুকরা জমিদারি দেওয়া হয় না। জীবনের অধিকাংশ কাল যাঁহারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গেলেন তাঁহারা কি বৃদ্ধবয়সে ইংলন্ডের কোনো-এক অখ্যাত বাসাবাড়িতে মরিতে যাইবেন। তাঁহারই মুখ হইতে ভাষা লইয়া এ কথা কি

---

[১] 'Under the present system the municipality exists for the Native Commissioners, their friends and canvassers.'

কেহ বলিতে পারে না যে : I do not think that any one will venture to seriously deny that the Permanent Settlement has proved a failure in this country। আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ যেরূপভাবে দেশের মধ্যে খোঁটা গাড়িয়া তাঁহাদের জমিদারি শাসন করেন, একজন ইংরাজ প্রভু কি তাহা অপেক্ষা ভালো শাসন করিতে পারে না। তাহার দ্বারা কি স্থানীয় স্বাস্থ্য শস্য শিক্ষা ও শিল্প বর্তমান বন্দোবস্তের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ পায়োনিয়ারের বক্ষঃস্থলে হেলিয়া-দুলিয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া বলিবেন, 'পারে, অবশ্য পারে। তোমরা সাহেব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কিসের। কিন্তু যে অধিকার দিয়াছ সে কি ফিরাইয়া লইবে।'

হায় আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ, তুমি মস্তলোক এবং আমাদের উকিল-ইস্কুলমাস্টারগণ তোমার সহিত তুলনীয় নহেন, কিন্তু আমাদের সকলেরই অধিকার অতি সামান্য, এবং ইংরাজের কথার উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর। তোমারও কোনো জোর নাই, উকিল-মোক্তারদেরও কোনো জোর নাই। যদি একটা অধিকার, একটা উন্নত আশ্বাসের কারণ আমাদিগকে দান করিয়া আবার তাহা ইংরাজ কাড়িয়া লন তবে তোমরা 'নোবিলিটি'-বর্গই বা কী করিবে আর যাঁহারা স্ববুদ্ধিজীবী তাঁহারাই বা কী করিবেন।

হে আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ, কন্‌গ্রেসের শূন্য বাগ্মিতার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ এবং একটা পাকা কথা বলিয়াছ যে, কঠিন কার্যের দ্বারাই দেশের উন্নতি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আগামী শাসনকর্তা কার্জন-সাহেব আসিয়া যদি তোমাদের দশশালা বন্দোবস্তটি কাড়িয়া অন্য দশজনের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেন তবে তোমরাই বা কী কঠিন কার্যটায় প্রবৃত্ত হও? তোমরা কি তোমাদের লাঠিয়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া লড়াই কর, না, কন্‌গ্রেসেরই মতো বাগ্মিতা অবলম্বন কর?

কন্‌গ্রেস ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের নিকটে যাহা চায় তাহা কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা চায়, কঠিন কার্যের দ্বারা চায় না—আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ-মহাশয়েরা কি তাহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছুক আছেন।

আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ যদিচ মহোচ্চ জমিদারসম্প্রদায়ভুক্ত তথাপি তাঁহার সংসারজ্ঞান যে একেবারেই নাই তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার একটা কথায় অত্যন্ত চতুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কন্‌গ্রেস যে প্রচুর রাজভক্তি প্রকাশ করে, গোড়াতেই মহারানীর জয়কীর্তন করিয়া কার্য আরম্ভ করে—ইহার অপেক্ষা চালাকি তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

বাস্তবিক, চোরের কাছে চোর ধরা পড়ে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। সেই অতিভক্তি কন্‌গ্রেসই প্রকাশ করুন আর আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ-সম্প্রদায়েরাই করুন, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য চুরি। যাঁহারা ডফারিন-ফন্ডে টাকা দেন, ভূতপূর্ব সাহেব-কর্মচারীদের অভূতপূর্ব পাষাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা-দ্বারা দেশকে ভারাতুর করিয়া তোলেন, পায়োনিয়রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করো দেখি তাঁহাদের অতিভক্তির মূল্য কি সাহেবেরা বোঝে না। ইহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া কিছু কি আদায়ের চেষ্টা নাই। আল্‌ট্রাগণ নাহয় নিজের জন্য উপাধি সন্ধান করেন, কন্‌গ্রেস নাহয় দেশের জন্য একটা-কিছু সুযোগের চেষ্টায় থাকেন, পরন্তু ভক্তি-জিনিসটাকে ব্যবহারে লাগানো হইয়া থাকে। এ ভক্তিকে ঠিক বলা যায় না—

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow!

তবু অতিভক্তিতে তোমাদের কাছে কন্‌গ্রেসকে হার মানিতে হইবে। একবার ভাবিয়া দেখো, তুমি যে রাজভক্তির প্রচুর তৈল-লেপনে পায়োনিয়র পত্রটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহার মধ্যে কত অভিসন্ধিই আছে। ঐ-যে মুগ্ধ চক্ষু সাহেবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছ, সাহেব, তোমারই জন্য দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম (অতএব কিছু আশা রাখি!)—ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর (অতএব কিঞ্চিৎ সুবিধা চাই!)—নাথ, তুমি বল কন্‌গ্রেস মন্দ, আমিও বলি তাই (অতএব দেশের লোকের মাথার উপরে আমাকে চড়াইয়া দাও!)—বঁধু, তুমি ম্যুনিসিপালিটি হইতে দিশি জঞ্জাল বিদায় করিয়া বিলাতির আমদানি করিতে চাও, সেই হচ্ছে 'জেনারেল সেন্টিমেন্ট্ অফ দি ক্লাস টু হিব্‌চ আই হ্যাভ দি অনার টু বিলঙ্গ্' (অতএব তোমার পাদপীঠপার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়ো!)—ভারতবর্ষের মন্ত্রসভাই বল আর পৌরসভাই বল, সমস্ত আগাগোড়া নূতন নিয়মে পরিবর্তন করা আবশ্যক (অর্থাৎ, সকল সভাতেই তুমি বস সিংহাসন জুড়িয়া, আর আমি বসি তোমার কোলে!) ইতি তোমার আদরের অতিভক্ত আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ।

এমন শুভদিন কখনোই আসিবে না, কিন্তু যদি দৈবাৎ আসে, যদি কোনো কারণে সাহেবের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া কন্‌গ্রেসের নিকট হইতেই সম্মান সৌভাগ্য ও সহায়তার প্রত্যাশা জন্মে তবে অতিভক্তির প্রবল স্রোত কি কন্‌গ্রেসের দিকেই ফিরিয়া আসে না। তখনও কি রাজা-রায়বাহাদুরগণ সাহেবের ডালি জোগান এবং পায়োনিয়রে পত্র লেখেন।

সাংসারিক ভক্তির এই নিয়ম। তাহা নিঃস্বার্থ নহে। যেখানে পাওনার সম্পর্ক নাই সেখানে আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভেরও যদ্রূপ মনের ভাব গবর্মেন্ট কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রেরও তদ্রূপ। মনুষ্যচরিত্রের মধ্যে বৈষম্য এতই যৎসামান্য।

উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। ভূতপূর্ব ছাত্র দেশের হিতোদ্দেশে 'হার্ড ওআর্কে' যদি-বা অপটু হন অন্তত তাঁহার 'এম্প্‌টি এলোকোয়েন্স'ও আছে, কিন্তু আমাদের আল্‌ট্রা-কন্‌সার্ভেটিভটি যে সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল করেন তাঁহারা বাগ্মিতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, 'কঠিন কর্ম'ও তাঁহাদের কর্ম নহে। তাঁহারা শিক্ষাকেও অবহেলা করেন এবং সামর্থ্য হইতেও বঞ্চিত। তাঁহাদের ধন আছে; দেশের হিতোদ্দেশে সে ধন যদি ব্যয় করিতে পারিতেন তবে বাক্যবীর ও কর্মবীর সকলের উপরে উঠিতে পারিতেন; কারণ, কবি বলিয়াছেন—

শতেষু জায়তে বক্তা সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ।
শূরো দশসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বা॥

কিন্তু সম্প্রতি দানে যিনি আমাদের দেশে আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি অধ্যাপক ছিলেন, দেশে তাঁহার কোনো 'স্টেক' ছিল না, এবং তাঁহারই উদার বদান্যতায় 'প্রেজেন্ট সিস্টেম অফ প্র্যাক্‌টিক্যালি ফ্রী এডুকেশন' এই দীনহীন দেশে বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছে।

১৩০৫

বিরোধমূলক আদর্শ

ওগুস্‌ৎ ব্রেয়াল কন্‌টেম্‌পোরারি রিভিয়ু পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ফরাসি ইংরাজকে জানে না, ইংরাজ ফরাসিকে বোঝে না।

ফরাসিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরাজের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন—উত্তর পাওয়া যাইবে, ইংরাজ মানুষটাকে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ইংরাজ জাতটার উপর আমার ঘৃণা।

য়ুরোপের বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়। প্যাট্রিয়টিক ভাবের প্রতি লক্ষ করিয়া ছেলেদিগকে অন্য দেশের সহিত স্বদেশের সাবেক কালের ঝগড়ার কথা স্মরণ করাইয়া, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত

সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়। কর্সিকাদেশের মাতৃগণ, অন্য পরিবারের সহিত স্বপরিবারের কুলক্রমাগত যে বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের প্রতি যে প্রতিহিংসা করিবার আছে, শিশুকাল হইতে সন্তানের কানে তাহা জপ করিতে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস-পড়ানোও ঠিক সেইরূপ।

আজকাল ইংলন্ডে খুব-একটা লড়াইয়ের নেশা চাপিয়াছে। সৈনিক-দলে ভিড়িবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই ডাক অন্য-সকল বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। ফ্রান্সও যে এ বিষয়ে নিরপরাধ, তাহা নহে। এখন দুই পক্ষের পালোয়ান সাহিত্যে পরস্পরকে শাসাইতেছে। ব্রিটিশ চ্যানেলের দুই পারে একদল খবরের কাগজ সৈনিকতার রাস্তা দিয়া বর্বরতায় পৌঁছিবার জন্য ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, ব্যক্তিগত ধর্মনীতি হইতে ন্যাশনাল ধর্মনীতির আদর্শের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, শেষে তাহার কি এইরূপ সমন্বয় হইবে। য়ুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্বরতায় ফিরিয়া যাইবে।

আজকাল দুই পয়সা দিলেই খবরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, ধাতুগত বিরোধের ভাব, অনিবার্য পার্থক্য এবং জাতিগত বিদ্বেষে পরস্পরের বংশানুক্রমিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক বা কাল হউক, একটা সংঘর্ষ হইবেই। তাহাদের মতে মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি এবং ন্যায়ধর্মের উচ্চতম নীতি-সকল দুই জাতিকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেছে। তাহারা বলে, নেশনদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের আশা বাতুলের খেয়াল মাত্র। ইত্যাদি।

এই-সকল বিরোধ-বিদ্বেষের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে বিদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিষের মাত্রা নিয়মমত পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই।

প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ ধর্মনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাঁধি বোল আছে, যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ করে এবং সে সম্বন্ধে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিয়া যায়। বাঁধি বোল মুখে মুখে চলিয়া যায়— লোকে নিঃসংশয়ে জীবনযাপন করে। প্যাট্রিয়টিক খুনাখুনি অথবা যোদ্ধৃধর্ম এইরূপের একটা বাঁধি বোল।

য়ুরোপীয় লেখক যে কথা বলিতেছেন তাহার উপরে আমরা আর কী বলিব। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া নাই বলিয়া লেখক অনেক দুঃখ করিয়াছেন— আর ইংরাজ ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব দাঁড়াইয়াছে সেজন্য আমাদের কী দুর্গতি ঘটিতেছে তাহা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি, ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরাজি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজ বালকদিগকে ইংরাজ-বীরত্বের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিবার জন্য যে-সকল ছেলেভুলানো গল্প ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইতেছে তাহাতে ম্যুটিনি-গল্পের উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে রক্তপিপাসু পশুর মতো আঁকিয়া দেবচরিত্র ইংরাজের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে। ফরাসিকে ইংরাজের ঠিক বুঝিবার উপায় আছে— পরস্পরের আচার ব্যবহার ধর্ম বর্ণ একই প্রকার; কিন্তু আমাদের মধ্যে যথার্থই পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, এমন-কি সেই পার্থক্যবশতই, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে ঘটিবে তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অভ্রান্তি ও মিথ্যার দ্বারা অন্ধতা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করিতেছে।

বস্তুত এই অন্ধতা নেশনতন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশন-তন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনো য়ুরোপে দেখিতে পাই না।

পরস্পরকে যথার্থরূপে জানাশুনা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে। নেশনের মেরুদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরাজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনোপ্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনি সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে,

ইংরাজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ। হিন্দুরা বলে, স্ব স্ব ধর্ম পালন করাই পুণ্য। অবস্থাভেদে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটিতেই পারে এবং সে পার্থক্য পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ, এ কথা শান্তচিত্তে নির্মলজ্ঞানে অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এবং ভিন্ন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাসম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও স্বসমাজের কর্তব্যপালন করা কঠিন হয় না। সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিত্রগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারও সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না। সর্বপ্রকার বিদ্বেষ অসত্য হিংসা সেই উন্নতির প্রতিকূল। সদ্ভাব ও সত্যই সমাজের মূল আশ্রয়। নেশন অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহুবলকে ন্যায়ধর্মের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া স্পষ্টতই ঘোষণা করে। সমাজ কদাপি তাহা করিতে পারে না—কারণ, ধর্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আমরা যদি বাঁধি বোলে না ভুলি, যদি 'প্যাট্রিয়ট'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে। আমরা নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা প্রবঞ্চনা ও অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এবং ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব?

আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে। সেখানে কেহ আমাদিগকে ঠেকাইবে না—সেখানে পিতৃলোক এবং দেবতা আমাদের সহায় হইবেন এবং বাঁধি বোলে যদি না ভুলি তবে ইহা জানা উচিত যে, সেখানে যে মহত্ত্বের উপাদান আছে তাহা সকল মহত্ত্বের উচ্চে।

কিন্তু এরূপ উপদেশ শুনা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ, অতএব বিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবে আমিও তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না। এইজন্য শিশুকাল হইতে ভিন্নজাতির সহিত বিরোধভাবের একান্ত চর্চাই 'প্যাট্রিয়টী'র সাধনা। হিন্দুজাতি সেই পোলিটিক্যাল বিরোধভাবের চর্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য দেয় নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয় তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলিব, আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোকসম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্ম নহে। ধর্মে যদি নাশ করে তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।

ন্যাশনালধর্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোয়ার জাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্য? তাহাদের হৃদয়ে ন্যাশনালধর্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই?

তা ছাড়া বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছদ্মবেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ তাহার মুখোশের মতো। কথিত আছে, ক্ষয়কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টক্‌টকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে, শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে— কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ য়ুরোপের যেরূপ অটল বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ্ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারেই যে ধ্রুব মৃত্যু তাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যভিচারেও ধ্রুব বিনাশ। ধার্মনীতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। আমাদের রাজার এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপরে যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই।

নদী তাহার দুই তটভূমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নদীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া যায়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্লাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত ধাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্তমানের আদর্শেই একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা ভীষণ হইয়া প্রলয় সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে, বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর-সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি-বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য, ন্যাশনালত্বের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক। নেশন শব্দের অর্থ যখন লোকে ভুলিয়া যাইবে তখনও এ সত্য অম্লান রহিবে এবং ঋষি-উচ্চারিত এই বাক্য স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের ঊর্ধ্বে বজ্রমন্দ্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।

১৩০৮

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি

এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাসের কারাবরোধের কথা সকলেই জানেন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অবিচার মাসিকপত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বর্তমান ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষনিবেশ করিয়াছে। সেইজন্য এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বলিতে হইতেছে।

পায়োনিয়র লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোক একত্রে বাস করে। ইহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের একটি দুরূহ কর্তব্য। সুতরাং যে ঘটনায় ভিন্নজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা হয়, সেটার প্রতি বিশেষ কঠিন বিধানের প্রয়োজন ঘটে। সে হিসাবে সোমেশ্বর দাসের কারাদণ্ডকে গুরুদণ্ড বলা যায় না।

সুযোগ্য ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘নিয়ু ইন্ডিয়া’ পত্রে পায়োনিয়রের এই-সকল যুক্তির অযথার্থতা

ভালোরূপেই দেখানো হইয়াছে। ইংরেজের যে-সকল ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় ইংরেজ বিচারক তাহাকে যে কত লঘুভাবে দেখিয়া থাকে তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ দেখিতে পাই। এই সেদিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে কোনো ইংরেজ পাদুকা বহন করাইয়াছিল— দেশের উচ্চতম আদালতে পর্যন্ত স্থির হইয়া গেছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ। তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু পায়োনিয়রের যুক্তি অনুসারে তুচ্ছ নহে। ভদ্র ব্রাহ্মণের এরূপ নিষ্ঠুর অপমান ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুতর।

তাহা হইলে কথাটা কী দাঁড়াইতেছে, বুঝিয়া দেখা যাক। যে-সকল জাতি law-abiding, অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। যাহারা কিছুতেই শান্তিভঙ্গ করিবে না, তাহাদিগকে অন্যায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ। আর যাহারা অসহিষ্ণু, যাহারা নিজের আইন নিজে চালাইয়া বসে, সংগত কারণেও তাহাদের গায়ে হাত দিবার উপক্রমমাত্র অপরাধ। ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াইবার উপায় বাঘকে দমন করিয়া নহে, গোরুটারই শিং ভাঙিয়া।

কিন্তু পায়োনিয়রের এ কথাটা লইয়া রাগ করিতে পারি না। পায়োনিয়র বন্ধুভাবে আমাদিগকে একটা শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতই বারুদে আগুন দেওয়া যতবড়ো অপরাধ, ভিজা তুলায় আগুন দেওয়া ততবড়ো অপরাধ নহে। যাহারা চিরসহিষ্ণু তাহাদের অপমানকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব আঘাত অপমান সম্বন্ধে আমরা আইন বাঁচাইব, কিন্তু আইন আমাদিগকে বাঁচাইবে না। Mild Hinduদের প্রতি পায়োনিয়রের ইহাই নিগূঢ় বক্তব্য।

আর-একটা কথা। বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনের কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিস আছে, সেটা যে দিকে ভর করে সে দিকে নিক্তি হেলে। এ দেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অন্ধ সম্ভ্রম একটা পোলিটিকাল প্রয়োজন, অতএব সেরূপ স্থলে সূক্ষ্মবিচার অসম্ভব। ন্যায়বিচারের মতে এ কথা ঠিক বটে যে, ইংরেজের প্রতি দেশী লোক যে ব্যবহার করিয়া যে দণ্ড পায় দেশী লোকের প্রতিও ইংরেজ সেই ব্যবহার করিয়া সেই দণ্ডই পাইবে। আইনের বহিতেও এ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন ন্যায়বিচারের চেয়েও নিজেকে বড়ো বলিয়া জানে।

এ কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্‌স্‌ সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নীচে। যেখানে পোলিটিকাল প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে সেইখানেই ধর্ম বসিবার স্থান পাইবে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে সত্য কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, অন্য প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেছে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে ন্যায়বিচারকেও বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়, পায়োনিয়র তাহা একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন। জজ্‌ বার্কিট সোমেশ্বরের ব্যবহারকে audacity অর্থাৎ দুঃসাহস বলিয়াছেন। স্বত্বরক্ষার উপলক্ষে ইংরেজকে বাধা দেওয়া যে দুঃসাহস, বিচারকই তাহা দেখাইয়াছেন, এবং এই সাহসিকতার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়া বিচারক যে মানসিক গুণের পরিচয় দিয়াছেন তাহাকে আমরা কোনোমতেই সাহসের কোটায় ফেলিতে পারি না। বস্তুত তিনি অবান্তর কারণে সোমেশ্বরের প্রতি অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিতে সাহসই করেন নাই। এ স্থলে দণ্ডিত যদি audacious হয় তবে দণ্ডদাতার প্রতি ইংরেজি কোন্‌ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ বিচারের ফলাফলকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া সাপ্তাহিক পত্রের এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাহার সমাধি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল প্রয়োজনের যে বিধান তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

ইহাতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কী হইতেছে তাহা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুবধর্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের

আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে সে শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কী করিয়া? ধর্মকে যদি অকর্মণ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করি তবে কিসের উপর নির্ভর করিব? বিলাতি সভ্যতার আদর্শের উপর? বিশ্বজগতের মধ্যে এই সভ্যতাটাই কি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী? দুর্ভাগ্যক্রমে, যে জিনিসটা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বুকের উপরে চাপিয়া বসে সেটা আমাদের পক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী— আমাদের পক্ষে হিমালয়পর্বতও তাহার চেয়ে লঘু। সেই হিসাবে বিলাতি সভ্যতার নীতিই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবান্বিত— তাহার কাছে ধর্মনীতি লাগে না।

অতএব ইচ্ছা করি আর না করি বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া ধরিয়া যে-সকল শিক্ষা দিতেছে তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। আমরা ক্লাইভ্‌কে হেস্টিংস্‌কে ড্যাল্‌হৌসিকে আদর্শ নরোত্তম বলিয়াই স্বীকার করিব, ইংরেজের সহিত ন্যায্য-অন্যায্য সর্বপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষ-স্থলে আমরা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাই করিব না, যেখানে ভারতশাসনের প্রয়োজনবশত প্রেস্টিজের দোহাই পড়িবে সেখানে বিশ্ববিধাতার দোহাই মানিব না ইহাই ঘাড় পাতিয়া লইলাম— কিন্তু এই গুরুই যখন শিবাজির রাষ্ট্রনীতিকে অধর্ম বলিয়া আমাদের নিকট নীতিপ্রচার করিতে আসিবেন তখন আমরা কী করিব? তখনও কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্মনীতিশাস্ত্রও বর্তমান ক্ষমতাশালীকেই ভয় করিয়া নিজের রায় লিখিয়া থাকেন, অতএব ধিক শিবাজি!

১৩০৯

রাজকুটুম্ব

‘নিয়ু ইন্ডিয়া’ ইংরাজি কাগজখানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে রস অথচ গাম্ভীর্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেক দূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।

১২ই মার্চের পত্রে সম্পাদক ‘ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ক্রিমিনাল’ নাম দিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৃথা অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া ক্রিমিনাল-শব্দটা আমরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

য়ুরোপীয় ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কেন-যে সদ্‌বিচার হয় না, সম্পাদক বিচারকের মতো ধীরভাবে তাহার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিনি বলেন, এক পক্ষে অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও আর-এক পক্ষে অপ্রতিহত শক্তি যেখানে সম্মুখীন হয় সেখানে স্বভাবতই এরূপ ঘটিতে বাধ্য। এ স্থলে আমরা হইলেও এমনিই করিতাম— এমন-কি, সম্পাদক টিপ্পনী দিয়া বলিয়াছেন, এশিয়াবাসী হয়তো সুযোগ পাইলে ‘রিফাইন্‌ড্‌’ পাশবিকতায় য়ুরোপীয়কে জিনিতে পারিত।

শুদ্ধমাত্র প্রসঙ্গক্রমে আমরাও একটি মনস্তত্ত্বের কথা বলিয়া লই। সম্পাদকের এই টিপ্পনীটুকুতে একটি দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজের বক্তব্যকে সবল করিবার জন্য অপক্ষপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বজাতির প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতও যেমন স্থলবিশেষে একপ্রকার কৌশলমাত্র, জাতিনির্বিশেষে একান্ত অপক্ষপাতও স্থলবিশেষে সেইরূপ কৌশল ছাড়া আর-কিছু নহে। নিয়ু ইন্ডিয়ার সম্পাদকের পক্ষে এটুকুর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি দুর্বল নহেন।

প্রাচ্যদের সম্বন্ধে ইংরাজদের কতকগুলি বাঁধিবুলি আছে, আমাদের 'রিফাইন্‌ড্‌' নিষ্ঠুরতা তাহার মধ্যে একটা। পূর্বদিকটা একটা মস্ত দিক—এ দিকে যাহারাই বাস করে তাহাদের সকলকে এক নামের অধীনে এক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া ভূগোলবৃত্তান্ত রচনা করিলেই যে তাহারা দানা বাঁধিয়া এক হইয়া যায় তাহা নহে। বিদেশীরা সামান্য বাহ্য সাদৃশ্যের ভিতর দিয়া বৈসাদৃশ্য ধরিতে পারে না। একজন চাষার চক্ষে এক গোরার সঙ্গে আর-এক গোরার ভেদ সহজে ধরা পড়ে না—ইংরাজের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে একজন বাঙালিও যেমন আর-একজনও প্রায় সেইরূপ। এই কারণেই য়ুরোপীয়েরা সমস্ত প্রাচ্যজাতিকে একটা পিণ্ড পাকাইয়া দেখে এবং সকলের দোষগুণকে একটা নামের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া 'ওরিয়েন্টাল' লেবেল্‌ আঁটিয়া দেয়।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু, সুতরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অন্ধতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি। রিফাইন্‌ড্‌ পাশবিকতায় এশিয়া য়ুরোপীয়ের চেয়ে অধিক বাহাদুরি কী পাইতে পারে, ইতিহাস ঘাঁটিয়া তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতের অপবাদটুকু শিরোধার্য করিয়া এ কথা অন্তরের সহিত, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, হিন্দুকে অকর্মণ্য বলো, অবোধ বলো, দুর্বল বলো সহ্য করিয়া যাইব—কারণ, সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু হিন্দুজাতির সত্যমিথ্যা নানা অপযশের মধ্যে রিফাইন্‌ড্‌ পাশবিকতার অপবাদটা সব চেয়ে অন্যায়। আর এশিয়াটিক-নামক বন্ধনবিহীন একটা প্রকাণ্ড বিচিত্র ব্যাপারের সহিত য়ুরোপীয় বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের পশুত্ব মনুষ্যত্ব বা দেবত্বের তুলনা একেবারেই অসংগত, অনর্থক। একটা মানকচুর সহিত একটা বাগানের তুলনা হইতেই পারে না।

এটা একটা অবান্তর কথা। মোটের উপর, সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহার প্রশংসা করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে চাপা কথা ঢের আছে, তাহা চাপাই থাক্‌। আমরা কেবল একটি কথা যোগ করিতে চাই মাত্র।

যাহার হাতে শক্তি আছে সে-যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মানুষের স্বভাব। ইংরাজও মানুষ, তাই সে ইংরাজ-ক্রিমিনাল্‌কে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না। যাহার হাতে শক্তি নাই সে প্রবলের অন্যায়বিচার অগত্যা সহ্য করে, ইহাও মানুষের স্বভাব। আমরাও মানুষ, তাই আমাদিগকে ইংরাজের আক্রমণ চুপ করিয়া সহ্য করিতে হয়। এই এক জায়গায় মনুষ্যত্বের সমনিম্নভূমিতে ইংরাজের সঙ্গে আমরা একত্রে মিলিতে পারিয়াছি।

নূতন ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া যখন সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী প্রভৃতি বিদেশী বচনগুলি বাংলায় তর্জমা করিবার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন আমরা এই জানিতাম যে, য়ুরোপ বাহুবলে প্রবল হইলেও মনুষ্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে দুর্বলের সহিত আপনার সাম্য স্বীকার করেন। তখন আমরা ইস্কুলের উত্তীর্ণ ছেলেরা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ইহারা দেবতা। আমরা চিরকাল ইহাদিগকে পূজা করিব এবং ইহারা চিরকাল আমাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিবে—ইহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধই শাশ্বত। আমরা মনের ভিতর হইতে ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ হার মানিয়াছিলাম।

আজ যখন বুঝিতেছি ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে—আমরাও দুর্বল, ইহারাও দুর্বল। আমাদের অক্ষমের দুর্বলতা, ইহাদের সক্ষমের দুর্বলতা—তখন অভিভূতির ভার কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি। ইংরাজ ক্রমাগত আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, 'ন্যায়পরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের স্বশ্রেণীর কোনো জাতির সহিত আমাদের তুলনাই হয় না।' এক সময়ে ইংরাজ যেন এই ধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রেস্টিজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে ব্যক্তি অক্ষমের নিকট ধর্মরক্ষা করিয়া চলে তাহার কাছে হার না মানিয়া থাকা যায় না—সেকালে আমাদের মন হার মানিয়াছিল। এখন ইংরাজ প্রতাপের প্রেস্টিজ সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে—স্বদেশী ও এদেশীকে ধর্মের চক্ষে সমান করিবার বল ও সাহস এখন তাহার নাই—এখন ইংরাজের কাছে ইংরাজ-গবর্মেন্ট দুর্বল।

এখন ম্যাঞ্চেস্টার রাজা, বার্মিংহাম রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বর অফ কমার্স্ রাজা। তাই আজকাল আমাদের প্রতি ভয় দ্বেষ ঈর্ষ্যার নানা লক্ষণ দেখিতে পাই। দেখি, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি, আপিস হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ডাক্তারিশিক্ষায় বাধা পাইতেছি, বিজ্ঞানশিক্ষায় গূঢ়ভাবে প্রতিহত হইতেছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু পাইতে পারি যে, কর্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড়ো নহে। ইহারা আমাদের অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচে না— ইহাদের মনে এ আশঙ্কাটুকু আছে যে, সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্যায় ক্ষমতায় ইহাদের সমান হইয়া উঠিতে পারি। ইংরাজ-ক্রিমিনাল দেশীয়ের প্রতি অন্যায় করিয়া ন্যায়সংগত শাস্তি পাইলে ইংরাজকে দেশীয় আপন সমতুল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, এই ভয়টুকু যখন ইংরাজের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার আত্মসম্মান নষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্তও ইংরাজের কাছে নতিস্বীকারের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে— প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সম্পাদকমহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায় ঘাটে ইংরাজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য— মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই— কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার গুটিকতক কারণ আছে।

একটি কারণ এই যে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি— পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন সমস্তই শিশুকাল হইতে আমাদিগকে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘুষাঘুষি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একান্নবর্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালোমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘুষিশিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্রকারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না। নিজের অসুবিধা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিবার ভাবই আমাদের স্বভাব ও অভ্যাস-সংগত— পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্তি পাইবার স্থান পায় নাই।

এক, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে যেটুকু বীররসের অবসর আছে, কর্তৃপক্ষ তাহা সহজে প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা কেবলই বলেন, আমাদের ছাত্রদিগকে যথেষ্ট শাসনে রাখা হয় না। তাঁহাদের স্বদেশে ছাত্রেরা যে ভাবে মানুষ হয় এ দেশের ছাত্রদের ব্যবহারে তাহার আভাসমাত্রও তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। যাহা দলন করিতে হইবে তাহা অঙ্কুরেই দলন করা ভালো, এ কথা ইংরাজ জানে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোনো কলেজের ছাত্র ফুটবল খেলিতে খেলিতে আহত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা শুশ্রূষার প্রয়োজনে কাছের একটি সরোবর হইতে কাপড়ে ভিজাইয়া জল লইয়াছিল। সেই সরোবর সাহেবদের পানীয় জলের জন্য সুরক্ষিত ছিল। সেখানে ছাত্রকে নাবিতে দেখিয়া পাহারাওআলা নিষেধ করে। সেই উপলক্ষে উভয়পক্ষে বচসা, এমন-কি হাতাহাতিও হইয়া থাকিবে। ম্যাজিস্ট্রেট সেই ছাত্রটিকে লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার ডিস্ট্রিক্টের যত দুর্গম স্থানে যে কৌশলে ঘুরাইয়া মারিয়া অবশেষে জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সেই ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকেরা কোনো কালে ভুলিতে পারিবে না। বাল্যলীলার এরূপ দণ্ডবিধি ইংরাজের নিজের দেশে যে নাই সে কথা সকলেই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো বিদ্যালয়েও, দেশীয় প্রিন্সিপালের বিচারেও, ছাত্রদিগকে যে-সকল লঘুপাপে গুরুদণ্ড সহ্য করিতে হয় তাহাতে তাহাদের পৌরুষচর্চা হয় না।

এই তো গেল ঘরে এবং বিদ্যালয়ে। তাহার পরেও যদি ইংরাজ-অন্যায়কারীর গায়ে ঘুষি তুলিবার মতো স্ফূর্তি কাহারও থাকে, তবে বিচারালয় আছে। দেশীয়দের বিরুদ্ধচারী ইংরাজ-ক্রিমিনালের প্রতি ইংরাজ-বিচারকের মানবস্বভাবসংগত পক্ষপাত সম্পাদকমহাশয় স্বীকার করেন— সেই স্বাভাবিক পক্ষপাত দেশীয় অপরাধীর পক্ষে কী আকার ধারণ করিতে পারে তাহা অনুমান

করা কঠিন নহে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবা গড়ের মাঠে গাড়ি হইতে অন্য গাড়ির একজন ইংরাজকে চাবুক মারিয়া জেলে গিয়াছিল মনে আছে, এলাহাবাদের সোমেশ্বর দাসের কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। ইংরাজের গায়ে হাত দিতে গিয়া গ্রামসুদ্ধ দোষী-নির্দোষী বহুতর লোকের কিরূপ অসহ্য লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহার কারণ, এ দেশে পোলিটিকাল নীতিতে অন্য নীতিকে জটিল করিয়া ফেলে। এ দেশে ইংরাজকে মারার মধ্যে ব্যক্তিগত মার এবং পোলিটিকাল মার, দু-ই আছে— ইস্কুলের ছেলের তুচ্ছ ক্রীড়ার মধ্যে ভাবীকালের পোলিটিকাল সংকটের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে— সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা হঠাৎ পোলিটিকালের মধ্যে পা দিয়া ফেলি, তখন সহসা কাঁধের উপরে যে দণ্ডটা আসিয়া পড়ে তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়। দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব করিয়া ইংরাজ অল্প দণ্ড ও ইংরাজের গায়ে হাত দিয়া আমরা গুরু দণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মনুষ্যধর্ম আছে তাহা নহে— তাহার সঙ্গে রাজধর্মও যোগ দিয়াছে। এ স্থলে ঘুষি তোলা কম কথা নহে।

মনুষ্যস্বভাবে সাহসের একটা সীমা আছে। জাহাজের একজন কাপ্তেন হাজার অন্যায়কারী হইলেও তাহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় নাবিকদল সংখ্যাধিক্যসত্ত্বেও সকলপ্রকার অপমান ও দৌরাত্ম্য অগত্যা সহ্য করিয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা অনেক শুনা গিয়াছে। আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা শক্ত। জস্টিস হিল ইংরাজ-ক্রিমিনালকে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, 'তোমার স্বদেশীয় ভৃত্য তোমার এরূপ ব্যবহার সহ্য করিত না।' না করিবার কারণ আছে। বিচারকের চক্ষে স্বদেশীয় ভৃত্য ও স্বদেশীয় মনিব সম্পূর্ণ সমান। সে স্থলে মনিবের দুর্ব্যবহার সহ্য না করিবার প্রভূত বল ভৃত্যের আছে। সে বল ভৃত্যের একলার বল নহে, তাহা তাহার সমস্ত স্বজাতির বল। এই বিপুল বলের সহিত একজন দেশীয় ভৃত্যের একলার বলের তুলনা করা ঠিক নহে।

এখানেও একান্নবর্তী পরিবারের কথা পাড়িতে হয়। একজন ইংরাজের উপর অল্প লোকেরই নির্ভর— আমরা প্রত্যেকেই বহুতর আত্মীয়ের সহিত নানা সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই-সকল সম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগপরতা সংযম মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে— সেই-সকল সম্বন্ধই হিন্দুজাতিকে রিফাইন্‌ড্‌ ও অকৃত্রিম পাশবিকতা হইতে দূরে রাখিয়াছে— আমাদের পক্ষে হঠকারিতা সহজ হইতেই পারে না, আমাদিগকে জেলের দিকে আকর্ষণ করিলে অনেকগুলা শিকড়েই সাংঘাতিক টান পড়ে। অতএব আমাদের জীর্ণ প্লীহা ইংরাজের বুটাগ্রের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরাজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে। সেজন্য ইংরাজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন তো করুন, কিন্তু আমরা কেন ইংরাজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি? যে ভাবে আমরা চিরকাল মনুষ্যত্বচর্চা করিয়া আসিতেছি ইংরাজের সহিত সংঘাতে তাহাতে আমাদের অসুবিধা ও অপমান ঘটিতেছে। তা হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যত্বে আমরা খাটো এ কথা আমরা তো স্বীকার করিতে পারিব না। মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের খর্বতা ঘটিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি লজ্জা পাইব? রোমের সম্রাট নগ্ন-নিরস্ত্র খৃস্টানদিগকে ক্রীড়াঙ্গনে পশু দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন— ধর্মরাজ যদি তাহার বিচার করিয়া থাকেন তিনি কি রোমরাজের পৌরুষকেই সম্মান দিয়াছেন? আমরা যদি যথার্থভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্য নিজেকে হেয় বলিয়া অন্যায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রচনানীতির খাতিরে বা যে কারণেই হউক, এ কথা আমরা যেন অনায়াসেই উচ্চারণ করিয়া না বসি যে, আমরা হইলেও ঠিক এইরূপ করিতাম বা ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতাম। না, আমরা হইলে এরূপ করিতাম না। ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। আমাদের সমাজের, আমাদের ধর্মের যে আদর্শ, আমাদের শাস্ত্রের যে অনুশাসন, আমাদের স্বভাবের যে গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম। আমরা ভিক্ষুককে, দুর্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই।

রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্বদের

উৎপাত সহ্য করিতেই হয়। মৃচ্ছকটিকের রাজশ্যালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন। প্রভেদ এই যে, উক্ত কুটুম্ববর্গের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গেছে।

মৃচ্ছকটিকের সেই রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক-না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে মুখে পরিহাস-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না। এখনকার রাজশ্যালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে পরিমাণ হাস্যরস আদায় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহারা প্রত্যহ আমাদের কাছে যে পরিমাণে সম্ভ্রম হারাইতেছেন তাহা যেন আমাদের মাথা তুলিবার সহায়তা করে।

১৩১০

সুবুদ্ধি

গত বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে 'রাজকুটুম্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে নিয়ু ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত কোনো রচনার সমালোচনা করা হইয়াছিল। নিয়ু ইন্ডিয়ার সম্পাদকমহাশয় আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দেওয়া যদি-বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজলপ্রবাহে আহতগণ্ডের আঘাতবেদনার উপশমচেষ্টাই আমাদের মতে শ্রেয়।

ইংরাজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকীসুরে নালিশ করা এ দেশে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত অধিক-মাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে ঢেলা মারিলে পৃথিবীসুদ্ধ কাক যেমন চীৎকার করিয়া মরে, দেশী লোকের মার খাইবার খবরে আমাদের খবরের কাগজগুলি তেমনি করিয়া অবিশ্রাম বিলাপ-পরিতাপে আকাশ বিদীর্ণ করিত।

আমরাই সর্বপ্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় এই নাকী কান্নার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি—এবং কথঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি তাহাও দেখা যাইতেছে। আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোনো কারণ ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।

ছবিতে যেমন চৌকা জিনিসের চারিটা পাশই একসঙ্গে দেখানো যায় না, তেমনি প্রবন্ধেও একসঙ্গে একটা বিষয়ের একটি, বড়োজোর দুইটি দিক দেখানো চলে। 'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধেও আমাদের বক্তব্যবিষয় খুব ফলাও নহে। নিয়ু ইন্ডিয়ার সম্পাদক মহাশয় যখন ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সম্ভবত আমাদের রচনায় কোনো ত্রুটি থাকিতে পারে। এবারে ছোটো করিয়া এবং স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়, এই দুই পক্ষের অবস্থা লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। আমরা কোনো পক্ষকেই কর্তব্যসম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিই নাই।

যে লোক জলে পড়িয়াছে, ডাঙা হইতে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ। অপরপক্ষের সে মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। এরূপ স্থলে কোন্ পক্ষকে কাপুরুষ বলিব? যে মারে, না, যে মার ফিরাইয়া দেয় না?

ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ—কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাতের বল আরও অনেক বেশি। তাহার দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আমি যেমন একটি মানুষ, সেও যদি তেমনি একটি মানুষমাত্র হইত তবে আমরা কতকটা সমকক্ষ হইতাম। কিন্তু এ স্থলে আমি একটি ব্যক্তিমাত্র, আর সে ইংরাজ, সে রাজশক্তি। বিচারকালে, মানুষ বলিয়া আমার বিচার হইবে, আর তাহার বিচার হইবে ইংরাজ বলিয়া।

আর, আমি যখন ইংরাজকে মারি, তখন বিচারক সেটাকে এই বলিয়া দেখে যে, ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে আমি আঘাত করিলাম, ইংরাজের প্রেস্টিজকে আমি ক্ষুণ্ণ করিলাম। অতএব সামান্য আঘাতকারী বলিয়া আমার বিচার হয় না।

আমাদের মধ্যে এই গুরুতর অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায়, তাহার চেয়ে যে মারে সেই কাপুরুষ বেশি। এই কাপুরুষতার জন্য ইংরাজ আঘাতকারী বিচারে নিষ্কৃতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে ধিক্‌কারলাভ করিত, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম। কিন্তু দেখিতে পাই, উল্টা তাহারা বেশি করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আহা-উহুর অন্ত থাকে না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ায় এইরূপ কাপুরুষতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া-ক্রস দেওয়া হয় না, এই পর্যন্ত!

সম্প্রতি একজন দেশী লোককে খুন করিয়া মার্টিন বলিয়া একজন ইংরাজের দ্বিতীয়বার বিচারে তিন বৎসর জেল হইয়াছে। ইহার পর হইতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজে কিরূপ আতঙ্কের আর্তনাদ উঠিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত নমুনাটি কৌতুকজনক—

There are some things that foreign Governments, and even Native States in India, manage better than we do; one of these is the protection of their own kith and kin, and the maintenance of that prestige so necessary for upholding constituted authority. To the disinterested observer in India, it seems that the white man is becoming very much discounted under the aegis of the British 'Raj'. Time was when the Britisher, as conqueror and ruler of this land, enjoyed certain rights and privileges, and one of these was his right to be tried by jury. Quite recently we have had the spectacle of the unanimous verdicts of juries, acquitting Europeans, charged with offences triable by these tribunals, set aside, not because there was any outcry against such acquittals, or on the application of the prosecution, but on appeal by the Government against the acquittal. To quote one specific instance, we may refer to the trial of Mr. Rose, of Dulu Tea Estate, Cachar. The relations between Europeans and natives are becoming acutely antagonistic, and this racial gulf is being widened by the violent writings of the native press. The time has arrived to look into this question a little more closely. The unprovoked assaults on Europeans, especially soldiers, are becoming increasingly frequent. Europeans are insulted, abused and jeered at by the lowest type of natives and if they retaliate, they are set upon by a mob. If the European gets badly mauled, nothing is done, no one cares, but if in the brawl he happens to seriously hurt one of his numerous assailants, in the exercise of his right of self-defence, he is tried for his life and liberty. This we say is one-sided and it behoves the Government to look a little deeper into the causes at work that bring about these frequent conflicts between Europeans and natives.

দেখো, এই একটি সামান্য ঘটনায় ইংলিশম্যান কম্পান্বিত। অন্যায় করিবার অপ্রতিহত ক্ষমতা যদি কোনো উপায়ে একটু খর্ব হয়, তবে কী আতঙ্কের বিষয়! ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, এ দেশে ইংরাজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে। করিতে পারে করুক—কিন্তু ইহার পরে ভীরুতার অপবাদ আমাদিগকে দেওয়া আর চলে না।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অপক্ষপাত বিচারে ‘কঙ্করর’ ও ‘রুলর’-দের যে প্রেস্টিজের হানি হয়, এ আশঙ্কা এ দেশের সাধারণ ইংরাজের মনে জাগিয়া আছে—জজ এবং জুরি নিতান্ত অসাধারণ না হইলে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অপক্ষপাতে সুবিচার করিতে যাহারা ভয় করে, তাহারা এক দিকে আমাদের পক্ষে ভয়ানক, তেমনি আর-এক দিকে তাহাদের এই ভীরুতাই আমাদের কাছে তাহাদের দুর্বলতা প্রতিপন্ন করে। আমাদের কাছে ইহাতে তাহাদের মর্যাদা কমিয়া গেছে। এখন আমরা ইংরাজকে ঘরে ঘরে এবং মনে-মনে খাটো করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি এক সময়ে আমাদিগকে যেরূপ সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া দিয়াছিল এখন আমরা ক্রমশই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্মনীতির যে আদর্শ তাহা প্রত্যহ আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য বর্বরতার নগ্নমূর্তি যতই দেখিতেছি ততই আশ্রয়লাভের জন্য আমাদের স্বদেশীয় কুলায়ের মধ্যেই একে একে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি। এইরূপে আমাদের অপমানের মধ্য দিয়াও আত্মসম্মানের পথ কিরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার আভাস ছিল।

আর-একটি কথা ছিল, বোধ হয় ‘নিয়ু ইন্ডিয়া’-সম্পাদকমহাশয় সেইটেতেই আপত্তি করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এমন যে, বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে সর্বপ্রকারে বিরোধের অপেক্ষা মিলনের জন্যই প্রস্তুত করে। আমাদিগকে আত্মত্যাগ এবং ধৈর্যই শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা যদি ক্ষমায় দীক্ষিত না হই, তবে এতগুলি লোকের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়। অতএব আমরা যে খপ্‌ করিয়া কাহারও নাক-চোখের উপর ঘুষি মারিতে, বা ভূপতিত ব্যক্তির মুখের উপর বা রাগ করিয়া কাহারও তলপেটে উপর্যুপরি লাথি মারিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের সাহসের অভাব নহে—তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শে আমাদিগকে নিরীহ করিয়াছে। ইংরাজ কথঞ্চিৎ পরিহাসের ভঙ্গিতে আমাদিগকে ‘mild Hindu’ বলিয়া থাকে—বস্তুতই আমরা মাইল্‌ড্‌ হিন্দু। ইহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা দেখিতেছি, এবং এখন বর্তমান অবস্থায় কী করা কর্তব্য তাহাও বিচার্য—কিন্তু মাইল্‌ড্‌ বলিয়া আমাদের লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিবার কথা নহে। ভারতবাসী মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়া যে কাহাকেও আক্রমণ করে না তাহা নহে—বোয়ার-যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় ডুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে যে, তাহারা বিনা উত্তেজনাতেও অবিচলিতভাবে মৃত্যুর মুখের সম্মুখে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে[1] কিন্তু তাহার ধর্ম, তাহার সমাজ তাহার হিংস্রপ্রবৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছে—এতদূর করিয়াছে যে, তাহাতে তাহার স্বার্থহানি ও অসুবিধা ঘটে এবং তাহার মানহানি ঘটিতেছে। এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়, তবে ভীরুতাকে যে ভাষায় করিবে, ইহাকেও কি সেই ভাষায় করিবে?

যাহাই হউক, ইংরাজের মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কী কী কারণে সহজ নহে, ‘রাজকুটুম্ব’ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ফিরাইয়া দেওয়া উচিত কি না সে কথা তুলি নাই। কর্তব্য দুঃসাধ্য হইলেও কর্তব্য, বরঞ্চ সে কর্তব্যের গৌরব বেশি। এলাহাবাদের কোনো দেশীয় ধনী ব্যাঙ্কর স্বত্বরক্ষা উপলক্ষে তাঁহার কোনো ইংরাজ ভাড়াটিয়াকে ফুলগাছের টব লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন—সেই স্পর্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। স্বত্বরক্ষা

---

[1] স্যাভেজ ল্যান্ডর-নামক ভ্রমণকারী যখন তিব্বতভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার সমুদয় ভৃত্যই প্রাণ ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কেবল চন্দনসিং ও মানসিং বলিয়া তাঁহার যে দুটিমাত্র হিন্দুভৃত্য ছিল তাহারা কখনো পলায়নের চেষ্টামাত্রও করে নাই—তাহারা আসন্নমৃত্যুর শঙ্কায় এবং অসহ্য উৎপীড়নেও অবিচলিত থাকে—অথচ নূতন দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা, সমাজে যশের প্রত্যাশা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাইয়া অর্থলাভের প্রলোভন, তাহাদের কিছুই ছিল না। তাহাদের প্রভুও বিদেশী এবং অল্পদিনের—কিন্তু তাহারা হিন্দু, অন্যকে মারিবার জন্য তাহারা সর্বদাই উদ্যত নয়, অথচ মরিতে ভয় করে না।

বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোনো ইংরাজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে এ আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও যখন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখনই ইংরাজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়ম সম্বন্ধে আমার সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

স্বভাবের নিয়মের অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে। কিন্তু সে নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বাধা পরাভূত করিয়া নিজেকে দুর্নিবারভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবের নিয়মকেই আশ্রয় করিতে হয়।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই-যে ঘুষাঘুষির উত্তেজনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের ধর্মনীতিতে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। অশুভপ্রবৃত্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্ধান করে না। তাহাকে দাসত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়। কোনো কোনো দুর্বৃত্ত মদ না খাইলে যেমন কাজ করিতে পারে না বিদ্বেষ সেইরূপ অন্ধ না হইলে পুরাদমে কাজ করিতে পারে না। গুণ্ডাগিরিকে যদি একবার রীতিমত জাগাইয়া তুলি তবে সে অন্ধবিদ্বেষের নেশায় না মাতিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে উঠিয়া-পড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চতন মনুষ্যত্বের বুকের রক্ত হইতে সে প্রতিদিন তাহার খোরাক আদায় করিতে থাকিবে। গুণ্ডাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মনুষ্যত্বকে শোষণ করে—বাহাদুরির নেশা জাগিয়া ওঠে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, শুদ্ধ উপদেশে কোনো ফল হয় না—অভ্যাস তাহা অপেক্ষা দরকারি জিনিস। মারা উচিত বলিলেই মারা যায় না, মারা অভ্যাস করা চাই। যাহাদের ঘুষি প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহারা শিশুকালে প্রতিবেশীর ছেলেকে মারে, বিদ্যালয়ে সহপাঠীকে মারে, কালেজে gownsman হইয়া townsman-কে মারে—এমনি করিয়া একেবারে এমন পাকিয়া যায় যে, তাহাদের ধর্মগ্রন্থের উপদেশ অরণ্যরোদনে পরিণত হয়। তাই হার্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার Facts and Comments গ্রন্থের ত্রিংশত্তম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

> But the refusal to recognize the futility of mere instruction as a means to moralization, is most strikingly shown by ignoring the conspicuous fact that after two thousand years of Christian exhortations, uttered by a hundred thousand priests throughout Europe, pagan ideas and sentiments remain rampant, from emperors down to tramps. Principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood : the obligation being so peremptory that an officer is expelled from the army for even daring to question it. And in international affairs the sacred duty of revenge, supreme with the savage, is supreme also with the so-called civilized.

ইহা না হইয়া যায় না। চালের একটি খড় পোড়াইতে গেলেও সমস্ত চালে আগুন লাগে। কাড়াকাড়ি ঘুষাঘুষিকে সমাজের সর্বত্র প্রচলিত করিলে, তবেই আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।

ট্রুথ প্রভৃতি বিলাতি কাগজে পুলিস আদালতের বিবরণে নিজে স্ত্রীকে, পুত্র-কন্যাকে, আত্মীয়-প্রতিবেশীকে যেরূপ নির্মম পাশবভাবে আঘাত করার উদাহরণ দেখিতে পাই, আমাদের হিন্দুসমাজে তাহার সিকির সিকিও দেখা যায় না। শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়; কে পিলা ফাটাইবে এবং কাহার পিলা ফাটিবে এই পুলিসের বিবরণী হইতেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

আমাদের দেশে ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া যদি মারামারি পর্যন্ত ওঠে, তবে যাহাতে আঘাত

গুরুতর না হয়, লড়াইকারীর সে চেষ্টা বরাবর থাকে—গালে চড়, পিঠে চাপড়ের ঊর্ধ্বে প্রায় ওঠে না। সে আমাদের সমাজের শিক্ষা; দূর হইতে সুদূরে আত্মীয়তা বিস্তার করাই আমাদের অভ্যাস; আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়া বাস করি—আমরা যদি ক্ষমা না করি, ধৈর্য না ধরি, তবে আমাদের সমাজ ভাঙিয়া যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

অতএব আমাদের দুই জাতের দুইরকম আচরণ। য়ুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী। আমাদের সমাজ ক্ষমা, ধৈর্য, সন্তোষ ও সর্বভূতে দয়া, এই শাস্ত্রমতের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে সুদীর্ঘকাল হইতে আমাদের চরিত্র গঠিত। অতএব মারামারিতে আমাদিগকে ইংরেজের কাছে হঠিতে হয়—কেবল ভয়ে নহে, অনভ্যাসে।

যদি হঠিতে না চাও, তবে শিশুকাল হইতে ঘরে-পরে সর্বত্র তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহা আমার তাহাতে কাহাকেও অংশ বসাইতে দিব না; যাহা পরের তাহা জবর-দখল করিতে চেষ্টা করিব; দুর্বল সহপাঠীর উপর অন্যায় অত্যাচার করিব; ঘুষি মারিবার সময় কাহারও নাক চোখ বাঁচাইয়া চলিব না, এবং নিষ্ঠুরতায় বিমুখ হওয়াকে পৌরুষের অভাব বলিয়া গণ্য করিব।

এইরূপে যখন আমাদের আমূল পরিবর্তন হইবে, তখন ইংরাজে-দেশীতে হাতাহাতি সমানভাবে চলিবে। বাঘে সিংহে থাবা মারামারি যেমন অত্যন্ত আমোদজনক দৃশ্য, আমাদেরও দাঁত-ভাঙাভাঙি সেইরূপ পরম কৌতুকাবহ হইতে পারিবে।

নতুবা কী হইবে। যে ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে ও পুরুষানুক্রমে স্বভাববর্বর নহে, সে যদি কর্তব্যের অনুরোধে চোখ কান বুজিয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভীষণ বর্বরতাকে জাগাইয়া তুলিবে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত নখদন্ত কোথায় মিলিবে। আমরা উপদেশের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ আরম্ভ করিব, কিন্তু যে নিষ্ঠুর বিদ্বেষ উন্মথিত হইয়া উঠিবে সেই হলাহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদের নাই।

আমি এ কথা ভয় হইতে বলিতেছি না। দাঁত ভাঙা, নাক থ্যাব্‌ড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অশুভ বলিয়া গণ্য না'ই হইল। কিন্তু যে গরলকে পরিপাক করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম সেই গরলকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না, জানি না।

কিন্তু একটা অবস্থা আছে যখন ফলাফল বিচার অসংগত এবং অন্যায়। ইংরাজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয়তো ঘুষায় পারিব না এবং হয়তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায় তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায়, এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে। বিদ্বেষ হইতে, বাহাদুরি হইতে, স্পর্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া, ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্টশাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শারীরিক কষ্ট ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি। আমরা দেখিয়াছি, দুই দিক বাঁচাইয়া চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভালোমন্দ ওজন করিয়া অনেক সময় আমাদিগকে একটা দিক অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সেরূপ রফা করিতে গেলেই সেই ছিদ্রযোগে শনি প্রবেশ করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও, তাহাই আমাদিগকে নিয়তযত্নে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। ধর্মের এই অমোঘ নিয়ম হইতে য়ুরোপ বা এশিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

অতএব ঘুষাঘুষি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তূণেও অস্ত্র আছে, দানবের তূণও শূন্য নহে— অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্র নির্বাচন যদি করিতে পারি তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে, তখন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

১৩১০

বঙ্গবিভাগ

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই— এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌গ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণ-ব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কলকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেক দিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই— প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না-আছে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা— কারণ, চাণক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয় আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি-বিলের দ্বারা তোমরা এ দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও, এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি— অপর পক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল— এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরাপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোলো আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা আমাদের নাই— আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরাজ সুহৃদ বলিয়াছিলেন : Spare him not, crush him like a worm! কিন্তু বাঙালি সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফল এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয়—এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, 'আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক্।' পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই। সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের 'স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ, কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্ত-মাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখো—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে—যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি-বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে 'তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব', তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না। গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে।

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, 'তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।' এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, 'তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।' বলিহারি এই 'অতএব'!

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয় তাহা গ্রহণ না করি কেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে—সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি-উপলক্ষেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং

লজ্জাকর। আমরা যদি-বা কপট ভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তায় ঘাটে, আপিসে আদালতে, রেলে ট্রামে, কাগজে পত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মন-জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালিজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন। গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না—আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রটা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম। বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম। আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই; এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনি আন্তরিক ঐক্য উদ্‌বেল হইয়া উঠিবে—তখনি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা; ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে—যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে—তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই

যে, পারে বটে, কিন্তু কী করিবে। কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক কাল হউক, গোপনে হউক প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই; আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন। মনে করো-না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল 'তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে মারিব' তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, 'আমি ঝরনার নীচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কী করিয়া।' তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসি-পালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন 'তোমরা কোনো কর্মের নও'। আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, 'আমাদের অধিকার গেল।' অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারানী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব, কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী। সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে। ময়দানে মহারানীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওআলিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউন-হল হইতে উদ্‌বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্মেন্ট একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল— তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না ইহা নিঃসন্দেহ; অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন তখনি আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কী আছে তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কী সাধ্য তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না— বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না— তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিন্‌সাল কন্‌ফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনা-

দিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না। এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টকে বলিব ধন্য— তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন্, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না— তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে— আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব— সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

১৩১১

দেশের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত 'দেশের কথা' নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন—

'এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগ্‌বি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্করমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই— কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়— প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।'

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন—

'দেউস্করমহাশয় বলেন, পুনঃপুনঃ আন্দোলন করিলে গবর্মেন্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।'

শিক্ষাটা কি এই হইল। ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবলজাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্‌ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়। ব্যাপারটা এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব। একটা তো কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় তো ঐ অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে। আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে : ইংরাজের আদর্শ

আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মতো সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ঐ নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে 'স্বাদেশিকতা' কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরাজ কখনোই এ কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধামাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাত ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কী জানি লাভ করিতে গিয়া মূলধন-সুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। এ স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলই পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে-সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedin-এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself', 'Thou shalt not steal', 'Thou shalt do no murder', 'Peace on earth and goodwill towards men' instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern polity. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ-সকল কথার তাৎপর্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইস্কুলই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে— তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চার জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারী-দের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া, ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায় ধর্মই বা কোথায়। আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়। কাজেই সেজন্য দরখাস্ত করিতেই হয়, শুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলেই না।

এক দিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপর দিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরাজিতে যাহাকে নেশন, অর্থাৎ পোলিটিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে— মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে; কারণ, স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরাজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ— ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে— তাহা নয়।

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি 'দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

'গবর্মেন্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন তখন তাঁহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখর-প্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে, ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।'

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এ পারে এবং একটি চোখ ও পারে রাখিলে ন্যায়দণ্ড কতকটা সিধা থাকিত। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। আসল কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে— কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে— আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে;

আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্কর মহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিষ্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

১৩১১

ব্যাধি ও প্রতিকার

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই-না কেন, সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেন্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই।

কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে, এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলই পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু শুধু কি তাই। এই কি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা। রাজাই যেন আমাদের পর, কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে।

যখন দেখি—পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে, একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র বাঁকিয়া চলিবে, ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায়-চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে।

কিন্তু আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদূর উপেক্ষার কারণ কী। ইহার কারণ, আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনো কারণে ইহার সঙ্গে আপস করিবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে কখনোই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাহ স্পর্ধা।

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই 'স্বদেশী' উদ্‌যোগ হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিস কিনি বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম, অতএব ঐখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই, কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিস আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে।

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানা স্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল—সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাথায় এই উদ্‌যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না।

কিন্তু সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা ছাড়া এক মুহূর্তেই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম 'এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল', তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ, আমরা দেশকে যে যতই ভালোবাসি-না কেন, দেশকে ঠিকমত কেহ কোনোদিন জানি না।

চিরদিন আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসি চাল— কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কন্‌গ্রেসের মলয়মারুতহিল্লোল নয়, দুটো-একটা করিয়া লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন তাড়নের পালা পুরাদমে আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুক-না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ-প্রকার বেআইনি ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতি-প্রথাবিরুদ্ধ। অল্পবয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে-সব ইংরেজ এ দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া যায় এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলন্ডবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত রাজ্যশাসন-ব্যাপারে হাঙ্গামার পালা সহজে আরম্ভ হয় না— ইংরেজই তাহাতে বাধা দেয়। এইজন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরাজি দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন তাহা ভদ্র ইংরেজ-পক্ষের দৃষ্টিতে বড়োই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের ঐ একটা ভারি মুশকিল আছে। তাহারা যখন ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি পড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে, আমাদের উপরে খুব কষিয়া হাত চালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার করে না— কারণ, অল্পে অল্পে আমাদেরই শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষেত্র আমাদের দেশের মতো আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্রপারে যে ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনো সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে।

এইজন্য আমাদের মতো অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিস্‌পিস ও দাঁত-কিড়্‌মিড়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়— তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য তাহাদের কাছে অত্যন্ত অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েন্টালদের সঙ্গে এ-রকম চাল ঠিক নয়— যেমন অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে।

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজে চাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই-সমস্ত আধ-মরা লোকদিগকেও মারিবার জন্য মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না; বোয়ার-যুদ্ধের পূর্বে এবং সেই সময়ে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্‌বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও গায়ের জ্বালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয়, ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়তো

ভুলাইতে পারে কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মতো সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

যাহা হউক, এ-সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম। এই স্পর্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল এক পক্ষ হইতেই চলিবে, অপর পক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

অপর পক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ কথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি, আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইন-রক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই-একটা মাথা-ফাটাফাটি ঘটিলেই আমরা এমন ভাব করি কেন, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখো দেখি, ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দে মাতরম্ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে, এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্ন-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে, ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ কথা বলা চলিত যে, রাগদ্বেষের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি। এ-সমস্তই সদ্‌যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলে না। যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্যথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এতবড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ার-ভাঁটা রৌদ্র-বৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া, যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, যে-কোনো কারণেই এবং যে-কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষতি করিতে যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই সহজ, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্ত্বের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম—ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় নাই।

এই তো দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে

শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্‌কার দিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় তো পাইলাম, কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন; তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত—যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না—সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে—মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়—মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।

যাহা হউক, 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই

বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, এ কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল নিজের জোরে। আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষা দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে 'আমরা উভয়ে ভাই'—তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাইসম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়—সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত, তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।

হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান—আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত, শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্। আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা

উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।

এইজন্য অদ্যকার অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে যে, স্পর্ধা করিবার, লড়াই করিবার দিন আজ আমাদের নহে। স্পর্ধা করাটা শক্তিমানের পক্ষে একটা বিলাসের স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু অশক্তের পক্ষে তাহা দেউলে হইবার পন্থা। যে শক্তি তাহাতে অপব্যয় হয় তাহা খরচ করিবার সম্বল আমাদের আছে কি। শুধু তাই নয়, যে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতটা আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে হিসাবটা কি ভালোরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। যে নৌকায় কোনোমতে ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে শুরু করিলে যদি তাহার ফাটগুলা দিয়া জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে আমরা এমন অভাবনীয় বলিয়া মনে করি কেন। এই নৃত্যব্যাপারে আমি আপত্তি করিতে চাই না, কিন্তু ইহাই যদি আমাদের অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়া অন্তত ঐ ফাটাগুলো সারাইয়া লইতে হইবে তো?—তাহাতে বিলম্ব হইবে। তা হইবে বটে, কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা এমন পুণ্য করি নাই যে, ভাঙা আসবাব লইয়া কাজও করিব, দুর্লভ ধন লাভও করিব, অথচ বিলম্বও ঘটিবে না।

তবে করিতে হইবে কী। আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে, দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনোপ্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ঔদ্ধত্য করিতে থাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হয়। গর্ভিণীকে সমস্ত অপঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতে হয়—সেই সতর্কতা ভীরুতা নহে, তাহা তাহার কর্তব্য।

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে, এ কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তি-প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর-কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই-সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া, ছোটো

বলিয়া অপবাদ দেয়, উপহাস করে, তবে তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু-একটা করিতেছি, ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পনেরো করিয়া ফলাইয়া কেবলই সাগরপারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না মনে করি। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা। আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি, কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী-রচনা লইয়া আমাদের তর্কবিতর্কের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া, বাধা কাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ, উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

এ কথা নিশ্চয় জানি, অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি-উদ্‌বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ নিষ্ফলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অঙ্কুরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কী। ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি, এ যে মগের মুল্লুক হইল! মর্লির মুখে লিবারেল নীতির উল্টা কথা শুনিলেই আমরা বলি, এ কি পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠিল!

আমার নিবেদন এই, এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। সমস্ত

ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়— শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি, এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী সুগভীর। ইহার কোন্ দুঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে, নানা দিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি।

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক। কিন্তু এখনি আমরা সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা যাহা পারিব তাহার গোড়া যদি মারিয়া দিই তবে আমাদের অদ্যকার সমস্ত আস্ফালন একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।

বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতি পদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব— নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব— স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব— অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে— আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি, আমরা কতবড়ো ভয়ংকর, সে আলোচনায় কাহারও কোনো লাভ নাই; কার্জন আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কতবড়ো অন্যায় ধমকটা দিলেন সে কথা লইয়া অনবরত এক সভা হইতে আর-এক সভায়, এক কাগজ হইতে আর-এক কাগজে, মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বলো, কী কাজ করিতে হইবে। আচ্ছা, মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা এক সময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে— নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী। কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই— ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম— কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে অসংযম চরিত্র-দুর্বলতার বিলাস মাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে— এ সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।

১৩১৪

যজ্ঞভঙ্গ

কন্‌গ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

এবারকার কন্‌গ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে, কিন্তু ঠিকমত প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

সমস্ত দেশকে লইয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞের কর্তারা কে কোন্‌ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খালাস পাইতে পারেন না। চারি দিকের অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাঁহাদের উপর। কোনো কারণে কর্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে গালি দিয়া তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বারুদের ভাণ্ডারে দেশলাই জ্বালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে সন্দেহ নাই—এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই নাহয় বারুদকেই কর্তৃপক্ষেরা আসামির দলে দাঁড় করাইয়া থাকেন—জগতের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। মণিপুরী হত্যাকাণ্ড যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের দণ্ড দিয়া তাঁহারা ধর্মবুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়াছেন, এবং আজ বাংলাদেশে যে বিচিত্র রকমের উৎপাত বাধিয়া উঠিয়াছে সেজন্য বাঙালিকেই বন্ধনপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে—ও দিকে কার্জন ও মর্লির জয়ধ্বনির বিরাম নাই।

বস্তুত বারুদকে ও দেশলাইকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে ও স্বীকার করে তাহারা এই দুটোর সংস্রবকে ঠেকাইবার জন্য সর্বপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। দোষ যাহারই হউক বা রাগ যাহার 'পরেই থাক্‌ সে কথা লইয়া গরম না হইয়া হাতের কাজটা কী করিলে সিদ্ধ হয় এই ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাহারা তৎপর হয়।

এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে এ কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পারো, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পারো না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতিমহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কন্‌গ্রেসের জাহাজকে কূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ করিতে উৎসাহিত করাই যে ইহার সকলের চেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক উত্তেজনায় তিনি মনে রাখেন নাই। তিনি এমনভাবে কন্‌গ্রেসের হালের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন ঐ চরমপন্থীর দলটা জলের একটা ঢেউ মাত্র, উহা পাহাড় নহে, যেন কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চলিবে।

আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কন্‌গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্‌গ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন—ইহাতে যাহা হয় তা হোক। এবং এটা এখনি করিতে হইবে—এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্‌গ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।

এই-যে লুব্ধতা, এই-যে অন্ধ নির্বন্ধ, ইহা যদি দলবর্তী সাধারণ লোকের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা হইলে সেটাকে মার্জনীয় বলিয়া গণ্য করা যায়—কিন্তু যাঁহারা দলের কর্তৃপদে আছেন তাঁহারাও যদি না বুঝেন কোন্‌খানে রাশ টানিলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয় এবং কোন্‌খানে হার মানিলে তবেই যথার্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই বলিতে হইবে—সংসারে যাঁহারা বড়ো জিনিসকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, যাঁহারা কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যকে কোনোমতেই ভুলিতে পারেন না, ইঁহারা সে দলের লোক নহেন। ইঁহারা কবির লড়াইয়ের দলের মতো উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখেন—দায়িত্বদৃষ্টিকে অবিচলিত স্থৈর্যের সহিত সুদূরে প্রসারিত করেন না।

বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে। এক গাড়ির এঞ্জিন যদি সামনের গাড়ির এঞ্জিনকে একেবারে নাই বলিতে চায়, এমন-কি, ঠেকাঠেকি হইলেও তখনো পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া যদি স্টীম চড়াইয়া দেওয়াকেই নিজের পথ খোলসার উপায় বলিয়া মনে করে তবে একটা চুরমার ব্যাপার না বাধিয়া থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় যাঁহারা চালক তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না।

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে কন্‌গ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না। কন্‌গ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না; শনৈঃ শনৈঃ প্রত্যহ প্রত্যেকের অশ্রান্ত চেষ্টায় দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই পথের চরম গম্যস্থান সভাপতির আসন নহে, এমন-কি, ঐ মঞ্চটা তাহার পান্থশালাও নহে।

আর যদিই মনে কর কন্‌গ্রেসের কর্তৃত্বলাভ দেশহিতসাধনের একটা চরিতার্থতা, তবে কি এত-বড়ো একটা সম্পদকে এমন অধৈর্য ও প্রমত্ততার সহিত কাড়াকাড়ি করিতে হয়। ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকেই কি অপমান করা হয় না।

কাজির বিচারের কথা মনে আছে? দুই স্ত্রীলোক যখন একটি ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া কাজির কাছে নালিশ করিয়াছিল তখন কাজি বলিয়াছিলেন, ছেলেটাকে দুই ভাগে কাটিয়া দুইজনকে দেওয়া হউক। এই কথা শুনিয়া যথার্থ মা বলিয়া উঠিল, 'ছেলে আমি চাই না, অপরকেই দেওয়া হউক।' যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ করা এবং মকদ্দমায় হার-মানা অনায়াসে স্বীকার করে।

এবারকার কাজির বিচারে কী দেখা গেল। দুই দিকেরই এই জিদ যে, বরং কন্‌গ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো, তবু হার মানিব না। ইহাতে এই প্রমাণ হয়, কোনো পন্থীই কন্‌গ্রেসকে তেমন সত্য ও তেমন বড়ো করিয়া মনে করেন না। ইহা যে একটা জীবধর্মী পদার্থ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণহানি ও আঘাত লাগিলে ইহা দুর্বল হয়, তাহা কেহ নিজের প্রাণের মধ্যে তেমন করিয়া অনুভব করেন না। তাহার কারণ কি এই নহে, এই জিনিসটাকে বিশ বৎসর তা' দিয়াও ইহার মধ্যে প্রাণ-পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই? সেইজন্যই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে ধৈর্যে দীক্ষিত করে নাই। আমাদের 'পরে এইজন্যই কন্‌গ্রেসের দাবি অত্যন্ত দুর্বল—ইহা অতি অল্পও যেটুকু ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে চায় তাহাও পুরামাত্রায় পায় না। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য-অবসরের উদ্‌বৃত্ত হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই এই কন্‌গ্রেসের জন্য রাখিয়া থাকি এবং যাঁহারা রাখেন সেই কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে অতি যৎসামান্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, কন্‌গ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কন্‌গ্রেসের মণ্ডপে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে, তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কন্‌গ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কন্‌গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক। তাহাকে এ বৎসর বা ও বৎসর কোনোরকমে দখল করিয়া বসিব এ চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।

আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনি প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ-অভিমান-বশত জগতে যে যুগে এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছে সেই কালে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ম পণ্ড হইয়াছে তাহা নহে, মহান অনর্থ ঘটিয়াছে। ক্ষমতাশালীর জিদ সত্যকে ক্ষণকালের জন্য নির্জীব করিয়া ফেলিতেও পারে কিন্তু রুদ্রকে কখনোই ঠেকাইতে পারে না এ কথা ইংরেজ ভুলিয়াছে বলিয়া আমরা অভিযোগ আনিয়াছি, কিন্তু আমরা নিজেও যদি ভুলি, বল ও কলকৌশলকেই অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি, তবে প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে ধৈর্য শান্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে; তবে বিলম্বে অসহিষ্ণু, পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশ্বাস হইব না; বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকে সহ্য করিব, এবং স্বাধীনতা বা স্বরাজের যথার্থই অধিকার লাভ করিতে পারিব।

১৩১৪

দেশহিত

বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যে উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্য দেশের এ-শ্রেণীয় উদ্দীপনার ঠিক নকল নহে, তাহা যে আমাদের দেশের স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ, এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।

এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্তমান আন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কি না তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায় যে, দেশে যদি দুই-চারিজন মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাঞ্চল্যমাত্র বলিয়া অনুভব না করেন—তাঁহারা যদি ইহার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় এবং আমাদের

যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য তাহাকেই তপ্ত সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল করিয়া তোলে— তবে তাঁহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে।

কিন্তু আমরা যে এই ধর্মের মূর্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? যে ইঁহাকে দেখিয়াছে সে তো আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্‌বেগ একান্ত সতর্কতার সহিত ইঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে— কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ত্রুটি সে সহ্য করিতে পারে না। সেই প্রাণান্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত কোনো উদ্দেশ্য-সাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্বল চিত্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই, তবে ইহার মতো উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারি দিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে।

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম-জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলংক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই— ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ ছিল।

আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই। সে বিপদ কি কেবলই যাহাদিগকে আমরা শত্রুপক্ষ বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই। উন্মত্ততা অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না। যথার্থ দুর্বলতাই কি উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার ভান করে না। যাহা শক্তি নহে কিন্তু শান্তির বিড়ম্বনা, শক্তিধর্মসাধনায় তাহার মতো সর্বনেশে বিঘ্ন আর তো কিছুই নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চারি দিকে দেখা যাইতেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রশ্রয় দিতেছেন না তাঁহারাও তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভর্ৎসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। যে শক্তি ধর্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন তবে তাঁহার এই-সকল নকল উৎপাতকে কখনো এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন, দেশহিতের নাম ধরিয়া চারি দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, এ কি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত দেশহিত লোকহিত যে-কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।

আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়। যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই দেশহিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে। ধর্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম দ্বারা আমরা অন্যকে আঘাত করিতে চাই সেই অধর্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কী

করিয়া, মিথ্যাকে অন্যায়কে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশ্রয় দিই তবে আমরা নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব—এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে আলোকের অভাবে পুত্র মাতাকে আঘাত করিবে, ভাই ভাইয়ের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিবে। যে ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়ীগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোনো ফল—সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক-না—সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে। ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

১৩১৫

স্বদেশ

প্রকাশ : ১৯০৮

'স্বদেশ' (১৯০৮) গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'দেশীয় রাজ্য' 'আত্মশক্তি' (১৯০৫) গ্রন্থে এবং 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ব্রাহ্মণ' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' পূর্বেই 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬) গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়ায় বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতেও ঐ দুই গ্রন্থভুক্ত হল। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি প্রথম খণ্ড'-এর প্রথম অংশের কবি-কর্তৃক সম্পাদিত রূপ; পরবর্তী অংশ সম্পাদনান্তে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'সমাজ' (১৯০৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ড এই দুই গ্রন্থে রক্ষিত হয়।
বর্তমান রচনাবলীতেও তদনুযায়ী মুদ্রিত।

নূতন ও পুরাতন

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর-সকলে কার্যে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি; আমরা আমাদের পুরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্মে ইস্তফা দিয়ে পেন্‌সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বহুকালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নূতন রাজার রাজত্বে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যেরকম খেটে মরছে এবং খাজনা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতিকে হঠাৎ নূতন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে।

অতএব চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো; ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য নিয়ে থাকলে আর চলবে না; কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো, পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নব-মানব রাজার রাজস্ব দাও; কালেজে পড়ো, হোটেলে খাও এবং আপিসে চাকরি করো।

হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে। আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ করে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গতিশীল নিখিল-সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসেছিলুম। এমন সময় কোন্‌ ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত ছারখার করে দিলে। পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।

মনে করো আমাদের চতুর্দিকে হিমাদ্রি এবং সমুদ্রের বাধা যদি আরও দুর্গম হত তা হলে এক-দল মানুষ একটি অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে স্থির-শান্ত-ভাবে একপ্রকার সংকীর্ণ পরিপূর্ণতা লাভের অবসর পেত। পৃথিবীর সংবাদ তারা বড়ো-একটা জানতে পেত না এবং ভূগোলবিবরণ সম্বন্ধে তাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ ধারণা থাকত; কেবল তাদের কাব্য, তাদের সমাজতন্ত্র, তাদের ধর্মশাস্ত্র, তাদের দর্শনতত্ত্ব অপূর্ব শোভা সুষমা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পেত; তারা যেন পৃথিবী-ছাড়া আর-একটি ছোটো গ্রহের মধ্যে বাস করত; তাদের ইতিহাস, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুখ-সম্পদ তাদের মধ্যেই পর্যাপ্ত থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে মৃত্তিকাস্তরে রুদ্ধ হয়ে যেমন একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়; সে কেবল নিস্তরঙ্গভাবে প্রভাতসন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং অন্ধকার রাত্রে স্তিমিত নক্ষত্রালোকে স্তম্ভিতভাবে চিররহস্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকে।

কালের বেগবান প্রবাহে, পরিবর্তন-কোলাহলের কেন্দ্রস্থলে, প্রকৃতির সহস্র শক্তির রণরঙ্গভূমির মাঝখানে সংক্ষুব্ধ হয়ে খুব একটা শক্ত-রকম শিক্ষা এবং সভ্যতা লাভ হয় সত্য বটে; কিন্তু নির্জনতা নিস্তব্ধতা গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে যে কোনো রত্ন সঞ্চয় করা যায় না তা কেমন করে বলব।

এই মথ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে সেই নিস্তব্ধতার অবসর কোনো জাতিই পায় নি। মনে হয়

কেবল ভারতবর্ষই এক কালে দৈবক্রমে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা লাভ করেছিল এবং অতলস্পর্শের মধ্যে অবগাহন করেছিল। জগৎ যেমন অসীম মানবের আত্মাও তেমনি অসীম; যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে কোনো নূতন সত্য এবং কোনো নূতন আনন্দ লাভ করেন নি তা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।

ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধদ্বার নির্জন রহস্যময় পরীক্ষাকক্ষের মতো ছিল; তার মধ্যে এক অপরূপ মানসিক সভ্যতার গোপন পরীক্ষা চলছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে যেমন আলকেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্রযোগে চিরজীবনরস (Elixir of Life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা-সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন-লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃতরসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তার থেকে কী হতে পারত কে জানে। আলকেমি থেকে যেমন কেমিস্ট্রির উৎপত্তি হয়েছে তেমনি তাঁদের সেই তপস্যা থেকে মানবের কী এক নিগূঢ় নূতন শক্তির আবিষ্কার হতে পারত তা এখন কে বলতে পারে।

কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে বলপূর্বক প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের কাছে অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। এখনকার নবীন দুরন্ত সভ্যতার মধ্যে এই পরীক্ষার তেমন প্রশান্ত অবসর আর কখনো পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে। একটি জীর্ণ তপস্বী; বসন নেই, ভূষণ নেই, পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। সে যে কথা বলতে চায় এখনো তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তগম্য পরিণাম নেই।

অতএব হে বৃদ্ধ, হে চিন্তাতুর, হে উদাসীন, তুমি ওঠো, পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন করো অথবা দিবাশয্যায় পড়ে পড়ে আপনার পুরাতন যৌবনকালের প্রতাপ ঘোষণাপূর্বক জীর্ণ অস্থি আস্ফালন করো—দেখো, তাতে তোমার লজ্জা নিবারণ হয় কি না।

কিন্তু আমার ওতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র খবরের কাগজের পাল উড়িয়ে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে যাত্রা আরম্ভ করতে আমার সাহস হয় না। যখন মৃদু মৃদু অনুকূল বাতাস দেয় তখন এই কাগজের পাল গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কখন সমুদ্র থেকে ঝড় আসবে এবং দুর্বল দম্ভ শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এমন যদি হত, নিকটে কোথাও উন্নতি-নামক একটা পাকা বন্দর আছে, সেইখানে কোনোমতে পৌঁছোলেই তার পরে দধি এবং পিষ্টক, দীয়তাং এবং ভুজ্যতাং, তা হলেও বরং একবার সময় বুঝে আকাশের ভাবগতিক দেখে অত্যন্ত চতুরতা-সহকারে পার হবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যখন জানি উন্নতিপথে যাত্রার আর শেষ নেই, কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই, ঊর্ধ্বে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্তি পাচ্ছে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র, বায়ু অনেক সময়েই প্রতিকূল এবং তরঙ্গ সর্বদাই প্রবল, তখন কি বসে বসে কেবল ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজের নৌকা নির্মাণ করতে প্রবৃত্তি হয়।

অথচ তরী ভাসাবার ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে; চতুর্দিকে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম, তখন আমারও মন নেচে ওঠে। তখন ইচ্ছা করে বহু বৎসরের গৃহবন্ধন ছিন্ন করে একেবারে বাহির হয়ে পড়ি। কিন্তু তার পরেই রিক্ত হস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি পাথেয় কোথায়। হৃদয়ে সে অসীম আশা, জীবনে সে অশ্রান্ত বল, বিশ্বাসের সে অপ্রতিহত প্রভাব কোথায়। তবে তো পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাসই ভালো, এই ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জীব শান্তিই আমাদের যথালাভ।

তখন বসে বসে মনকে এই বলে বোঝাই যে, আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ আবিষ্কার করতে পারি নে, কিন্তু ভালোবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে পারি। দুঃসাধ্য দুরাশা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াবার আবশ্যক কী। নাহয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, 'টাইম্স্'-এর জগৎপ্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল।

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, প্রবলের অত্যাচার আছে, অসহায়ের ভাগ্যে অপমান আছে; কোণে বসে কেবল গৃহকর্ম এবং আতিথ্য করে তার কী প্রতিকার করবে।

হায়, সেই তো ভারতবর্ষের দুঃসহ দুঃখ। আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব। রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! যিশুখৃস্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অনুর্বর কাঠিন্যকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাষাণের সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব? সভা করে? দরখাস্ত করে? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে? কাল একটা তাড়া খেয়ে? তা কখনোই হবে না।

তবে প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি য়ুরোপ কতখানি প্রবল, কত কারণে প্রবল—যখন এই দুর্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি, তখন কি আর আশা হয়। তখন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালোবাসি এবং ভালো করি। পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি, ভান না করি। অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে, সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে বৃহৎ ভানকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান!

কিন্তু উপদেশ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। প্রকৃত অবস্থাটা কী তাই আমি দেখতে চেষ্টা করছি। তা দেখতে গেলে যে পুরাতন বেদ পুরাণ সংহিতা খুলে বসে নিজের মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করে একটা কাল্পনিক কাল রচনা করতে হবে তা নয়, কিংবা অন্য জাতির প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাযোগে আপনাদের বিলীন করে দিয়ে আমাদের নবশিক্ষার ক্ষীণভিত্তির উপর প্রকাণ্ড দুরাশার দুর্গ নির্মাণ করতে হবে তাও নয়; দেখতে হবে এখন আমরা কোথায় আছি! আমরা যেখানে অবস্থান করছি এখানে পূর্ব দিক থেকে অতীতের এবং পশ্চিম দিক থেকে ভবিষ্যতের মরীচিকা এসে পড়েছে; সে দুটোকেই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সত্য-স্বরূপে জ্ঞান না করে একবার দেখা যাক আমরা যথার্থ কোন্ মৃত্তিকার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি; এত প্রাচীন যে এখানকার ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে; মনুষ্যের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; সেইজন্যে ভ্রম হচ্ছে যেন এ নগর মানব-ইতিহাসের অতীত, এ যেন অনাদি প্রকৃতির এক প্রাচীন রাজধানী। মানব-পুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে সজ্জিত করেছে। এখানে সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্নরেখা রেখে গিয়েছে এবং সহস্র বৎসরের বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ হরিদ্বর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত করেছে। এক দিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, এক দিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এখানে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে। এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্য-মর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গি জটাভারগ্রস্ত শাখাপ্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকা-ভিত্তির মধ্যে, শতসহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে ভ্রম হয়। এখানকার এই সনাতন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মতো নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত-বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে। এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম। জগতের মধ্যাহ্ন-সূর্যালোক ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কেবল ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়, প্রবল ঝড় শত শত

সংকীর্ণ শাখাসংকটের মধ্যে প্রতিহত হয়ে মৃদু মর্মরের মতো মিলিয়ে আসে। এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেছে; অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা একসঙ্গেই ধাবিত হয়েছে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে আছে সেইখানে পড়েই আছে, এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেউ, অলস ভক্তিভরে, হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই-ই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থবিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করছে।

এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার স্থান! এখানকার ভগ্ন ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবদের কারাগার নির্মাণের যোগ্য। তোমাদের অস্থির উদ্যমের বেগে এর প্রাচীন ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করে দিতে পার বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতিপ্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই নিশ্চেষ্ট নিবিড় মহানগরারণ্য ভেঙে গেলে সহস্র মৃত বৎসরের যে একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্য এখানে চিরনিভৃত আবাস গ্রহণ করেছিল সেও যে সহসা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে।

এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি, সে অভ্যাস এদের নেই, এদের সমধিক চিন্তাশীলগণের সেই এক মহৎ গর্ব। তারা যে কথা নিয়ে লেখনীপুচ্ছ আস্ফালন করে সে কথা অতি সত্য, তার প্রতিবাদ করা কারও সাধ্য নয়। বাস্তবিকই অতিপ্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি। কালক্রমে অনেক অবস্থাবৈসাদৃশ্য, অনেক নূতন সুবিধা-অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে মৃতকে এবং জীবিতকে, সুবিধা এবং অসুবিধাকে প্রাণপণে সেই পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। অসুবিধার খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিতভাবে স্বহস্তে নূতন গৃহ নির্মাণ বা পুরাতন গৃহসংস্কার করেছে এমন গ্লানি এদের শত্রুপক্ষের মুখেও শোনা যায় না। যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র প্রকাশ পেয়েছে সেখানে অযত্নসম্ভূত বটের শাখা কদাচিৎ ছায়া দিয়েছে, কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে কথঞ্চিৎ ছিদ্ররোধ করেছে।

এই বনলক্ষ্মীহীন ঘন বনে, এই পুরলক্ষ্মীহীন ভগ্ন পুরীর মধ্যে, আমরা ধুতিটি চাদরটি পরে অত্যন্ত মৃদুমন্দভাবে বিচরণ করি, আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিই, ছায়ায় বসে তাস-পাশা খেলি, যা-কিছু অসম্ভব এবং সাংসারিক কাজের বাহির তাকেই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, যা-কিছু কার্যোপযোগী এবং দৃষ্টিগোচর তার প্রতি মনের অবিশ্বাস কিছুতে সম্যক্ দূর হয় না, এবং এরই উপর কোনো ছেলে যদি সিকিমাত্রা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তা হলে আমরা সকলে মিলে মাথা নেড়ে বলি : সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্।

এমন সময় তোমরা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের জীর্ণ পঞ্জরে গোটা দুই-তিন প্রবল খোঁচা দিয়ে বলছ : ওঠো ওঠো, তোমাদের শয়নশালায় আমরা আপিস স্থাপন করতে চাই। তোমরা ঘুমোচ্ছিলে বলে যে সমস্ত সংসার ঘুমোচ্ছিল তা নয়। ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঐ ঘণ্টা বাজছে, এখন পৃথিবীর মধ্যাহ্নকাল, এখন কর্মের সময়।

তাই শুনে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধড়্‌ফড়্ করে উঠে ‘কোথায় কর্ম’ ‘কোথায় কর্ম’ করে গৃহের চার কোণে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে এবং ওরই মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় স্ফীত স্বভাবের লোক তারা পাশমোড়া দিয়ে বলছে : কে হে! কর্মের কথা কে বলে! তা, আমরা কি কর্মের লোক নই বলতে চাও। ভারি ভ্রম। ভারতবর্ষ ছাড়া কর্মস্থান কোথাও নেই। দেখো-না কেন, মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে এইখানেই আর্য-বর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে; এইখানেই কত রাজ্যপত্তন, কত নীতিধর্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে। অতএব কেবলমাত্র আমরাই কর্মের লোক, অতএব আমাদের আর কর্ম করতে বোলো না। যদি অবিশ্বাস হয় তবে তোমরা বরং এক কাজ করো—তোমাদের তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদালখানা দিয়ে ভারতভূমির যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির স্তর

উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে কোথায় কোথায় আমাদের হস্তচিহ্ন আছে। আমরা ততক্ষণ অমনি আর-একবার ঘুমিয়ে নিই।

এইরকম করে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্ধ-অচেতন জড় মূঢ় দাম্ভিক-ভাবে ঈষৎ-উন্মীলিত নিদ্রাকষায়িত নেত্রে আলস্যবিজড়িত অস্পষ্ট রুষ্ট হুংকারে জগতের দিবালোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, এবং কেউ কেউ গভীর আত্মগ্লানি-সহকারে শিথিলস্নায়ু অসাড় উদ্যমকে ভূয়োভূয় আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে। এবং যারা জাগ্রতস্বপ্নের লোক, যারা কর্ম ও চিন্তার মধ্যে অস্থিরচিত্তে দোদুল্যমান, যারা পুরাতনের জীর্ণতা দেখতে পায় এবং নূতনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করে, সেই হতভাগ্যেরা বারংবার মুণ্ড আন্দোলন করে বলছে : হে নূতন লোকেরা, তোমরা যে নূতন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তো তার শেষ হয় নি, এখনো তো তার সমস্ত সত্যমিথ্যা স্থির হয় নি, মানব-অদৃষ্টের চিরন্তন সমস্যার তো কোনোটারই মীমাংসা হয় নি।

তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি। আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ। তোমরা যে নিত্যনূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকেই সমস্ত জীবনের কর্তা করে উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তোমরা কি স্পষ্ট জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেছি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে, দূর ও নিকট সম্পর্কীয়ে, অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি। যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না, এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না।

ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে। এখন আর তার কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমাদের যখন একদিন কাজ বন্ধ করতে হবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে। আমাদের মতো এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি। উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগাহন করে, সেইরকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি। না, কল যেরকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যেরকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীত-মুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়, সেইরকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?

যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ— অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও আমাদের গৃহে আমরা থাকি, এই কথাই ভালো।

কিন্তু মানুষে থাকতে দেয় কই? তুমি যখন বিশ্রাম করতে চাও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে তখন অশ্রান্ত। গৃহস্থ যখন নিদ্রায় কাতর, গৃহছাড়ারা যে তখন নানা ভাবে পথে পথে বিচরণ করছে।

তা ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর-কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে,

একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও— পৃথিবীর এইরকম নিয়ম।

অতএব আমরা যে জগতের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে আছি তাতে কারও কিছু বলবার নেই। তবে, সে সম্বন্ধে যখন বিলাপ করি তখন এইরকম ভাবে করি যে, পূর্বে যে নিয়মের উল্লেখ করা হল সেটা সাধারণত খাটে বটে, কিন্তু আমরা ওরই মধ্যে এমন একটু সুযোগ করে নিয়েছিলুম যে আমাদের সম্বন্ধে অনেক দিন খাটে নি। যেমন মোটের উপরে বলা যায় জরামৃত্যু জগতের নিয়ম, কিন্তু আমাদের যোগীরা জীবনীশক্তিকে নিরুদ্ধ করে মৃতবৎ হয়ে বেঁচে থাকবার এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমাধি অবস্থায় তাঁদের যেমন বৃদ্ধি ছিল না তেমনি হ্রাসও ছিল না। জীবনের গতিরোধ করলেই মৃত্যু আসে, কিন্তু জীবনের গতিকে রুদ্ধ করেই তাঁরা চিরজীবন লাভ করতেন।

আমাদের জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা খাটে। অন্য জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায়স্বরূপ করে দীর্ঘজীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা বহু যত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্‌যোগ করেছিলুম।

মনে হয়, যেন কতকটা ফললাভও হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যেখানে আপনি থেমে আসে সময়কেও কৌশলপূর্বক সেইখানে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জীবনকে অনেকটা পরিমাণে নির্বাসিত করে এমন-একটা মধ্য-আকাশে তুলে রাখা গিয়েছিল যেখানে পৃথিবীর ধুলো বড়ো পৌঁছত না, সর্বদাই সে নির্লিপ্ত নির্মল নিরাপদ থাকত।

কিন্তু একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কিছুকাল হল নিকটবর্তী কোন্‌-এক অরণ্য থেকে এক দীর্ঘজীবী যোগমগ্ন যোগীকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল। এখানে বহু উপদ্রবে তার সমাধি ভঙ্গ করাতে তার মৃত্যু হয়। আমাদের জাতীয় যোগনিদ্রাও তেমনি বাহিরের লোক বহু উপদ্রবে ভেঙে দিয়েছে। এখন অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার আর-কোনো প্রভেদ নেই; কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, বহুদিন বহির্বিষয়ে নিরুদ্যম থেকে জীবনচেষ্টায় সে অনভ্যস্ত হয়ে গেছে। যোগের মধ্যে থেকে একেবারে গোলযোগের মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু কী করা যাবে। এখন উপস্থিতমত সাধারণ নিয়মে প্রচলিত প্রথায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘ জটা ও নখ কেটে ফেলে নিয়মিত স্নানাহার-পূর্বক কথঞ্চিৎ বেশভূষা করে হস্তপদচালনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এইরকম হয়েছে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি বটে, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের লোকের সঙ্গে মিশতেও আরম্ভ করেছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করতে পারি নি। এখনো আমরা বলি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা শুদ্ধমাত্র হরীতকী সেবন করে নগ্নদেহে মহত্ত্বলাভ করেছিলেন, অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহারবিহার চালচলনের এত সমাদর কেন। এই বলে আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তার-পূর্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে কর্মক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাত-পূর্বক বায়ু সেবন করি।

এটা আমাদের স্মরণ নেই যে, যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।

তোমার-আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করি নে, হবিষ্যও খাই নে, জুতোমোজা পরে ট্রামে চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই; যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গৌতম জরৎকারু বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন— ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ-পর্যন্ত কারও ভ্রম হয় নি, একদিন তিন সন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস

কিংবা কালেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এরকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্‌যোগপরায়ণ মান্যজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীট্‌কার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসংগত, হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।

বিশেষ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পালোয়ান লেংটি পরে, মাটি মেখে ছাতি ফুলিয়ে চলে বেড়ায়, রাস্তার লোক বাহবা-বাহবা করে—তার ছেলেটি নিতান্ত কাহিল এবং বেচারা এবং এন্‌ট্রেন্স্‌ পর্যন্ত পড়ে আজ পাঁচ বৎসর কেবল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস, সেও যদি লেংটি পরে, ধুলো মাখে এবং উঠতে বসতে তাল ঠোকে এবং ভদ্রলোকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে 'আমার বাবা পালোয়ান', তবে অন্য লোকের যেমনি আমোদ বোধ হোক, আত্মীয়বন্ধুরা তার জন্যে সবিশেষ উদ্‌বিগ্ন না হয়ে থাকতে পারে না। অতএব হয় সত্যই তপস্যা করো নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।

পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের প্রতি একটি বিশেষ কার্যভার ছিল। সেই কার্যের বিশেষ উপযোগী হবার জন্যে তাঁরা আপনাদের চারি দিকে কতকগুলি আচরণ-অনুষ্ঠানের সীমারেখা অঙ্কিত করেছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁরা আপনার চিত্তকে সেই সীমার বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে দিতেন না। সকল কাজেরই এইরূপ একটা উপযোগী সীমা আছে যা অন্য কাজের পক্ষে বাধামাত্র। ময়রার দোকানের মধ্যে অ্যাটর্নি নিজের ব্যবসায় চালাতে গেলে সহস্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হয়ে থাকতে পারেন না এবং ভূতপূর্ব অ্যাটর্নির আপিসে যদি বিশেষ কারণবশত ময়রার দোকান খুলতে হয় তা হলে কি চৌকিটেবিল কাগজপত্র এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ল-রিপোর্টের প্রতি মমতা প্রকাশ করলে চলে।

বর্তমান কালে ব্রাহ্মণের সেই বিশেষত্ব আর নেই। কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং ধর্মালোচনায় তাঁরা নিযুক্ত নন। তাঁরা অধিকাংশই চাকরি করেন, তপস্যা করতে কাউকে দেখি নে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, ব্রাহ্মণেতর জাতির কোনো কার্যবৈষম্য দেখা যায় না, এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকার কোনো সুবিধা কিংবা সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কিন্তু সম্প্রতি এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম যে কেবল ব্রাহ্মণকেই বদ্ধ করেছে তা নয়। শূদ্র, শাস্ত্রের বন্ধন যাঁদের কাছে কোনো কালেই দৃঢ় ছিল না তাঁরাও, কোনো-এক অবসরে পূর্বোক্ত গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন; এখন আর কিছুতেই স্থান ছাড়তে চান না।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের অধিকার গ্রহণ করাতে স্বভাবতই শূদ্রের প্রতি সমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কাজের ভার ছিল, সুতরাং তাঁদের উপর থেকে আচারবিচার মন্ত্রতন্ত্রের সহস্র বন্ধনপাশ প্রত্যাহরণ করে নিয়ে তাঁদের গতিবিধি অনেকটা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এখন ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড লূতাতন্তুজালের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই হস্তপদবদ্ধ হয়ে মৃতবৎ নিশ্চল পড়ে আছেন। না তাঁরা পৃথিবীর কাজ করছেন, না পারমার্থিক যোগসাধন করছেন। পূর্বে যে-সকল কাজ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি যে কাজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাকেও পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

অতএব বোঝা উচিত, এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারবিচার নিয়ে খুঁত খুঁত করে বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধরে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না—যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, পবিত্র ব্যক্তির কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থ-ভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করে, মহামান্য আপনাটিকে সর্বদা ধুয়ে মেজে ঢেকে-ঢুকে, অন্য সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করে আমরা যেরকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে—এইরকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্মণ্য ও বন্ধ্যা হয়ে আসে।

জড়পদার্থকেই কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায়। জীবকেও যদি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখবার জন্য নির্মল স্ফটিক-আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা যায় তা হলে ধূলি রোধ করা হয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যও রোধ করা হয়, মলিনতা এবং জীবন দুটোকেই যথাসম্ভব হ্রাস করে দেওয়া হয়।

আমাদের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, আমরা যে একটি আশ্চর্য আর্য-পবিত্রতা লাভ করেছি তা বহু সাধনার ধন, তা অতিযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য; সেইজন্যই আমরা ম্লেচ্ছ যবনদের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করে থাকি।

এ সম্বন্ধে দুটি কথা বলবার আছে। প্রথমত আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চা করে থাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ অন্যায় বিচার, অমূলক অহংকার, পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানবঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা অম্লানমুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি! আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। শাস্ত্রে কী আছে এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী দাঁড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্তু আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই থাক্ তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতই মানবঘৃণার উৎপত্তি হয় কি না, এবং কোনো-একটি জাতির আপামর সাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করবার অধিকারী কি না, তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর-একটি কথা, জড়পদার্থই বাহ্য মলিনতায় কলঙ্কিত হয়। শখের পোশাকটি পরে যখন বেড়াই তখন অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। পাছে ধুলো লাগে, জল লাগে, কোনোরকম দাগ লাগে, অনেক সাবধানে আসন গ্রহণ করতে হয়। পবিত্রতা যদি পোশাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় পাছে এর ছোঁয়া লাগলে কালো হয়ে যায়, ওর হাওয়া লাগলে চিহ্ন পড়ে। এমন একটি পোশাকি পবিত্রতা নিয়ে সংসারে বাস করা কী বিষম বিপদ। জনসমাজের রণক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে এবং রঙ্গভূমিতে ঐ অতি পরিপাটি পবিত্রতাকে সামলে চলা অত্যন্ত কঠিন হয় বলে শুচিবায়ুগ্রস্ত দুর্ভাগা জীব আপন বিচরণ-ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে আনে, আপনাকে কাপড়টা-চোপড়টার মতো সর্বদা সিন্ধুকের মধ্যে তুলে রাখে, মনুষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

আত্মার আন্তরিক পবিত্রতার প্রভাবে বাহ্য মলিনতাকে কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষা করলে চলে না। অত্যন্ত রূপপ্রয়াসী ব্যক্তি বর্ণবিকারের ভয়ে পৃথিবীর ধুলামাটি জলরৌদ্র বাতাসকে সর্বদা ভয় করে চলে এবং ননির পুতুলটি হয়ে নিরাপদ স্থানে বিরাজ করে। ভুলে যায় যে, বর্ণসৌকুমার্য সৌন্দর্যের একটি বাহ্য উপাদান, কিন্তু স্বাস্থ্য তার একটি প্রধান আভ্যন্তরিক প্রতিষ্ঠাভূমি— জড়ের পক্ষে এই স্বাস্থ্য অনাবশ্যক, সুতরাং তাকে ঢেকে রাখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আত্মাকে যদি মৃত জ্ঞান না কর তবে কিয়ৎপরিমাণে মলিনতার আশঙ্কা থাকলেও তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে, তার বল উপার্জনের উদ্দেশে, তাকে সাধারণ জগতের সংস্রবে আনা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা কথাটা কেন ব্যবহার করেছিলুম এইখানে তা বোঝা যাবে। অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতাপ্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। একটু খাওয়াটি শোয়াটি বসাটির ইদিক ওদিক হলেই যে সুকুমার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তা বাবুয়ানার অঙ্গ। এবং সকলপ্রকার বাবুয়ানাই মনুষ্যত্বের বলবীর্যনাশক।

সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়, সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দুই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন করে আহার কমিয়ে দিয়ে দুই বেলা চাবুকের ভয় দেখানো হয় তা হলে একদল চলৎশক্তিরহিত অতিনিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়, জীবস্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়, দেখে বোধ হয় ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্মাণ করেছেন, জীবের আবাসভূমি করেন নি।

কিন্তু সমাজের যে-সকল প্রাচীন ধাত্রী আছেন তাঁরা মনে করেন সুস্থ ছেলে দুরন্ত হয় এবং দুরন্ত ছেলে কখনো কাঁদে, কখনো ছুটোছুটি করে, কখনো বাইরে যেতে চায়, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট, অতএব তার মুখে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়ে তাকে যদি মৃতপ্রায় করে রাখা যায় তা হলেই বেশ নির্ভাবনায় গৃহকার্য করা যেতে পারে।

সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতই বেড়ে উঠতে থাকে। যদি আমরা বলি, আমরা এতটা পেরে উঠব না, আমাদের এত উদ্যম নেই, শক্তি নেই—যদি আমাদের পিতামাতারা বলে, পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে আমরা অশক্ত, কিন্তু মানুষের পক্ষে যত সত্বর সম্ভব (এমন-কি, অসম্ভব বললেও হয়) আমরা পিতামাতা হতে প্রস্তুত আছি—যদি আমাদের ছাত্রবৃন্দ বলে, সংযম আমাদের পক্ষে অসাধ্য, শরীর মনের সম্পূর্ণতালাভের জন্য প্রতীক্ষা করতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ, অকালে অপবিত্র দাম্পত্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং হিঁদুয়ানিরও সেই বিধান—আমরা চাই নে উন্নতি, চাই নে ঝঞ্ঝাট—আমাদের এই-রকম ভাবেই বেশ চলে যাবে—তবে নিরুত্তর হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এ কথাটুকু বলতেই হয় যে, হীনতাকে হীনতা ব'লে অনুভব করাও ভালো, কিন্তু বুদ্ধিবলে নির্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতা বলে প্রতিপন্ন করলে সদ্‌গতির পথ একেবারে আটেঘাটে বন্ধ করা হয়।

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে এত কথা ওঠে না। তা হলে কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।

আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্‌বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধানে থেকে কালের সীমান্ত-দেশে আমরা সেই ভারতসভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মতো দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল—আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলই শান দিতেন—তাকে একেবারে কর্মাতীত অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা—সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহু দিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র। আমাদের অবয়ব-সাদৃশ্যের উপর ভর করে আমরা মনে করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাতে ক্ষিত্যপ্‌তেজের সংস্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো-একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না।

এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।

সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি, আমরা সেই সভ্য জাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য; আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব; সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে, ভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত করে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দুনামের সার্থকতা সাধন করব।

কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় করে উন্নতমস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি, যদি সংগীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে— দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে— পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ করে এবং মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে আপনাকে চারি দিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি, তা হলে আমি যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিঁকবে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দু-সভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্য সাধন করতে পারব।

এইখানে আমার একটি তুলনা মনে উদয় হচ্ছে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো। এক কালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি-আদানপ্রদানের নিয়ম বর্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্ত-বর্ষার সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্পপল্লবের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই, গতি নেই বলে যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহু যুগের উত্তাপ ও আলোক নিহিতভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের কাছে তা অন্ধকারময় শীতল। আমরা তার থেকে কেবল খেলাচ্ছলে ঘনকৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তম্ভ নির্মাণ করছি। কারণ নিজের হাতে যদি অগ্নিশিখা না থাকে তবে কেবলমাত্র গবেষণা দ্বারা পুরাকালের তলে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড সংগ্রহ করে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। তাও যে নিজে সংগ্রহ করছি তাও নয়। ইংরেজের রানীগঞ্জের বাণিজ্যশালা থেকে কিনে আনছি। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু করছি কী। আগুন নেই, কেবলই ফুঁ দিচ্ছি, কাগজ নেড়ে বাতাস করছি এবং কেউ বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে, নিজের ব্যবহারে আনতে পারা যায়।

মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখানকারই। জীবিত মনুষ্য দশ দিকের কেন্দ্রস্থলে। সে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতুস্থাপন ক'রে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে; এক দিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।

১২৯৮

সমাজভেদ

গত জানুয়ারি মাসে 'কন্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রে ডাক্তার ডিলন 'ব্যাঘ্র চীন এবং মেষশাবক য়ুরোপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধ-উপলক্ষে চীনবাসীদের প্রতি য়ুরোপের অকথ্য অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং প্রভৃতি লোকশত্রুদিগের ইতিহাসবিখ্যাত নিদারুণ কীর্তি সভ্য য়ুরোপের উন্মত্ত বর্বরতার নিকট নতশির হইল।

য়ুরোপ নিজের দয়াধর্মপ্রবণ সভ্যতার গৌরব করিয়া এশিয়াকে সর্বদাই ধিক্‌কার দিয়া থাকে, তাহার জবাব দিবার উপলক্ষ পাইয়া আমাদের কোনো সুখ নাই। কারণ, অপবাদ রটনা করিয়া দুর্বল সবলের কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু সবল দুর্বলের নামে যে অপবাদ ঘোষণা করে তাহা দুর্বলের পক্ষে কোনো-না কোনো সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

সাধারণত এশিয়া-চরিত্রের ক্রূরতা বর্বরতা দুর্জ্ঞেয়তা য়ুরোপীয় সমাজে একটা প্রবাদবাক্যের মতো। এইজন্য এশিয়াকে য়ুরোপের আদর্শে বিচার করা কর্তব্য নহে, এই একটা ধুয়া আজকাল খৃস্টান-সমাজে বেশি করিয়া উঠিয়াছে।

আমরা যখন য়ুরোপের শিক্ষা প্রথম পাইলাম তখন 'মানুষে মানুষে অভেদ' এই ধুয়াটাই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমাদের নূতন শিক্ষকটির সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রভেদ যাহাতে ঘুচিয়া যায় আমরা সেইভাবেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় মাস্টারমশায় তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বন্ধ করিয়া বলিলেন, পূর্ব-পশ্চিমে এমন প্রভেদ যে সে আর লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

আচ্ছা বেশ, প্রভেদ আছে, প্রভেদ থাক্‌। বৈচিত্র্যই সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। পৃথিবীতে শীতাতপ সব জায়গায় সমান নহে বলিয়াই বায়ু চলাচল করে। সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাক্‌; তাহা হইলে সেই স্বাতন্ত্র্যে পরস্পরের নিকট শিক্ষার আদানপ্রদান হইতে পারে।

এখন তো দেখিতেছি, গালাগালি গোলাগুলির আদান-প্রদান চলিয়াছে। নূতন খৃস্টান শতাব্দী এমনি করিয়া আরম্ভ হইল।

ভেদ আছে স্বীকার করিয়া লইয়া বুদ্ধির সহিত, প্রীতির সহিত, সহৃদয় বিনয়ের সহিত, তাহার অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে খৃস্টীয় শিক্ষায় উনিশ শত বৎসর কী কাজ করিল? কামানের গোলায় প্রাচ্য দুর্গের দেয়াল ভাঙিয়া একাকার করিবে, না চাবি দিয়া তাহার সিংহদ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে?

মিশনারিদের প্রতি চীনবাসীদের আক্রমণ হইতে চীনে বর্তমান বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। য়ুরোপ এ কথা সহজেই মনে করিতে পারে যে, ধর্মপ্রচার বা শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য চীনের বর্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। মিশনারি তো চীন রাজত্ব জয় করিতে যায় নাই।

এইখানে পূর্ব-পশ্চিমে ভেদ আছে এবং সেই ভেদ য়ুরোপ শ্রদ্ধার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করে না; কারণ, তাহার গায়ের জোর আছে।

চীনের রাজত্ব চীনের রাজার। যদি কেহ রাজ্য আক্রমণ করে তবে রাজায় রাজায় লড়াই বাধে, তাহাতে প্রজাদের যে ক্ষতি হয় তাহা সাংঘাতিক নহে। কিন্তু য়ুরোপের রাজত্ব রাজার নহে, তাহা সমস্ত রাজ্যের। রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর; এই কলেবরটিকে আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না। সুতরাং অন্য কোনোপ্রকার আঘাতের গুরুত্ব তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্তপ্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র। জিব্রল্টরের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলন্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, কিন্তু খৃস্টান ধর্ম সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।

পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই। শিথিল রাজশক্তি বিপুল চীনের সর্বত্র আপনাকে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না। রাজধানী হইতে সুদূরবর্তী দেশগুলিতে রাজার আজ্ঞা পৌঁছে, রাজপ্রতাপ পৌঁছে না; কিন্তু তথাপি সেখানে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, সভ্যতা আছে।

ডাক্তার ডিলন ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পই বল ব্যয় করিয়া এত বড়ো রাজ্য সংযত রাখা সহজ কথা নহে।

কিন্তু বিপুল চীনদেশ শস্ত্রশাসনে সংযত হইয়া নাই, ধর্মশাসনেই সে নিয়মিত। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনী স্বামীস্ত্রী প্রতিবেশী-পল্লীবাসী রাজাপ্রজা যাজক-যজমানকে লইয়া এই ধর্ম। বাহিরে যতই বিপ্লব হউক, রাজাসনে যে-কেহই অধিরোহণ করুক, এই ধর্ম বিপুল চীনদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া অখণ্ড নিয়মে এই প্রকাণ্ড জনসমাজকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। তখন কে তাহাকে ঠেকাইবে। তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে। তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তে আমার কথা পরিষ্কার হইবে। ইংরেজপরিবার ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের পরিবার কুলের অঙ্গ। এইটুকু প্রভেদে সমস্তই তফাত হইয়া যায়। ইংরেজ এই প্রভেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে হিন্দুপরিবারের দরদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞাপরায়ণ হইয়া উঠিবে। কুলসূত্রে হিন্দুপরিবারে জীবিত মৃত ও ভাবী অজাতগণ পরস্পর সংযুক্ত। অতএব, হিন্দুপরিবারের মধ্য হইতে কেহ যদি কুলত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা পরিবারের পক্ষে কিরূপ গুরুতর আঘাত, ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ, ইংরেজ-পরিবারে দাম্পত্যবন্ধন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না। কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোনো সজীব অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দুপরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিক্ষত করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই শ্রেয়োজ্ঞান করে। কারণ, প্রেমসঞ্চারের উপযুক্ত বয়স হইলেই স্ত্রীপুরুষে মিলন হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের সঙ্গে একীভূত হইবার বয়স বাল্যকাল।

বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্য দিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে গিয়া ইংরেজকে যেমন ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও জিব্রল্টর মাল্টা সুয়েজ এবং এডেন রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুকে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও এই-সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।

এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিবার ও সমাজ গঠন ভালো কি না সে তর্ক ইংরেজ তুলিতে পারে। আমরা বলি রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তা-সাধন ভালো কি না সেও তর্কের বিষয়। দেশের জন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব করিয়া সৈনিকগঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে, সৈন্যসম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়। নিহিলিস্ট্‌দের অগ্ন্যুৎপাতে, না পরস্পরের প্রলয়সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না তাহারও পরীক্ষা বাকি আছে।

যাহাই হউক, পূর্ব ও পশ্চিমের এই-সকল প্রভেদ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া দেখিবার বিষয়। য়ুরোপের প্রথাগুলিকে যখন বিচার করিতে হয় তখন য়ুরোপের সমাজতন্ত্রের সহিত তাহাকে মিলাইয়া বিচার না করিলে, আমাদের মনেও অনেক সময় অন্যায় অবজ্ঞার সঞ্চার হয়। তাহার সাক্ষী, বিলাতি সমাজে কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি; আমাদের নিকট এ প্রথা অভ্যস্ত নহে বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ বালবিধবাকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক, সে কথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। কুমারীর বেলায় আমরা বলি মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্বল, অথচ বিধবার বেলায় বলি শিক্ষাসাধনায় প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। কিন্তু আসল কথা, এ-সকল নিয়ম কোনো নীতিতত্ত্ব

হইতে উদ্ভূত হয় নাই, প্রয়োজনের তাড়নে দাঁড়াইয়া গেছে। অল্প বয়সে কুমারীর বিবাহ হিন্দু-সমাজের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, চিরবৈধব্যও সেইরূপ। সেইজন্যই আশঙ্কাসত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হয় না এবং অনিষ্ট-অসুবিধাসত্ত্বেও কুমারীর বাল্যবিবাহ হয়। আবশ্যকের নিয়মেই য়ুরোপে অধিক বয়সে কুমারীর বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন সম্ভবপর নহে, সেখানে বিধবা কোনো পরিবারের আশ্রয় পায় না বলিয়া তাহার পক্ষে অনেক সময়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্ররক্ষার অনুকূল বলিয়াই মুখ্যত ভালো, ইহার অন্য ভালো যাহা-কিছু আছে তাহা আকস্মিক, তাহা অবান্তর।

সমাজে আবশ্যকের অনুরোধে যাহা প্রচলিত হয়, ক্রমে তাহার সহিত ভাবের সৌন্দর্য জড়িত হইয়া পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার-কুমারীর স্বাধীন প্রেমাবেগের সৌন্দর্য য়ুরোপীয় চিত্তে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা য়ুরোপের সাহিত্য পড়িলেই প্রতীতি হইবে। সেই প্রেমের আদর্শকে য়ুরোপীয় কবিরা দিব্যভাবে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পতিব্রতা-গৃহিণীর কল্যাণপরায়ণ ভাবটিই মধুর হইয়া হিন্দুচিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সেই ভাবের সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যে অন্য-সকল সৌন্দর্যের উচ্চে স্থান পাইয়াছে। সে আলোচনা আমরা অন্য প্রবন্ধে করিব।

কিন্তু তাই বলিয়া যে স্বাধীন প্রেমের সৌন্দর্যে সমস্ত য়ুরোপীয় সমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে অনাদর করিলে আমাদের অন্ধতা ও মূঢ়তা প্রকাশ হইবে। বস্তুত তাহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। যদি না করিত তবে ইংরেজি কাব্য উপন্যাস আমাদের পক্ষে মিথ্যা হইত। সৌন্দর্য হিন্দু বা ইংরেজের মধ্যে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলে না। ইংরেজি সমাজের আদর্শগত সৌন্দর্যকে সাহিত্য যখন পরিস্ফুট করিয়া দেখায় তখন তাহা আমাদের জাতীয় সংস্কারকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ে দীপ্যমান হয়। তেমনি আমাদের হিন্দু পারিবারিক আদর্শের মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী সৌন্দর্যশ্রী আছে, তাহা যদি ইংরেজ দেখিতে না পায়, তবে ইংরেজ সেই অংশে বর্বর।

য়ুরোপীয় সমাজ অনেক মহাত্মা লোকের সৃষ্টি করিয়াছে; সেখানে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান প্রত্যহ উন্নতিলাভ করিয়া চলিতেছে; এ সমাজ নিজের মহিমা নিজে পদে পদে প্রমাণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে; ইহার নিজের অশ্ব উন্মত্ত হইয়া না উঠিলে ইহার রথকে বাহির হইতে কেহ প্রতিরোধ করিবে এমন কল্পনাই করিতে পারি না। এমনতরো গৌরবান্বিত সমাজকে শ্রদ্ধার সহিত পর্যবেক্ষণ না করিয়া ইহাকে যাহারা ব্যঙ্গ করে, বাংলাদেশের সেই-সকল সুলভ লেখক অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতিই বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

অপর পক্ষে বহুশত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিসাৎ করিতে পারে নাই, সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দয়াধর্ম-ক্রিয়াকর্তব্যের মধ্যে সংযত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে, রসাতলের মধ্যে নামিতে দেয় নাই, যে সমাজ হিন্দুজাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সতর্কতার সহিত এমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে যে বাহির হইতে উপকরণ পাইলেই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, যে সমাজ মূঢ় অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকেও পদে পদে প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও সমাজের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই সমাজকে যে মিশনারি শ্রদ্ধার সহিত না দেখেন তিনিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন। তাঁহার এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ন্যায়; আবশ্যক হইলেও, ইহার কোনো-এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে; সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় তাহা বর্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায় অবিচার নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ কী। সেই সভ্যতা যাহাকে

অধিকার করিয়াছে, স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ : তিনি সকলকে জানেন ও সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বদাই উপহাস করে ও ধিক্‌কার দেয় তাহা হিঁদুয়ানি, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা নহে। তেমনি যাহা প্রাচ্যসভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ তাহা আদর্শই নহে।

সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেইজন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।

১৩০৮

ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত

অন্যত্র বলিয়াছি কোনো ইংরেজ অধ্যাপক এ দেশে জুরির বিচার সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছিলেন যে, যে দেশের অর্ধসভ্য লোক প্রাণের মাহাত্ম্য (Sanctity of Life) বোঝে না, তাহাদের হাতে জুরি-বিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায়।

প্রাণের মাহাত্ম্য ইংরেজ আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, সে কথা না-হয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। অতএব সেই ইংরেজ যখন প্রাণ হনন করে তখন তাহার অপরাধের গুরুত্ব আমাদের চেয়ে বেশি। অথচ দেখিতে পাই, দেশীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজ খুনি ইংরেজ জজ ও ইংরেজ জুরির বিচারে ফাঁসি যায় নাই। প্রাণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাহাদের বোধশক্তি যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইংরেজ অপরাধী হয়তো তাহার প্রমাণ পায়, কিন্তু সে প্রমাণ দেশীয় লোকদের কাছে কিছু অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে।

এইরূপ বিচার আমাদিগকে দুই দিক হইতে আঘাত করে। প্রাণ যা যাবার সে তো যায়ই, ও দিকে মানও নষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহা আমাদের সকলেরই গায়ে বাজে।

ইংলন্ডে গ্লোব বলিয়া একটি সংবাদপত্র আছে। সেটা সেখানকার ভদ্রলোকেরই কাগজ। তাহাতে লিখিয়াছে— টমি অ্যাট্‌কিন (অর্থাৎ পল্টনের গোরা) দেশী লোককে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া মারে না, কিন্তু মার খাইলেই দেশী লোকগুলা মরিয়া যায়; এইজন্য টমি-বেচারার লঘু দণ্ড হইলেই দেশী খবরের কাগজগুলা চীৎকার করিয়া মরে।

টমি অ্যাট্‌কিনের প্রতি দরদ খুব দেখিতেছি, কিন্তু 'স্যাঙ্ক্‌টিটি অফ লাইফ' কোন্‌খানে। যে পাশব আঘাতে আমাদের পিলা ফাটে এই ভদ্রকাগজের কয় ছত্রের মধ্যেও কি সেই আঘাতেরই বেগ নাই। স্বজাতিকৃত খুনকে কোমল স্নেহের সহিত দেখিয়া হত ব্যক্তির আত্মীয়সম্প্রদায়ের বিলাপকে যাহারা বিরক্তির সহিত ধিক্‌কার দেয় তাহারাও কি খুন পোষণ করিতেছে না।

কিছুকাল হইতে আমরা দেখিতেছি, য়ুরোপীয় সভ্যতায় ধর্মনীতির আদর্শ সাধারণত অভ্যাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবোধশক্তি এই সভ্যতার অন্তঃকরণের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় নাই। এইজন্য অভ্যাসের গণ্ডির বাহিরে এই আদর্শ পথ খুঁজিয়া পায় না, অনেক সময় বিপথে মারা যায়।

য়ুরোপীয় সমাজে ঘরে ঘরে কাটাকাটি-খুনাখুনি হইতে পারে না, এরূপ ব্যবহার সেখানকার সাধারণ স্বার্থের বিরোধী। বিষপ্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাতের দ্বারা খুন করাটা য়ুরোপের পক্ষে কয়েক শতাব্দী হইতে ক্রমশ অনভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু খুন বিনা অস্ত্রাঘাতে বিনা রক্তপাতে হইতে পারে। ধর্মবোধ যদি অকৃত্রিম আভ্যন্তরিক হয়, তবে সেরূপ খুনও নিন্দনীয় এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া তোলা যাক।

হেনরি স্যাভেজ ল্যান্ডর একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তিব্বতের তীর্থস্থান লাসায় যাইবার জন্য তাঁহার দুর্নিবার ঔৎসুক্য জন্মে। সকলেই জানেন, তিব্বতিরা য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ও মিশনারি প্রভৃতিকে সন্দেহ করিয়া থাকে। তাহাদের দুর্গম পথঘাট বিদেশীর কাছে পরিচিত নহে, ইহাই তাহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র; সেই অস্ত্রটি যদি তাহারা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অন্যে তাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহারও নিষেধ মানিবে না, য়ুরোপের এই ধর্ম। কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক, শুদ্ধমাত্র বিপদ লঙ্ঘন করিয়া বাহাদুরি করিলে য়ুরোপে এত বাহবা মিলে যে অনেকের পক্ষে সে একটা প্রলোভন। য়ুরোপের বাহাদুর লোকেরা দেশ-বিদেশে বিপদ সন্ধান করিয়া ফেরে। যে-কোনো উপায়ে হোক, লাসায় যে য়ুরোপীয় পদার্পণ করিবে সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না।

অতএব তুষারগিরি ও তিব্বতির নিষেধকে ফাঁকি দিয়া লাসায় যাইতে হইবে। ল্যান্ডর সাহেব কুমায়ুনে আলমোড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে এক হিন্দু চাকর আসিয়া জুটিল, তাহার নাম চন্দন সিং।

কুমায়ুনের প্রান্তে তিব্বতের সীমানায় বৃটিশ রাজ্যে শোকা বলিয়া এক পাহাড়ি জাত আছে। তিব্বতিদের ভয়ে ও উপদ্রবে তাহারা কম্পমান। বৃটিশরাজ তিব্বতিদের পীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া ল্যান্ডর সাহেব বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শোকাদের মধ্য হইতে সাহেবকে কুলি মজুর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বহুকষ্টে ত্রিশজন কুলি জুটিল।

ইহার পর হইতে যাত্রাকালে সাহেবের এক প্রধান চিন্তা ও চেষ্টা, কিসে কুলিরা না পালায়। তাহাদের পালাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ল্যান্ডর তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের পঁচিশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

> এই বাহকদল যখন নিঃশব্দ গম্ভীরভাবে বোঝা পিঠে লইয়া করুণাজনক শ্বাসকষ্টের সহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতেছিল তখন এই ভয় মনে হইতেছিল, ইহাদের মধ্যে কয়জনই বা কোনো কালে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এ শঙ্কা যখন তোমার মনে আছে তখন এই অনিচ্ছুক হতভাগ্যদিগকে মৃত্যুমুখে তাড়না করিয়া লইয়া যাওয়াকে কী নাম দেওয়া যাইতে পারে। তুমি পাইবে গৌরব এবং তাহার সঙ্গে অর্থলাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। তুমি তাহার প্রত্যাশায় প্রাণপণ করিতে পার, কিন্তু ইহাদের সম্মুখে কোন্ প্রলোভন আছে?

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবচ্ছেদ (vivisection) লইয়া য়ুরোপে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। সজীব জন্তুদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে যন্ত্রণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবার ঔচিত্যও আলোচিত হয়। কিন্তু বাহাদুরি করিয়া বাহবা লইবার উদ্দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিচ্ছুক মানুষদের উপরে যে অসহ্য পীড়ন চলে ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ হয়, সমালোচকেরা করতালি দেন, সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, হাজার হাজার পাঠক ও পাঠিকা এই-সকল বর্ণনা বিস্ময়ের সহিত পাঠ ও আনন্দের সহিত আলোচনা করেন। দুর্গম তুষারপথে নিরীহ শোকা বাহকদল দিবারাত্র যে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহার পরিণাম কী। ল্যান্ডর সাহেব নাহয় লাসায় পৌঁছিলেন, তাহাতে জগতের এমন কী উপকার হওয়া সম্ভব যাহাতে এই-সকল ভীত পীড়িত পলায়নেচ্ছু মানুষদিগকে অহরহ এত কষ্ট দিয়া মৃত্যুর পথে তাড়না করা লেশমাত্র বিহিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু কই, এজন্য তো লেখকের সংকোচ নাই, পাঠকের অনুকম্পা নাই!

তিব্বতিরা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও হত্যা করিতে পারে, শোকারা সেই কারণে তিব্বতিদিগকে কিরূপ ভয় করে এবং তাহাদিগকে তিব্বতিদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বৃটিশরাজ কিরূপ

অক্ষম, তাহা ল্যান্ডর জানিতেন। ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহার মধ্যে যে উৎসাহ উত্তেজনা ও প্রলোভন কাজ করিতেছে, লোকাদের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। তৎসত্ত্বেও ল্যান্ডর তাঁহার গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় যে ভাবে তাঁহার বাহকদের ভয়দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তর্জমা করিয়া দিলাম—

> তাহারা প্রত্যেকে হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। কাচির দুই গাল বাহিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, দোলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এবং ডাকু ও অন্য যে-একটি তিব্বতি আমার কাজ লইয়াছিল—যাহারা ভয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিল—তাহারা তাহাদের বোঝার পশ্চাতে লুকাইয়া বসিয়া ছিল। আমাদের অবস্থা যদিও সংকটাপন্ন ছিল তবু আমাদের লোকজনদের এই আতুর দশা দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইহার পরে এই দুর্ভাগারা পলায়নের চেষ্টা করিলে ল্যান্ডর তাহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করেন যে, যে-কেহ পলায়নের বা বিদ্রোহের চেষ্টা করিবে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।

কিরূপ তুচ্ছ কারণেই ল্যান্ডর সাহেবের গুলি করিবার উত্তেজনা জন্মে অন্যত্র তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। তিব্বতি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ল্যান্ডর যখন প্রথম নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি ভান করিলেন, যেন, ফিরিয়া যাইতেছেন। একটা উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া দূরবীন কষিয়া দেখিলেন, পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর হইতে প্রায় ত্রিশটা মাথা পাথরের আড়ালে উঁকি মারিতেছে। সাহেব লিখিতেছেন—

> আমার বড়ো বিরক্তি বোধ হইল। যদি ইচ্ছা হয় তো ইহারা প্রকাশ্যভাবেই আমাদের অনুসরণ করে না কেন। দূর হইতে পাহারা দিবার দরকার কী। অতএব আমি আমার আটশো-গজি রাইফেল লইয়া মাটিতে চ্যাপ্টা হইয়া শুইলাম এবং যে মাথাটাকে অন্যদের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির করিলাম।

এই 'অতএব'-এর বাহার আছে। লুকাচুরিকে ল্যান্ডর সাহেব কী ঘৃণাই করেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গের আর-একটা মিশনারি সাহেব নিজেদের হিন্দু তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, প্রকাশ্যে ভারতবর্ষে ফিরিবার ভান করিয়া গোপনে লাসায় যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, কিন্তু পরের লুকাচুরি ইঁহার এতই অসহ্য যে, ভূমিতে চ্যাপ্টা হইয়া আত্মগোপনপূর্বক তৎক্ষণাৎ আটশো-গজি রাইফেল বাগাইয়া কহিলেন : I only wish to teach these cowards a lesson। 'আমি এই কাপুরুষদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি।' দূরে হইতে লুকাইয়া রাইফেল-চালনায় সাহেব যে পৌরুষের পরিচয় দিতেছিলেন তাহার বিচার করিবার কেহ ছিল না। আমাদের ওরিয়েন্টাল্‌দের অনেক দুর্বলতার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু চালুনি হইয়া ছুঁচকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদের মতো আমাদের নাই। আসল কথা, গায়ের জোর থাকিলে বিচারাসনের দখল একচেটে করিয়া লওয়া যায়। তখন অন্যকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসটাই বদ্ধমূল হইয়া যায়, নিজেকে বিচার করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

আশিয়ায় আফ্রিকায় ভ্রমণকারীরা অনিচ্ছুক ভৃত্য বাহকদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনায় ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগকে যে করিয়া বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যান, তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ Sanctity of Life সম্বন্ধে এই-সকল পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বোধশক্তি অত্যন্ত সুতীব্র হইলেও কোথাও কোনো আপত্তি শুনিতে পাই না। তাহার কারণ, ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে; স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিকৃত হইতে থাকে। এমন-কি, সে গণ্ডির মধ্যেও যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে! যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের সর্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিবার বিরুদ্ধে কথা কহা

'সেন্টিমেন্টালিটি'। য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। গ্লাডস্টোনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পোঁছিয়াছে।

দক্ষিণ-আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ আচরণ চলিতেছে তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত 'পোস্ট' সংবাদপত্র হইতে গত ২রা জুলাই তারিখের বিলাতি 'ডেলি নিউস'-এ সংকলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রীপুরুষকে পুলিসকোর্টে হাজির করা হয়; সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গেরা শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক লৌহশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সকলপ্রকার উপায়ে তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে তো চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে দ্বৈধব্য (bigamy)-অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। হাজতে থাকার সময় একজন ব্যারিস্টার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করে। কিন্তু কোনো বিচার না হইয়াই নির্দোষ বলিয়া এই স্ত্রীলোকটি খালাস পায়। ব্যারিস্টার ফি-এর দাবি করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্তে এই নিগ্রো স্ত্রীলোকটিকে ম্যাক্রি ক্যাম্পে চৌদ্দ মাস কাজ করিবার জন্য পাঠায়। সেখানে তাহাকে নয়মাস চাবি তালা দিয়া বন্ধ করিয়া খাটানো হইয়াছে, জোর করিয়া আর-এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমার বৈধস্বামীর সহিত তোমার কোনো কালে মিলন হইবে না। পলায়নের আশঙ্কা করিয়া তাহার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রভু ম্যাক্রিরা তাহাকে নিজের হাতে চাবুক মারিয়াছে এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, খালাস পাইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে সে মাসে পাঁচ ডলার করিয়া বেতন পাইত।

'ডেলি নিউস' বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কঙ্গোয় বেলজিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা দুরূহ হইয়াছে। After all, no great power is entirely innocent of the charge of treating with barbarous harshness the alien races which are subject to its rule.

আমাদের দেশে ধর্মের যে আদর্শ আছে তাহা অন্তরের সামগ্রী, তাহা বাহিরে গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে। আমরা যদি Sanctity of Life একবার স্বীকার করি তবে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কোথাও তাহার সীমাস্থাপন করি না। ভারতবর্ষ একসময়ে মাংসাশী ছিল; মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাশী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, জগতে বোধ হয় ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ভারতবর্ষে দেখিতে পাই অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যাহা উপার্জন করে তাহা দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থেরও যে একটা ন্যায্য অধিকার আছে, এ কথাটাকে আমরা সর্বপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়া যত দূর সম্ভব খর্ব করিয়াছি। আমাদের দেশে বলে, যুদ্ধেও ধর্মরক্ষা করিতে হইবে! নিরস্ত্র, পলাতক, শরণাগত শত্রুর প্রতি আমাদের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ ব্যবহার ধর্মবিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে য়ুরোপে তাহা হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার একমাত্র কারণ, ধর্মকে আমরা অন্তরের ধন করিতে চাহিয়াছিলাম। স্বার্থের প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের ধর্মকে গড়িয়া তোলে নাই, ধর্মের নিয়মই আমাদের স্বার্থকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্য আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্বল হইয়া থাকি, সেইজন্যই বহিঃশত্রুর কাছে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরবলাভ করিয়াছি তাহা কখনোই ব্যর্থ হইবে না—একদিন তাহারও দিন আসিবে।

১৩১০

সমাজ

প্রকাশ : ১৯০৮

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ডের (১৮৯১) দ্বিতীয়াংশ সম্পাদনান্তে 'সমাজ' গ্রন্থে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়।

'চিঠিপত্র' (১৮৮৭) প্রথমে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে পরে 'সমাজ' গ্রন্থভুক্ত হয়। বর্তমান রচনাবলীতে 'চিঠিপত্র' স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে এই খণ্ডেই মুদ্রিত।

'সমাজ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯০৮) যে 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয় সেটি পৃথক সময়ে প্রকাশিত 'কোট বা চাপকান' এবং 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধদ্বয়ের সংস্কৃত ও সংযোজিত রূপ। পরবর্তী কোনো সংস্করণে এই নূতন প্রবন্ধটি 'সমাজ' গ্রন্থ থেকে বর্জিত হয়। বর্তমান রচনাবলীতে প্রবন্ধ দুটি প্রথম প্রকাশিত স্বতন্ত্র রূপেই রক্ষিত হয়েছে। 'নকলের নাকাল' প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আলোচনাটি 'পরিশিষ্ট' অংশে মুদ্রিত। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ বঙ্গদর্শনে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে মুদ্রিত হয়েছিল।

আচারের অত্যাচার

‘ইংরেজিতে পাউন্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।...ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয়; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না।...হিন্দু বলেন যে ধর্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।’

--সাহিত্য, ৩য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা

সকল দিক সমানভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্য মানুষকে কোনো-না-কোনো বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি থিয়োরি লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা তো এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্মহিসাবী, দন্তি কাক পর্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিসাবী বলিতে পারেন, কাকে গিয়াই বা থামিব কেন। বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের দিকে টানিতেই হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না—তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার জো নাই—কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, জোড়হস্তে বিনীতস্বরে আমরা বলি, ‘প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই, সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ; ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ; এবং এই-সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি, দন্তিকাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে তো হিন্দুকে সংসারের কোনো প্রকৃত কাজে, মানবের কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে তো তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কষিতে হয়। তুমি যে শোভাসৌন্দর্যবৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে-পৃথিবী তো পর্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানব-বংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক্‌ পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান, সে তো অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানবপ্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গনিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া, কাহনকে কড়া-কড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র ‘হিঁদু’ হইব, মানুষ হইব না।’

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ‘পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ’—বাংলায় তাহার তর্জমা করা যাইতে পারে, ‘কড়ায় কড়া কাহনে কানা।’ অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া

কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। তাহার ফল হয়, 'বজ্র আঁটন ফসকা গিরো'—প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা-আচারবিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একজন লোক গোরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এইজন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্ম-দৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে। আমি যদি অস্পৃশ্য নীচজাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তিহিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন। প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান তপ বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না।

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্র ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনই যেখানে-সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোটোবড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটোবড়ো সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফসকা গিরো।

এইরূপে পাপপুণ্য যে মনের ধর্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ, মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভলোকসান ব্যাবসাবাণিজ্য ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়, যদি ওঠাবসা মেলামেশা ছোঁয়াখাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপপুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম মনে করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতিসূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর করা

যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ, মানুষ ঠেকিয়া শেখে—কিন্তু তিলমাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানোই যুক্তিসংগত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়া-বয়স পর্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানোই ভালো। তাহা হইলে তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। কী রাখিলাম আর কী হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবিকঙ্কণে বাণিজ্যবিনিময়ে আছে—

শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে-স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য-উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সে-ই আমাদের যথার্থ লাভ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলিকর্দমের উপর দিয়া, আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়া, পতন-পরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে-বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী। মাটিতে পদার্পণমাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র পুণ্যশয্যায় শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতিনিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়—কিন্তু সে-হিসাব কী। একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়াক্রান্তি-কাকদন্তির গোল হয় এইজন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁত সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতিসম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয়, তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে।

জন্তুদের জীবনের পরিসর সংকীর্ণ, তাহারা অল্পদূর গিয়াই উন্নতি শেষ করে—এইজন্য আরম্ভকাল হইতেই তাহারা শক্তসমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এইজন্য বহুকাল পর্যন্ত সে অপরিণত দুর্বল।

জন্তুরা যে-স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরেজিতে তাহাকে বলে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌, বাংলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ-সংস্কার। সহজ-সংস্কার, অশিক্ষিতপটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ-সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ-সংস্কারের গম্য-স্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

আবশ্যকের আকর্ষণ চতুষ্পার্শ্ব বাঁচাইয়া, পথঘাট দেখিয়া, ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়া, সুবিধার পথ দিয়া আমাদিগকে স্বার্থপরতার সীমা পর্যন্ত লইয়া যায়; প্রেমের আকর্ষণ আমাদিগকে সমস্ত গণ্ডির বাহিরে লইয়া, আত্মবিসর্জন করাইয়া, কখনো ভূতলশায়ী কখনো অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে।

আবশ্যকের সীমা আপনার মধ্যে, প্রেমের সীমা কোথায় কেহ জানে না। তেমনই, পূর্ব হইতে সমস্ত নির্দিষ্ট করিয়া সমস্ত পতন সমস্ত গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া একটি নিরতিশয় সমতল সমাজের মধ্যে নিরাপদে জীবন চালনা করিলে, সে-জীবনের পরিসর নিতান্ত সামান্য হয়।

আমরা মানবসন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদিগের শিক্ষা করিতে যায়—আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সে-ই আমাদের সৌভাগ্য, সে-ই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে এখনো আমাদের বুদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের মতো অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণী-সংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না; অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয়, তবে আমরা একান্ত দুর্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়া ক্রান্তি কাক দন্তি চোখবাঁধা ঘানির বলদের জন্য; সে তাহার পূর্ববর্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোলচক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈলনিষ্পেষণ নামক একটি বিশেষনির্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবননির্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়—কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস এবং কচ্ছপ নামক একটি ন্যায়ের কূতর্ক আছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একিলিস যতই দ্রুতগামী হউক, মন্দগতি কচ্ছপ যদি একত্রে চলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে, তবে একিলিস তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন—কড়াক্রান্তি-দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্মভূমিতে একিলিস এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি-দন্তিকাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। তেমনই আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, কড়াক্রান্তি-দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে; কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক-এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুল-চেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমত চলিতে আরম্ভ করা যাক। আর তা যদি না চাই, তবে অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময়যাপনের একটা উপায় বটে। তাহাতে আমাদের পুণ্য প্রমাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু নৈপুণ্য প্রমাণ হয়।

১২৯৯

সমুদ্রযাত্রা

বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ তাহা লইয়া কোনো কথা নহে। কারণ, যাহা অন্য হিসাবে ভালো অথবা যাহাতে কোনো মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভালো না হইতে পারে এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভালো এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক-না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়ো, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকল সময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে-সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনোরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না; তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্তব্যের নিয়ামক কে। শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে। লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে, ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষত যে-লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রান্ত গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে তো আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরেজের আইনেও বাহির হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্বকালে তাঁহারা সে কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরেজ আমাদের সমাজকে যে-অবস্থায় হাতে পাইয়াছে, ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোনো নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোনো নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন্‌টা বৈধ কোন্‌টা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোনো সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট জড় কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণপথে তিলার্ধমাত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কী করেন। তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।

তাঁহাদের আর-একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্য সময়ের

লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বর্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহুপ্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার কোনো বাধা ছিল না। বর্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে; ইহার কোনো উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে আর-এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে, সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোনো ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতিপথের ব্যাঘাতস্বরূপ আপন পাষাণ-মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবিধি ছিল কি না। যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল; আর যদি দৈবাৎ অনুস্বারবিসর্গবিশিষ্ট একটা বচনার্থ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনই নিরুপায় যে, সমাজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য করিয়া বহন করিব, এমন-কি তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব। দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।

আমরা কি নিজের কর্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না— পূর্বে কী ছিল এবং এখন কী আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব। আমাদের শুভাশুভ-জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণসংহিতা আগমনিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইবে— সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্ক লোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোনো দেশে প্রচলিত আছে কি।

আমাদের ধর্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যে-লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনই মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সংগতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা মাদ্রাজ সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জাতি লইয়া কোনো কথা উঠিতেছে না, এদিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্য পান করিতেছে, কেহ সেদিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড়ো শঙ্কিত। কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ-সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবারও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার-নামক প্রকাণ্ড জড়পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে তো মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণ মাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্তমান লোকাচারের অসংগতিদোষ দেখানো হয়। বলা হয়, একদিকে আমরা বাধ্য হইয়া অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্যদিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াক্কড়। কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি, কাহাকে সে-কথাগুলা বলা হইতেছে। শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে। সে নিজেও এমন মহা অপরাধ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি।

সমাজের মধ্যে যে-কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিনা যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রায় উপকার আছে; মনুর যে-নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চিরকালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক; দেশে-বিদেশে গিয়া জ্ঞান-অর্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোনো প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না; যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্র-বেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন—তবে আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না—তবে কোনো শ্লোকখণ্ড আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোনো লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাঁধও ভাঙিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশিদিন কেহ ভয় করিবে না। যে-সমাজ মিথ্যাকে কপটতাকে মার্জনা করে, অর্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া-শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোনো নৈতিক কারণ কোনো যৌক্তিক সংগতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড়ো দুরূহ হইত।

যাঁহারা শুভবুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোনো যুক্তি নাই; সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দু-সমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙিতে গেলে আর-একটা ভাঙিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রীশিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে।

সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্তমান সমাজ রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোনো প্রকার স্বাধীনতার কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট নিশ্চল অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোনো ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত পল্লবিত বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না। আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে। যেখানেই কালক্রমে একটি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে, সেখানেই পুনর্বার নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত।

স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজশিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্য-সহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র

নড়িলে-চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।

সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শ লাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধনমুক্তি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে-সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনো কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে-সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ। বাহ্যত ম্লেচ্ছসংসর্গ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে, কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়াই যথার্থ লোকাচারবিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়, আমরা সমুদ্র পার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এ দেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরেজি-শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কী। আমরা যেন ইংলন্ডে না গেলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সে-ই তো ভাঙিয়াছে। আজ যে এত বাক্‌চাতুরী, এত শাস্ত্রসন্ধানের ধুম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে তো তাহার কোনো আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনই অন্ধ অথবা এমনই কপটাচারী যে, সেদিকে কোনো দৃক্‌পাত নাই। অতি বড়ো পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরেজি শিখাইতেছে; এমন-কি মাতৃভাষা শিখাইতেছে না; এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষার প্রস্তাব উঠিতেছে, তখন স্বদেশের লোকেই তো তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরানীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাস করিতেই হইবে। পাস না করিলে চাকরি চুলায় যাক, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরেজি-শিক্ষার মর্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কী ভ্রম, এ কী দুরাশা। ইংরেজি-শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করিবে না। এ কি কখনো সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে, পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরেজি-শিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাকরি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালি সমুদ্র পার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

১২৯৯

বিলাসের ফাঁস

ইংরেজ আত্মপরিতৃপ্তির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে, ইহা লইয়া ইংরেজি কাগজে আলোচনা দেখা যাইতেছে। এ কথা তাহাদের অনেকেই বলিতেছে যে, বেতনের ও মজুরির হার আজকাল উচ্চতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রা এখনকার দিনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ হইয়াছে। কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে, আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত

হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ইংলন্ড এবং ওয়েল্‌সে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক লোক দেনা শোধ করিতে না পারায় আদালতে হাজির হয়। এই-সকল দেনার অধিকাংশই আড়ম্বরের ফল। পূর্বে অল্প আয়ের লোকে সাজে সজ্জায় যত বেশি খরচ করিত, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি করে। বিশেষত মেয়েদের পোশাকের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ফতুর হইতেছে। যে-স্ত্রীলোক মুদির দোকানে কাজ করে, ছুটির দিনে তাহার কাপড় দেখিয়া তাহাকে আমীর-ঘরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এমন ঘটনা দুর্লভ নহে। বৃহৎ ভূসম্পত্তি হইতে যে-সকল ড্যুকের বিপুল আয় আছে, বহুব্যয়সাধ্য নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে তাহাদেরও টানাটানি পড়িয়াছে, যাহাদের অল্প আয় তাহাদের তো কথাই নাই। ইহাতে লোকের বিবাহে অপ্রবৃত্তি হইয়া তাহার বহুবিধ কুফল ফলিতেছে।

এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা কাহারও অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের অপেক্ষা সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়। দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে যে-সকল আয়োজন আবশ্যক, অর্থাভাবে আমাদের দেশে তাহা সমস্তই অসম্পূর্ণ।

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্বকালে অল্প ছিল, সে কথা মানিতে পারি না। তখনো লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতোই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই, তখন খ্যাতির পথ এক দিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্য দিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম, পূজাপার্বণ ও পূর্তকার্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতিলাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গেছে।

কিন্তু, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসা তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা সাধারণত নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে করো, যে-ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশি হউক-না অতিথিরা যে-আহার পাইতেন তাহাতে বিলাসিতার চর্চা হইত না। বিবাহাদি কর্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চালচলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদেরই চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি এ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল; এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গেছে অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সংকুচিত হয় নাই, এইজন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম করে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃ-বিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম নির্বাহ করো-না কেন।' সে বলিল, তাহার কোনো উপায় নাই, গ্রামের লোক ও আত্মীয়কুটুম্বমণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ ঘটিবে।

এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবি সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গেছে। পূর্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা শহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সংগতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষিজীবী গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরি দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, 'কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস কেন।' সে কহিল, 'বাবু, একদিন ছিল যখন জমিজমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমিজমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন বল্‌ তো।' সে উত্তর করিল, 'আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে। পূর্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়াগুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতি র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারী করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি, ছেলেরা বিলাতি জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।'

কেহ কেহ বলিবেন, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহুবন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ-সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। হিন্দু সমাজতন্ত্রে কতকগুলি লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে, এই উভয় পন্থাতেই ভালো মন্দ দুইই আছে। য়ুরোপীয় পন্থাই যদি একমাত্র শ্রেয় বলিয়া সপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। য়ুরোপের মনীষীগণের কথায় অবধান করিলে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে-অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে-আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের সচ্ছলতা ছিল। এই কারণে আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল। তখন ধনোপার্জন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। তখন সমাজে ধনের মর্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনই সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলিয়া গণ্য ছিল না। ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহাও নহে। এই কারণে, ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে আমি ধনী। বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।

মুসলমানসমাজে বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা হিন্দুসমাজকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবি বলিত। অল্প লোকেরই সেই নবাবি চাল ছিল। এখনকার দিনে বিলাসিতাকে বাবুগিরি বলে, দেশে বাবুর অভাব নাই।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কতদিক হইতে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো। একদিকে আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্য দিকে পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভার বহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কা বোধ করে। এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কী আছে। পণের পরিমাণও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শ অনুসারে যে বাড়িয়া যাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য নাই। এই পণ-লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক আলোচনা চলিতেছে; বস্তুত ইহাতে বাঙালি গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই, কন্যার বিবাহ লইয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া নাই এমন কন্যার পিতা আজ বাংলাদেশে অল্পই আছে। অথচ, এজন্য আমাদের বর্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। একদিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপরদিকে কন্যামাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে-সমাজের কল্যাণ নাই, সে-সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কী। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব করুন, তবেই লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, সেই গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

একবার ভাবিয়া দেখো, আজ চাকরি সমস্ত বাঙালি ভদ্রসমাজের গলায় কী ফাঁসই টানিয়া দিয়াছে। এই চাকরি যতই দুর্লভ হইতে থাক্‌, ইহার প্রাপ্য যতই স্বল্প হইতে থাক্‌, ইহার অপমান যতই দুঃসহ হইতে থাক্‌, আমরা ইহারই কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছি। এই দেশব্যাপী চাকরির তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালি জাতি দুর্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকরির মায়ায় বাংলার বহুতর সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকেই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা দেশের সহিত ধর্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে। আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখো। বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন বিমুখ কারা। তখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা। তখন ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা। তখন বালকদের অতি পবিত্র গুরুসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে অপমান ও নির্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা। যারা চাকরির ফাঁস গলায় পরিয়াছে। তারা যে কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়, তারা নিজেকে ভুলাইতেছে, তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে দেশের লোক ভুল করিতেছে। বলো দেখি, দেশের যোগ্যতম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে এই যে চাকরি-শিকলের টান, ইহা কী প্রাণান্তকর টান। এই টানকে আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া

তুলিতেছি কী করিয়া। নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানাকে প্রত্যহই উগ্রতর করিয়া মনকে বিলাসের অধীন করিয়া আপন দাসখতের মেয়াদ এবং কড়ার বাড়াইয়া চলিয়াছি।

জীবনযাত্রাকে লঘু করিবামাত্র দেশব্যাপী এই চাকরির ফাঁসি এক মুহূর্তে আলগা হইয়া যাইবে। তখন চাষবাস বা সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইবে না। তখন এত অকাতরে অপমান সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকা সহজ হইবে না।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ-কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে-অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জংগলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে-দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে-দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া, কোঠাবাড়ি গাড়িঘোড়া সাজসরঞ্জাম আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে—কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে-ধন সমস্তদেশের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য চারি দিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে বন্ধুস্থানকে জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া, কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

১৩১২

কোট বা চাপকান

আজকাল একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতি পোশাক পরেন, স্ত্রীগণকে তাঁহারা শাড়ি পরাইয়া বাহির করিতে কুণ্ঠিত হন না। একাসনে গাড়ির দক্ষিণভাগে হ্যাট কোট, বামভাগে বোম্বাই শাড়ি। নব্য বাংলার আদর্শে হরগৌরীরূপ যদি কোনো চিত্রকর চিত্রিত করেন, তবে তাহা যদি-বা 'সাব্‌লাইম' না হয়, অন্তত সাব্‌লাইমের অদূরবর্তী আর-একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।

পশুপক্ষীর রাজ্যে প্রকৃতি অনেক সময় স্ত্রীপুরুষের সাজের এত প্রভেদ করেন যে, দম্পতিকে একজাতীয় বলিয়া চেনা বিশেষ অভিজ্ঞতাসাধ্য হইয়া পড়ে। কেশরের অভাবে সিংহীকে সিংহের পত্নী বলিয়া চেনা কঠিন এবং কলাপের অভাবে ময়ূরের সহিত ময়ূরীর কুটুম্বিতানির্ণয় দুরূহ।

বাংলাতেও যদি প্রকৃতি তেমন একটা বিধান করিয়া দিতেন, স্বামী যদি তাঁহার নিজের পেখম বিস্তার করিয়া সহধর্মিণীর উপরে টেক্কা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথাই উঠিত না। কিন্তু গৃহকর্তা যদি পরের পেখম পুচ্ছে গুঁজিয়া ঘরের মধ্যে অনৈক্য বিস্তার করেন, তাহা হইলে সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপসোসের বিষয় হয় তাহা নহে, পরের চক্ষে হাস্যেরও বিষয় হইয়া ওঠে।

যাহা হউক, ব্যাপারটা যতই অসংগত হউক, যখন ঘটিয়াছে তখন ইহার মধ্যে সংগত কারণ একটুকু আছেই।

আমরা যে-কারণটি নির্ণয় করিয়াছি তাহার মধ্যে আমাদের মনের কতকটা সান্ত্বনা আছে। অন্তত সেইজন্যই আশা করি এইটেই যথার্থ কারণ। সে কারণ নির্দেশ করিবার পূর্বে বিষয়টা একটু বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করা যাক।

ইংরেজি কাপড়ের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তাহার ফ্যাশানের উৎস ইংলন্ডে। সেখানে কী কারণবশত কিরূপ পরিবর্তন চলিতেছে আমরা তাহা জানি না, তাহার সহিত আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রবমাত্র নাই। আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া খবর লইতে এবং সাবধানে অনুকরণ করিতে হয়। যাঁহারা নূতন বিলাত হইতে আসেন তাঁহারা সাবেক দলের কলার এবং প্যান্টলুনের ছাঁট দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন, এবং সাবেক দলেরা নব্যদলের সাজসজ্জার নব্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে ফ্যাশানেব্‌ল বলিয়া হাস্য করিতে ত্রুটি করেন না।

ফ্যাশানের কথা ছাড়িয়া দেও। সকল দেশেরই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে। যে দেশে কাপড় না পরিয়া উলকি পরে সেখানেও উলকির ইতরবিশেষে ভদ্র অভদ্র চিহ্নিত হয়। ইংরেজি ভদ্রকাপড়ের সেই আদর্শ আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিব। তাহা আমাদের ঘরের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে নাই। সে আদর্শ আমরা নিজের ভদ্রতাগৌরবে আমাদের নিজের সুরুচি ও সুবিচারের দ্বারা, আমাদের আপনাদের ভদ্রমণ্ডলীর সাহায্যে স্বাধীনভাবে গঠিত করিতে পারি না। আমাদিগকে ভদ্র সাজিতে হয় পরের ভদ্রতা-আদর্শ অনুসন্ধান করিয়া লইয়া।

যাহাদের নিকট হইতে অনুসন্ধান এবং ধার করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের সমাজে আমাদের গতিবিধি নাই। তাহাদের দোকান হইতে আমরা ঈভনিং কোর্তা কিনি, কিন্তু তাহাদের নিমন্ত্রণে সেটা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাই না।

এমন অবস্থায় ক্রমে দোকানে-কেনা আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। ক্রমে কলারের শুভ্রতায় টাইয়ের বন্ধনে প্যান্টলুনের পরিধিতে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। শুনিতে পাই ইংরেজিবেশী বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায় দেখা যায়।

একে বিলাতি সাজ স্বভাবতই বাঙালিদেহে অসংগত, তাহার উপরে যদি তাহাতে ভদ্রোচিত পারিপাট্য না থাকে, তবে তাহাতে হাসিও আসে অবজ্ঞাও আনে। এ কথা সহজেই মুখে আসে যে, যদি পরিতে না জান এবং শক্তি না থাকে, তবে পরের কাপড়ে সাজিয়া বেড়াইবার দরকার কী ছিল।

ইংরেজি কাপড়ে 'খেলো' হইলে যত খেলো এবং যত দীন দেখিতে হয়, এমন দেশী কাপড়ে নয়। তাহার একটা কারণ ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে। ইংরেজি কাপড় যদি গায়ে ফিট না হইল, যদি তাহাতে টানাটানি প্রকাশ পাইল, তবে তাহা ভদ্রতার পক্ষে অত্যন্ত বেআবরু হইয়া পড়ে; কারণ, ইংরেজি কাপড়ের আগাগোড়ায় গায়ে ফিট করিবার চরম উদ্দেশ্য, দেহটাকে খোসার মতো মুড়িয়া ফেলিবার সযত্ন চেষ্টা সর্বদা বর্তমান। সুতরাং প্যান্টলুন যদি একটু খাটো হয়, কোট যদি একটু উঠিয়া পড়ে, তবে নিজেকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়, সেইটুকুতেই আত্মসম্মানের লাঘব হইতে থাকে—যে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অজ্ঞতাসুখে অচেতন, অন্যলোকে তাহার হইয়া লজ্জা বোধ করে।

যাঁহারা আজকাল ইংরেজি বস্ত্র ধরিয়াছেন লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন, তাঁহাদিগকে কখনো যেন চাঁদনিতে ঢুকিতে না হয়। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা সকলেই যে র‍্যাঙ্কিনের বাড়ি গতিবিধি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। অথচ পৈতৃক বেশের সহিত পৈতৃক দুর্বলতাটুকুও যদি তাহারা পায়, সাহেবিয়ানা পরিহার করিবার শক্তি যদি তাহাদের না থাকে, তবে তাহাদের সম্মুখে দারুণ চুনাগলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না।

যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা বিলাতি বসনভূষণের অন্ধিসন্ধি কতকটা বুঝিয়া চলিতে পারেন; যাঁহারা যান নাই তাঁহারা অনেক সময় অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তাঁহারা দার্জিলিঙের প্রকাশ্য-

পথে ড্রেসিংগাউন পরিয়া বেড়ান, এবং ছোটো কন্যাকে মলিন সাদা ফুলমোজার উপরে বিলাতি ফ্রক এবং টুপি উল্টা করিয়া পরাইয়া সভায় লইয়া আসেন।

এ সম্বন্ধে দুটো কথা আছে। প্রথমে ঠিক দস্তুর-মতো ফ্যাশান-মতো কাপড় পরিতেই হইবে, এমন কী মাথার দিব্য আছে। এ কথাটা খুব বড়োলোকের, খুব স্বাধীনচেতার মতো কথা বটে। দশের দাসত্ব, প্রথার গোলামি, এ সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ধিক্‌। কিন্তু এ স্বাধীনতার কথা তাহাকে শোভা পায় না যে লোক গোড়াতেই বিলাতি সাজ পরিয়া অনুকরণের দাসখত আপাদমস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছে। পাঁঠা যদি নিজের হয়, তবে তাহাকে কাটা সম্বন্ধেও স্বাধীনতা থাকে; নিজেদের ফ্যাশানে যদি চলি, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াও মহত্ত্ব দেখাইতে পারি। পরের পথেও চলিব, আবার সে পথ কলুষিতও করিব, এমন বীরত্বের মহত্ত্ব বোঝা যায় না।

আর-একটা কথা এই যে, যেমন ব্রাহ্মণের পইতা তেমনই বিলাতফেরতের বিলাতি কাপড়, ওটা সাম্প্রদায়িক লক্ষণরূপে স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। কিন্তু সে বিধান চলিবে না। গোড়ায় সেই মতোই ছিল বটে, কিন্তু আজকাল সমুদ্র পার না হইয়াও অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন। আমাদের উর্বর দেশে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি যে-কোনো ব্যাধি আসিয়াছে, ব্যাপ্ত না হইয়া ছাড়ে নাই; বিলাতি কাপড়েরও দিন আসিয়াছে; ইহাকে দেশের কোনো অংশবিশেষে পৃথক্‌করণ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলন্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহার দৈন্য কী বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে। আজ যাহা কেবলমাত্র শোকাবহ আছে সেদিন তাহা কী নিষ্ঠুর হাস্যজনক হইয়া উঠিবে। আজ যাহা বিরল-বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সংবৃত সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্তার ছিদ্রপথে অর্ধাবরণের ইতরতায় কী নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে। চুনাগলি যেদিন বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আসিবে, সেদিন যেন ভারতবর্ষ একটি পা মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহারই সমুদ্রের ঘাটে তাঁহার মলিন প্যান্টলুনের ছিন্ন প্রান্ত হইতে ভাঙা টুপির মাথাটা পর্যন্ত নীলাম্বুরাশির মধ্যে নিলীন করিয়া নারায়ণের অনন্তশয়নের অংশ লাভ করেন।

কিন্তু এ হল সেন্টিমেন্ট, ভাবুকতা—প্রকৃতিস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না। ইহা সেন্টিমেন্ট বটে। মরিব তবু অপমান সহিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। যাহারা আমাদিগকে ক্রিয়াকর্মে আমোদপ্রমোদ-সামাজিকতায় সর্বতোভাবে বাহিরে ঠেলিয়া রাখে, আমরা তাহাদিগকে পূজার উৎসবে ছেলের বিবাহে বাপের অন্ত্যেষ্টিসংকারে ডাকিয়া আনিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। বিলাতি কাপড় ইংরেজের জাতীয় গৌরবচিহ্ন বলিয়া সেই ছদ্মবেশে স্বদেশকে অপমানিত করিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। এই-সমস্ত সেন্টিমেন্টই দেশের যথার্থ বল, দেশের যথার্থ গৌরব; অর্থে নহে, রাজপদে নহে, ডাক্তারির নৈপুণ্য অথবা আইন-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে নহে।

আশা করিতেছি এই সেন্টিমেন্টের কিঞ্চিৎ আভাস আছে বলিয়াই বিলাতি বেশধারীগণ অত্যন্ত অসংগত হইলেও তাঁহাদের অর্ধাঙ্গিনীদের শাড়ি রক্ষা করিয়াছেন।

পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য ভাবগৌরবকে বলিদান দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু স্ত্রীগণ যেখানে আছেন সেখানে সৌন্দর্য এবং ভাবুকতার রাহুরূপী কর্ম আজিও আসিয়া প্রবেশ করে নাই। সেইখানে একটু ভাবরক্ষার জায়গা রহিয়াছে, সেখানে আর স্ফীতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু গ্রাস করিয়া যায় নাই।

সাহেবিয়ানাকেই যদি চরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে স্ত্রীকে বিবি না সাজাইয়া সে গৌরব অর্ধেক অসম্পূর্ণ থাকে। তাহা যখন সাজাই নাই, তখন শাড়িপরা স্ত্রীকে বামে বসাইয়া এ কথা প্রকাশ্যে কবুল করিতেছি যে, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সুবিধার খাতিরে—দেখো, ভাবের খাতির রক্ষা করিয়াছি আমার ঘরের মধ্যে, আমার স্ত্রীগণের পবিত্র দেহে।

কিন্তু আমরা আশংকা করিতেছি, ইঁহাদের অনেকেই এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিবেন। বলিবেন; পুরুষের উপযোগী জাতীয় পরিচ্ছদ তোমাদের আছে কোথায় যে আমরা পরিব?

ইহাকেই বলে আঘাতের উপরে অবমাননা। একে তো পরিবার বেলা ইচ্ছাসুখেই বিলাতি কাপড় পরিলেন, তাহার পর বলিবার বেলা সুর ধরিলেন যে, তোমাদের কোনো কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদিগকে এই বেশ ধরিতে হইয়াছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে, কিন্তু তোমাদের কোনো কাপড়ই নাই—সে আরও খারাপ।

বাঙালি সাহেবেরা ব্যঙ্গসুরে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিতে গেলে পায়ে চটি, হাঁটুর উপরে ধুতি এবং কাঁধের উপরে একখানা চাদর পরিতে হয়; সে আমরা কিছুতেই পারিব না। শুনিয়া ক্ষোভে নিরুত্তর হইয়া থাকি।

যদিও কাপড়ের উপর মানুষ নির্ভর করে না, মানুষের উপর কাপড় নির্ভর করে; এবং সে হিসাবে মোটা ধুতি চাদর লেশমাত্র লজ্জাকর নহে। বিদ্যাসাগর, একা বিদ্যাসাগর নহেন, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মোটা চাদরধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত গৌরবে গাম্ভীর্যে কোর্তাগ্রস্ত কোনো বিলাতফেরতই তুলনীয় হইতে পারেন না। যে ব্রাহ্মণেরা এককালে ভারতবর্ষকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বসনের একান্ত বিরলতা জগদ্‌বিখ্যাত। কিন্তু সে-সকল তর্ক তুলিতে চাহি না। কারণ সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তনের একেবারে বিপরীতমুখে চলিতে গেলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলাদেশে যেভাবে ধুতি চাদর পরা হয়, তাহা আধুনিক কাজকর্ম এবং আপিস-আদালতের উপযোগী নয়। কিন্তু আচকান-চাপকানের প্রতি সে দোষারোপ করা যায় না।

সাহেবী বেশধারীরা বলেন, ওটাও তো বিদেশী সাজ। বলেন বটে, কিন্তু সে একটা জেদের তর্ক মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বলিয়া চাপকান তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, সাহেব সাজিবার একটা কোনো বিশেষ প্রলোভন আছে বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন।

কারণ যদি চাপকান এবং কোট দুটোই তাঁহার নিকট সমান নূতন হইত, যদি তাঁহাকে আপিসে প্রবেশ ও রেলগাড়িতে পদার্পণ করিবার দিন দুটোর মধ্যে একটা প্রথম বাছিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে এ-সকল তর্কের উত্থাপন হইতে পারিত। চাপকান তাঁহার গায়েই ছিল, তিনি সেটা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়া যেদিন কালো কুর্তির মধ্যে প্রবেশপূর্বক গলায় টাই বাঁধিলেন, সেদিন আনন্দে এবং গৌরবে এ তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও-চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তোলাও সহজ নহে, কারণ চাপকানের ইতিবৃত্ত ঠিক তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কেননা মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দুমুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে-সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে। এখনো পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন রাজাধিকারে চাপকানের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়; সে বৈচিত্র্যে যে একমাত্র মুসলমানের কর্তৃত্ব তাহা নহে, তাহার মধ্যে হিন্দুরও স্বাধীনতা আছে।

যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয়জাতীয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।

তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য,

গীত, এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।

অতএব এই মিশ্রণের মধ্যে চাপকানের খাঁটি মুসলমানত্ব যিনি গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাকে এই কথা বলিতে হয় যে, তোমার যখন গায়ের এতই জোর, তখন কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া ঐ গায়ের জোরেই হ্যাটকোট অবলম্বন করো; আমরা মনের আক্ষেপ নীরবে মনের মধ্যে পরিপাক করি।

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেইদিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দুমুসলমানের বেশ।

যদি সত্য হয়, চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্ভাবিত সজ্জা, তথাপি এ কথা যখন স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণাপ্রতাপ রণজিৎ সিংহ এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তখন মিস্টার ঘোষ-বোস-মিত্র, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের এ বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে, চাপকান পায়জামা দেখিতে অতি কুশ্রী। তর্ক যখন এইখানে আসিয়া ঠেকে তখন মানে মানে চুপ করিয়া যাওয়া শ্রেয়। কারণ রুচির তর্কের, শেষকালে প্রায় বাহুবলে আসিয়াই মীমাংসা হয়।

১৩০৫

নকলের নাকাল

ইংরেজিতে একটি বচন আছে, সাব্‌লাইম হইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে। সংস্কৃত অলংকারে অদ্ভুতরস ইংরেজি সাব্‌লিমিটির প্রতিশব্দ। কিন্তু অদ্ভুত দুই রকমেরই আছে—হাস্যকর অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত।

দুইদিনের জন্য দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র দেখা গেল। একদিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ, আর-একদিকে বিলাতি-কাপড়-পরা বাঙালি। সাব্‌লাইম এবং হাস্যকর একেবারে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন।

ইংরেজি কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে কথা আমি বলি না—বাঙালির ইংরেজি কাপড় পরাটাই যে হাস্যকর, সে প্রসঙ্গও আমি তুলিতে চাহি না। কিন্তু বাঙালির গায়ে বিসদৃশ রকমের বিলাতি কাপড় যদি করুণরসাত্মক না হয়, তবে নিঃসন্দেহই হাস্যকর। আশা করি, এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইবে না।

হয়তো কাপড় একরকমের, টুপি একরকমের, হয়তো কলার আছে টাই নাই, হয়তো যে-রঙটা ইংরেজের চক্ষে বিভীষিকা সেই রঙের কুর্তি; হয়তো যে-অঙ্গাবরণকে ঘরের বাহিরে ইংরেজ বিবসন বলিয়া গণ্য করে, সেই অসংগত অঙ্গচ্ছেদ। এমনতরো অজ্ঞানকৃত সং-সজ্জা কেন।

যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোঁচা দিয়া কোনো ইংরেজ বাঙালিটোলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা করিতে পারে না। আমাদের যে বাঙালি ভ্রাতারা অদ্ভুত বিলাতি সাজ

পরিয়া গিরিরাজের রাজসভায় ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিয়া ইংরেজ দর্শকের কৌতুকবিধান করিয়া থাকেন।

বেচারা কী আর করিবে। ইংরেজ-দস্তুর সে জানিবে কী করিয়া। যে বিলাতফেরত বাঙালি দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের এই বেশবিভ্রমে তিনিই সব চেয়ে লজ্জাবোধ করেন। তিনিই সব চেয়ে তীব্রস্বরে বলিয়া থাকেন, যদি না জানে তবে পরে কেন। আমাদের শুদ্ধ ইংরেজের কাছে অপদস্থ করে।

না পরিবে কেন। তুমি যদি পর, এবং পরিয়া দেশীপরিচ্ছদধারীর চেয়ে নিজেকে বড়ো মনে কর, তবে সে-গর্ব হইতে সেই-বা বঞ্চিত হইবে কেন। তোমার যদি মত হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোশাকই গ্রাহ্য, তবে দলপুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

তুমি বলিবে, বিলাতি সাজ পরিতে চাও পরো, কিন্তু কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা অভদ্র কোন্‌টা সংগত কোন্‌টা অদ্ভুত, সে খবরটা লও।

কিন্তু সে কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। যাহারা ইংরেজিসমাজে নাই, যাহাদের আত্মীয়স্বজন বাঙালি, তাহারা ইংরেজি-দস্তুরের আদর্শ কোথায় পাইবে।

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা র‍্যাঙ্কিন-হার্মানের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মসমর্পণ করে, এবং বড়ো বড়ো চেকে সই করিয়া দেয়, মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করে, নিশ্চয়ই আর কিছু না হউক আমাকে দেখিয়া অন্তত ভদ্র ফিরিঙ্গি বলিয়া লোকে আন্দাজ করিবে—ইংরেজি কায়দা জানে না, এমন মূর্খাকর অপবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু পনেরো-আনা বাঙালিরই অর্থাভাব, এবং চাঁদনিই তাহাদের বাঙালি সজ্জার চরম মোক্ষস্থান। অতএব উল্টা-পাল্টা ভুলচুক হইতেই হইবে। এমন স্থলে পরের সাজ পরিতে গেলে, অধিকাংশ লোকেরই সং-সাজা বৈ গতি নাই।

স্বজাতিকে কেন এমন করিয়া অপদস্থ করা। এমন কাজ কেন কর, যাহার দৃষ্টান্তে দেশের লোক হাস্যকর হইয়া উঠে। দুই-চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিতেও পারে, কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না, কারণ ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই, এমন অবস্থায় সমস্ত কাকসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সংবরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা হইতে, ইংরেজিয়ানার এই বিকার হইতে, স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কি সক্ষম নকলকারীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে পারি না, কারণ, তাঁহারা সক্ষম, আর-সকলে অক্ষম। এমন-কি, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাও অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহারা যখন ফিরিঙ্গি-লীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আবর্জনার মতো পড়িয়া থাকিবে, তখন কি র‍্যাঙ্কিনবিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে।

দরিদ্র কোনোমতেই পরের নকল ভদ্ররকমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহাকে নকল করিতে হইবে, সর্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়, দরিদ্রের পক্ষে সেইটেই সর্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে-অবস্থায় নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাঙালির পক্ষে খাটো ধুতি পরা লজ্জাকর নহে, কিন্তু খাটো প্যান্টলুন পরা লজ্জাজনক। কারণ, খাটো প্যান্টলুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝায় না, তাহাতে পর সাজিবার যে-চেষ্টা যে-স্পর্ধা প্রকাশ পায়, তাহা দারিদ্র্যের সহিত কিছুতেই সুসংগত নহে।

আজকাল ইংরেজি সাজ কিরূপ চলতি হইয়া আসিতেছে, এবং যতই চলতি হইতেছে ততই তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে, দার্জিলিঙের মতো জায়গায় আসিলে অল্পকালের মধ্যেই তাহা অনুভব করা যায়। বাঙালির দুরদৃষ্ট বাঙালিকে অনেক দুঃখ দিয়াছে—পেটে প্লীহা, হাড়ের

মধ্যে ম্যালেরিয়া, দেহে কৃশতা, চর্মে কালিমা, ভাণ্ডারে দৈন্য; অবশেষে তাহাকে কি অদ্ভুত সাজে সাজাইয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিবে। চিত্তদৌর্বল্যে যখন হাস্যকর করিয়া তোলে, তখন ধরণী দ্বিধা হওয়া ছাড়া লজ্জানিবারণের আর উপায় থাকে না।

আচারব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মতো, তাহাকে উপড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতি বেশভূষা-আদবকায়দার মাটি এখানে কোথায়। সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে। ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আমদানি করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্ন-সচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনোমতে খাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে কেবল দুই-চারিজন শৌখিনের দ্বারাই সাধ্য।

যাহাকে পালন করিতে, সজীব রাখিতে পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলাদেশেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্তন হইবে না। যেখানে যাহা আছে, চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে।

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তিস্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অতএব রেলওয়ে-ভ্রমণের জন্য, আপিসে বাহির হইবার জন্য, নূতন প্রয়োজনের জন্য ছাঁটা-কাটা কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্বাপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত করো। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ ভাববিরুদ্ধ সংগতিবিরুদ্ধ অনুকরণের প্রতি হতবুদ্ধির ন্যায় ধাবিত হইয়ো না।

পুরাতনের পরিবর্তন ও নূতনের নির্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতিকেই সর্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনোই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয়তো একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বাহুল্য। তাহার ছাঁটা কোর্তা হয়তো দৌড়ধাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েস্টকোট হয়তো অনাবশ্যক এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয়তো খপ্‌ করিয়া মাথায় পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই-কলার বাঁধিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

যেখানে পরিবর্তন ও নূতন নির্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত, সেইখানেই অনুকরণ মার্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে কথা কোনোক্রমেই খাটে না।

বিশেষত বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না, তাহাতে ভদ্রাভদ্র, দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরেজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরেজ জানে। আমাদের ভদ্রলোকদের অধিকাংশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। জানিতে গেলেও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি-বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার জন্যই বিলাতি কাপড়ের প্রয়োজন হয়।

এ কথা বলিতে যাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। পরের বাড়িতে ছদ্মবেশে সম্বন্ধী সাজিয়া গেলে আদর পাওয়া যাইতে পারে, তবু যাহার কিছুমাত্র তেজ ও ভদ্রতাজ্ঞান আছে, সেই আদরকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে। রেলওয়ের ফিরিঙ্গি গার্ড ফিরিঙ্গি-ভ্রাতা মনে করিয়া যে আদর করে তাহার প্রলোভন সংবরণ করাই ভালো। কোনো কোনো রেল-লাইনে দেশী-বিলাতির স্বতন্ত্র গাড়ি আছে, কোনো কোনো হোটেলে দেশী লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না, সেজন্য রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে তবে সে কষ্ট স্বীকার করো, কিন্তু

জন্ম ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলে সম্মানের যে কী বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন।

পরিবর্তন কোন্ পর্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে।

যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

মোজা পরিলে কোট পরা অনিবার্য হয় না, ধুতির সঙ্গে মোজা বিকল্পে চলিয়া যায়। কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না। সাধু ইংরেজিভাষার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসি মিশাল চলে, তাহা ইংরেজি-পাঠকেরা জানেন। কিন্তু কী-পর্যন্ত চলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে, সে নিয়ম বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শেখানো বাহুল্য। তথাপি তার্কিক বলিতে পারে, তুমি যদি অতটা দূরে গেলে, আমি নাহয় আরও কিছুদূর গেলাম, কে আমাকে নিবারণ করিবে। সে তো ঠিক কথা। তোমার রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না করে, তবে কাহার পিতৃপুরুষের সাধ্য তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখে।

বেশভূষাতেও সেই তর্ক চলে। যিনি আগাগোড়া বিলাতি ধরিয়াছেন তিনি সমালোচককে বলেন, তুমি কেন চাপকানের সঙ্গে প্যান্টলুন পরিয়াছ। অবশেষে তর্কটা ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়ায়।

সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অন্যায় হইয়া থাকে, নিন্দা করো, সংশোধন করো, প্যান্টলুনের পরিবর্তে অন্য কোনোপ্রকার পায়জামা যদি কার্যকর ও সুসংগত হয় তবে তাহার প্রবর্তন করো—তাই বলিয়া তুমি আগাগোড়া দেশীবস্ত্র পরিহার করিবে কেন। একজন এক কান কাটিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খামকা দুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহার বাহাদুরিটা কোথায় বুঝিতে পারি না।

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে তাহার সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলির পরে পরস্পর আপসে সীমানা পাকা হইয়া আসে। সেই অনিবার্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পুরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

কারণ, আলস্য সংক্রামক। পরের তৈরি জিনিসের লোভে নিজের সমস্ত চেষ্টা বিসর্জন দিবার নজির পাইলে, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভুলিয়া যায়, পরের জিনিস কখনোই আপনার করা যায় না। ভুলিয়া যায়, পরের কাপড় পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

জড়ত্ব যাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম। আজ যদি বলি, কে অত ভাবে, তার চেয়ে বিলিতি দোকানে গিয়া একসুট অর্ডার দিয়া আসি—তবে কাল বলিব, প্যান্টলুনটা খাটো হইয়া গেছে, কে এত হাঙ্গাম করে, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে।

কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালি-সমাজে বিলাতি কাপড়ের অসংগতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাতফেরতদের মধ্যেও বিলিতি সাজ সম্বন্ধে ঢিলাভাব দেখা যায়; সস্তার চেষ্টায় বা আলস্যের গতিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশবিন্যাস করেন, যাহা বিধিমত অভদ্র।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে বাঙালিভদ্রলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতি ভদ্রতার নিয়মে নিমন্ত্রণসাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজ্জা সম্বন্ধে কোন্‌টা বিহিত, কোন্‌টা অবিহিত, সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অতীত হইয়া যাইতেছেন। ইংরেজি সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে ফিরিতে পান না। দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন—সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান নিজের বিধান, সুবিধার বিধান; সে বিধানে

আলস্য-ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই-সকল ছাড়া-কাপড় ইঁহাদের পরপুরুষের গাত্রে কিরূপ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচারব্যবহারে এ-সকল কথা আরও অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচারব্যবহারকে সদাচার-সদ্ব্যবহারের সীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে। যে-ইংরেজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা বলপূর্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলিতে পারে, বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে, তাহার পরে চলিবে কিসে।

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসমাজের ত্যাজ্যপুত্র, এবং চেষ্টাসত্ত্বেও পরসমাজের পোষ্যপুত্র নহেন, তাঁহারা স্বভাবতই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া সুখটুকু লইবারই চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে।

ইঁহাদের একরকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা কী করিবে, এবং যাহারা নকলের নকল করে, তাহাদের কী দুরবস্থা হইবে।

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতি-সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালি-সাহেব কেবলমাত্র ধনসম্পদ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির ঊর্ধ্বে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবের পুত্রটি সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতনলব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই। তখন সে কে।

কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না, ইহা নিশ্চয়, এবং যে-দুর্বলচিত্তগণ ইঁহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই।

যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপে গৌরব অনুভব করিতে বসিলে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া। যিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ববোধ করেন তিনি বস্তুত সাহেবির অনুকরণ করিতেছেন। সাহেবির অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব। যদি সাহেবের অনুকরণ করিবার শক্তি তাঁহার থাকিত, তবে সাহেবির অনুকরণ কখনোই করিতেন না। অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অন্য কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লম্ফঝম্ফ না করাই শ্রেয়।

১৩০৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কেবল দেখলুম, জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লামেন্ট চলছে— সকলেই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

দেখে আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে বিস্ময়-সহকারে বলে— হাঁ, এরাই রাজার জাত বটে। আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চন দারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও মানুষের শক্তি আপন পেশী ও স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে খেটে মরছে।

জাহাজে বসে ভাবতুম এই যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ-বা বিশ্রামসুখে, কেউ-বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত; কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে সংক্ষিপ্ত করছে সেখানে কী অসহ্য চেষ্টা, কী দুঃসাধ্য পরিশ্রম, মানবজীবনের কী নির্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চলেছে। কিন্তু কী করা যাবে। আমাদের মানব-রাজা চলেছেন; কোথাও তিনি থামতে চান না; অনর্থক কাল নষ্ট কিংবা পথকষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে কেবলমাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে, যেমন ঐশ্বর্যে থাকেন পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চান না। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত, ভোজনশালা সংগীতমণ্ডপ সুসজ্জিত স্বর্ণচিত্রিত শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহারকালে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্যে কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালায় গৃহে সর্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশদিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে। তিনি মুহূর্ত-কালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সংবৎসরকাল চেষ্টা চলছে।

এ-রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার শৌখিনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্বহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood-রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপসংগীত।

খুব সম্ভব দুর্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামিড অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেক-গুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয়, এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্যও অপূর্ব চমৎকার, তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারও চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসাব জমা হচ্ছে। প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায়, তাহলে সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ক্রমশ ধ্বংস করে ফেলে।

স্মরণ হচ্ছে য়ুরোপের কোনো এক বড়োলোক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেছেন যে এক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক, কিন্তু আশ্চর্য কী। কারণ আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে রয়েছে, কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে বিপদ সেইখানে বসে গোপনে বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি। মানব-নবাবের নবাবি যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈশান কোণ থেকেই ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।

এইসঙ্গে আর-একটা কথা মনে হয়; যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোনো কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা, কিন্তু বাহির হতে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয়, য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে-পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে-পরিমাণে আকর্ষণ করে আনতে পারছে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাববৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকাসংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে চলতে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না। স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পাত্রের অপেক্ষায় কুমারী দীর্ঘকাল বসে থাকে, স্বামী কার্যোপলক্ষে চলে যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকাসংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজনিয়ম তার প্রতিকূলতা করছে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্তির যে-চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এই রকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাইহিলিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে আপাতত আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে য়ুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়মূর্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, অসমর্থ পুরুষই বল আর অবলা রমণীই বল, দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ-সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবলই গতি চাই; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এইজন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে, আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয়, আমাদের বলও আছে। অতএব ‘আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে’। হায়, আমরা ইংরেজ-শাসিত বাঙালিরাও সেইভাবেই বলছি ‘নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে’।

এই তো অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলন্ডে আমাদের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ হয়, তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্ছে বলে মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরেজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে কথাটি কবার জো নেই। ইংরেজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়ে ঝুড়ে ধুয়ে নিংড়ে ভাঁজ করে পাট করে ইস্ত্রি করে নিজের বাক্সর মধ্যে পুরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে আছে। আমরা ইংরেজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি; যদি কোনো কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার, নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর অবজ্ঞাবিহীন অনুকূল প্রসন্নভাবের। আমরা উপকার অনেক পাই, কিন্তু দয়া কিছুই পাই নে। অতএব যখন এই দুর্লভ করুণার অস্থানে অপব্যয় দেখি, তখন ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা পরে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো-বা ভালোবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে; কিন্তু রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ

সন্তান পৃথিবীর সর্বত্রই আছে; বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংলন্ডেও তার অভাব নেই। যা হোক, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখী আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন।

পরস্পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতই অত্যন্ত ভুল করে থাকেন। মৎস্য যদি উত্তরোত্তর সভ্যতার বিকাশে সহসা মানবহিতৈষী হয়ে ওঠে, তা হলে সমস্ত মানবজাতিকে একটা শৈবালবহুল গভীর সরোবরের মধ্যে নিমগ্ন না করে কিছুতে কি তার করুণ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দূর হয়। তোমরা বাহিরে সুখী আমরা গৃহে সুখী, এখন আমাদের সুখ তোমাদের বোঝাই কী করে।

একজন লেডি-ডফারিন্‌-স্ত্রী-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে, অপরিচ্ছন্ন ছোটো কুঠরি—ছোটো ছোটো জানলা, বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্টস্টুডিয়োর রং-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রে দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন—তখন সে মনে করে কী সর্বনাশ, কী ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কী স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে। জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রস্কিন পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হলে অভিমানিনী সহধর্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি।

কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু আমরা নিতান্ত অধম নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই বললেই হয়, কিন্তু তবুও তো আমাদের দয়ামায়া ভালোবাসা আছে। তক্তপোশের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় এক হাতে তাকিয়া আঁকড়ে ধরে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও তো অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই; ভাঙা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে থাকি, তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদেরই মতো বিশ্বাসবিহীন হয়ে আসছে।

আমরাও আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারি নে। কৌচ কেদারা খেলাধুলা তোমরা এত ভালোবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও তোমাদের বেশ চলে যায়। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে ভালোবাসা; আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহজীবনে কিছুতেই আর আরামের জোগাড় হয়ে ওঠে না।

অতএব আমরা যখন বলি, আমরা যে বিবাহ করে থাকি সেটা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ রেখে পারত্রিক মুক্তিসাধনের জন্য, কথাটা খুব জাঁকালো শুনতে হয় কিন্তু তবু সেটা মুখের কথা মাত্র, এবং তার প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের বর্তমান সমাজ পরিত্যাগ করে প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে প্রবেশপূর্বক ব্যস্তভাবে গবেষণা করে বেড়াতে হয়। প্রকৃত সত্য কথাটা হচ্ছে, ও না হলে আমাদের চলে না, আমরা থাকতে পারি নে। আমরা শুশুকের মতো কর্মতরঙ্গের মধ্যে দিগ্‌বাজি খেলে বেড়াই বটে, কিন্তু চট করে অমনি যখন-তখন অন্তঃপুরের মধ্যে হুস করে হাঁফ ছেড়ে না এলে আমরা বাঁচি নে। যিনি যা-ই বলুন, সেটা পারলৌকিক সদ্গতির জন্যে নয়।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভালো হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, সে-কথা এখানে বিচার্য নয়, সে-কথা নিয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যে রকম গঠন, তাতে সমাজের ভালোমন্দ যা-ই হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে। ইংরেজেরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।

আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব। এইজন্যে একজন ইংরেজ-মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্যহৃদয় ক্রমশ নীরস হয়ে আসে, কেবল কুকুরশাবক পালন ক'রে এবং সাধারণ-হিতার্থে সভা পোষণ ক'রে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করে। যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সঞ্চিত স্তন্য কৃত্রিম উপায়ে নিষ্ক্রান্ত করে দেওয়া তার স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, তেমনি য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারী-হৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদের আত্মার প্রকৃত পরিতৃপ্তি হতে পারে না।

ইংরেজ old maid-এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবার তুলনা বোধ হয় অন্যায় হয় না। সংখ্যায় বোধ করি ইংরেজ কুমারী এবং আমাদের বালবিধবা সমান হবে কিংবা কিছু যদি কমবেশ হয়। বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী, কখনো দুহিতা, কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সামনে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহু-কালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্বন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো-একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনবার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোটো ছোটো ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্‌বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, তোমাদের যে-সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো একটা কুকুরশাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে করে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুর-চারিণীরা অসুখী, এ কথা আমার মনে লয় না। ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির মধ্যে অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।

আমরা আর যা-ই হই, আমরা গৃহস্থ জাতি; অতএব বিচার করে দেখতে গেলে, আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি; তাঁরাই আমাদের সর্বদা বহু যত্ন আদর করে রেখে দিয়েছেন। এমনই আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু-দিন টিঁকতে পারি নে; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে করে নারীরা অসুখী হয় না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁদের শরীরমনের সুখসাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন-কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করানোকে আমাদের দেশের পরিহাস-রসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন; কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায়, আমাদের স্ত্রীকন্যারা সর্বদাই বিভীষিকারাজ্যে বাস করছেন না এবং তাঁরা সুখী।

তাঁদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত। আমরা কি একরকম কাঁচা-পাকা জোড়া-তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই। আমাদের কি পর্যবেক্ষণশক্তির, বিচারশক্তি এবং ধারণাশক্তির বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে। আমরা কি সর্বদাই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে ফেলি নে, এবং অন্ধসংস্কার

কি আমাদের যুক্তিরাজ্যসিংহাসনের অর্ধেক অধিকার করে সর্বদাই অটল এবং দাম্ভিকভাবে বসে থাকে না। আমাদের এইরকম দুর্বল শিক্ষা এবং দুর্বল চরিত্রের জন্য সর্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসংগতি দেখা যায় না। আমাদের বাঙালিদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি একপ্রকার শৃঙ্খলাসংযমহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না।

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখতে শিখি নি, ভাবতে শিখি নি, কাজ করতে শিখি নি, সেইজন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই—আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মতো মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মতো ঝরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেইজন্যে আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের ‘এসে’-র মতো, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে, জীবনের ব্যবহারের জন্যে নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা তো আমাদের স্ত্রীলোকদের কতই বা শিক্ষা হবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের যে-অন্তরের স্থান অধিকার করে থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও তাই দেখা যায়। অতএব আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশলাভের পূর্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তা হলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বলতেই হয় ইংরেজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণ-স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হতেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনই অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে, নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারও কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেকগুলায় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব করে রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মতো হয়ে যায়, তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোনো-একজনের মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে এ দেশে জাতি হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মে নি—পরিবারকেই আমরা সংসার বলে থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর-এক কাণ্ড দেখা যাচ্ছে। য়ুরোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল ব'লে তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিংবা মানবহিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি আরেক দিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্ছেন; একদিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর-এক দিকেও তেমনি বাধাবিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার বাড়ছে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়ছে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্ধেক, ইংরেজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্ধাঙ্গ; আমরা বলি সন্তানে গৃহ পরিবৃত না হলে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরেজ বলেন আসবাব অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনই প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার জো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এ দেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সর্বাগ্রেই জুড়ি গাড়ি এবং বড়ো বাড়ির আবশ্যক; এইজন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাদর প'রে পালকি অবলম্বনপূর্বক যাতায়াত করেন তাতে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার

যদি গাড়ি ঘোড়া ঘড়ি ঘড়ির চেনকে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক-সুশ্রুত-ধন্বন্তরীর সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সূত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্বদাই আমাদের কর্তা হয়ে উঠে। এইজন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল ক'রে মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শন-স্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য দেখা দেয়, অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেইরকম প্রবল নদী বলে এক-একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন-সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতিবর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে। আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ ক'রে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘন শৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে; গৃহ, যা মানুষের স্নেহপ্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চিরউৎসভূমি, পৃথিবীর আর সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক, স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেইখানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে ফেলছে, হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠছে।

নতুবা যে-সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল, সে-সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্‌-নামক অত-বড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়। সোশ্যালিজম কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে। যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী সার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনি সন্ধ্যাবেলায় এই শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।

যা হোক, আমার মতো অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের তত্ত্ব নেওয়ার মতো হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে-কোনো অনুমানই ব্যক্ত করি-না কেন, তার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে, ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড-পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ-সকল কথা যিনি যে-ভাবেই নিন আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে-কথাটা বলছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে আমার বোধ হয় না।

যে-দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে; যে যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, easy chair-টি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, চুরটের পাইপটি, এবং জুয়াখেলবার ক্লাবটি নিয়ে নির্বিঘ্ন আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙে গেছে। পূর্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ ক'রে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞী-মক্ষিকারা কর্তৃত্ব করতেন, এখন স্বার্থপরগণ যে-যার নিজের নিজের চাক ভাড়া ক'রে সকালে মধু উপার্জনপূর্বক সন্ধ্যাপর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানী-মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধুদান এবং মধুপান করবার আর সময় নেই। বর্তমান অবস্থা এখনো তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে যায় নি, এইজন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে তাঁরা ইতস্তত ভন্‌ ভন্‌ করে বেড়াচ্ছেন। আমরা আমাদের মহারানীদের রাজত্বে বেশ আছি এবং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুর অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক সমাজের মর্মস্থানটি অধিকার করে সকল কটিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

কিন্তু সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটছে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে

আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেইসঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাপরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর-এক জনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এইজন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওআটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এইজন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারও বক্তৃতায় নয়, কর্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশ করে সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সংবরণ করে পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব, আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে-আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই-না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরেজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলন্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, বাইবেল্ যদিও বহুকাল হতে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ আপন অসহিষ্ণু দুর্দান্ত ভাব রক্ষা করে এসেছে, বাইবেলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনো তাদের অন্তরকে গলাতে পারে নি।

আমার তো বোধ হয় য়ুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, য়ুরোপ বাল্যকাল হতে এমন একটি শিক্ষা পাচ্ছে যা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার এনে দিচ্ছে, এবং সর্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্ত্বের পথে জাগ্রত করে রাখছে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত তা হলে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হত না। তা হলে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাকত না, তা হলে একই উদারক্ষেত্রে এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না। খৃস্টধর্ম সর্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত্য, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে রেখেছে।

খৃস্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করছে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না। য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবেল সহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের হৃদয়ে স্থান লাভ করে সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য বিকাশ করেছে; উপদেশের দ্বারায় নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে-শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এইজন্যে আশা করছি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, নবজীবনহিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

কেহ কেহ বলেন য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনো প্রকৃত ভালো কখনোই পরস্পরের প্রতিযোগী নয় তারা সহযোগী। অবস্থাবশত আমরা কেহ একটাকে কেহ আর-একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে দেওয়া যায় না। এমন-কি, সকল ভালোর মধ্যেই এমন একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে, একজনকে দূর করলেই আর-একজন দুর্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশ আপনার গতি বন্ধ ক'রে সংসারপথপার্শ্বে একস্থানে স্থিতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতির চূড়ান্ত পরিণাম বলে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিংবা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তা হলে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পারে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ করেই আমি বাঁচব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভূমি থেকে আমাকে ক্রমশই আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, অতএব আমরা নব্যতরুসম্প্রদায়েরা একটা সভা করে এই সততচঞ্চল পরিবর্তনশীল রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পরিহারপূর্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভূমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব।

কিংবা সে এমন তর্কও করতে পারে যে, ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল, হেয় এবং নিম্নবর্তী, অতএব তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতক পক্ষীর মতো কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাকব— দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষের পক্ষে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনই বর্তমান কালে যাঁরা বলেন আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে বসে থাকব, কিংবা যাঁরা বলেন, হঠাৎ-শিক্ষার বলে আমরা আতশবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করছেন।

কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচব না এবং যে-ইংরেজিশিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে নিতেই হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো-একটা বজ্রও পড়তে পারে এবং কেবলই যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়। তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করছে।

অতএব ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের কী হবে। আমরা ইংরেজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব, তবে এখন যেমন 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিংবা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষণীয় বলে ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব-পশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে-সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিংবা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে। আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক-জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থসামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ-আইডিয়ালটা আশানুরূপ উচ্চ না মনে হতেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সংগত বোধ হয়। এমন-কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট কিংবা পিরামিড আইডিয়াল নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে তোলা যায় তাকে আকৃতির উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনি মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যরহিত একটা হঠাৎ গগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সম্যক স্ফূর্তি সাধন করে আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আমরা গৃহকোণে বসে রুদ্র আর্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিশ গণ্ডা দুই পাইকে একঘরে করে কল্পনা করি পৃথিবীর মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক; পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানি নে; এবং যদি থাকে তো কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে আছে তাও বলতে পারি নে; আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখি নে, সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে রেখে দিই কোথাও-না-কোথাও আছে, নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক, বর্তমানের মধ্যেই হোক আর অতীতের মধ্যেই হোক, অর্থাৎ আছেই হোক আর ছিলই হোক, ও একই কথা।

ধনীর ছেলে যেমন মনে করে আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোনো আবশ্যক নেই, এমন-কি, চাকরি-পিপাসুদের মতো কলেজে পাস দেওয়া আমার বংশমর্যাদার হানিজনক তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে বিশেষ বড়ো, অতএব আমাদের আর-কিছু না করলেও চলে এমন-কি, কিছু না করাই কর্তব্য।

এ দিকে হয়তো আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয়তো তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই কেবল এই কীটদষ্ট চেকবইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র অপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ঐ বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড়ো বড়ো অঙ্কপাত-পূর্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরি ক'রে সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

অতএব আপাতত আমাদের কোনো বিশেষ মহত্ত্বে কাজ নেই। আমরা যে-ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর করে আমরা যদি পুরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা কুর্তি পরে চতুর্দিকে লড়াই করে করে বেড়াই কিংবা আধ্যাত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিংবা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে রেখে দিই সে পরের কথা।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্ছি। এখনো আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান; তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মতো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে; কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য আশ্রয়টি উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশাভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

১২৯৮

অযোগ্য ভক্তি

ইষ্টি আর পুরোহিত
যাহা হতে সর্বস্থিত
তারা যদি আসে বাড়ি-'পরে,
শুধু হাতে প্রণামেতে
ভার হয়ে যান তাতে
মুখে হাসি অন্তরে বেজার।
তিন টাকা নগদে দিলে
চরণ তুলি মাথা-'পরে,
প্রসন্ন বদনে দেন বর।

উল্লিখিত শ্লোক তিনটি টাকা সম্বন্ধীয় একটি ছড়া হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার ছন্দ মিল এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো জবাবদিহি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই।

কেবল দেখিবার বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে যে-সত্যটুকু বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

টাকার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা তাহারই অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমাদের অখ্যাতনামা কবি উপরের দৃষ্টান্তটিও নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্তে টাকার ক্ষমতা অপেক্ষা মানুষের মনের সেই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে যাহার প্রভাবে সে একই সময়ে একই লোককে যুগপৎ ভক্তি এবং অশ্রদ্ধা করিতে পারে।

সাধারণত গুরুপুরোহিত যে সাধুপুরুষ নহেন, সামান্য বৈষয়িকদের মতো পয়সার প্রতি তাঁহার যে বিলক্ষণ লোভ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই, তথাপি তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি কেননা গুরুব্রহ্ম এরূপ ভক্তিদ্বারা আমরা যে নিজেকে অপমানিত করি, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করাই যে আত্মসম্মান এ কথা আমরা মনেই করি না।

কিন্তু অন্ধ ভক্তি অন্ধ মানুষের মতো অভ্যাসের পথ দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়; সকল দেশেই ইহার নজির আছে। বিলাতে একজন লর্ডের ছেলে সর্বতোভাবে অপদার্থ হইলেও অতি সহজেই যোগ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যাহাকে অনেকদিন অনেকে পূজা করিয়া আসিতেছে তাহাকে ভক্তি করিবার জন্য কোনো ভক্তিজনক গুণ বা ক্ষমতাবিচারের প্রয়োজনই হয় না। এমন-কি, সে-স্থলে অভক্তির প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও তাহার পদমূলে অর্ঘ্য আপনি আসিয়া আকৃষ্ট হয়।

এইরূপ আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম আছে। সেই কারণে আমাদের মন অভ্যাসের গড়ানো পথে মোহের আকর্ষণে আপনিই পাথরের মতো গড়াইয়া পড়ে, যুক্তি তাহার মাঝখানে বাধা দিতে আসিলে যুক্তি চূর্ণ হইয়া যায়।

সভ্যতার মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে; যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের পর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়, যাহা এইরূপে ক্রমশই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড়বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

এই অশ্রান্ত সভ্যতাশক্তির উত্তেজনাতেই য়ুরোপখণ্ডে ভক্তিবৃত্তির জড়ত্বকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। ইংরেজ একজন লর্ডকে সুদ্ধমাত্র লর্ড বলিয়াই বিশেষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না এবং সেইসঙ্গে এইরূপ অযোগ্য ভক্তিকে 'স্নবিশনেস'

বলিয়া লাঞ্ছিত করে। ক্রমশ ইহার ফল দুই দিকেই ফলে—অর্থাৎ আভিজাত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অসংগত ভক্তি শিথিল হয় এবং অভিজাতগণও এই বরাদ্দ ভক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোনো নিন্দনীয় কাজ করিতে সাহস করেন না।

এই শক্তির বলে অন্ধ রাজভক্তির মোহপাশ ছেদন করিয়া য়ুরোপ কেমন করিয়া আপনি রাজা হইয়া উঠিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। পুরোহিতের প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধেও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিদ্রোহী শক্তি কাজ করিতেছে।

জনসমাজের স্বাধীন ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি য়ুরোপে টাকার থলি একটা পূজার বেদী অধিকার করিবার উপক্রম করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে তাহা সর্বদা উপহসিত। কার্লাইল প্রভৃতি মনস্বীগণ ইহার বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছেন।

যে ক্ষমতার কাছে মস্তক নত করিলে মস্তকের অপমান হয়, যেমন টাকা, পদবি, গায়ের জোর এবং অমূলক প্রথা—যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি নিষ্ফলা হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার না ঘটিয়া কেবল সংকোচ ঘটে তাহার দুর্দান্ত শাসন হইতে মনকে স্বাধীন ও ভক্তিকে মুক্ত করা মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রধান সাধনা।

ভক্তির দ্বারা যে-বিনতি আনয়ন করে সে-বিনতি সকল ক্ষেত্রেই শোভন নহে। এই বিনতি, কেবল গ্রহণ করিবার শিক্ষা করিবার, মাহাত্ম্যপ্রভাবের নিকট আপনার প্রকৃতিকে সাষ্টাঙ্গে অনুকূল করিবার জন্য। কিন্তু অমূলক বিনতি, অস্থানে বিনতি সেই কারণেই দুর্গতি আনয়ন করে। তাহা হীনকে ভক্তি করিয়া হীনতা লাভ করে, তাহা অযোগ্যের নিকট নত হইয়া অযোগ্যতার জন্য আপনাকে অনুকূল করিয়া রাখে।

ভক্তি আমাদিগকে ভক্তিভাজনের আদর্শের প্রতি স্বতঃ আকর্ষণ করে বলিয়াই সজীব সভ্যসমাজে কতকগুলি কঠিন বিচার প্রচলিত আছে। সেখানে যে-লোকের এমন কোনো ক্ষমতা আছে যাহা সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহাকে সমাজ সকল বিষয়েই নিষ্কলঙ্ক হইতে প্রত্যাশা করে। যে লোক রাজনীতিতে শ্রদ্ধেয় সে লোক ধর্মনীতিতে হেয় হইলে সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশি নিন্দনীয় হইতে হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যায় আছে। কারণ, ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না, রাষ্ট্রনীতিতে যাহার বিচক্ষণতা, তাহার ক্ষমতা এবং চরিত্রের অপর অংশ সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে উন্নত হইবেই এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, অতএব সাধারণ লোককে যে-আদর্শে বিচার করি, রাষ্ট্রনীতিতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনীতি ব্যতীত অন্য অংশে সেই আদর্শে বিচার করাই উচিত। কিন্তু সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবিচার করিতে বাধ্য।

কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তির দ্বারা মন গ্রহণ করিবার অনুকূল অবস্থায় উপনীত হয়। এক অংশ লইব এবং অপর অংশ লইব না এমন বিচারশক্তি তখন তাহার থাকে না। কোনো সূত্রে যে-লোক আমার ভক্তি আকর্ষণ করে, অলক্ষে, নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাহার অনুকরণ করিতে থাকি। ভক্তির ধর্মই এই।

কিন্তু যে-বিষয়ে কোনো লোক অসাধারণ, ঠিক সেই বিষয়েই সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য। সুতরাং যে-অংশে সে সাধারণ লোকের অপেক্ষা উচ্চ নহে, এমন-কি, যে-অংশে তাহার দুর্বলতা, সেই অংশেরই অনুকরণ দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত এবং সফল হইয়া উঠে। এইজন্য যে-লোক এক বিষয়ে মহৎ সে-লোক অন্য বিষয়ে হীন হইলে সমাজ প্রথমত তাহার এক বিষয়ের মহত্ত্বও অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে যদি কৃতকার্য না হয় তবে তাহার হীনতার প্রতি সাধারণ হীনতা অপেক্ষা গাঢ়তর কলঙ্ক আরোপ করে। আত্মরক্ষার জন্য সভ্যসমাজের এইরূপ চেষ্টা। যে লোক অসাধারণ, তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য ততটা নহে, কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক তাহাদিগকে ভক্তির কুফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য।

অহংকারের কুফল সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রমাত্রেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া রাখে। অহংকারে

লোকের পতন হয় কেন। প্রথম কারণ, নিজের বড়োত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস থাকাতে সে পরকে ঠিকমত জানিতে পারে না; যে-সংসারে পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ও কাজ করিতে হয় সেখানে নিজের তুলনায় অন্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলে তবেই সকল বিষয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব। চীনদেশ আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহার এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল। জর্মানির সহিত যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আর অতিদর্পে হতা লঙ্কা, এ কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানই বল। কী গৃহে কী কর্মক্ষেত্রে পরের সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল। অহংকার সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করিয়া আমাদের দুর্বলতার প্রধান কারণ হইয়া থাকে।

অহংকারের আর-এক বিপদ, তাহা সংসারকে আমাদের প্রতিকূলে দাঁড় করায়। যিনি যত বড়ো লোকই হোন-না কেন, সংসারের কাছে নানা বিষয়ে ঋণী; যে-লোক সবিনয়ে সেই ঋণ স্বীকার করিতে না চাহে তাহার পক্ষে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ আর-একটি আছে। বড়োকে বড়ো বলিয়া জানায় একটি আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে-আনন্দ। অহংকার আমাদিগকে নিজের সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে; যাহার ভক্তি নাই, সে জানে না অহংকারের অধিকার কত সংকীর্ণ, যাহার ভক্তি আছে সেই জানে আপনার বাহিরে যে-বৃহত্ত্ব যে-মহত্ত্ব তাহাই অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।

এইজন্য বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় হিসাবেই অহংকারের এত নিন্দা।

কিন্তু অযথা ভক্তিও যে অহংকারের মতো সর্বতোভাবে দূষ্য, নীতিশাস্ত্রে সে কথার উল্লেখ থাকা উচিত। অন্ধ ভক্তিও পরের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ হয়। এবং অযোগ্য ভক্তিতে আমাদিগকে যদি আপনার সমকক্ষ অথবা আপনার অপেক্ষা হীনের নিকট নত করে, তবে তাহাতে যে দীনতা উপস্থিত করে তাহা অহংকারের সংকীর্ণতা অপেক্ষা অল্প হেয় নহে।

এইজন্য ইংরাজসমাজে অভিমানকে অহংকারের মতো নিন্দনীয় বলে না। অভিমান না থাকিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়, এ কথা তাহারা স্বীকার করে।

যাহার মনুষ্যত্বের অভিমান আছে, সে কখনোই অযোগ্য স্থানে আপনাকে নত করিতে পারে না। তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায় তবে সে যেখানে-সেখানে লুটাইয়া পড়ে না— সে যথোচিত সন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা যথার্থ ভক্তিভাজনকে বাহির করে।

কিন্তু আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি; কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

আমাদের সৎপ্রবৃত্তিরও পথ যদি অত্যন্ত অবাধ হয়, তাহাতে ভালো ফল হয় না। তাহার বল, তাহার সচেষ্টতা, তাহার আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা রক্ষার জন্য, তাহাকে অমোঘ হইবার জন্য, বাধার সহিত তাহার সংগ্রাম আবশ্যক।

যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহাকে পদে পদে সংশয়ের দ্বারা বাধা দিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসাধারণের কাছে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া খ্যাত, তাহাকেও কঠিন প্রমাণের দ্বারা বারংবার বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে লোক অতিব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইতে চায় তাহার উত্তর জানিবার ব্যাকুলতা সহজে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে ভুল উত্তর পায়। বৈজ্ঞানিকের ব্যাকুলতা সহজে নিবৃত্ত হইতে পায় না, কিন্তু বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সে যে-উত্তরটুকু পায় তাহা খাঁটি। এখানে যে-কোনো প্রকারে হউক জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, সত্যনির্ণয়ই জিজ্ঞাসার প্রকৃত পরিণাম।

তেমনি, তাড়াতাড়ি কোনোপ্রকারে ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনই ভক্তির সার্থকতা নহে। বরঞ্চ কোনোমতে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিবার অতিমাত্র আগ্রহে সে আপনাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। এইরূপে সে মিথ্যা দেবতা, আত্মাবমান ও সহজ সাধনার সৃষ্টি করিতে থাকে। মহত্ত্বের

ধারণাই ভক্তির লক্ষ্য তা সে যতই কঠিন হউক; আত্ম-পরিতৃপ্তি নহে, তা সে যতই সহজ ও সুখকর হউক।

জিজ্ঞাসাবৃত্তির পথে বুদ্ধিবিচারই প্রধান আবশ্যক বাধা। সেইসঙ্গে একটা অভিমানও আছে। অভিমান বলে, আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি এমন অপদার্থ নহি। যাহা-তাহাকে আমি সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। আগে আমার সমস্ত সংশয়কে পরাস্ত করো, তবেই আমি সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ভক্তিপথেও সেই বুদ্ধিবিচার ও অভিমানই অত্যাবশ্যক বাধা। সেই বাধা থাকিলে তবেই যথার্থ ভক্তিভাজনকে আশ্রয় করিয়া ভক্তি আপনাকে চরিতার্থ করে। অভিমান সহজে মাথা নত হইতে দেয় না। যখন সে আত্মসমর্পণ করে তখন ভক্তিভাজনের পরীক্ষা হইয়া গেছে, রামচন্দ্র তখন ধনুক ভাঙিয়া তবে তাঁহার বলের প্রমাণ দিয়াছেন। সেই বাধা না থাকিলে ভক্তি অলস হইয়া যায়, অন্ধ হইয়া যায়, কলের পুতুলের মতো নির্বিচারে ক্ষণে ক্ষণে মাথা নত করিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এইরূপে ভক্তি অধ্যাত্মশক্তি হইতে মোহে পরিণত হয়।

অনেক সময় আমরা ভুল বুঝিয়া ভক্তি করি। যাহাকে মহৎ মনে করি সে হয়তো মহৎ নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কল্পনায় সে মহৎ, ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি করিলে ক্ষতির কারণ অল্পই আছে।

ক্ষতির কারণ কিছু নাই তাহা নয়। পূর্বেই বলিয়াছি যাহাকে মহৎ বলিয়া ভক্তি করি, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। যে-লোক প্রকৃত মহৎ নহে, কেবল আমাদের কল্পনায় ও বিশ্বাসে মহৎ, অন্ধভাবে তাহার আচরণের অনুকরণ আমাদের পক্ষে উন্নতিকর নহে।

কিন্তু আমাদের দেশে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি, তাহার পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে ব্যগ্র হই। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা কল্পনা করা যায় না।

সৈন্যগণকে যেমন মরিবার মুখে লইয়া যাইতে হইলে বহুদিনের কঠিন চর্চায় যন্ত্রবৎ বশ্যতা অভ্যাস করাইয়া লইতে হয় তেমনি পদে পদে আমাদের জাতিকে বিনাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র আমাদের আচার আমাদিগকে বিশ্ব-জগতের কাছে নত এবং বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুরোহিতের পবিত্র এবং দেবচরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে-মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে-পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে-লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্তও জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের জন্যও কুণ্ঠাবোধ হয় না, এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে-সকল দেবতার পুরাণবর্ণিত আচরণ লক্ষ করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেক স্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি, সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।

সুতরাং এ স্থলে সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, কেন পূজা করি। তাহার এক উত্তর এই যে, অভ্যাস-বশত অর্থাৎ মনের জড়ত্ববশত; দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ভক্তিজনক গুণের জন্য নহে, পরন্তু শক্তি কল্পনা করিয়া এবং সেই শক্তি হইতে ফল কামনা করিয়া।

আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমেই আছে, 'ইষ্টি আর পুরোহিত যাহা হতে সর্বস্থিত।' ইহাতেই বুঝা যাইতেছে গুরু ও পুরোহিতের মধ্যে আমরা একটা গূঢ় শক্তি কল্পনা করিয়া থাকি; তাঁহাদের শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণ যেমনই হউক তাঁহারা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলের প্রধান কারণ এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতে লাভ ও অভক্তিতে লোকসান আছে, এই বিশ্বাস আমাদের মাথাকে তাঁহাদের পায়ের কাছে নত করিয়া রাখিয়াছে। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে, তাঁহারা গৃহধর্মনীতির সুস্পষ্ট ব্যভিচার দ্বারাও গুরুভক্তিকে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দেবতা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। দেবচরিত্র আমাদের আদর্শ চরিত্র হইবে, এমন আবশ্যক নাই। দৈবভক্তিতে ফল আছে, কারণ দেবতা শক্তিমান।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র নরাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজ্য। ব্রাহ্মণের কতকগুলি নিগূঢ় শক্তি আছে। তাঁহাদের প্রসাদে ও বিরাগে আমাদের ভালো মন্দ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তিপাত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে না, দেনা-পাওনার সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধে ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না এবং ভক্তও নীচতা লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেবভক্তি সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত অনেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তর্ক করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যখন সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী তখন ঈশ্বর বলিয়া আমরা যাঁহাকেই পূজা করি, ঈশ্বরই সে-পূজা গ্রহণ করেন। অতএব এরূপ ভক্তি নিষ্ফল নহে।

পূজা যেন খাজনা দেওয়ার মতো; স্বয়ং রাজার হস্তেই দিই আর তাঁহার তহসিলদারের হস্তেই দিই, একই রাজভাণ্ডারে গিয়া জমা হয়।

দেবতার সহিত দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আমাদের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, পূজার দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটা বিশেষ উপকার করিলাম এবং তাহার পরিবর্তে একটা প্রত্যুপকার আমার পাওনা রহিল, ইহাই ভুলিতে না পারিয়া আমরা দেবভক্তি সম্বন্ধে এমন দোকানদারির কথা বলিয়া থাকি। পূজাটা দেবতার হস্তগত হওয়াই যখন বিষয়, এবং সেটা ঠিকমত তাঁহার ঠিকানায় পৌঁছিলেই যখন আমার কিঞ্চিৎ লাভ আছে, তখন যত অল্প ব্যয়ে অল্প চেষ্টায় সেটা চালান করা যায় ধর্ম-ব্যবসায়ে ততই আমার জিত। দরকার কী ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণার চেষ্টায়, দরকার কী কঠোর সত্যানুসন্ধানে; সম্মুখে কাষ্ঠ প্রস্তর যাহা উপস্থিত থাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা নিবেদন করিয়া দিলে যাঁহার পূজা তিনি আপনি ব্যগ্র হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া লইবেন।

আমাদের পুরাণে ও প্রচলিত কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয় যেন দেবতারা আপনাদের পূজা গ্রহণের জন্য মৃতদেহের উপর শকুনি-গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছেন। অতএব আমাদের নিকট হইতে ভক্তিগ্রহণের লোলুপতা যে ঈশ্বরেরই, এ কথা আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনেও অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু কী মনুষ্যপূজায় এবং কী দেবপূজায়, ভক্তি ভক্তেরই লাভ। যাঁহাকে ভক্তি করি তিনি না জানিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহাকেই আমার জানা চাই, তবেই আমার ভক্তির সার্থকতা। পূজ্য ব্যক্তির আদর্শকে আমাদের প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিশাইয়া লইতে চাহিলে ভক্তি ছাড়া আর কোনো উপায়ই নাই। আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকেই যদি বস্তুত চাই তবে তাঁহার প্রকৃতির আদর্শ তাঁহার সত্যস্বরূপ একান্ত ভক্তিযোগে হৃদয়ে স্থাপনা করিতে হয়। সেরূপ অবস্থায় ফাঁকি দিতে স্বতই প্রবৃত্তি হয় না; তাঁহার সহিত বৈসাদৃশ্য ও দূরত্ব যতই হীনত্বের সহিত অনুভব করি, ততই ভক্তি বাড়িয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র আপনাকে তাঁহার সহিত লীন করিবার চেষ্টা করে।

ইহাই ভক্তির গৌরব। ভক্তিরস সেই আধ্যাত্মিক রসায়নশক্তি যাহা ক্ষুদ্রকে বিগলিত করিয়া মহতের সহিত মিশ্রিত করিতে পারে।

অতএব ঈশ্বরকে যখন ভক্তি করি তখন তদ্দ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য বাড়ে না, আমরাই সেই রসস্বরূপের রাসায়নিক মিলন লাভ করি। আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ যত মহৎ মিলনের আনন্দ ততই প্রগাঢ়, এবং তদ্দ্বারা আত্মার প্রসার ততই বিপুল হইবে।

ভক্তি আমরা যাঁহাকে করি, তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাই না। যদি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি করি, তবে সে গুরুর আদর্শই আমাদের মনে অঙ্কিত হয়। ভক্তির প্রবলতায় সেই গুরুর মানস আদর্শ তাঁহার স্বাভাবিক আদর্শ অপেক্ষা কতকটা পরিমাণে আপনি বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

অস্থানে ভক্তি করিবার একটা মহৎ পাপ এই যে, যিনি যথার্থ পূজ্য, অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ থাকে না।

আমাদের দেশে এই অন্যায় মিশ্রণ সকল দিকেই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে অনাচার এবং পাপ এক কোঠায় পড়িয়া গেছে। ইতর জাতিকে স্পর্শ করাও পাপ, ইতরজাতিকে হত্যা করাও পাপ। নরহত্যা করিয়া সমাজে নিষ্কৃতি আছে কিন্তু গোহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি নাই। অন্যায় করিয়া যবনের অন্ন মারিলে ক্ষমা আছে কিন্তু তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে পাতক।

প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও তেমনি। তিলক রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন—সেখানে অনিবার্য রাজদণ্ডের বিধানে তাঁহাকে দূষিত অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে; মাথা মুড়াইয়া গোঁফ কামাইয়া কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সমাজ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিলক যে সত্য রাজদ্রোহী এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না এবং যদি-বা করিত সেজন্য তাঁহাকে দণ্ডনীয় করিত না—কিন্তু যে অনিচ্ছাকৃত অনাচারে তাঁহার সাধু চরিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই তাহাই তাঁহার পক্ষে পাপ, এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন।

যে-সমস্ত পাপ অনাচার মাত্র নহে—যাহা মিথ্যাচরণ. চৌর্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি চরিত্রের মূলগত পাপ তাহারও খণ্ডন তিথিবিশেষে গঙ্গাস্নানে তীর্থযাত্রায়।

অনাচার আচারের ত্রুটি এবং ধর্মনিয়মের লঙ্ঘনকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরা এমনই একটি ঘোরতর জড়বাদ, এমনই নিগূঢ় নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছি।

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ মিশ্রণ ঘটাইয়া আমরা ভক্তির আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিয়াছি। সেইজন্যই আমরা বরঞ্চ সাধু শূদ্রকে ভক্তি করি না, কিন্তু অসাধু ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি। আমরা প্রভাত-সূর্যালোকিত হিমাদ্রিশিখরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতে পারি কিন্তু সিন্দূরলিপ্ত উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সত্য এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা এইরূপ একটা জটা পাকাইয়াছি। সমুদ্রযাত্রা উচিত কি না তাহা নির্ণয় করিতে ইহাই দেখা কর্তব্য যে, নূতন দেশ ও নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় কি না, আমাদের সংকীর্ণতা দূর হয় কি না, ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কোনো জ্ঞানপিপাসু উন্নতি-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বলপূর্বক বন্ধ করিয়া রাখিবার ন্যায্য অধিকার কাহারও আছে কি না। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আমরা দেখিব, পরাশর সমুদ্র পার হইতে বলিয়াছেন কি না এবং অত্রি কী বলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

বালবিধবাকে চিরকুমারী করিয়া রাখা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিদারুণ ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কি না ইহা আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় নহে কিন্তু বহু প্রাচীন্‌কালে সমাজের শিক্ষা আচার ও অবস্থার একান্ত পার্থক্যের সময় কোন্‌ বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।

এমন বিপরীত বিকৃতি কেন ঘটিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্বাধীনতাতেই যে-সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বন্ধ করা হইয়াছে।

অভ্যাস বা পরের নির্দেশবশত নহে, পরন্তু স্বাধীন বোধশক্তি যোগে ভক্তিবলে আমরা মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাহাই সার্থক ভক্তি।

কিন্তু আশংকা এই যে, যদি বোধশক্তি তোমার না থাকে। অতএব নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া গেল, অমুক সম্প্রদায়কে এই প্রণালীতে ভক্তি করিতেই হইবে। না করিলে সাংসারিক ক্ষতি ও পুরুষানুক্রমে নরকবাস।

যে-ভক্তি স্বাধীন হৃদয়ের তাহাকে মৃত শাস্ত্রে রাখা হইল; যে-ভক্তির প্রকৃত লাভ-ক্ষতি আমাদের অন্তঃকরণে আমাদের অন্তরাত্মায় তাহা সংসারের খাতায় ও চিত্রগুপ্তের কাল্পনিক খতিয়ানে লিখিত হইল।

গাছ মাটিতে রোপণ করিলে তাহাকে গোরুতে খাইতে পারে, তাহাকে পথিকে দলন করিতে পারে, এই ভয়ে তাহাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ রাখা হইল। সেখানে সে নিরাপদে রহিল, কিন্তু তাহাতে ফল ধরিল না; সজীব গাছ মৃত কাষ্ঠ হইয়া গেল।

মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ কিন্তু যদি সে ভুল করে,

অতএব তাহাকে বাঁধো; আমি বুদ্ধিমান যে-ঘানিগাছ রোপণ করিলাম চোখে ঠুলি দিয়া সেইটেকে সে নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করিতে থাক্‌। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনোদিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না— আমি ঠিক করিয়া দিলাম কোন্‌ তিথিতে মুলা খাইলে তাহার নরক এবং চিঁড়া খাইলে তাহার অক্ষয় ফল। তোমার মুলা ছাড়িয়া চিঁড়া খাইয়া তাহার কী উপকার হইল তাহার কোনো প্রমাণ নাই, কিন্তু যাহা অপকার হইল ইতিহাসে তাহা উত্তরোত্তর পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

একটি সামান্য উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যাহারা রেশম-কীটের চাষ করে তাহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, নিরামিষ আহার, নিয়ম পালন ও গংগাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে সর্বদা পবিত্র না রাখিলে রেশমব্যবসায়ীর সাংসারিক অমংগল ঘটে।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলিয়া উঠিবেন, পাছে মলিনতা দ্বারা রেশমকীটের মধ্যে সংক্রামক রোগবীজ প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট হয় এইজন্য বুদ্ধিমান-কর্তৃক এইরূপ প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু চাষাকে প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝাইয়া দিয়া তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের মতো অন্ধ করিয়া পরিণামে বিষময় ফল হয়। চাষা অনির্দিষ্ট অমংগল আশংকায় নিজে নিয়ম পালন করে কিন্তু কীটদের সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষা করে না— স্নান-পানাদির দ্বারা নিজে পবিত্র থাকে কিন্তু কীটের ঘরে এক পাতায় তিন দিন চলিতেছে, মলিনতা সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে দৃষ্টি নাই।

শোয়া বসা চলা ফিরা কোনো ক্ষুদ্র বিষয়েই যাহাকে স্বাধীন বুদ্ধি চালনা ও নিজের শুভাশুভ বিচার করিতে হয় না তাহার কাছে অদ্য বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝাইতে গিয়া মাথায় করাঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

এইরূপে নীতি, ভক্তি ও বুদ্ধি— স্বাধীনতাতেই যাহার বল, যাহার জীবন, স্বাধীনতাতেই যাহার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত ও বিকশিত হয়, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্বাভাবিক আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সযত্নে মৃত্যু ও বিকৃতির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির এমনই নিদারুণ জড়ত্ব জন্মিয়াছে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানে জানি ভক্তির অযোগ্য তাহাকেও প্রথার অভ্যাসে ভক্তি করিতে সংকোচমাত্র অনুভব করি না।

১৩০৫

পূর্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকায় আর্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে-বিচিত্র আলোকময় উন্মুক্ত রংগভূমি উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্যরা অনার্যদের সংগে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল, তখনো অনার্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরও অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে,

এ কথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে-শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে-শুভ্রতা মলিন হইয়াছে; এবং আর্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস। হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দু-মুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে, যে-বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সব চেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু নয় মুসলমান নয় ইংরেজ নয় আর-কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান-গাড়ি করিয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই—ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক—জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজান্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে; পৃথিবীতে আজ সে-দম্ভের মূল্য কী। রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্‌খান্‌ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু

উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে-খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে-সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সে-ই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারি দিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারের সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর-কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে—এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ

ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা-র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক-না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীর-বদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহংকারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে-অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন,

সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে-জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ্র অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন-কি, অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব। তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল। এই বিরোধের তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বল আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ

উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে-মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বিরোধে দুর্বলভাবে দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস পোশাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্‌বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন: এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে-শক্তি নব্যভারতের আদি-অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ-ভারতবাসীর যে-বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন; তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা

যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্‌পীয়র বায়রনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বল, ম্যাজিস্ট্রেট বল, সদাগর বল, পুলিসের কর্তা বল, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে-সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন, রুটির পরিবর্তে পাথরেরই মতো। সে-পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত-কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেইজন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই, এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয়

তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারি দিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ-সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই-সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল সর্বদাই তাহদের চারি দিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারি দিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এ দেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এইজন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে-বিচারের ন্যায়ধর্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে, সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে-ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি-দুর্বলতাবশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে-ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেইজন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা-কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা-কিছু দুঃখ অপমান; এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন-কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’—পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে-ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্যপ্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাব-মোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল

পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্‌ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্‌বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে-মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে; তখন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

১৩১৫

পরিশিষ্ট

সমাজ

‘সমাজ’ গ্রন্থ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সাল পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমাজবিষয়ক অসংকলিত রচনাগুলি ‘পরিশিষ্ট’ অংশে সংকলিত হয়েছে।

হিন্দু বিবাহ

সায়ান্স্‌ অ্যাসোসিয়েশন হলে পঠিত

অধ্যাপক সীলি তাঁহার *Natural Religion* নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন :

Among the crowd of Voltairian Abbes we can fancy some in whom the conflict between inherited and imbibed ways of thinking may have destroyed belief and energy alike. Those who live in the decay of Churches and systems of life are exposed to such a paralysis. They have been made all that they are by the system; their mode of thought and feeling, their very morality has grown out of it. But at a given moment the system is struck with decay. It falls out of the current of life and thought. Then the faith which had long been genuine, even if mistaken, which had actually inspired vigorous action and eloquent speech, begins to ebb. The vigour begins to be spasmodic, the eloquence to ring hollow, the loyalty to have an air of hopeless self-sacrifice. Faith gradually passes into conventionalism. A later stage comes when the depression, the uneasiness, the misgiving, have augmented tenfold. It is then that in an individual here and there the moral paralysis sets in. In the ardour of conflict they have pushed in to the foreground all the weakest parts of their creed, and have learnt the habit of asserting most vehemently just what they doubt most, because it is what is most denied. As their own belief ebbs away from them they are precluded from learning a new one, because they are too deeply pledged, have promised too much, asseverated too much, and involved too many others with themselves. Happy those in such a situation who either are not too clearsighted or cling to a system not entirely corrupt! There is an extreme case when what is upheld as divine has really become a source of moral evil, while the champion is one who cannot help seeing clearly. As he becomes reluctantly enlightened, as his advocacy grows first a little forced, then by degrees consciously hypocritical, until in the end he secretly confesses himself to be on the wrong side, what a moral dissolution!

ইহার মর্মার্থ :

> যাঁহারা কোনো পুরাতন ধর্মপ্রণালী অথবা সমাজতন্ত্রের জীর্ণদশায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধবশত বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু-অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সমাজতন্ত্রের মধ্যেই গঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাপ্রণালী, এমন-কি ধর্মনীতি সেই সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কখন এক সময়ে সেই সমাজে জরা প্রবেশ করিয়াছে; সে-সমাজ মানবের বুদ্ধি ও জীবনস্রোতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। যে অকপট বিশ্বাস পূর্বে সকলকে উদ্যমশীল কার্যে ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এখন সে-বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। তাহার জীবন্ত উদ্যম ক্বচিৎ ক্ষণস্থায়ী চকিত চেষ্টায় পর্যবসিত হয়, তাহার বক্তৃতাবেগ শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহার নিষ্ঠা অত্যন্ত আশাহীন

> আত্মবলিদানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমে বাহ্য প্রথায় পরিণত হয়। ক্রমে অবসাদ অশান্তি ও সংশয় বাড়িতে থাকে। এই মতবিরোধের সময় কতকগুলি লোক উঠেন, তাঁহারা বিবাদে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের মতের জীর্ণতম অংশগুলিই সম্মুখে সাজাইয়া আস্ফালন করিতে থাকেন; যেগুলি মনে মনে সর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ করেন সেইগুলিই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন, কারণ বিরোধী পক্ষ সেইগুলিকেই অধিকতর অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ক্রমে এতদূর পর্যন্তও হইতে পারে যে, যাহা নৈতিক দুর্দশার কারণ তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়া প্রচার করেন, অথচ ইহার অসংগতি নিজেই মনে মনে না বুঝিয়া থাকিতে পারেন না। প্রথমে অল্পে অল্পে চোখ ফুটিতে থাকে এবং জোর করিয়া নিজমত সমর্থন করেন, পরে ক্রমে আপন মত অন্যায় জানিয়াও স্পষ্ট কাপট্য অবলম্বন করেন।

অধ্যাপক সীলির এই বর্ণনার সহিত আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থার কী আশ্চর্য ঐক্য। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গভূমির নূতন চিন্তাস্রোত ও জীবনস্রোতের সহিত প্রাচীন সমাজতন্ত্র মিশিতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রাচীন সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসবলে যে-সকল বৃহৎকার্য যেরূপ প্রবল বেগে সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখনকার জীবন্ত বিশ্বাস এখন জীবনহীন প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অবসাদ অশান্তি ও সংশয়ে আমাদের সমাজ ভারাক্রান্ত, এবং আমাদের মধ্যে একদল লোক উঠিয়াছেন, তাঁহারা পরমসূক্ষ্ম কূটযুক্তি দ্বারা প্রাচীন মতের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং বোধ করি একদল রূঢ়স্বভাব সংবাদপত্রব্যবসায়ীর মধ্যে এ-সম্বন্ধে কাপট্যের লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে একদলের মধ্যে এই যে প্রাচীনতার একান্ত পক্ষপাত দেখা যায়, তাহার কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমত, নূতন শিক্ষার প্রভাবে আমরা অনেকগুলি নূতন কর্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু আমাদের অনভ্যাস, পূর্বরাগ, স্বাভাবিক জড়ত্ব ও ভীরুতাবশত আমরা তাহা সমস্ত পালন করিয়া উঠিতে পারি না। আলস্যের দায়ে ও সমাজের ভয়ে অনেক সময়ে আমরা তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু অসম্পন্ন কর্তব্যের লাঞ্ছনা মানুষ চিরদিন সহিয়া থাকিতে পারে না। কেন বিশ্বাস করিতেছি একরূপ এবং কাজ করিতেছি অন্যরূপ, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কিছুদিন পরে নূতন বিশ্বাসের খুঁত ধরিতে আরম্ভ করা যায়। নূতন শিক্ষালব্ধ কর্তব্য যে অকর্তব্য, এবং আমরা যাহা করিয়া আসিতেছি ঠিক তাহাই করা যে উচিত, প্রাণপণ সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থলে সাধারণত যুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে; এত সূক্ষ্ম হয় যে সেই যুক্তিভেদ করিয়া যুক্তিকর্তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস কখনো কখনো কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, পুরাতনের উপর যখন একবার আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়, তখন আমরা অনেক সময় অবিচারে নূতনকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিই। নূতনের উপর প্রকৃত বিশ্বাসবশতই যে তাহাকে সকল সময়ে আমরা হৃদয়ে স্থান দিই তাহা নহে, অনেক সময়ে পুরাতনের প্রতি আড়ি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি। আমরা গৃহশত্রুর প্রতি আড়ি করিয়া কখনো কখনো বহিঃশত্রুকে গৃহে আহ্বান করিয়া থাকি। অবশেষে উপদ্রব সহ্য করিয়া যখন চৈতন্য হয় তখন আগাগোড়া নূতনের উপরে বিরাগ জন্মে। যখন এদেশে নূতন কালেজ হয় তখন শিক্ষিত যুবকেরা যে অনেকগুলি উৎপাত আপন গৃহচালের উপরে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, সে কেবল পুরাতনের উপরে আড়ি করিয়া বৈ তো নয়। এখনকার একদল লোক সেই-সকল উৎপাতমিশ্রিত নূতন মতকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

তৃতীয়ত, আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পরের কাছে অপমানিত, সুতরাং ঘরে সম্মানের প্রত্যাশী। এইজন্য আমরা ইংরেজকে বলিতে চাহি—ইংরেজ, তোমাদের শস্ত্র বড়ো, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বড়ো; তোমরা রাজা, আমরা আর্য। এককালে আমাদের যাহা ছিল এখনো যেন তাহাই আছে,

এইরূপ ভান করিয়া অপমানদুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাই। দেহে বল ও হৃদয়ে সাহস নাই যে অপমান হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি, সুতরাং পুরাণ ও সংহিতা, চটুল রসনা ও কূটযুক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়। যে-সকল আচারের অস্তিত্ব হয়তো আমাদের অপমানের অন্যতম কারণ সেগুলি দূর করিতে সাহস হয় না, এইজন্য তাহাদের প্রতি আর্য আধ্যাত্মিক পবিত্র প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করি। এইরূপে অনেক সময়ে অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইবার অভিপ্রায়েই আমরা অপমানের কারণ স্বহস্তে স্বদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিই।

চতুর্থত, ভাবেগতিকে বোধ হয়, কেহ কেহ মনে করেন প্রাচীনতাকে অবলম্বন করা আমাদের political উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। তাহাকে বিশ্বাস করি বা না করি, তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করিলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে কতকগুলি লাভ আছে। কিন্তু সত্যমিথ্যার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া এরূপ লাভক্ষতি গণনা করিয়া যে দেশের কোনো স্থায়ী ও বৃহৎ কাজ করা যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইল হিন্দুবিবাহ লইয়া আলোচনা পড়িয়াছে। যাঁহারা এই আলোচনা তুলিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র এবং আমাদের বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহারা কেহই হিন্দুবিবাহের শাস্ত্রসম্মত ঐতিহাসিকতা বা বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতার বিষয় বড়ো-একটা-কিছু বলেন নাই, কেবল সূক্ষ্মযুক্তি ও কবিত্বময় ভাষা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে হিন্দুবিবাহের বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে—ইহার মধ্যে কোন্ সময়ের বিবাহকে যে তাঁহারা হিন্দুবিবাহ বলেন, তাহা ভালোরূপ নির্দেশ করেন নাই। যদি বঙ্গদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলেন, তবে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কেন। প্রাচীন কালে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, এখন সেরূপ আছে কি না সে বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। অতএব সেকালের শাস্ত্রোক্তি এখন প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে চোখে ধুলা দেওয়া হয়। হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে যদি কেহ বৈদিক বচন উদ্ধৃত করেন তাঁহার জানা উচিত যে, বৈদিক কালে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য অবস্থা আমাদের বর্তমান কালের ন্যায় ছিল না। যিনি হিন্দুবিবাহের পক্ষে পুরাণ ইতিহাস উদ্ধৃত করেন, তিনি এক মহাভারত সমস্ত পড়িয়া দেখিলে অকূল সমুদ্রে পড়িবেন। মহাভারতের নানা কাহিনীতে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা বিশৃঙ্খলা বর্ণিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে তাহার ভালোরূপ সমালোচনা ও কালাকাল নির্ণয় না করিয়া কোনো কথা বলা উচিত হয় না। যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে। প্রথমত, মনুসংহিতা যে-সমাজের সংহিতা সে-সমাজের সহিত আমাদের বর্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ। শিক্ষার ঐক্য নাই অথচ সমাজের ঐক্য আছে, ইহা প্রমাণ করিতে বসা বিড়ম্বনা। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ নির্দিষ্ট আছে তাহা যে বঙ্গদেশে কোন্‌কালে প্রচলিত ছিল নির্ণয় করা কঠিন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্ত জো-সো করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রতের অভিনয় সমাপনপূর্বক আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কোথায় বা গুরুগৃহে বাস, কোথায় বা বেদাধ্যয়ন, কোথায় বা কঠিন ব্রতাচরণ। অতএব প্রথমেই দেখা যাইতেছে মনুসংহিতার মতে যে-মানুষ গঠিত হইত, এখনকার মতে সে-মানুষ গঠিত হয় না। দ্বিতীয়ত, মনু পুরুষের পক্ষে বিবাহের যে-বয়স নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কোথায় পালিত হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, বিবাহের পরে মনু স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংসর্গের যে-সকল নিয়ম স্থির করিয়াছেন, তাহাই বা কয়জন লোক জানে ও পালন করে। তবে, আপন সুবিধামত মনু হইতে দুই-একটা শ্লোক নির্বাচন করিয়া বর্তমান দেশাচারপ্রচলিত বিবাহপ্রথার পক্ষে প্রয়োগ করা সকল সময়ে সংগত বোধ হয় না। তবে যদি কেহ বলেন, আমাদের বর্তমান প্রথাসকল হিন্দু-

শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে, অতএব আমরা মনুকে আদর্শ করিয়াই আমাদের বিবাহাদিপ্রথার সংস্কার করিব, কারণ সেকালের বিবাহাদি পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ছিল, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই— বিবাহাদি সম্বন্ধে মনুর সমস্ত নিয়ম নির্বিচারে গ্রহণ করিবে, না আপনাপন মতানুসারে স্থানে স্থানে বর্জন করিয়া সংহিতাকে আপন সুবিধা ও নূতন শিক্ষার অনুবর্তী করিয়া লইবে। মনুসংহিতা স্ত্রীপুরুষের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন তাহার সমস্তটাই পবিত্র ও আধ্যাত্মিক, না তুমি তাহার মধ্য হইতে যেটুকু বাদসাদ দিয়া লইয়াছ সেইটুকু পবিত্র ও আধ্যাত্মিক।

আমরা যে শাস্ত্র হইতে বাদসাদ দিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেশানুরাগে কথঞ্চিৎ অন্ধ হইয়া আপন ঘরগড়া মতকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করি, এখানে তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিতে চাই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু পরম ভাবুক জ্ঞানবান ও সহৃদয়। তাঁহার শকুন্তলাসমালোচন তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আমি যতদূর জানি বাংলায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই। বাংলার পাঠকসাধারণে চন্দ্রনাথবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এইজন্য কিছুকাল হইল তিনি 'হিন্দুপত্নী' এবং 'হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' নামে যে-দুই প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহা সাধারণ্যে অতিশয় আদৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুদম্পতির একীকরণতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আজকাল গুটিকতক কাগজে অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে হিন্দুবিবাহ এবং তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যতটা বলিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তী আর কেহ ততটা বলেন নাই। খ্যাতনামা গুণী ও গুণজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় চন্দ্রনাথবাবুর বিবাহ প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন, 'হিন্দু-বিবাহের ওরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই।' অতএব উক্ত সর্বজনমান্য প্রবন্ধদ্বয়কে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি, এবং এই উপলক্ষে আমার মতামত যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়াছি।[১]

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার 'হিন্দুপত্নী' প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

> খৃস্টধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খৃস্টধর্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খৃস্টধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতা সন্তুষ্ট হন।

প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন নহি এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু আজকাল মুখে ও লেখায় ও অনুবাদে শাস্ত্রচর্চা দেশে এতটুকু ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা

---

[১] এইখানে বলা আবশ্যক, চন্দ্রনাথবাবু যখন বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তখন এ বিষয়ে আন্দোলন কিছুই ছিল না। সুতরাং বিবাহের সমস্ত দিক আলোচনার তেমন আবশ্যক ছিল না। তখন সহৃদয় কল্পনার দ্বারা নীত হইয়া হিন্দুবিবাহের কোনো একরূপ বিশেষ ব্যাখ্যা করা আশ্চর্য নহে; ইহাতে সাহিত্যের অধিকার আছে। কিন্তু আজকাল বিষয়টি যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে কেবল সাহিত্যের হিসাবে দেখিলে আর চলে না। এইজন্য সাহিত্যের কল্পনাপূর্ণ ভাষা ও ভাবকে অনুসন্ধান ও যুক্তির দ্বারা নির্মমভাবে ভাঙিয়া দেখিতে হইতেছে। বর্তমান আন্দোলন যদি চন্দ্রনাথবাবু পূর্ব হইতে জানিতে পারিতেন তবে তাঁহার প্রবন্ধ আর-একরূপ হইত। তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধে সাহিত্যরস অপেক্ষাকৃত অল্প থাকিত এবং তিনি তাঁহার বিষয়টিকে একমাত্র যুক্তির সাহায্যে দুর্গম পথের মধ্য দিয়া অতি সাবধানে লইয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহের কথা বলিয়াছেন তাহা সমাজের কোনো কাল্পনিক অবস্থায় ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু আজকাল যে আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা ভালোমন্দ পরিপূর্ণ সমাজের প্রাত্যহিক বিবাহ লইয়া কিন্তু তাঁহার উক্ত সাহিত্য প্রবন্ধের ভাষা লইয়া আজকাল সকলেই কার্যস্থলে ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং কঠিন যুক্তির দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধ সমালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর দোষ নাই এবং আমারও দোষ নাই— ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়া পড়িল।

করিবার অধিকার অনেকেরই জন্মিয়াছে। চন্দ্রনাথবাবুর মত সত্য কি মিথ্যা তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এটুকু বলিতে পারি যে, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মত ভালোরূপ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি যেমন দুই-একটি শ্লোক আপন মতের স্বাপক্ষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তেমনি অনেকগুলি শ্লোক তাঁহার মতের বিপক্ষে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে-সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোক পাঠ করিবেন, আমি কেবল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক এইখানে পাঠ করি।

শয্যাসনমলংকারং কামং ক্রোধমনার্জবং
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।

> শয্যা, আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রীলোক হইতে হয় ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মোব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।

> যেহেতুক স্ত্রীলোকের মন্ত্রদ্বারা কোনো ক্রিয়া নাই ধর্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্মজ্ঞানহীন মন্ত্রহীন স্ত্রীগণ অনৃত, মিথ্যা পদার্থ।

এ-সকল শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে হিন্দুবিবাহের সহিত কোম্‌তের মতের তুলনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতদূর কোম্‌ৎশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষাও অনেক অল্প, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুই এককথায় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোম্‌তের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করি :

> বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এতদিনের পর য়ুরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ধর্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণসম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেইজন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

বলা বাহুল্য কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন মনু মুক্তকণ্ঠে ঠিক তাহা বলেন নাই। মহাভারতে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরও মুক্তকণ্ঠে কোম্‌তের মত সমর্থন করেন নাই। অনুশাসনপর্বে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে-কথোপকথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে। অতএব তাহার স্থানে স্থানে পাঠ করি। কালীসিংহ-কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলম্বন।

> কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর।
>
> উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই।
>
> তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনোই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে-সময় সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূতসমুদয় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন :

> পুরুষে রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে।

> কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করিতে অক্ষম, বিশেষত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোম্‌ৎ-শিষ্যগণের মতের সহিত তাহাদের মতের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমত স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। চন্দ্রনাথবাবু শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন— প্রাচীন সমাজে স্ত্রীলোকের সবিশেষ সম্মান ছিল, কিন্তু আমি দেখিতেছি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অসম্মানেরও প্রমাণ আছে। অতএব এ-বিষয়ে এখনো নিঃসংশয়ে কিছু বলিবার সময় হয় নাই।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থা সেকালে কিরূপ ছিল। চন্দ্রনাথবাবু রঘুনন্দনের এক বচন উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে—

> হিন্দুভার্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন আমাদের দেশে সর্বসাধারণের সংস্কার এই যে, স্বামীই স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্ত্রী যে স্বামীর দেবতা ইহা ইতিপূর্বে শুনা যায় নাই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ স্বরূপে দান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিবেন, তৎপূর্বে তিনি আপনাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই যে, আপনাকে সম্মান করিতে কেহ বাধ্য নহে, কিন্তু মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে সকলে বাধ্য। দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্ঠিরের মান্যা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির কখনোই তাঁহাকে দ্যূতের পণ্যস্বরূপ দান করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদী যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন তখন ভীষ্ম-দ্রোণ-ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন! ঐ দ্রৌপদীই যখন প্রকাশ্যভাবে বিরাটসভায় কীচকের পদাঘাত সহ্য করেন তখন সমস্ত সভাস্থলে কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই। মনুসংহিতার দণ্ডবিধির মধ্যে এক স্থলে আছে :

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতা চ সোদরঃ
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যুরজ্জ্বা-বেণুদলেন বা।

> স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য ও সোদর কনিষ্ঠভ্রাতা যদি অপরাধ করে, সূক্ষ্ম রজ্জু অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাড়ন করিবে।

দেবতার প্রতি এরূপ রজ্জু ও বেণুদলের তাড়নব্যবস্থা হইতে পারে না। স্বামীও স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনো গ্রহণ করেন নাই; তবে শাস্ত্রের অনভিমতে সম্মার্জনীপ্রয়োগ প্রভৃতির উল্লেখ এখানে আমি করিতে চাহি না। যাহা হউক, আমার এবং বোধ করি সাধারণের বিশ্বাস এই যে, হিন্দু স্ত্রী কোনোকালে হিন্দু স্বামীর দেবতা ছিলেন না। অতএব এ স্থলে হিন্দুশাস্ত্রের সহিত কিঞ্চিৎ বলপূর্বক কোম্‌ৎশাস্ত্রের অসবর্ণ মিলন সংঘটন করা হইয়াছে।

বিবাহবিশেষ আলোচনায় তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্যবন্ধন কিরূপ ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য কোনো জাতির বিবাহে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এক স্বামী ও এক স্ত্রীর একীকরণ বিবাহের উচ্চতম আদর্শ। সে-আদর্শ আমাদের দেশে যদি জাজ্বল্যমান থাকিত তবে এ দেশে বহু বিবাহ কিরূপে সম্ভব হইত। মহাভারত পাঠে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের যোড়শসহস্র মহিষী ছিল। তখনকার অন্যান্য রাজপরিবারেও বহুবিবাহদৃষ্টান্তের অসদ্ভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ ঋষিদিগেরও একাধিক

পত্নী দেখা যাইত। অন্য ঋষির কথা দূরে যাউক, বশিষ্ঠের দৃষ্টান্ত দেখো। অরুন্ধতীই যে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী তাহা নহে, অক্ষমালা নামে এক অধম জাতীয়া নারী তাঁহার অপর স্ত্রী ছিলেন। এরূপ ব্যবস্থাকে ন্যায্যমতে একীকরণ বলা উচিত হয় না; ইহাকে পঞ্চীকরণ, ষড়ীকরণ, সহস্রীকরণ বলিলেও দোষ নাই। কেহ কেহ বলিবেন, স্ত্রী যতগুলিই থাক্‌-না কেন, সকলগুলিই স্বামীর সহিত মিশিয়া একেবারে এক হইয়া যাইবে, ইহাই হিন্দুবিবাহের গৌরব। স্ত্রী যত অধিক হয় বিবাহের গৌরবও বোধকরি তত অধিক, কারণ একীকরণ ততই গুরুতর। কিন্তু একীকরণ বলিতে বোধকরি এই বুঝায় যে, প্রেমবিনিময়বশত স্বামীস্ত্রীর হৃদয়মনের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য; এবং এরূপ ঐক্য যে দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্র আদর্শ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু প্রেমপ্রভাবে হৃদয়ের ঐক্য যেখানে মুখ্য আদর্শ সেখানে বহুদারপরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরিপূর্ণ মিলন যদি হিন্দুবিবাহের যথার্থ প্রাণ হইত তবে এ দেশে কৌলীন্য বিবাহ কোনোমতে স্থান পাইত না। বিবাহের যত-কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে-আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না। কিন্তু ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বিবাহ পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া হয়। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আশ্চর্য উত্তর দিয়াছেন। হিন্দু বিধবার ন্যায় বিপত্নীক পুরুষও যে কেন নিষ্কাম ধর্ম অবলম্বন করেন না, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন :

> হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু মানেন অনুপাতবাদ। ক খ যখন সমান নহে তখন তাহারা সমান আসন পাইবেও না; ক যেমন তেমনই ক পাইবে, খ যেমন তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, ক-র ও খ-র স্বত্বাধিকার মধ্যে সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাতবাদী। হিন্দু স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্বীকার করে না; কাজেই হিন্দু স্ত্রীপুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করে না।

এ কথা যদি বল তবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে হয় বলা যায় না। তুমি বলিতেছ নিষ্কামধর্মের পবিত্র মহত্ত্ব আছে; অতএব স্বামীর মৃত্যুর পর কামনা বিসর্জন দিয়া সংসারধর্ম পালন করিবার যে-অবসর পাওয়া যায়, তাহা অতি পবিত্র অবসর, সে-অবসর অবহেলা করা উচিত নহে। এখন তোমার সাম্য-বৈষম্যের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, নিষ্কামধর্মও কি হিন্দুদের ন্যায় অনুপাতবাদ মানিয়া চলেন। পুরুষের পক্ষেও নিষ্কামধর্ম কি পবিত্র নহে, অতএব কষ্টসাধ্য হইলেও হিন্দু-বিবাহের পরম একীকরণ এবং আধ্যাত্মিক মিলনের দ্বারা অনিবার্যবেগে চালিত হইয়া স্ত্রীবিয়োগে পুরুষেরও নিষ্কামধর্মব্রত গ্রহণ করা কেন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্থির হয় নাই। তাহার বেলায় ক খ ও অনুপাতবাদের হেঁয়ালিধূম বিস্তার করিবার তাৎপর্য কী। পবিত্র একনিষ্ঠ অচল দাম্পত্য-প্রেম পুরুষেরও মহত্ত্বের লক্ষণ ও হৃদয়ের উন্নতির অন্যতম কারণ, তাহা কোন্‌ অনুপাতবাদী অস্বীকার করিতে পারেন।

তবে এমন যদি বল যে, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার কথা ছাড়িয়া দাও, হিন্দুবিবাহ সাংসারিক সুবিধার জন্য তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে অনুপাতবাদের হিসাব কাজে লাগিতে পারে। অক্ষয়বাবু বলেন :

> অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, এ-সিদ্ধান্ত বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যে বিবাহের অতি নিকৃষ্টভাগ, অতি সামান্যভাগ এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। এবং প্রাচীন হিন্দুরা যে ইহাকে নিকৃষ্ট ও সামান্য জ্ঞান করিতেন, আমার তাহা বোধ হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'ভারতবর্ষের ধর্মপ্রণালী' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

> মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, সমাজই সে সকলের কেন্দ্রস্থান; সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়াই সেইসকল ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতএব সমাজের কল্যাণের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে অপত্যোৎপাদন বিবাহের নিতান্ত সামান্য ও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য কেহই বলিবেন না। সুস্থকায় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রফুল্লচিত্ত সুচরিত্র সন্তান উৎপাদন অপেক্ষা সমাজের মঙ্গল আর কিসে সাধিত হইতে পারে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, এ কথা আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। মনু কহিতেছেন :

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ।

> সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীগণ বহুকল্যাণভাগিনী পূজনীয়া ও গৃহের শোভাজনক হয়েন।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং।

> স্ত্রীগণ অপত্যের উৎপাদন, অপত্যের পালন ও প্রত্যহ-লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ নিদান হয়েন।

যেখানে মনু বলিয়াছেন :

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

সেইখানেই বলিয়াছেন :

যদিহি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে।

> নারী যদি দীপ্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে তিনি স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে পারেন না। স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে না পারিলে সন্তানোৎপাদন সম্পন্ন হয় না।

এই-সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে সংসারযাত্রানির্বাহই হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং কেবল সেই উদ্দেশ্যেই যতটা একীকরণ সাংসারিক হিসাবে আবশ্যক তাহার প্রতি হিন্দুধর্মের বিশেষ মনোযোগ। অনেক সময়ে সংসারযাত্রানির্বাহের সহায়তা-জন্যই পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য। কারণ, অপত্য উৎপাদন যখন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য তখন বন্ধ্যা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রমতে অন্যায় হইতে পারে না। এমন-কি, প্রাচীনকালে অশক্ত স্বামীর নিয়োগানুসারে অথবা নিরপত্য স্বামীর মৃত্যুতে দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্মহানিজনক ছিল না। মহাভারতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে।

অতএব সন্তান-উৎপাদন, সন্তানপালন ও লোকযাত্রানির্বাহ যদি হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে দেখা যাইতেছে, উক্ত কর্তব্যসাধনের পক্ষে স্ত্রীলোকের একপতিনিষ্ঠ হওয়ার যত আবশ্যক পুরুষের পক্ষে একপত্নীনিষ্ঠ হইবার তেমন আবশ্যক নাই। কারণ, বহুপতি থাকিলে সন্তানপালন ও লোকযাত্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু বহুপত্নীতে সে-ব্যাঘাত না ঘটিতেও পারে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ সংসারযাত্রার সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অধিকাংশস্থলে সংসারে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। কারণ, বিধবার যদি সন্তানাদি থাকে তবে সেই সন্তানদিগকে হয় এক কুল হইতে কুলান্তরে লইয়া যাইতে হয়, নচেৎ তাহাদিগকে মাতৃহীন হইয়া থাকিতে হয়। সন্তানাদি না থাকিলেও বিধবা রমণীকে পুরাতন ভর্তৃকুল হইতে নূতন ভর্তৃকুলে লইয়া যাওয়া নানাকারণে সমাজের অসুখ ও অসুবিধাজনক; অতএব যখন সাংসারিক অসুবিধার

কথা হইতেছে; কোনো প্রকার আধ্যাত্মিকতার কথা হইতেছে না, তখন এ স্থলে অনুপাতবাদ গ্রাহ্য। এইজন্য মনু পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন :

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেবচ।

পূর্বমৃতা ভার্যার দাহকর্ম সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্বার স্ত্রী ও শ্রৌত অগ্নি গ্রহণ করিবেন।

এখানে সংসারধর্মের প্রতিই মনুর লক্ষ দেখা যাইতেছে। আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতি অনুরাগ ততটা প্রকাশ পাইতেছে না। বিবাহের আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে। সমস্ত বিরহবিচ্ছেদ-অবস্থান্তর, সমস্ত অভাবদুঃখক্লেশ, এমন-কি কদর্যতা ও অবমাননা অতিক্রম করিয়াও ব্যক্তিবিশেষ বা ভাববিশেষের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার যে একটি পবিত্র উজ্জ্বল সৌন্দর্য আছে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিকতা বল এবং যদি বল সেই আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুবিবাহের মুখ্য অবলম্বন এবং সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য তাহার গৌণ উদ্দেশ্য, তাহার সামান্য ও নিকৃষ্ট অংশ তবে কোনো যুক্তি অনুসারেই বহুবিবাহ ও স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয় বিবাহ আমাদের সমাজে স্থান পাইতে পারিত না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি বিবাহ বলিতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই পরস্পরের সম্মিলন বুঝায়— বিবাহ লইয়া সম্প্রতি এত আন্দোলন পড়িয়াছে এবং বুদ্ধির প্রভাবে অনেকে অনেক নূতন কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ শুনা যায় নাই।

অনেকে হিন্দুবিবাহের পবিত্র একীকরণপ্রসঙ্গে ইংরেজি ডিভোর্স প্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ডিভোর্স প্রথার ভালোমন্দ বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ডিভোর্স প্রথা নাই বলিয়া যে আমাদের বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে শাস্ত্র ও রাজনিয়মে একাধিক বিবাহ হইতেই পারে না সেখানে ডিভোর্স প্রথা দূষণীয় বলা যায় না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্য স্ত্রী অথবা বারস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকের উপর পঙ্কিল পাদুকাসমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো অধিকার দেওয়া হয় নাই। যদি জানা যাইত অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষের অধিকাংশই বারস্ত্রীসক্ত নহে তবে হিন্দুবিবাহের পবিত্র প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহমোচন হইত। কিন্তু যখন পুরুষ যথেচ্ছ বিবাহ ও ব্যভিচার করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকের স্বামীত্যাগের পথ কঠিন নিয়মের দ্বারা রুদ্ধ তখন এ প্রসঙ্গে কোনো তুলনাই উঠিতে পারে না।

আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার যে যথেষ্ট প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিতে হইবে না। বৃদ্ধ লোকেরা অবগত আছেন, কিছুকাল পূর্বে অন্যান্য নানা আয়োজনের মধ্যে বেশ্যা রাখাও বড়োমানুষির এক অঙ্গ ছিল। এখনো দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ি করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে এবং ধুমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না এবং সমাজও সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা করে না। সমাজের অনেক তুচ্ছ নিয়মটুকু লঙ্ঘন করিলে যে-দায়ে পড়িতে হয় ইহাতে ততটুকু দায়ও নাই। অতএব ডিভোর্স প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়াই ইহা বলা যায় না যে, আমাদের দেশে বিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক একীকরণতা রক্ষার প্রতি সমাজের বিশেষ মনোযোগ আছে।

যাহা হউক আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুবিবাহের যথার্থ যাহা মর্ম ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ না করিয়া যদি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আপন মনের মতো এক নূতন আদর্শ গড়িয়া তাহাকে

পুরাতন বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করি, তবে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমরা ইংরেজি শিক্ষা হইতে অনেক sentiment প্রাপ্ত হইয়াছি (sentiment শব্দের বাংলা আমার মনে আসিতেছে না), অনেক দেশানুরাগী ব্যক্তি সেইগুলিকে দেশীয় ও প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন, এবং তাঁহারা বিরোধী পক্ষকে বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করেন। কেবল sentiment নহে, অনেকে Evolution, Natural Selection, Magnetism প্রভৃতি নব্য বিজ্ঞানতন্ত্রসকলও প্রাচীন ঋষিদের জটাজালের মধ্য হইতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বাছিয়া বাহির করিতেছেন। কিন্তু সাপুড়ে অনেক সময়ে নিরীহ দর্শকের ক্ষুদ্র নাসাবিবর হইতে একটা বৃহৎ সাপ বাহির করে বলিয়াই যে, উক্ত নাসাবিবর যথার্থ সেই সাপের আশ্রয়স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে। সাপ তাহার বৃহৎ ঝুলিটার মধ্যেই ছিল। Sentiment-সকলও আমাদের ঝুলিটার মধ্যেই আছে, আমরা নানা কৌশলে ও অনেক বাঁশি বাজাইয়া সেগুলি পুঁথির মধ্য হইতেই যেন বাহির করিলাম এইরূপ অন্যকে এবং আপনাকে বুঝাইতেছি। হিন্দুবিবাহের মধ্যে আমরা যতটা sentiment পুরিয়াছি তাহার কতটা Comte-র, কতটা ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের, কতটা খৃস্টধর্মের 'স্বর্গীয় পবিত্রতা' নামক শব্দ ও ভাব বিশেষের এবং কতটা প্রাচীন হিন্দুর এবং কতটা আধুনিক আচারের, তাহা বলা দুঃসাধ্য। সাংসারিকতাকে প্রাচীন হিন্দুরা হেয়জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু খৃস্টানেরা করেন। অতএব, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—এ কথা স্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে লজ্জার কারণ নহে, খৃস্টানের পক্ষে বটে। হিন্দু স্ত্রীকে যে পতিপ্রাণা হইতে হইবে সেও সাংসারিক সুবিধার জন্য। পুত্রার্থেই বিবাহ কর বা যে কারণেই কর-না কেন, স্ত্রী যদি পতিপ্রাণা না হয় তবে অশেষ সাংসারিক অসুখের কারণ হয়, এবং অনেক সময়ে বিবাহের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব সাংসারিক শৃঙ্খলার জন্যই স্ত্রীর পতিপ্রাণা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর পত্নীগতপ্রাণ হইবার এত আবশ্যক নাই যে তাহার জন্য ধরাবাঁধা করিতে হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্যা যা প্রজাবতী—সেই ভার্যা যে পতিপ্রাণা। কিন্তু ইহা বলিয়াই শেষ হয় নাই—তাহার উপরে বলা হইয়াছে, সেই ভার্যা যে সন্তানবতী। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যতই থাক্‌, সন্তান না হইলেই হিন্দুবিবাহ ব্যর্থ।

এইখানে আমার মনে একটি আশঙ্কা জন্মিতেছে। যে-শব্দের পরিষ্কার অর্থ নাই অথবা নির্দিষ্ট হয় নাই তাহা ইচ্ছামত নানাস্থানে নানা অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে সে-শব্দের উপযোগিতা বাড়ে কি কমে তাহা বিচারের যোগ্য। সকলেই জানেন আমাদের বাংলাভাষায় 'ইয়ে' নামক সর্বভুক্‌ সর্বনাম শব্দ আছে; শব্দ বা ভাবের অভাব হইলেই তৎক্ষণাৎ 'ইয়ে' আসিয়া ভাষার শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দেয়। এই সুবিধা থাকাতে আমাদের মানসিক আলস্য ও ভাবপ্রকাশের অক্ষমতা সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছে। Magnetism-এর স্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত না থাকাতে উক্ত শব্দকে আশ্রয় করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক উপকথা সমাজে প্রচলিত হয়। Magnetism-এর কুহেলিকাময় ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া আমাদের আর্যশাস্ত্রের অনেক প্রমাণহীন উক্তি ও অর্থহীন আচার বিজ্ঞানের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আসন পাইবার মন্ত্রণা করে। সম্প্রতি Psychic Force -নামক আরেকটি অজ্ঞাতকুলশীল শব্দ Magnetism-এর পদ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। যতদিন না স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়া তাহার মুক্তিলাভ হয় ততদিন সে প্রদোষের অন্ধকারে জীর্ণমতের ভগ্নভিত্তির মধ্যে ও দেবতাহীন প্রাচীন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষে প্রেতের ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে। অতএব মুক্তির উদ্দেশেই কথার অর্থ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ 'আধ্যাত্মিক' বলিতে কী বুঝায়। যদি কেহ বলেন যে, সাংসারিক কার্য সুশৃঙ্খলে নির্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহ করার নামই আধ্যাত্মিক বিবাহ, কেবলমাত্র নিজের সুখ নহে সংসারের সুখের প্রতি লক্ষ করিয়া বিবাহ করাই আধ্যাত্মিকতা, তবে বোধহয় আধ্যাত্মিক শব্দের প্রতি অত্যাচার করা হয়। পার্ল্যামেন্ট-সভায় সমস্ত ইংলন্ড এবং তাহার অধীনস্থ দেশের সুখ সম্পদ সৌভাগ্য

নির্ধারিত হয়, কিন্তু পার্ল্যামেণ্ট-সভা কি আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। যদি বল পার্ল্যামেণ্ট-সভার সহিত ধর্মের কোনো যোগ নাই তাহা ঠিক নহে। দেশের Church যাহাতে যথানিয়মে অব্যাহতরূপে বজায় থাকে পার্ল্যামেণ্টকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। উক্ত সভার প্রত্যেক সভ্যকে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বীকার করিতে হয় এবং ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। যদি বল, পার্ল্যামেণ্টের কার্যকে ইংরেজরা ধর্মকার্য বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু বিবাহকে আমরা ধর্মকার্য বলিয়া মনে করি, অতএব আমাদের বিবাহ আধ্যাত্মিক—তবে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদের কোন্ কাজটা ধর্মের সহিত জড়িত নহে। সম্মুখযুদ্ধে নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও পুণ্যের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এমন-কি, ক্রূরকর্মা দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির স্বর্গস্থ দেখিয়া যখন বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন তখন দেবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করেন যে, ক্ষত্রিয় সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়া যে-ধর্ম উপার্জন করেন তাহারই প্রভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ক্ষত্রিয় দুর্যোধন যে-যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাকে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বলিবে কি না। শরীররক্ষার্থে আহারব্যবহার সম্বন্ধে ধর্মের নামে শাস্ত্রে সহস্র অনুশাসন প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিকে আধ্যাত্মিক বলা যায় কি না। শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি অন্য-একজন ব্রাহ্মণ মাঝখানে থাকেন ও তাঁহাকে উপলক্ষ রাখিয়া শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে তাহাতে অধর্ম নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলে তাহার আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত হয় কি না, এবং ব্রাহ্মণ মধ্যবর্তী থাকিলেই সে ব্যাঘাত দূর হয় কি না। ধর্মের অঙ্গস্বরূপ নির্দিষ্ট হইলেও এ-সকল লৌকিক নিয়ম না আধ্যাত্মিক নিয়ম? যখন আমাদের সকল কার্যই ধর্মকার্য তখন ধর্মানুষ্ঠানমাত্রকে যদি আধ্যাত্মিকতা বল, তবে আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে আমরা যাহাই করি-না কেন আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইবার জো নাই।

যদি বল হিন্দু স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ অনন্ত সম্বন্ধ, দেহের অবসানে স্বামীস্ত্রীর বিচ্ছেদ নাই এইজন্য তাহা আধ্যাত্মিক, তবে সে-কথাও বিচার্য। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে কর্মফলানুসারে জন্মান্তর-পরিগ্রহ কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত কর্মফলের প্রভেদ আছেই, অতএব পরজন্মে পুনরায় উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন দৈবক্রমে হইতেও পারে কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে। আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তরের ন্যায় স্বর্গনরক-কল্পনাও আছে, কিন্তু সকল সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে একত্রে স্বর্গ বা নরকে গতি হইবে তাহা নহে। যদি পুণ্যবলে উভয়েই স্বর্গে যায় তবে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে লোকভেদ আছে, এবং পাপভেদে নরকেও সেইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের শাস্ত্রে পাপপুণ্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম বিচারের কল্পনা আছে, এ স্থলে বিবাহের অনন্তকালস্থায়িত্ব সম্ভব হয় কিরূপে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রমতে সাধারণত ইহজীবনেই দাম্পত্যবন্ধনের সীমা, অতএব তাহাকে ইহলৌকিক অর্থাৎ সাংসারিক বলিতে আপত্তি কিসের। দাম্পত্য বন্ধনের ঐহিক সীমাসম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস বদ্ধমূল। কুমারী যখন স্বামী প্রার্থনা করে তখন সে বলে, যেন রামের মতো বা মহাদেবের মতো স্বামী পাই। পূর্বজন্মের স্বামী এ-জন্মেও আধ্যাত্মিক মিলনে বদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিবে এ বিশ্বাস যদি কুমারীর থাকিত, তবে এ প্রার্থনা সে করিত না। বাল্মীকির রামায়ণে কী আছে স্মরণ নাই, কিন্তু সাধারণে প্রচলিত গান এবং উপাখ্যানে শুনা যায় সীতা রামকে বলিতেছেন, পরজন্মে যেন তোমার মতো স্বামী পাই—কিন্তু তোমাকেই পাই এ কথা কেন বলা হয় নাই।

অনেকে বলেন, অন্য দেশের বিবাহ চুক্তিমূলক, আমাদের দেশে ধর্মমূলক, অতএব তাহা আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটাই অমূলক। য়ুরোপের ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে বলে :

> Our divine Redeemer sanctified this holy state of matrimony, and from a natural and civil contract raised it to the dignity of a Sacrament.

> And St. Paul declared it to be a representative of that sacred union which Jesus Christ had formed with his spouse the Church.

ইহার মর্ম এই :

> বিবাহ পূর্বে প্রাকৃতিক ও সামাজিক চুক্তিমাত্র ছিল, কিন্তু যিশুখৃস্ট ইহাকে উদ্ধার করিয়া মন্ত্রপূত পবিত্র সংস্কারমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ধর্মমণ্ডলীর সহিত দেবতার যে-পুণ্য মিলন সংঘটিত হইয়াছে বিবাহ সেই পুণ্য মিলনের সামাজিক প্রতীকস্বরূপ।

বিবাহসময়ে ক্যাথলিক স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট যে-প্রার্থনা করেন তাহাও পাঠ করিলে য়ুরোপীয় দাম্পত্যের একীকরণতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইবে। অতএব অন্যদেশের বিবাহের তুলনায় হিন্দু-বিবাহকে বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া হয় কেন। আধাত্মিক শব্দের শাস্ত্রসংগত ঠিক অর্থটি কী তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আত্মা সম্বন্ধীয়'। কোনো খণ্ডকালে বা খণ্ডদেশে যাহার অবসান নাই এমন যে এক অজর অমর সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান, তাহা সহজবোধ্যই হউক বা দুর্বোধ্যই হউক, তৎসম্বন্ধীয় যে-ভাব তাহাকে আধ্যাত্মিক ভাব বলে। এ আত্মা সমাজ নহে, এবং এ সমাজে, এ সংসারে ও এ দেহে আত্মার নিত্য অবস্থিতি নহে—অতএব বিবাহ যদি শ্বশুরশ্বশ্রূ পরিবার প্রতিবেশী অতিথিব্রাহ্মণ প্রভৃতির সমষ্টিভূত সমাজ রক্ষার জন্য হয় অথবা ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য হয় তাহাকে কোন্ অর্থ অনুসারে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া যায়। যে-উদ্দেশ্য জন্মমৃত্যুসংসারকে অতিক্রম করিয়া নিত্য বিরাজ করে তাহাকেই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কহে। কিন্তু হিন্দুমতে বিবাহ নিত্য নহে, আত্মার নিত্য আশ্রয় নহে। হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহা সংসারের হিতসাধনের জন্য নহে।

যাহা হউক, আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিতেছি আমাদের বিবাহ সামাজিক বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন-কি, এখন মনুর নিয়মও সমস্ত রক্ষিত হয় না। অতএব বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন করিবার অধিকার আছে। যদি দেখা যায় হিন্দুবিবাহে আমাদের বর্তমান সমাজে রোগ শোক দারিদ্র্য বাড়িতেছে, তবে বলা যাইতে পারে, মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া বিবাহের নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের নিয়ম-পরিবর্তন করা অন্যায় নহে। ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজসংস্কার আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল-পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল অমঙ্গল কোনোকালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না; জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে কবে।

বিবাহের বয়সনির্ণয় লইয়া কিছুদিন হইতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যদি এমন বিবেচনা করা যায় যে, সন্তানোৎপাদন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সুস্থ সবল সন্তান উৎপাদন সমাজের কল্যাণের প্রধান হেতু, তবে সুস্থ সন্তানোৎপাদনপক্ষে স্ত্রীপুরুষের কোন্ বয়স উপযোগী বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু কিছুদিন হইতে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোনো কথাই শুনিবেন না বলিয়া দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শরীরতত্ত্ববিৎ কোনো পণ্ডিতেরই মত শুনিতে চাহেন না, আপনারা মত দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, বাল্যবিবাহে সন্তান দুর্বল হয় এ-কথা শ্রবণযোগ্য নহে। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশের মনুষ্যেরাই যে কেবল দুর্বল তাহা নহে পশুরাও দুর্বল, অথচ পশুরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মনুর বিধান মানিয়া চলে না; অতএব বাল্যবিবাহের দোষ দেওয়া যায় না, দেশের জল-

বায়ুরই দোষ। এ বিষয়ে গুটিদুয়েক বক্তব্য আছে। সত্যই যে আমাদের দেশের সকল জন্তুই অন্যদেশের তজ্জাতীয় জন্তুদের অপেক্ষা দুর্বল তাহা রীতিমত কোনো বক্তা বা লেখক প্রমাণ করেন নাই। আমাদের বঙ্গদেশের ব্যাঘ্র ভুবনবিখ্যাত জন্তু। বাংলার হাতি বড়ো কম নহে, অন্যদেশের হাতির সহিত ভালোরূপ তুলনা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোনো মত ব্যক্ত করা অন্যায়। আমাদের দেশের বন্যপশুদের সহিত অন্য দেশের বন্যপশুর তুলনা কেহই করেন নাই। গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহাদের বিষয়েও ভালোরূপ না জানিয়া কেবল চোখে দেখিয়া কিছুই বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের উপরে যে জলবায়ুর প্রভাব আছে এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহের কথা চাপা দেওয়া যায় না। শ্যালককে মন্দ বলিলেই যে ভগ্নীপতিকে ভালো বলা হয়, ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ কোনো পদ্ধতি নাই। দেশের জলবায়ুর অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বাল্যবিবাহের দোষ তাহাতে কাটে না, বরং বাড়ে। বাল্যবিবাহে দুর্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে, এ কথা শুনিলেই অমনি আমাদের দেশের অনেক লোক বলিয়া উঠেন এবং লিখিয়াও থাকেন যে, 'ম্যালেরিয়াতে দেশ উচ্ছন্ন গেল, তাহার বিষয় কিছুই বলিতেছ না, কেবল বাল্যবিবাহের কথাই চলিতেছে!' যখন একটা কথা বলিতেছি তখন কেন যে সে-কথাটা ছাড়িয়া দিয়া আরেকটা কথা বলিব তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যাহারা কোনো কর্তব্য সমাধা করিতে চাহে না তাহারা এক কর্তব্যের কথা উঠিলেই দ্বিতীয় কর্তব্যের কথা তুলিয়া মুখচাপা দিতে চায়। আমরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং অতিশয় দূরদৃষ্টি ও সম্পূর্ণ সাবধানতাসহকারে দেশের সমস্ত অভাব এবং বিঘ্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সমালোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাকা চাল চালিতে চাহি, যাহাতে একই সময়ে সকল দিকে সকল প্রকার সুবিধা করিতে পারি এবং সজোরে 'কিস্তিমাত' উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হইতে যাবজ্জীবন নির্বিঘ্নে তামাক এবং তাকিয়া সেবন করিবার অখণ্ড অবসর প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান বাঙালি হইলেও ঠিক এমন সুযোগটি সংঘটন করিতে পারিব না। এমন-কি, আমাদিগকেও ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। অতএব দেশে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য দুর্বলতার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে বাল্যবিবাহের কুফল সমালোচন ও তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। একেবারে অনেক অধিক ভাবিতে পারিব না, কারণ অত্যন্ত অধিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে অনেক সময়ে চিন্তনীয় বিষয় সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া চিন্তার অতীত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে হয়। মহাবীর হনুমান যদি অতিরিক্তমাত্রায় লম্ফনশক্তি প্রয়োগ করিতেন তবে তিনি সমুদ্র ডিঙাইয়া লঙ্কায় না পড়িয়া লঙ্কা ডিঙাইয়া সমুদ্রে পড়িতেও পারিতেন। ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে, অন্যান্য সকল শক্তির ন্যায় চিন্তাশক্তিরও সংযম আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের কথায় যদি কর্ণপাত না করি তবে সত্য সম্বন্ধে কিছু কিনারা করা দুর্ঘট। আমরা নিজে সকল বিষয়েই সকলের চেয়ে ভালো জানিতে পারিব না অতএব অগত্যা বিনীত ভাবে পারদর্শীদের মত লইতেই হয়। কিছুদিন হইল আমাদের মান্য সভাপতি[1] এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে বিধান দিয়াছেন তাহা কালক্রমে পুরাতন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে-সকল কথা পাড়িতে সাহস হয় না— সকলেই পরম অশ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিবেন, 'সেই এক পুরাতন কথা!' কিন্তু আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। পুরাতন কথা বারবার তুলিতেই হইবে— নাচার।

ডাক্তার কার্পেন্টারকে সকলেই মান্য করিয়া থাকেন, শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মস্ত পণ্ডিত এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; অতএব এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিতে সকলেই বাধ্য। তিনি বলেন, ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে। অনেকে বলেন, উষ্ণদেশে স্ত্রীলোকদের যৌবনারম্ভের বয়স শীতদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত

---

[1] শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

অনেক অল্প। কিন্তু কার্পেন্টার তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যৌবনলক্ষণ প্রকাশ শারীরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে, বাহ্য উত্তাপের উপরে নহে। বাহ্য উত্তাপ সামান্য পরিমাণে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে মাত্র। অতএব যৌবনবিকাশ সম্বন্ধে বাহ্য উত্তাপের প্রভাব অতি সামান্য। আমাদের মান্য সভাপতি মহাশয়ের মতের সহিতও এই মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। তবে আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসর বয়সেও যে অনেক স্ত্রীলোকের যৌবনসঞ্চার হইবার উপক্রম দেখা যায় তাহা বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে। বাল্যকালে স্বামীসহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়, ইহা সহজেই মনে করা যায়। যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইবামাত্রই যে স্ত্রীপুরুষ সন্তানোৎপাদনের যোগ্য হয় তাহাও নহে। কার্পেন্টার বলেন :

> যৌবনারম্ভে স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়সকলের বিকাশ লক্ষণ দেখা দিবামাত্র যে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহা কেবল পূর্ববর্তী আয়োজন মাত্র। নরনারী যখন সর্বাঙ্গীণ পরিস্ফুটতা লাভ করে হিসাবমতে তখনই তাহারা জাতিরক্ষার জন্য জননশক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকারী হয়।

আমাদের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—যেমন দাঁত উঠিলেই অমনি ছেলেদের খুব শক্ত জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত হয় না, তেমনই যৌবন সঞ্চার হইবামাত্র স্ত্রীপুরুষ সন্তান-উৎপাদনের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তারদের মত এতবার সাধারণের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে যে, এস্থলে অন্য পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। সুশ্রুতসংহিতার সহিত এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহাও সকলে অবগত আছেন—অতএব শাস্ত্র-আস্ফালন করিয়া প্রবন্ধবাহুল্যের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

যাহা হউক, কাহারও কাহারও মতের সহিত না মিলিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মান্য ব্যক্তিগণ বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শাইয়া বলিয়া থাকেন যে, যৌবনারম্ভ হইবামাত্রই অপত্যোৎপাদন স্ত্রীপুরুষ এবং সন্তানের শরীরের পক্ষে ক্ষতিজনক। অতএব বিজ্ঞানের পরামর্শ লইতে গেলে বাল্যবিবাহ টেঁকে না।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে দুই দল আছেন। একদল মনুর ব্যবস্থানুসারে পুরুষের ২৪ হইতে ৩০-এর মধ্যে এবং স্ত্রীলোকের ৮ হইতে ১২-র মধ্যে বিবাহ দিতে চান, আর-এক দল, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাল্যাবস্থায় বিবাহে কোনো দোষ দেখেন না। ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’-নামক একখানি পরমোৎকৃষ্ট গ্রন্থে মান্যবর লেখক ‘বাল্যবিবাহ’ নামক প্রবন্ধে প্রথমে মনুর নিয়মের প্রশংসা করিয়া তাহার পরেই লিখিতেছেন :

> ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুটিকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটি নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে-প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে।

অতএব পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ লেখকের অভিমত কি না তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু বলেন, যখন স্ত্রীকে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতে হইবে, তখন স্বামীর পরিণতবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। কারণ :

> যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার জ্ঞানবান বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশি, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম।

চব্বিশে এবং আটে বিবাহ হইলে হাড়ে হাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও পারে কিন্তু সে-মিশ্রণ সত্বর বিশ্লিষ্ট হইতে আটক নাই। দম্পতির বয়সের এত ব্যবধান থাকিলে আমাদের

দেশে বিধবাসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িবে সন্দেহ নাই। যদিও বৈধব্যব্রতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষ ও রমণী উভয়েরই কল্যাণ কামনায় ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাই বলিয়া বিবাহিতা রমণীর বৈধব্য প্রার্থনীয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়বাবু এই মনে করিয়াই ‘হিন্দুবিবাহ’ প্রবন্ধে ‘কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহ’ অন্যায় বলিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ ইহাই স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

> আসুন-না, সকলে মিলিয়া আমরা বালকবিবাহের কার্যত প্রতিবাদ করি। করিলে বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে। যাহার বিবাহ হয় নাই সে বিধবা হইয়াছে এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।

যদি ২৪ বৎসর এবং তদূর্ধ্ব বয়সে পুরুষের বিবাহ স্থির হয়, তবে যিনি যেরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন কন্যার বয়সও বাড়াইতেই হইবে।

এইখানে চন্দ্রনাথবাবুর কথা ভালো করিয়া সমালোচনা করা যাক। কেন কন্যার বয়স অল্প হওয়া আবশ্যক তাহার কারণ দেখাইয়া চন্দ্রনাথবাবু বলেন :

> ইংরেজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিস্টজিটনের বিবাহ; যিশুখৃস্টের সহিত সেন্ট পলের বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, হিন্দুবিবাহ মহৎ-উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া হিন্দুদম্পতির সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া আবশ্যক, নতুবা উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। এবং এক হইতে গেলে স্ত্রীর বয়স নিতান্ত অল্প হওয়া চাই। মহৎ উদ্দেশ্য বলিতে এখানে স্ত্রীর পক্ষে এই বুঝাইতেছে যে, শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা দেবর প্রভৃতির সহিত মিলিয়া গৃহকার্যের সহায়তা, অতিথির জন্য রন্ধন ও সেবা, পরিবারে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান হয় তাহার আয়োজনে সহায়তা করা এবং স্বামীর সেবা করা। স্বামীর পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক নিত্যকার্যে স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা। সাংসারিক নিত্য-অনুষ্ঠেয় কার্যে স্ত্রীর সাহায্যগ্রহণ-করা-রূপ মহৎ উদ্দেশ্য সকল দেশের সকল স্বামীরই আছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদ এই, সকল দেশে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সমান নহে। দেশভেদে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রভেদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যভেদ দেখিতেছি না। মুসলমান সংসারে নিত্যঅনুষ্ঠান কী কী তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি মুসলমান পত্নী সে-সকল অনুষ্ঠানের প্রধান সহায়। ইংরেজপরিবারে নিত্যকার্য কী তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি ইংরেজ পত্নীর সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেবল তাহাই নহে, শুনিয়াছি সাংসারিক কার্য ছাড়া অন্যান্য মহৎ বা ক্ষুদ্র কার্যেও ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকেন। লেখকের স্ত্রী স্বামীর কেরানীগিরি করেন, প্রুফ-সংশোধন করেন, এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষা গুরুতর সাহায্য করিয়া থাকেন। পাদ্রির স্ত্রী পল্লীর দরিদ্র রুগ্‌ণ শোকাতুর ও দুষ্কর্মকারীদের সাহায্য সেবা সান্ত্বনা ও উপদেশ দান করিয়া স্বামীর পৌরোহিত্য কার্যের অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি দরিদ্রের দুঃখমোচন বা অসুস্থের স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি কোনো লোকহিতকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে কায়মনে সাহায্য করে। চন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি না করে? আমার উত্তর, হিন্দু স্ত্রী যদি সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম না পালন করে? সে যদি দুষ্টস্বভাব বা আলস্যবশত শাশুড়ির সহিত ঝগড়া করে ও সঘনে হাতনাড়া দিয়া কঠিন পণ করিয়া বসে, আমি অমুক গৃহকাজটা করিতে পারিব না, তবে কী হয়। তবে হয় তাহাকে বলপূর্বক সে-কাজে প্রবৃত্ত করানো হয়, নয় বধূর এই বিদ্রোহ পরিবারকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইংলন্ডেও সম্ভবত তাহাই ঘটে। যদি ইংরেজ স্ত্রী তাহার অসহায় স্বামীকে বলিয়া বসে তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পাকাদির ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব না, তবে হয় স্বামী বলপ্রকাশ বা ভয়-

প্রদর্শন করে, নয় ভালোমানুষটির মতো আর-কোনো বন্দোবস্ত করে। চন্দ্রনাথবাবু বলিবেন, হিন্দু স্ত্রী এমনভাবে শিক্ষিত ও পালিত হয় যে বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অল্প; অপর পক্ষে তেমনই বলা যায়, ইংরেজ স্ত্রী যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতায় পালিত, তাহাতে সাংসারিক কার্য ছাড়া মহৎ স্বামীর অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিতে সে অধিকতর সক্ষম। কতকগুলি কাজ যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়, এবং কতকগুলি কাজ স্বাধীন ইচ্ছার বল ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। রন্ধন ও শুশ্রূষাদি শাশুড়ি-ননদের নিত্য সেবা এবং গৃহ-কর্মের অনুষ্ঠানে সাহায্য করা, আশৈশব অভ্যাসে প্রায় সকলেরই দ্বারা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিল যেরূপ স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন সেরূপ স্ত্রী জাঁতায় পিষিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। হার্মোদিয়াস এবং এরিস্টজিটন, যিশুখৃস্ট এবং সেন্ট পল, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, রাম এবং লক্ষ্মণের যে মহৎউদ্দেশ্যজাত বিবাহ তাহা জাঁতায় পেষা বিবাহ নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিবাহ। কেহ না মনে করেন আমি জাঁতায়-পেষা বিবাহের নিন্দা করিতেছি, অনেকের পক্ষে তাহার আবশ্যক আছে; তাই বলিয়া যিনি একমাত্র সেই বিবাহের মহিমা কীর্তন করিয়া অন্য সমস্ত বিবাহের নিন্দা করেন তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্বত্রই পুরুষ বলিষ্ঠ, অনেক কারণেই স্বামী স্ত্রীলোকের প্রভু; এইজন্য সাধারণত প্রায় সর্বত্রই সংসারে স্ত্রী স্বামীর অধীন হইয়া কাজ করে। ইংরেজের অপেক্ষা আমাদের পরিবার বৃহৎ এইজন্য পরিবারভারে অভিভূত হইয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অধীন-অবস্থা অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়া উঠে। ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর অধীন বটে কিন্তু বৃহৎ সংসারভারে এত ভারাক্রান্ত নহে যে, কেবল পারিবারিক কর্তব্য ছাড়া আর-কোনো কর্তব্য সাধন করিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। এইজন্য পরিবারের অবশ্য-কর্তব্যকার্য তাহাকে সাধন করিতেই হয়, এবং তাহা ছাড়া জগতের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্তব্যগুলি পালন করিতেও তাহার অবসর হয়। যদি বল অনেক ইংরেজ স্ত্রী সে-অবসর বৃথা নষ্ট করেন তবে এ পক্ষে বলা যায় যে, অনেক হিন্দু স্ত্রী জগতের অনেক স্থায়ী উপকার করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কুটনা কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতএব দাম্পত্যবলে বলীয়ান হইয়া কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বিবাহ করিতে হইলেই যে শিশুস্ত্রীকে বিবাহ করাই আবশ্যক তাহা আমার বিশ্বাস নহে। শিক্ষা পাইলেই যে লোকে মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহা নহে, স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। অতএব শিশুস্ত্রী বড়ো হইয়া মহৎ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনে স্বামীর সহযোগিনী হইতে পারিবে কি না কিছুই বলা যায় না। কতকগুলি নিত্য-অভ্যস্ত কার্য নির্বিচারে ও নিপুণতাসহকারে সম্পন্ন করা এক, আর শিক্ষামার্জিত স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি ও বিবেচনা সহকারে জগতের উন্নতি-সাধনকার্যে স্বামীর সহযোগিতা করা আর-এক। ইহার জন্য নির্বাচন এবং দুই হৃদয়ের এক মহৎ-উদ্দেশ্যগত স্বাভাবিক আকর্ষণ আবশ্যক। তবে নির্বাচন করিতে গেলে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া পাছে রূপ যৌবন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয় এই ভয়। কিন্তু যদি গোড়াতেই পুরুষকে পরিণতবয়স্ক বিদ্যাবান ধর্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও মহৎ-উদ্দেশ্যসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে ইহা কেন মনে করা হয়, উক্ত পুরুষ কেবলমাত্র কন্যার রূপ দেখিয়াই কন্যা নির্বাচন করিবেন। চন্দ্রনাথবাবু গোড়ায় তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তিনি বলেন মহৎ-উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য স্ত্রীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার ভার স্বামীর উপরে, অতএব হিন্দুবিবাহে স্বামীর পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক। এমন স্বামী যদি অধিক থাকে, সমাজের এত উন্নতির অবস্থা যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে অনেক গোলযোগ গোড়ায় মিটিয়া যায়। তবে সে-সমাজে মহৎ পিতামাতার মহৎ আদর্শ ও মহৎ শিক্ষায় কন্যারাও সহজে মহত্ত্ব লাভ করে এবং মহৎ পুরুষের পক্ষে মহৎ-উদ্দেশ্যসম্পন্ন স্ত্রী লাভ করাও দুরূহ হয় না। কিন্তু সর্বত্রই ভালো মন্দ দু-ই আছে, এবং মহৎ উদ্দেশ্য সকলের দেখা যায় না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর প্রভৃতির যথাবিহিত সেবা, এবং পুরপ্রচলিত দেবকার্যের যথাবিধি সহায়তা করিয়া স্ত্রী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেই যে সকল স্বামীর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি

ঘটে তাহা নহে। স্বামী চায় মনের মতো স্ত্রী। তাহারই বিশেষ প্রীতিকর রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রী নহিলে কেবল অভ্যস্ত-গৃহকার্যনিষ্ঠা স্ত্রী লইয়া তাহার সম্পূর্ণ বাসনা তৃপ্ত হয় না। মনুষ্যের যে কেবল একমাত্র গার্হস্থ্য শৃঙ্খলার প্রতিই দৃষ্টি আছে তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্যের প্রতি স্পৃহা, কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ, এবং লোকবিশেষে কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও নৈতিকগুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এইজন্য রুচি-অনুসারে স্বভাবতই মানুষ সৌন্দর্য সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং আপন মনের গতি-অনুযায়ী বিশেষ কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণ স্ত্রীর নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। স্ত্রীতে তাহার অভাব দেখিলে হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যায়। সেরূপ স্থলে অনেক পুরুষ হতাশ হইয়া বারাঙ্গনাসক্ত হয় এবং অনেক পুরুষ দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া মনের অসুখে স্ত্রীর প্রতি ঠিক ন্যায্য ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা তো অনেক স্থলেই দেখা যায় স্ত্রী অভ্যাসমত গৃহকোণে আপনমনে নিত্যগৃহকার্য ম্লানমুখে সম্পন্ন করিতেছে, স্বামীর তাহার প্রতি লক্ষই নাই, আদর নাই, যত্ন নাই।

কেহ কেহ বলিবেন আধুনিক শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই এরূপ ঘটিতেছে, পূর্বে এতটা ছিল না। এ কথা অসংগত নহে। পূর্বে আমাদের মনে সকল বিষয়েই যে-একটি সন্তোষ ছিল, ইংরেজিশিক্ষায় তাহা দূর করিয়া দিয়াছে। ইংরেজের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় বাঙালির মনে কিয়ৎপরিমাণে উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েই অদৃষ্টের হাত দেখিয়া আপন হাত গুটাইয়া লইতে পারি না। এইজন্য কোনো অভাব বোধ করিলে সকল সময়ে অদৃষ্টকে ধিক্‌কার না দিয়া আপনাকেই ধিক্‌কার দিই; ইহাই অসন্তোষ। আমাদের আকাঙ্ক্ষাবেগ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, এবং আগে অনেক কিছু যাহা অনুভব করিতাম না এখন তাহা অনুভব করিয়া থাকি। অতএব আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়াছে, এবং আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে উদ্যমও বাড়িয়াছে। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, আধুনিক কালে অনেক পুরুষ তাঁহার বাল্যবিবাহিতা পত্নীর প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে স্বভাববিরুদ্ধ কিছু ঘটিয়াছে এমন বলিতে পারি না। অনেকে বলিবেন এরূপ যাহাতে না হয়, প্রাচীন সন্তোষ যাহাতে ফিরিয়া আসে, এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কালে পুরুষের প্রতি যে-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এখন সে-শিক্ষাপ্রণালী আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। আমরা যে-শিক্ষার দায়ে পড়িয়াছি তাহা লইয়াই বিব্রত, কারণ তাহার সহিত পেটের দায় জড়িত। চারি দিকের অবস্থা আলোচনা করিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে এ শিক্ষা এখন অনেক কাল চলিবেই। অতএব এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ এবং অলক্ষ্য প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুতরাং সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান সমালোচন করিবার সময় এ শিক্ষাকে একেবারেই আমল না দিলে চলিবে কেন। সমাজে যে-শিক্ষা প্রচলিত নাই তাহারই ফলাফল বিচার করিয়া, এবং যে-শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাকে দূরে রাখিয়া কোনো সমাজনিয়ম স্থাপন করা যায় না।

বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজিশিক্ষার কী প্রভাব তাহা আলোচনা আবশ্যক। পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজি মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রীপুরুষের একীকরণ ইংরেজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে-একীকরণ সর্বাঙ্গীণ একীকরণ—কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ। স্বামী যদি বিদ্বান হয় এবং স্ত্রী যদি মূর্খ হয় তবে উভয়ের মধ্যে মানসিক একীকরণ সম্ভবে না, পরস্পরের মধ্যে সম্যক্‌ ভাবগ্রহ চলিতে পারে না। একটি প্রধান বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে।

জীবনের সমুদয় কর্তব্যসাধনে স্ত্রীর সহযোগিতা, ইহাও ইংরেজি বিবাহের আদর্শ। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি; এবং ইহাও বলিয়াছি এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে মিলন ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায় না। চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের, যিশুখৃস্টের সহিত সেন্ট পলের, রামের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ অনিবার্য স্বাভাবিক মিলন ঘটিয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। ইংরেজি সকল বিবাহে যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু এইরূপ বিবাহই তাহাদের আদর্শ।

যাঁহারা বলেন হিন্দুবিবাহের এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনো মানিতে

পারি না। হিন্দুবিবাহে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য। আমরা স্ত্রীকে সহধর্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিতমতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না। ইহাকে যদি সহধর্ম বলে তবে প্রাচীন কালের শূদ্রদিগকেও ব্রাহ্মণের সহধর্মী বলা যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্মব্রতপালনের ঐক্য নাই, কেবলমাত্র জাতিকুলের ঐক্য আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে ইংরেজিশিক্ষার গুণে এই ইংরেজি একীকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। হৃদয়মনের স্বাভাবিক নিগূঢ় ঐক্য থাকা প্রযুক্ত দুই স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্বক এক হইয়া যাওয়াই ইংরেজি একীকরণ; আঠা দিয়া এবং চাপ দিয়া জোড়া, সে অন্য প্রকার একীকরণ। উক্ত ইংরেজি আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজি ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই। জলে প্রবেশ করিয়া মাছ ধরিতে গেলে ভিজিতেও হইবে।

অতএব আধুনিক শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকেই যখন স্ত্রী গ্রহণ করেন তখন সে স্ত্রী যে কেবলমাত্র গৃহকার্য নিপুণরূপে সম্পন্ন করিবে, ও তাঁহাকেই দেবতা জ্ঞান করিবে, ইহাই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না। সে স্ত্রীর স্বাভাবিক গুণ ও শিক্ষা তাঁহারা দেখিতে চান, এবং যাঁহারা ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন, তাঁহারা স্ত্রীর কোনো স্থায়ী রোগপ্রবণতা বা অঙ্গহীনতা না থাকে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে চান। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ বিচার করিয়া বিবাহ করিবেন তাহা বলি না। অনেকেই ধন রূপ বা যৌবন-মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবেন। বর্তমান হিন্দুবিবাহেও সেরূপ হইয়া থাকে। অক্ষয়বাবু তাঁহার বক্তৃতায় কায়স্থবিবাহে দরদামের প্রাবল্য এবং কুলশীলের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রচলিত বিবাহে কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াও যে কন্যা নির্বাচন হয় না, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। ইহার যা ফল তাহা এখনো হয় পরেও হইবে। পিতার ধনমদে মত্ত বধূ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে দরিদ্র পতিকুলের অশান্তির কারণ হইয়া থাকে; এবং অক্ষমতাবশত দরিদ্র পিতা কন্যার বিবাহের পণ সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি করিলে অভাগিনী কন্যাকে তজ্জন্য বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অতএব কেবলমাত্র ধনযৌবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কন্যানির্বাচন করিলে তাহার যা ফল তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা গুণ দেখিয়া কন্যা বিবাহ করিতে চান, বাল্যবিবাহে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা। চরিত্রবিকাশ না হইলে কন্যার গুণাগুণ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কন্যা বড়ো হইয়াই যে সত্যনিষ্ঠ সদ্‌বিবেচক প্রিয়বাদিনী ও হিতানুষ্ঠাননিরতা হইবে তাহা বলা যায় না। অনেক শিশুস্ত্রী বড়ো হইয়া নানাবিধ বৃথা অভিমানে ও উত্তরোত্তর-বিকাশমান হীন স্বভাব-বশত ঝগড়া-বিবাদ ও ঘরভাঙাভাঙি করিয়া থাকে। এবং অনেকে অগত্যা বধূদশা নিরুপদ্রবে যাপন করিয়া যথাসময়ে প্রচণ্ড শাশুড়িমূর্তি ধারণ করিয়া অকারণে নিজ বধূর প্রতি যৎপরোনাস্তি নিপীড়ন, অধীনাগণকে তাড়ন ও গৃহের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে কী করিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের সমাজে এরূপ শাশুড়ির বহুল অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। অতএব বাল্যবিবাহেই যে সুগৃহিণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যৌবনবিবাহে হয় না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

উপহাসরসিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, যদি এমন করিয়া বাছিয়াই বিবাহ প্রচলিত হয় তবে সমাজে অন্ধ খঞ্জ কুৎসিত অঙ্গহীনদের দশা কী হইবে। মনুর আমলে অঙ্গহীনতা প্রভৃতি দোষ জন্য যে-সকল কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের দশা কী হইত। পিতামাতার উপরে নির্বাচনের ভার রহিয়াছে বলিয়াই যদি সমাজে অন্ধ খঞ্জ অঙ্গহীনরা পার হইয়া যায়, তবে এমন হৃদয়হীন বিবেচনাশূন্য নির্বাচনপ্রণালী অতি ভয়ানক বলিতে হইবে। ছেলেমেয়ের বিবাহ

দিবার সময় পিতামাতা তাহাদের মঙ্গল আগে খুঁজিবেন, না সমাজের যত অন্ধখঞ্জদের সুখ আগে দেখিবেন?

কিন্তু পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেই সকল সময়ে মনের মতো হইবে এমন কী কথা আছে— ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনের মতো বিবাহ করাই যদি মত হয় তবে পছন্দ করিয়া লইতেই হইবে। আসল কথা, মনের মতো পাওয়া শক্ত, অতএব ঠকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কয়জন লোক বলিতে পারেন, তবে আমি মনের মতো চাই না—মনের অ-মতো হইলেও ক্ষতি নাই। যদি আমার সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, আমার সমগ্র মানবপ্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য আমি স্ত্রী চাই, তবে তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এমন কোনো কথাই নাই। কিন্তু সন্ধানপূর্বক বিবেচনাপূর্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য পন্থা নাই। Catholic শাস্ত্র দাম্পত্য-নির্বাচন সম্বন্ধে কী বলেন এইখানে উদ্ধৃত করিব :

> They ought to implore the divine assistance by fervent and devout prayer, to guide them in their choice of a proper person; for on the prudent choice which they make will very much depend their happiness both in this life and in the next. They should be guided by the good character and virtuous dispositions of person of their choice rather than by riches, beauty or any other worldly considerations, which ought to be but secondary motives.

এখনকার অনেক ছেলে যথাসম্ভব স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লয়। এখন অনেক স্থলে শুভদৃষ্টিই যে প্রথম দৃষ্টি তাহা নয়। অতএব দেখিতেছি নির্বাচনপ্রথা অল্পে অল্পে শুরু হইয়াছে। পিতামাতারাও ইহাতে ক্ষুব্ধ নহেন।

তবে একান্নবর্তী পরিবারের কী দশা হইবে। বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে এই এক প্রধান যুক্তি। স্ত্রীকে যে অনেকের সহিত এক হইতে হইবে। স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ একীকরণ সকল সময় হউক বা না হউক, বৃহৎ পরিবারের সহিত বধূর একীকরণসাধন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবু যাহা বলেন তাহা যথার্থ :

> ইংরেজপত্নীর যেমন একটিমাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যদি তাহাই হয় তবে কেমন করিয়া শৈশববিবাহের নিন্দা করি।

শৈশববিবাহের যে নিন্দাই করিতে হইবে, এমন তো কোনো কথা নাই। অবস্থাবিশেষে তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি স্ত্রীশিক্ষা না থাকে এবং একান্নবর্তী পরিবার থাকে, তবে শিশুস্ত্রীবিবাহ সমাজরক্ষার জন্য আবশ্যক। কিন্তু তাহার জন্য আরও গুটিকতক আবশ্যক আছে; তাহার প্রতি কেহ মনোযোগ করেন না। পুরাকালে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক এবং তখন সাংসারিক অবস্থা যেরূপ ছিল সেইরূপ অবস্থা আবশ্যক। কারণ, কেবলমাত্র শিশুস্ত্রীবিবাহের উপর একান্নবর্তী পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে না।

পূর্বকালে সমাজের যে-অবস্থা ছিল ও যে-শিক্ষা প্রচলিত ছিল, সেই-সমস্ত অবস্থা ও শিক্ষা একত্র মিলিয়া একান্নবর্তী-পরিবার-প্রথার স্থায়িত্ব বিধান করিত। ইহার মধ্যে কোনো একটিকে বাছিয়া লইলে চলিবে না। সন্তোষ একান্নবর্তী-প্রথার মূলভিত্তি। বর্তমান সমাজে সন্তোষ কোথায়। আমাদের কত কী চাই তাহার ঠিক নাই। প্রথমত, ছাতা জুতা টুপি অশন বসন ভূষণ এবং ভদ্র-

সমাজের বাহ্য উপকরণ বিস্তর বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের দামও বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও মহার্ঘতা বাড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে লেখাপড়া অল্প ছিল এবং তাহার খরচ অল্প ছিল। সংস্কৃত সকলে শিখিতেন না, যাঁহারা শিখিতেন তাঁহাদের জন্য টোল ছিল। রাজভাষা ফার্সি কেহ কেহ শিখিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের বর্তমান রাজভাষাশিক্ষার ন্যায় এমন গুরুতর ব্যাপার ছিল না। শুভংকর ও বাংলা বর্ণমালা শিখিতে অধিক সময়ও চাই না, অর্থও চাই না। কিন্তু এখন ছেলেকে ইংরেজি শিখাইতে হইবে, পিতামাতার মনে এ-আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই জাগ্রত থাকে। কেহ কেহ বা ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবেন, এমন বাসনাও মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন। ইংরেজিবিদ্যাকে যে সকলে শুদ্ধমাত্র অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা নহে; অনেকেই মনে করেন, ইংরেজি শিক্ষা না হইলে মানসিক, এমন-কি, নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এইজন্য ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া তাঁহারা পরম কর্তব্য জ্ঞান করেন। অতএব সন্তানের স্থায়ী উন্নতিসাধন পিতামাতার সর্বপ্রধান ধর্ম, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা পুত্রের সামান্য শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সবসুদ্ধ ধরিয়া অভাব আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুসারে খরচপত্র বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের সচ্ছল ও সন্তোষের অবস্থাতেই একান্নবর্তী পরিবার সম্ভব। যখন সকলেরই অভাব অল্প এবং সামান্য পরিশ্রমেই সে-অভাব মোচন হইতে পারে, তখন অনেকে একত্র থাকিয়া পরস্পরের অভাবমোচনচেষ্টা স্বাভাবিক, এবং তাহা দুরূহ নহে। বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন (ইংরেজিতে যাহাকে clan system বলে) সাধারণের অল্প অভাব এবং এক উদ্দেশ্য থাকিলে সহজেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই যদি বিপুল অভাব ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য জন্মে তবে ঐক্যবন্ধন বলবৎ থাকিতে পারে না। অভাব আমাদের বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে, একান্নবর্তী পরিবারও টলমল করিতেছে—অনেক পরিবার ভাঙিয়াছে এবং অনেক পরিবার ভাঙিতেছে।

ইংরেজি শাস্ত্রে স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয়। স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে সেখানে বুদ্ধির ভিন্নতা-অনুসারে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা জন্মিয়াই থাকে। এখন কর্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। ভিন্ন মত না থাকিলে বর্তমান প্রবন্ধ লইয়া আজ আমাকে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে হইত না। যখন শাস্ত্রের প্রবল অনুশাসনে সকলে গুটিকতক কর্তব্য শিরোধার্য করিয়া লইত তখন ভিন্ন লোকের মধ্যে জীবনযাত্রার ঐক্য ছিল, এবং এক শাস্ত্রের অধীনে অনেকে মিলিয়া বাস করা দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু এখন যখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, শাস্ত্র বলিতেছে বলিয়াই কিছু মানি না, এমন-কি, যাঁহারা শাস্ত্রকে সম্মান করেন তাঁহারা অনেকে আপন মতানুসারে শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করেন, অথবা নিজের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের কোনো কোনো অংশ বর্জন করিয়া কোনো কোনো অংশ নির্বাচন করিয়া লন, তখন নির্বিরোধে একত্র অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়। অতএব একত্র থাকিতে গেলে সকলের অভাব অল্প থাকা চাই, এবং যুক্তিবিচারনিরপেক্ষ কতকগুলি সরল কর্তব্য থাকা চাই, এবং তাহার কর্তব্যতার প্রতি সকলের সমান বিশ্বাস থাকা চাই।

ইহা ছাড়া পরিবারের একটি কর্তা থাকা চাই। কিন্তু এখন পূর্বের মতো কর্তার কর্তৃত্ব তেমন নাই বলিলেও হয়। বঙ্গদেশে পিতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, এইজন্য সচরাচর গুরুতর পিতৃদ্রোহ ততটা দেখা যায় না; কিন্তু বড়ো ভায়ের প্রতি ছোটো ভায়ের অসম্মান এবং ভায়ে ভায়ে বিরোধ, ইহা অনেক দেখা যায়। বড়ো ভাই যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য, এবং যাহা করিবেন তাহাই সহিয়া থাকিতে হইবে, ইহা এখন সকলে মানে না। যে-কারণে শাস্ত্রের অনুশাসন শিথিল হইয়া আসিতেছে, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের নির্বিচার ভক্তিবন্ধন সেই কারণেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এ স্থলে আরেকটি বিষয় বিচার্য। তাহা শিক্ষার বৈষম্য। যে ভালোরূপ ইংরেজি শিখিয়াছে এবং যে শেখে নাই, তাহাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান পড়িয়াছে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্বে বিদ্বান-মূর্খের মধ্যে এরূপ প্রভেদ ছিল না। তখন একজন বেশি

জানিত আরেকজন কম জানিত, এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে, আরেকজন অন্যরূপ জানে। এইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয়ে উভয়কে জানে না। সামান্য বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝে, এইজন্য উভয়ের তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকা প্রায় অসম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে, এক সময় একান্নবর্তী প্রথা থাকাতে অনেক সুবিধা ছিল এবং তাহাতে মানবপ্রকৃতির অনেক উন্নতি সাধন করিত। কিন্তু এখন অবস্থাভেদে তাহার সুবিধাগুলি চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে যে উন্নতির কারণ ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। পূর্বে জটিলতা-বিহীন সমাজে যে-সকল সুখ সম্পদ ও শিক্ষা লভ্য ছিল, তাহা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই সকলে পাইত। এখন একান্নবর্তী পরিবারে থাকে বলিয়াই অনেকে সে-সকল হইতে বঞ্চিত হইতেছে। আমি প্রাণপণে উপার্জন করিয়া যে-অর্থ সঞ্চয় করিতেছি, তাহাতে কোনোমতে আমার পুত্রের শিক্ষা দিয়া তাহার যাবজ্জীবন উন্নতির মূলপত্তন করিয়া দিতে পারি; কিন্তু আমি আমার পুত্রের অহিতসাধন করিয়া আমার শ্যালকপুত্রের কথঞ্চিৎ উদরপূর্তি করিব, ইহাকে সকলের মহৎ উদ্দেশ্য মনে না হইতেও পারে। যদি ইচ্ছা কর তো সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিয়া অপরের সন্তানের উন্নতিসাধনে প্রাণপণ করিতে পার, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে; কিন্তু যদি তোমার নিজের সন্তান জন্মে তবে সর্বাপেক্ষা প্রবল স্নেহ ও কর্তব্যসূত্রে তোমার সহিত বদ্ধ যে-আত্মজ, তাহার সম্যক উন্নতিবিধানের জন্য তুমি প্রধানত দায়ী। পূর্বে শ্যালকপুত্রের সহিত নিজ পুত্রের প্রভেদ করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না, কারণ তখন আমাদের অন্নপূর্ণা বঙ্গভূমি তাঁহার সকল সন্তানকে একত্রে কোলে লইয়া সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার ভাণ্ডার এমন পরিপূর্ণ ছিল; এখন চারি দিকে অন্ন নাই অন্ন নাই রব উঠিয়াছে, এখন পিতা স্বয়ং আপন ক্ষুধিত সন্তানের মুখ না চাহিলে উপায় কী। দ্বিতীয় কথা, পূর্বকালে একান্নবর্তী পরিবারে প্রীতিভাবের অত্যন্ত চর্চা হইত। এজন্য তাহা দেশের একটি মহৎ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন সাধারণের অবস্থাভেদে শিক্ষাভেদে শাস্ত্রভেদে মতভেদে ও রুচিভেদে নিতান্ত একত্র অবস্থানে সর্বত্র সেরূপ সদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষ্যা ও নিন্দাগ্লানির সম্ভাবনা; এবং ইহাতে মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবারই কথা। তৃতীয় কথা, যখন পরিবারের মধ্যে শাসন শিথিল হইয়া আসিয়াছে ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন তখন পরিবারের মধ্যে যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বহুবিস্তৃত পরিবারে এরূপ যথেচ্ছাচারের অপেক্ষা ক্ষতিজনক আর কী আছে। একজন এক ঘরে মদ্যপান করিতেছেন, আরেকজন অন্য ঘরে বন্ধুবান্ধবসমেত অট্টহাস্য ও ঊর্ধ্বকণ্ঠে কুৎসিত আলাপে নিরত, এ স্থলে আমার ছেলেপুলের শিক্ষা কীরূপ হয়। আমি আমার সন্তানকে এক ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, আমার গুরুজন তাহাকে অন্য ভাবে শিক্ষা দেন, সে-স্থলে ছেলেটার উপায় কী। পিতার শিক্ষা-গুণে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বিগড়িয়া গেছে, তাহাদের সহিত আমি আমার ছেলেকে একত্র রাখি কী করিয়া। তাহা ছাড়া বৃহৎ পরিবারে সকলের প্রেমের বন্ধন সমান হইতেই পারে না; সুতরাং পরস্পরের প্রতি কুৎসা দ্বেষ মিথ্যাচরণ অনেক সময় দূষিত রক্তস্রোতের ন্যায় পরিবারের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। অতএব দেখিতেছি, কালক্রমে একান্নবর্তী প্রথার সদ্‌গুণসকল বিনষ্ট এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র কন্যার বাল্যবিবাহ-প্রবর্তন-রূপ ক্ষীণ দণ্ড আশ্রয় করিয়াই যে এই ঐতিহাসিক প্রকাণ্ড পতনোন্মুখ মন্দিরকে ধরিয়া রাখিতে পারিব তাহা মনে হয় না। প্রথমে শিখিতে হইবে শাস্ত্র অভ্রান্ত, গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়, তার পর দেখিতে হইবে জীবনের অভাব-সকল উত্তরোত্তর স্বল্প ও সরল হইয়া আসিতেছে; তবে জানিব একান্নবর্তী প্রথা টিঁকিবে। কিন্তু দেখিতেছি, বর্তমান সমাজে দুটার মধ্যে কোনোটাই ঘটিতেছে না; এবং ভবিষ্যতে যতটা দেখা যায়, শীঘ্র এ-অবস্থার পরিবর্তন দেখি না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

এই-সকল ভাবিয়া যাঁহারা বলেন বর্তমান সমাজে একান্নবর্তী প্রথার অনেক দোষ ঘটিয়াছে,

অতএব উহা উঠিয়া গেলে কোনো হানি নাই, বরং উঠিয়া যাওয়াই উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহ উঠাইবার কোনো প্রয়োজন দেখি না—তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, একান্নবর্তী প্রথা না রাখিলে বাল্যবিবাহ থাকিতে পারে না। যেখানে স্বতন্ত্র গৃহ করিতে হইবে সেখানে স্বামীস্ত্রীর বয়স অল্প হইলে চলিবে না। তখন শিশু-স্ত্রী যদি অনেক দিন পর্যন্ত স্বামীর নিরুদ্যম ভারস্বরূপ হইয়া থাকে তবে স্বামীর পক্ষে সংকট। একক স্বামীগৃহে কেই বা তাহাকে গৃহকার্য শিক্ষা দিবে। অতএব এরূপ অবস্থায় পিতৃভবন হইতে গৃহকার্য শিক্ষা করিয়া স্বামীগৃহে আসা আবশ্যক। অথবা পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে স্বল্প পরিবারের ভার গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

অতএব একান্নবর্তীপ্রথা ভালো সুতরাং তাহা রক্ষার জন্যই বাল্যবিবাহ ভালো, এ কথা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা উঠে; সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল। এখন আর-একটি কথা দেখিতে হইবে। যে-অসচ্ছল অবস্থার পীড়নে একান্নবর্তীপ্রথা প্রতিদিন অল্পে অল্পে ভাঙিয়া পড়িতেছে, সেই অবস্থার দায়েই বাল্যবিবাহপ্রথাও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। দায়ে পড়িয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক কন্যাকে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখা হইয়াছে, ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক মান্য কুলীনসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্থলে এখনো আছে। অতএব তেমন দায়ে পড়িলে অল্পে অল্পে কুমারী কন্যার বয়োবৃদ্ধি এখনো অসম্ভব নহে। সমাজ দায়েও পড়িয়াছে এবং অল্পে অল্পে বয়োবৃদ্ধিও আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আচার মানিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যেও ১৩ বৎসর বয়সে কন্যাদান অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে আট-দশ বৎসর পার হইলেই কন্যাকে পিতৃগৃহে দেখা যাইত না। পূর্বে কন্যার ৩/৪/৫ বৎসর বয়সে যত বিবাহ দেখা যাইত এখন তত দেখা যায় না। পুরুষের বিবাহবয়স পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দুসমাজে পুরুষের শিশুবিবাহ নাই বলিলেও হয়। এইরূপ অলক্ষিতভাবে বিবাহের বয়োবৃদ্ধি যে ইংরেজিশিক্ষার অব্যবহিত ফল, আমার তাহা বিশ্বাস নহে। অবস্থার অসচ্ছলতাই ইহার প্রধান কারণ। আমার বোধ হয় বড়োমানুষের ঘরে বাল্যবিবাহ যতটা আছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ততটা নাই। অর্থক্লেশের সময় ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া বিষম ব্যাপার। সুবিধা করিয়া বিবাহ দিতে অনেক সময় যায়। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য সাংসারিক খরচ বাদে অল্প অল্প করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহাতে অনেক সময় চাই। সমাজের সচ্ছল অবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্তকে লোকে সাহায্য করিত। কিন্তু এখন একপক্ষে খরচ বাড়িয়াছে, অপরপক্ষে সাহায্য কমিয়াছে।

এ ছাড়া, ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে অনেক অবিবাহিত যুবক নানা বিবেচনায় চটপট বিবাহকার্য সারিয়া ফেলিতে চান না। ইঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যুবক আছেন যাঁহারা যৌবনের স্বাভাবিক উৎসাহে সংকল্প করেন যে, বিবাহ না করিয়া জীবন দেশের কোনো মহৎ কার্যে উৎসর্গ করিব; অবশেষে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে মহৎ কার্যের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মিলে হয়তো বিবাহের প্রতি মনোযোগ করেন। অনেকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া পঠদ্দশায় বিবাহ করিতে অসম্মত। এবং অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া তাড়াতাড়ি পরিবারবৃদ্ধি করিলে ইহজীবন দারিদ্র্যের হাত এড়ানো দুষ্কর হইবে। তাঁহারা জানেন যে, অল্পবয়সে স্ত্রীপুত্রের ভারে অভিভূত হইয়া তেজ বল সাহস সমস্তই হারাইতে হয়। সহস্র অপমান নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হয়, তাহার সমুচিত প্রতিশোধ দিতে ভরসা হয় না। যখন বিদেশীয় প্রভুর নিকট হইতে নিতান্ত হীনজনের ন্যায় অন্যায় লাঞ্ছনা সহ্য করা যায় তখন গৃহের ক্ষুধিত রুগ্‌ণ সন্তানের ম্লান মুখই মনে পড়ে এবং নীরবে নতশিরে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হয়। কাগজে পত্রে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অনেক লেখনী-আস্ফালন করি, কিন্তু গৃহে ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে আর থাকা যায় না; সেই শ্বেতপুরুষের দ্বারস্থ হইয়া জোড়হস্তে ছলছলনয়নে দুই বেলা উমেদারি করিয়া মরিতে হয়। সংসারভার বহন করিয়া বাঙালিদের স্বাভাবিক সাবধানতাবৃত্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠে এবং সকল দিক বিবেচনা

করিয়া কোনো কাজে অগ্রসর হইতে পা উঠে না। এইরূপ ভারাক্রান্ত ভীত এবং ব্যাকুল ভাব জাতির উন্নতির প্রতিকূল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ কথা স্মরণ করিয়া অনেক দেশানুরাগী অপমান-অসহিষ্ণু উন্নতস্বভাব যুবক অসমর্থ অবস্থায় বিবাহ করিতে বিরত হইবেন। ইহা নিশ্চয়ই যে, দারিদ্র্যের প্রভাব যতই অনুভব করা যাইবে লোকে বিবাহবন্ধনে ধরা দিতে ততই সংকুচিত হইবে। যখন চারি দিকে দেখা যাইবে উদ্‌বাহবন্ধন উদ্‌বন্ধনের ন্যায় বিবাহিতের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখন মনু অথবা অন্য কোনো ঋষির বিধান সত্ত্বেও যুবক যখন-তখন উক্ত ফাঁসের মধ্যে গলা গলাইয়া দিতে সম্মত হইবে না। স্ত্রীর সহিত পবিত্র একত্ব সাধন করিতে গিয়া যদি পঞ্চত্ব নিকটবর্তী হয় তবে অনেক বিবেচক লোক উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। বাপ মায়ে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাও যে তাড়াতাড়ি অবিবেচক বালকের গলদেশে বিষম গুরুভার বধূ বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। ছেলে যখন আপনি উপার্জন করিবে তখন বিবাহ করিবে, আজকাল অনেক পিতার মুখে এ কথা শুনা যায়। এমন-কি, হিন্দুগৃহে প্রাচীন নিয়মে পালিতা সেকেলে একটি প্রাচীনার মুখে এই মত শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। অথবা আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই; জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি— সমাজের অবস্থাগতিকে এ বিশ্বাস আর টিঁকে না।

অতএব ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অভাবের জটিলতা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই পুরুষেরা শীঘ্র বিবাহ করিতে চাহিবে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আগে অনেক ছেলে 'বিয়েপাগলা' ছিল, এখন অনেকে বিয়েকে ডরায়। ক্রমে এ ভাব আরও অনেকের মধ্যে সংক্রামিত হইতে থাকিবে। পুরুষ যদি উপার্জনক্ষম হইয়া বড়ো বয়সে বিবাহ করে তবে মেয়ের বয়সও বাড়াইতে হইবে সন্দেহ নাই। মস্ত পুরুষের সঙ্গে কচি মেয়ের বিবাহ নিতান্ত অসংগত। দেখা যায় বরকন্যার মধ্যে বয়সের নিতান্ত বৈসাদৃশ্য দেখিলে কন্যাপক্ষীয় মেয়েরা অত্যন্ত কাতর হন। বোধ করি মনের অমিল ও বৈধব্যের সম্ভাবনাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিবাহযোগ্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহযোগ্য মেয়ের বয়সও বাড়িতে থাকিবে।

অতএব যিনি যতই বক্তৃতা দিন, দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে এবং আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বয়সের সীমা বাড়িবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। কিছুদিন প্রাচীন নিয়ম ও নূতন অবস্থার বিরোধে সমাজে অনেক অসুখ অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এবং ক্রমশ এই মথিত সমাজের আলোড়নে নূতন জীবন নূতন নিয়ম জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাহার সমস্ত ফলাফল আমরা আগে হইতে সম্পূর্ণ বিচার করিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন আমাদের সমাজে অনেক মন্দ আছে, কিন্তু অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেগুলিকে তত গুরুতর মন্দ বলিয়া মনে হয় না; তখনো হয়তো কতকগুলি অনিবার্য মন্দ উঠিবে যাহা আমরা আগে হইতে কল্পনা করিয়া যত ভীত হইতেছি তখনকার লোকের পক্ষে তত ভীতিজনক হইবে না। দূর হইতে ইংরেজেরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানের নামমাত্র শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে যতখানি চমক খাইয়া উঠেন, ভিতরে প্রবেশ করিলে ততখানি চমক খাইবার কিছুই নাই; সমাজের মধ্যে সন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক অনুষ্ঠানের ভালোমন্দ ভাগ লইয়া একপ্রকার সামঞ্জস্যবিধান হইয়াছে। তেমনই আমরাও দূর হইতে ইংরেজসমাজের অনেক আচারের নাম শুনিয়া যতটা ভয় পাই, ভিতরে গিয়া দেখিলে হয়তো জানিতে পারি ততটা আশঙ্কার কারণ নাই। তাহা ছাড়া অভ্যাসে অনেক ভালোমন্দ সৃজিত হয়। এখন যে-মেয়ে ঘোমটা দিয়া সূক্ষ্ম বসন পরে তাহাকে আমরা বেহায়া বলি না, কিছুকাল পরে যাহারা ঘোমটা না দিয়া মোটা কাপড় পরিবে তাহাদিগকে বেহায়া বলিব না। মনে করো শ্যালীর সহিত ভগ্নিপতির অনেকস্থলে যেরূপ উপহাস চলে তাহাতে একজন বিদেশের লোক কত কী অনুমান করিয়া লইতে পারে, এবং অনুমান করিলেও তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সত্য সত্যই ততটা ঘটে না। সমাজের এক নিয়ম অপর নিয়মের দোষসম্ভাবনা কথঞ্চিৎ সংশোধন করে। অতএব কোনো সমাজের একটিমাত্র নিয়ম স্বতন্ত্র তুলিয়া

লইয়া তাহার ভালোমন্দ বিচার করিলে প্রতারিত হইতে হয়। এইজন্য আমাদের সমাজের পরিবর্তনে যে-সকল নূতন নিয়ম অল্পে অল্পে স্বভাবতই উদ্ভাবিত হইবে, আগে হইতে তাহার সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। তাহারা অকাট্য নিয়মে পরস্পর পরস্পরকে জন্ম দিবে ও রক্ষা করিবে। সমাজে আগে-ভাগে বুদ্ধি খাটাইয়া গায়ে পড়িয়া একটা নিয়মস্থাপন করিতে যাওয়া অনেক সময় মূঢ়তা। সে-নিয়ম নিজে ভালো হইতে পারে, কিন্তু অন্য নিয়মের সংসর্গে সে হয়তো মন্দ। অতএব বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে আজ তাহার ফল যতটা ভয়ানক বলিয়া মনে হইবে, তাহা হইতে যত বিপদ ও অমঙ্গল আশঙ্কা করিব, তাহার অনেকটা আমাদের কাল্পনিক। কেবল, কতকটা দেখিতেছি এবং অনেকটা দেখিতেছি না বলিয়া এত ভয়।

বলা বাহুল্য, আমি সমাজের পরিবর্তন সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানত শিক্ষিত-সমাজের পক্ষে খাটে। অতএব শীঘ্র বাল্যবিবাহ দূর হওয়া শিক্ষিতসমাজেই সম্ভব। কিন্তু তাহা আপনি সহজ নিয়মে হইবে। যাঁহারা আইন করিয়া জবরদস্তি করিয়া এ-প্রথা উঠাইতে চান তাঁহারা এ-প্রথাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ইহার দুই একটি ফলাফলমাত্র বিচার করিয়াছেন, হিন্দু-সমাজে বাল্যবিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রথা তাঁহারা দেখেন নাই। সামাজিক অন্যান্য সহকারী নিয়মের মধ্য হইতে বাল্যবিবাহকে বলপূর্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। অল্পে অল্পে নূতন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নূতন আকার ধারণ করিয়া সমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত আপন উপযোগিতাসূত্রে বন্ধন করিতেছে। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহাদিগকে অকারণ ব্যস্ত হইতে হইবে না।

তেমনই, যাঁহারা একান্নবর্তী পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন অবস্থা ও নূতন শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া আচার ও উপদেশ হইতে বাল্যবিবাহ দূর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম অথবা বিদেশগমন দ্বারা জাতিচ্যুত হইলেও বিবেচক হিন্দুমণ্ডলী তাঁহাদিগকে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা মহাপাতকী জ্ঞান না করেন। তাঁহারা কিছুই অন্যায় করেন নাই। তাঁহারা বর্তমান শিক্ষা ও বর্তমান অবস্থার অনুগত হইয়া আপন কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় যুক্তিসংগত কাজই করিয়াছেন। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অবস্থাবিশেষে বাল্যবিবাহ উপযোগী হইলেও অবস্থা-বিপর্যয়ে তাহা অনিষ্টজনক।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কী কী বলিয়াছি, এইখানে তাহার একটি সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি আবশ্যক।

প্রথম। হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন না করাতে তাঁহাদের কথার সত্যমিথ্যা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের ইতস্তত হইতে শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া একই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়। যাঁহারা বলেন, হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ্য দম্পতির একীকরণতার প্রতি, তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে পুরুষের বহুবিবাহ এ-দেশে কোনোক্রমে প্রচলিত হইতে পারিত না।

তৃতীয়। আজকাল অনেকেই বলেন হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ কী। উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ হিন্দুবিবাহে নানা কারণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; উক্ত কারণ-সকল একে একে দেখানো হইয়াছে।

চতুর্থ। তাহাই যদি হয় তবে দেখা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহ সামাজিক মঙ্গল ও সাংসারিক সুবিধার জন্য। সংহিতা সম্বন্ধে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি এবং মনুর কতকগুলি বিধান উক্ত মতের পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

পঞ্চম। সমাজের মঙ্গল যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহার না থাকে বা গৌণভাবে থাকে, তবে বিবাহ সমালোচনা করিবার সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজের পরিবর্তন হইতেছে এবং নানা বিষয়ে

জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েরও তদনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হইতেছে। পুরাতন সমাজের নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদের বর্তমান সমাজে বিবাহের সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক হয় কি না তাহা সমালোচ্য।

ষষ্ঠ। তাহা হইলে দেখিতে হইবে বাল্যবিবাহের ফল কী। প্রথম, বাল্যবিবাহে সুস্থকায় সন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত হয় কি না। বিজ্ঞানের মতে ব্যাঘাত হয়।

সপ্তম। কেহ কেহ বলেন, পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ দিলেই আর কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পুরুষের বিবাহবয়স বাড়াইলে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় মেয়েদের বয়সও বাড়াইতে হইবে নয় পুরুষের বয়স আপনি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিবে, যেমন মনুর সময় হইতে কমিয়া আসিয়াছে।

অষ্টম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সুস্থ সন্তান-উৎপাদনই সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ নহে, অতএব একমাত্র তৎপ্রতিই বিবাহের লক্ষ্য থাকিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্যসাধনেই বিবাহের মহত্ত্ব। অতএব মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের অভিপ্রায়ে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া স্বামীর কর্তব্য। এইজন্য স্ত্রীর অল্প বয়স হওয়া চাই। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যথার্থ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ উপযোগী। তাহার পরে দেখাইয়াছি, মহৎ উদ্দেশ্য সকল স্বামীরই থাকিতে পারে না; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে, উক্ত গুণসকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে; নিরাশ হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি ও অমঙ্গল সৃষ্ট হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করিতে হইলে বড়ো বয়সে বিবাহ আবশ্যক।

নবম। কিন্তু পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে। আমি দেখাইয়াছি, কালক্রমে নানা কারণে একান্নবর্তীপ্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব একমাত্র বাল্যবিবাহদ্বারা উহাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং রক্ষা করা উচিত কি না তদ্‌বিষয়েও সন্দেহ।

দশম। সমাজে এ-সকল ছাড়া দারিদ্র্য প্রভৃতি এমন কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে স্বতই বাল্যবিবাহ অধিক কাল টিঁকিতে পারে না। সমাজে অল্পে অল্পে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহ দূষণীয় জ্ঞান করেন অথবা সুবিধার অনুরোধে ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্বক বাল্যবিবাহ উঠানো যায় না। কারণ, ভালোরূপ শিক্ষা-ব্যতিরেকে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হইবে। যেখানে শিক্ষার প্রভাব হইতেছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠিতেছে, যেখানে হয় নাই সেখানে এখনো বাল্যবিবাহ উপযোগী। আমাদের অন্তঃপুরের, আমাদের সমাজের, অনেক অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে এবং আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের ভিতরকার শিক্ষায় বাল্যবিবাহ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে; অতএব অগ্রে শিক্ষার প্রভাবে সে-সকলের পরিবর্তন না হইলে কেবল আইনের জোরে ও বক্তৃতার তোড়ে সর্বত্রই বাল্যবিবাহ দূর করা যাইতে পারে না।

১২৯৪

রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে

পত্র

কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুনতে গিয়েছিলেম। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী নিরাভরণা শ্বেতাম্বরী ক্ষীণতনুযষ্টি উজ্জ্বলমূর্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল। তিনি বললেন, মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কী মনে হয়। মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা

পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন, রূপে এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে; তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তা হলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়। সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of Compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অবশ্য এ কথা কেউ বলবে না যে, তবে তাদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত; যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, তবে পুরুষদের হৃদয়বৃত্তি চর্চা করা অকর্তব্য। অতএব স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই।

আমার তো বোধ হয় না, কবি হতে ভূরিপরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। মেয়েরা এতদিন যেরকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। Burns খুব যে সুশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। অনেক বড়ো কবি অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথমশ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনো হয় নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখছে এত পুরুষ শেখে নি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart কিংবা Beethoven জন্মাল। অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই musician। এমন তো ঢের দেখা যায়, বাপের গুণ মেয়েরা এবং মায়ের গুণ ছেলেরা পায়, তবে কেন এরকম প্রতিভা কোনো মেয়ে সচরাচর পায় না। আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেইসঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই। আমার তো এইরকম বিশ্বাস। তুমি বলবে, এখন পর্যন্ত এইরকম চলে আসছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে কে বলতে পারে। সে-সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আছে।

আসলে শিক্ষা, যাতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, তা কেবল বই পড়ে হতে পারে না— তা কেবল কাজ করে হয়। বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে পড়ে যখন সংগ্রাম করতে হয়, সহস্র বাধা বিঘ্ন যখন অতিক্রম করতে হয়, যখন বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতে ও জড় বাধাতে সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সমস্ত বুদ্ধি জেগে ওঠে। তখন আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির আবশ্যক হয় সুতরাং চর্চা হয়, এবং সেই অবিশ্রাম আঘাতে স্নেহ দয়া প্রভৃতি কতকগুলি কোমল বৃত্তি স্বভাবতই কঠিন হয়ে আসে। মেয়েরা হাজার পড়াশুনা করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর-একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেক দিন ও অনেক ক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়। কেননা গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করত তা হলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাটত কী করে।

যদি এ কথা ঠিক হয় যে, বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে

তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে এ কথা নিশ্চয় যে, মেয়েরা কখনোই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না। য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভেদ কোথা থেকে হয়েছে তার কারণ অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যায়—আমাদের দেশের লোকেরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে নি, এইজন্যে তাদের বুদ্ধির দৃঢ়তা হয় নি। তাদের সমস্ত মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। এরকম আধা-আধি রকমের সভ্যতা হয়েছিল; য়ুরোপের আজ যে এত প্রভাব তার প্রধান কারণ, কাজ করে তার বুদ্ধি হয়েছে; প্রকৃতির রণক্ষেত্রে অবিশ্রাম সংগ্রাম করে তার সমস্ত বুদ্ধি বলিষ্ঠ হয়েছে। আমরা চিরকাল কেবল বসে বসে চিন্তা করেছি। জীবতত্ত্ববিদ বলেন, যখন থেকে প্রাণীরাজ্যে বুড়ো-আঙুলের আবির্ভাব হল, তখন থেকে মানবসভ্যতার একরকম গোড়াপত্তন হল। বুড়ো-আঙুলের পর থেকে সমস্ত জিনিস ধরে ছুঁয়ে ভেঙে নেড়েচেড়ে আঁকড়ে ভার অনুভব করে উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করে দেখবার উপায় হল। কৌতূহল থেকে পরীক্ষার আরম্ভ হয়, তার পরে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত হতে থাকে। এই পরীক্ষায় বুড়ো-আঙুল পুরুষদের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করতে হয়, মেয়েদের তেমন করতে হয় না। সুতরাং—।

যদি বা এমন বিবেচনা করা যায়, একসময় আসবে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা উপার্জন প্রভৃতি কার্যে সমানরূপে ভিড়বে—সুতরাং তখন পরিবারসেবার অনুরোধে মেয়েদের অধিকাংশ সময় গৃহে বদ্ধ থাকবার আবশ্যক হবে না—বাহিরে গিয়ে এই বিপুল বিচিত্র সংসারের সঙ্গে তাদের চোখোচোখি মুখোমুখি হাতাহাতি পরিচয় হবে, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পার, বাপভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন করতে পার—কিন্তু সন্তানকে তো ছাড়বার জো নেই। সে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায় ভাবে জননীর কোল অধিকার করে বসবে, তখন সমকক্ষ ভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়েদের পক্ষে কী রকমে সম্ভব হবে। এইরকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার-সেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান। যখন শারীরিক দুর্বলতা এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থাভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে তখন কাজে-কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে। এক সন্তানধারণ থেকেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে; তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। আবার এ-কারণটা এমন স্বাভাবিক কারণ যে, এর হাত এড়াবার জো নেই।

অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন-কি, অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্বসম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তা হলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না। রাজভক্তি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়; সেগুলিকে যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তা হলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তা হলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলে আমি স্বাধীন। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে-ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাখাটানা কুলিকে লাথি মারে তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।

আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকি সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের

সম্বন্ধবন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই। যারা অগত্যা অধীনতা স্বীকার করে আছে তারা নিজেকে দাসী মনে করছে; সুতরাং তারা আপনার কর্তব্য কাজ প্রসন্ন মনে এবং সম্পূর্ণভাবে করতে পারছে না। দিনরাত খিটিমিটি বাধছে, নানা সূত্রে পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করছে। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তা হলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেকটা বিচ্ছেদ হবে; কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক্‌, তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয়-অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে-সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম। ছোটো বালকের পক্ষে পিতামাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তার পক্ষে পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম, সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল। নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না। অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের মতো আশ্রিত হতে পারলেই ভালো থাকত, কিন্তু তাদের অনুরোধে পুরুষ-সাধারণের কর্তব্যনিয়ম উল্টে দেওয়া যায় না। যাই হোক. পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।

স্ত্রীপুরুষের অবস্থাপার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত; কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড়সংকোচভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষা সত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়। রমাবাই যখন বললেন. মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ করতে পারে, তখন পুরুষ উঠে বলতে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ করতে পারত; কিন্তু তা হলে এখন পুরুষদের যে-সব কাজ করতে হচ্ছে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনই মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না করতে হত তা হলে সে পুরুষের অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু এ 'যদি'কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিংবা আর কোনো বিদ্রোহী রমণীর কর্ম নয়। অতএব এ কথার উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা।

রমাবাইয়ের বক্তৃতার চেয়ে আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না। রমাবাই বলতে আরম্ভ করতেই তারা ভারি গোল করতে লাগল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীরপুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন; তর্জনগর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা করতে লাগলুম, আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু ভদ্ররমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে এতটা প্রতাপ এখনো কারও জন্মায় নি। তবে বলা যায় না, নীচলোক সর্বত্রই আছে; এবং নীচশ্রেণীয়-হীনশিক্ষা ভীরুদের এই একটা মহৎ অধিকার আছে যে, পঙ্কের মধ্যে বাস করে তারা

অসংকোচে স্নাত দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ করতে পারে; মনে জানে, এরূপ স্থলে সহিষ্ণুতাই ভদ্রতার একমাত্র কৌলিক ধর্ম। মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবালকবর্গের প্রতি এতটা কথা বলা অসংগত হয়ে পড়ে— আমি কেবল প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটা বলে রাখলুম। আক্ষেপের বিষয় এই, যাদের প্রতি এ কথা খাটে তারা এ-ভাষা বোঝে না এবং তাদের যে-ভাষা তা ভদ্রসম্প্রদায়ের শ্রবণের ও ব্যবহারের অযোগ্য।

পুণা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬

মুসলমান মহিলা

সারসংগ্রহ

কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরেজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা জেনানার সুখদুঃখ সত্যমিথ্যা কে প্রমাণ করিবে। তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন তক্তার নীচে আর-একজন সিন্দুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়, তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধূর দৃষ্টিপথে ভাশুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এইমতোই বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, 'বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে। তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে, সূর্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।' আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড়ো বড়ো কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। যে-হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে, তাহাকে কেবলই শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ তাহাকে হীরা-জহরতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপমায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল, তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা আমাকে মারিয়া ফেলো, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।' ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সাও চাহি না, বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।' সে কহিল, 'এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে।'

তাহার রকমসকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, 'যে-রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।' বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয়, পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুইচারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

১২৯৮

প্রাচ্য সমাজ

কোনো ইংরেজ মহিলা মুসলমান স্ত্রীলোকদের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া নাইনটিন্‌থ-সেঞ্চুরিতে যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা পূর্ব সংখ্যায় তাহার সারমর্ম প্রকাশ করিয়াছি।[১] গত সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় অনরেবল জস্টিস আমির আলি তাহার জবাব দিয়াছেন।

তিনি দেখাইতেছেন যে, খৃস্টীয় ধর্মই যে য়ুরোপে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশেই তাহারা বর্তমান উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। খৃস্টীয় সমাজের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীজাতি খৃস্টধর্মমণ্ডলীর চক্ষে নিতান্ত নিন্দিতভাবে ছিলেন। স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক দূষণীয়তা সম্বন্ধে চার্চের অধ্যক্ষগণ বিপরীত বিদ্বেষের সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন; খৃস্টীয় সাধু টর্টলিয়ন স্ত্রীলোককে শয়তানের প্রবেশদ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলচোর, দিব্যধর্ম-পরিত্যাগিনী, মনুষ্যরূপী-ঈশ্বরপ্রতিমাবিনাশিনী আখ্যা দিয়াছেন। এবং সেন্ট ক্রিসস্টম স্ত্রীলোককে প্রয়োজনীয় পাপ, প্রকৃতির মায়াপাশ, মনোহর বিপৎপাত, গার্হস্থ্য সংকট, সাংঘাতিক আকর্ষণ এবং সুচিক্কণ অকল্যাণ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

তখন কোনো উচ্চ অঙ্গের ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকদের অধিকার ছিল না। জনসমাজে মিশিতে, প্রকাশ্যে বাহির হইতে, কোনো ভোজে বা উৎসবে গমন করিতে তাহাদের কঠিন নিষেধ ছিল। অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক স্বামীর আজ্ঞা পালন করা এবং তাঁত চরকা ও রন্ধন লইয়া থাকাই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল।

তার পর মধ্যযুগে যখন শিভল্‌রি-ধর্মের অভ্যুদয়ে য়ুরোপে নারীভক্তির প্রচার হইল, স্ত্রীলোকদের প্রতি উৎপীড়ন এবং প্রতারণা তখনকার কালেরও একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। বহুবিবাহ এবং গোপন বিবাহ কেবল কুলীন নহে সাধারণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ধর্মযাজকেরাও তাহাদের চির কৌমার্যব্রত লঙ্ঘন করিয়া একাধিক বৈধ অথবা অবৈধ বিবাহ করিত। পুরাবৃত্তবিৎ হ্যালাম দেখাইয়াছেন যে, জর্মান ধর্মসংস্কারকগণ সন্তানাভাবে এককালীন দুই অথবা তিন বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকলেই জানেন মহারাজ শার্লমানের বহুপত্নী ছিল। খৃস্টধর্মবৎসল জাস্টিনিয়নের অধিকারকালে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের রাজপথ স্ত্রীলোকের প্রতি কী নিদারুণ অত্যাচারের দৃশ্যস্থল ছিল। একটি স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং বিদুষী ছিলেন, এইমাত্র অপরাধে কোনো খৃস্টান সাধুর অনুচরগণ তাঁহাকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার রাজপথে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বধ করিয়াছিল। লেখক বলিতেছেন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকার মনুর অনুশাসনে আছে যে, স্ত্রী স্বামীর

---

[১] মুসলমান মহিলা : সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮।
দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী প্রবন্ধ।

অবাধ্য হইলে তাহাকে চতুষ্পথে ডালকুত্তার দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলাই বিধান; যদি সেন্ট সীরিল্ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ লিখিতেন তবে কি মনুর সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইত না। য়ুরোপের মধ্যযুগে স্ত্রীলোক সদাসর্বদাই উৎপীড়িত, বলপূর্বক অপহৃত, কারামধ্যে বন্দীকৃত, এবং পরমখৃস্টান য়ুরোপের উপরাজগণের দ্বারা কশাহত হইত। খৃস্টানগণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে, জলমগ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব-সমাজে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রীপরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইজন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

লেখক বলেন, স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে খৃস্টীয় আইন অপেক্ষা মুসলমান আইনে অনেক উদারতা প্রকাশ পায়। হিন্দুশাস্ত্রে যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে স্বামীত্যাগের বিধি আছে কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার কোনো চিহ্ন নাই, সেইরূপ লেখক বলেন, মুসলমানশাস্ত্রেও অত্যাচার, ভরণপোষণের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীর স্বামীত্যাগের অধিকার আছে।

আমরা যেরূপ লীলাবতী ও খনার দৃষ্টান্ত সর্বদা উল্লেখ করিয়া থাকি, লেখক সেইরূপ প্রাচীন কালের মুসলমান বিদুষীদের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন আরব-রমণীদের উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, মান্যবর আমির আলি মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে-সকল সংস্কারকার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নাই। মধ্যস্থ হইয়া তখনকার প্রবল সমাজের সহিত উপস্থিত-মতো রফা করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজকে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিল। কিন্তু সে-দোষ মুসলমান ধর্মের নহে, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব।

আমির আলি মহাশয়ের এই রচনা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদের উদয় হয়। এককালে আদর্শ উচ্চতর ছিল, ক্রমশ তাহা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে; এবং এককালে কোনো মহাপুরুষ তৎসময়ের উপযোগী যে-সকল বিধান প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধিচালনাপূর্বক সচেতনভাবে সমাজ তাহার অধিক আর এক পা অগ্রসর হয় নাই—এ কথা বর্তমান মুসলমানেরাও বলিতেছেন এবং বর্তমান হিন্দুরাও বলিতেছেন। গৌরব করিবার বেলাও এই কথা বলি, বিলাপ করিবার বেলাও এই কথা বলি। যেন আমাদের এশিয়ার মজ্জার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রাম গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

য়ুরোপে এশিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এশিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এশিয়ায় বড়ো লোককে মহৎ মনুষ্য বলে না, একেবারে দেবতা বলিয়া বসে; কিন্তু য়ুরোপের কর্মপ্রধান দেশে প্রতিদিনই মনুষ্য নানা আকারে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, সেইজন্য তাহারা আপনাকে নগণ্য, জীবনকে স্বপ্ন এবং জগৎকে মায়া মনে করিতে পারে না। প্রাচ্য খৃস্টীয় ধর্মের প্রভাবে য়ুরোপীয়দের মনে মধ্যে মধ্যে বিপরীতভাব উপস্থিত হইলেও তাহা প্রবল কর্মের স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙিয়া আসে পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপরে স্বাধীনবুদ্ধি জয়লাভ করে।

আমাদের পূর্বাঞ্চলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিভূতভাবে বাস করিয়া প্রত্যেক মানুষ নিজের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করে; এইজন্য কোনো মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেবতা-পদে স্থাপিত করে। তাহার পর হইতে তিনি যে-কয়টি কথা বলিয়া গিয়াছেন বসিয়া বসিয়া তাহার অক্ষর গণনা করিয়া জীবনযাপন করি; তিনি সাময়িক অবস্থার উপযোগী যে-বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহার রেখামাত্র লঙ্ঘন করা মহাপাতক জ্ঞান করিয়া থাকি। পুনর্বার যুগান্তরে দ্বিতীয় মহৎলোক দেবতাভাবে আবির্ভূত হইয়া সময়োচিত দ্বিতীয় পরিবর্তন প্রচলিত না করিলে আমাদের আর গতি নাই। আমরা যেন ডিম্ব হইতে ডিম্বান্তরে জন্ম গ্রহণ করি। একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলা ভাঙিয়া যে-নূতন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের যত্নে নিজের উপযোগী খাদ্যসংগ্রহ আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠে না। মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে যেখানে দাঁড় করাইলেন তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। কোনো সংস্কারকার্য বীজের মতো ক্রমশ অঙ্কুরিত হইয়া যে পরিপুষ্টতা লাভ করিবে, আমাদের সমাজ সেরূপ জীবনপূর্ণ ক্ষেত্র নহে। মনুষ্যত্বের মধ্যে যেন প্রাণধর্মের অভাব। এইজন্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ না করিয়া বিশুদ্ধ আদর্শ ক্রমশই বিকৃতি লাভ করিতে থাকে। যেমন পাখি তা' না দিলে ডিম পচিয়া যায়, সেইরূপ কালক্রমে মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাবের উত্তাপ যতই দূরবর্তী হয় ততই আবরণবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিকৃতি জন্মিতে থাকে।

আসল কথা, বিশুদ্ধ জিনিসও অবরোধের মধ্যে দূষিত হইয়া যায় এবং বিকৃত বস্তুও মুক্তক্ষেত্রে ক্রমে বিশুদ্ধি লাভ করে। যে-সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীনবুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক। কারণ, তাহাতে বাতাস লাগে না, প্রকৃতির স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তি তাহার উপর সম্পূর্ণ তেজে কাজ করিতে পায় না।

১২৯৮

আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত

অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আহার নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে আহারের দুই উদ্দেশ্য, দেহের পুষ্টিসাধন ও আত্মার শক্তিবর্ধন। তিনি বলেন, আহারে দেহের পুষ্টি হয় এ কথা সকল দেশের লোকই জানে, কিন্তু আত্মার শক্তিবর্ধনও যে উহার একটা কার্যের মধ্যে—এ-রহস্য কেবল ভারতবর্ষেই বিদিত; কেবল ইংরেজি শিখিয়া এই নিগূঢ় তথ্য ভুলিয়া ইংরেজি শিক্ষিতগণ লোভের তাড়নায় পাশব আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ধর্মশীলতা শ্রমশীলতা ব্যাধিহীনতা দীর্ঘজীবিতা, হৃদয়ের কমনীয়তা, চরিত্রের নির্মলতা, সাত্ত্বিকতা আধ্যাত্মিকতা সমস্ত হারাইতে বসিয়াছেন। তিনি বলেন, এই আহার-তথ্যের 'শিক্ষা গুরুপুরোহিতেরা দিলেই ভালো হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি এ-শিক্ষা দিতে অক্ষম হন তবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রকেই এ-শিক্ষা দিতে হইবে'। এই বলিয়া তিনি নিজে উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 'নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।'

এই লেখা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। নিশ্চয়ই লেখকমহাশয়ের অগোচর নাই যে, ইংরেজিশিক্ষিত নব্যগণ যে কেবল আমিষ খান তাহা নয়, তাঁহারা গুরুবাক্য মানেন না। কতকগুলি কথা আছে যাহার উপরে তর্কবিতর্ক চলিতে পারে। আহার প্রসঙ্গটি সেই শ্রেণীভুক্ত। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্বপ্রান্তে নিবিষ্ট করিয়াছেন; সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু। পূর্বকালের বাদশাহেরা যখন কাহারও মুণ্ড আনিতে বলিতেন তখন আদেশপত্রে এইরূপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যুক্তি প্রয়োগ

করিতেন; এবং গুরুপুরোহিতেরাও সচরাচর নানা কারণে এইরূপ যুক্তিকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরেজ বাদশাহ কাহারও মুণ্ডপাত করিবার পূর্বে বিস্তারিত যুক্তিনির্দেশ বাহুল্য জ্ঞান করেন না, এবং ইংরেজ গুরু মত জাহির করিবার পূর্বে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে না পারিলে গুরুপদ হইতে বিচ্যুত হন। আমরা অবস্থাগতিকে সেই ইংরেজরাজের প্রজা, সেই ইংরেজ গুরুর ছাত্র, অতএব চন্দ্রনাথবাবুর স্বাক্ষরের প্রতি আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহা ছাড়াও আমরা প্রমাণ প্রত্যাশা করিয়া থাকি। ইহাকে কুশিক্ষা বা সুশিক্ষা যাহাই বল, অবস্থাটা এইরূপ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আহার সম্বন্ধে কী নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচলিত ছিল জানি না এবং চন্দ্রনাথবাবুও নব্যশিক্ষিতদের নিকটে তাহা গোপন করিয়াই গেছেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রমাণ করিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আহার্যের মধ্যে মাংসের চলন না ছিল এমন নহে।

এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোনো সমাজ রচিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবল বিংশতি কোটি অধ্যাপক পুরোহিত এবং তপস্বীর প্রাদুর্ভাব হইলে অতি সত্বরই সেই সুপবিত্র জনসংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল মাংসপেশীও ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক-অনুসারে আমিষও ছিল নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত—শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল তখনই প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য আপনাকে মহতের ধৈর্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল এবং দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মদের গোরুটি হইয়া তাঁহারই ঘানিগাছের চতুর্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল। এমন সংযম এমন বন্ধ নিয়ম, এমন নিরামিষ সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে। আজকাল চোখের ঠুলি খুলিয়া অনেকে ঘানি-প্রদক্ষিণের পবিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। কী আক্ষেপের বিষয়।

এক হিসাবে শঙ্করাচার্যের আধুনিক ভারতবর্ষকেই প্রাচীন ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতবর্ষ তখন এমনই জরাগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহার জীবনের লক্ষণ আর বড়ো নাই। সেই মৃতপ্রায় সমাজকে শুভ্র আধ্যাত্মিক বিশেষণে সজ্জিত করিয়া তাহাকেই আমাদের আদর্শস্থল বলিয়া প্রচার করিতেছি, তাহার কারণ, আমাদের সহিত তাহার তেমন অনৈক্য নাই। কিন্তু মহাভারতের মহাভারতবর্ষকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে-প্রচণ্ড বীর্য, বিপুল উদ্যমের আবশ্যক তাহা কেবলমাত্র নিরামিষ ও সাত্ত্বিক নহে, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের আবাদ করিলে সে-ভারতবর্ষ উৎপন্ন হইবে না।

আহারের সহিত আত্মার যোগ আর-কোনো দেশ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল কি না জানি না কিন্তু প্রাচীন য়ুরোপের যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যেও আহারব্যবহার এবং জীবনযাত্রা কঠিন নিয়মের দ্বারা সংযত ছিল। কিন্তু সেই উপবাসকৃশ যাজকসম্প্রদায়ই কি প্রাচীন য়ুরোপ। তখনকার য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়মণ্ডলীও কি ছিল না। এইরূপ বিপরীত শক্তির ঐক্যই কি সমাজের প্রকৃত জীবন নহে।

কোনো বিশেষ আহারে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় বলিতে কী বুঝায়। মনুষ্যের মধ্যে যে-একটি কর্তৃশক্তি আছে, যে-শক্তি স্থায়ী সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণিক সুখ বিসর্জন করে, ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করিয়া বর্তমানকে চালিত করে, সংসারের কার্যনির্বাহার্থ আমাদের যে-সকল প্রবৃত্তি আছে

প্রভুর ন্যায় তাহাদিগকে যথাপথে নিয়োগ করে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তবে স্বল্পাহারে বা বিশেষ আহারে সেই শক্তি বৃদ্ধি হয় কী করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এবং আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ-পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যদি তৎসম্বন্ধে কোনো রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গোচর হইয়া থাকে, তবে অক্ষম গুরুপুরোহিতের প্রতি ভারার্পণ না করিয়া চন্দ্রনাথবাবু নিজে তাহা প্রকাশ করিলে আজিকার এই নব্য পাশবাচারের দিনে বিশেষ উপকারে আসিত।

এ কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।

মনে করো, প্রভুর নিয়োগক্রমে লোকাকীর্ণ রাজপথে আমাকে চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিতে হয়। কাজটা খুব শক্ত হইতে পারে কিন্তু ঘোড়াগুলার দানা বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আধমরা করিয়া রাখিলে কেবল ঘোড়ার চলৎশক্তি কমিবে, কিন্তু তাহাতে যে আমার সারথ্যশক্তি বাড়িবে এমন কেহ বলিতে পারে না। ঘোড়াকে যদি তোমার শত্রুই স্থির করিয়া থাক তবে রথযাত্রাটা একেবারে বন্ধই রাখিতে হয়। প্রবৃত্তিকে যদি রিপু জ্ঞান করিয়া থাক তবে শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে কি না তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য।

গীতায় ‘শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন’ তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই যে, কর্মেই মনুষ্যের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযত করিতেও হয়। কর্ম যতই বিচিত্র, বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মসংযমের চর্চা ততই অধিক। এঞ্জিনের পক্ষে বাষ্প যেমন, কর্মানুষ্ঠানের পক্ষে প্রবৃত্তি সেইরূপ। এঞ্জিনে যেমন একদিকে ক্রমাগত কয়লার খোরাক দিয়া আগ্নেয় শক্তি উত্তেজিত করিয়া তোলা হইতেছে আর-একদিকে তেমনি দুর্ভেদ্য লৌহবল তাহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিয়া স্বকার্যে নিয়োগ করিতেছে, মনুষ্যের জীবনযাত্রাও সেইরূপ। সমস্ত আগুন নিবাইয়া দিয়া সাত্ত্বিক ঠাণ্ডা জলের মধ্যে শীতকালের সরীসৃপের মতো নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই যদি মুক্তির উপায় বল তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে উপদেশ নহে। প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ মনোজ শক্তিকে নানা শক্তিতে রূপান্তরিত ও বিভক্ত করিয়া চালনা করার দ্বারাই কর্মসাধন এবং আত্মকর্তৃত্ব উভয়েরই চর্চা হয়-- খোরাক বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির শ্বাসরোধ করা আধ্যাত্মিক আলস্যের একটা কৌশলমাত্র।

তবে এমন কথা উঠিতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবমাত্রেরই আহারের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে; যদি মধ্যে মধ্যে এক-একদিন আহার রহিত করিয়া অথবা প্রত্যহ আহার হ্রাস করিয়া সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় তবে তদ্দ্বারা আত্মশক্তির চালনা হইয়া আধ্যাত্মিক বললাভ হয়। এ-সম্বন্ধে কথা এই যে, মাঝিগিরিই যাহার নিয়ত ব্যবসায়, শখের দাঁড় টানিয়া শরীরচালনা তাহার পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে প্রতিদিনই এত সংযমচর্চার আবশ্যক এবং অবসর আছে যে শখের সংযম বাহুল্যমাত্র। এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁহারা জপ তপ উপবাস ব্রতচারণে নানাপ্রকার সংযম পালন করেন, কিন্তু সাংসারিক বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সংযম নাই। শখের সংযমের প্রধান আশঙ্কাই তাই। লোকে মনে করে যখন সংযমচর্চার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র কঠিনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে তখন কর্মক্ষেত্রে ঢিলা দিলেও চলে। অনেক সময় ইহার ফল হয়, খেলায় সংযম এবং কাজে স্বেচ্ছাচারিতা, মুখে জপ এবং অন্তরে কুচক্রান্ত, ব্রাহ্মণকে দান এবং ব্যবসায়ে প্রতারণা, গঙ্গাস্নানের নিষ্ঠা এবং চরিত্রের অপবিত্রতা।

যাহা হউক, কর্মানুষ্ঠানকেই যদি মনুষ্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ বল, এবং কেবল ঘরসংসার করাকেই একমাত্র কর্ম না বল, যদি ঘরের বাহিরেও সুবৃহৎ সংসার থাকে এবং সংসারের বৃহৎ কার্যও যদি

আমাদের মহৎ কর্তব্য হয় তবে শরীরকে নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না; তবে শারীরিক বল ও শারীরিক উদ্যমকে আধ্যাত্মিকতার অংগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা হইলে বিচার্য এই যে, শরীরের বলসাধনের পক্ষে সামিষ এবং নিরামিষ আহারের কাহার কিরূপ ফল সে-বিষয়ে আমার কিছু বলা শোভা পায় না এবং ডাক্তারের মধ্যেও নানা মত। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

> নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।

আমরা এক শতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহমনের সাতিশয় পুষ্টি অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়া আসিতেছি, মতপ্রচারের উৎসাহে চন্দ্রনাথবাবু সহসা তাহাদিগকে কী করিয়া ভুলিয়া গেলেন বুঝিতে পারি না। তাহারাই কি আমাদিগকে ভোলে না আমরাই তাহাদিগকে ভুলিতে পারি? তাহাদের দেহের পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদের নাসার সম্মুখে সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে, এবং তাহাদের মনের পুষ্টি যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে আমাদেরই বোধশক্তির অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

প্রমাণস্থলে লেখকমহাশয় হবিষ্যাশী অধ্যাপকপণ্ডিতের সহিত আমিষাশী নব্য বাঙালির তুলনা করিয়াছেন। এইরূপ তুলনা নানা কারণে অসংগত।

প্রথমত, মুখের এক কথাতেই তুলনা হয় না। অনির্দিষ্ট আনুমানিক তুলনার উপর নির্ভর করিয়া সর্বসাধারণের প্রতি অকাট্য মত জারি করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, যদি বা স্বীকার করা যায় যে, অধ্যাপকপণ্ডিতেরা মাংসাশী যুবকের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তথাপি আহারের পার্থক্যই যে সেই প্রভেদের কারণ তাহার কোনো প্রমাণ নাই। সকলেই জানেন অধ্যাপকপণ্ডিতের জীবন নিতান্তই নিরুদ্‌বেগ এবং আধুনিক যুবকদিগের পক্ষে জীবনযাত্রানির্বাহ বিষম উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং উদ্‌বেগ যেরূপ আয়ুক্ষয়কর এরূপ আর কিছুই নহে।

নিরামিষাশী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতই বলিষ্ঠ ও নম্রপ্রকৃতি হউন না কেন, তাঁহাকে 'সাত্ত্বিক আহারের উৎকৃষ্টতার' প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা লেখকমহাশয়ের পক্ষে যুক্তিসংগত হয় নাই। আমিও এমন কোনো লোককে জানি যিনি দুইবেলা মাংস ভোজন করেন অথচ তাঁহার মতো মাটির মানুষ দেখা যায় না। আরও এমন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অনেক আছে, কিন্তু সেগুলিকে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া ফল কী। চন্দ্রনাথবাবুর বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এরূপ ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রমাণস্বরূপে প্রয়োগ করিলে বুঝায় যে, তাঁহার মতে অন্যপক্ষে একজনও বলিষ্ঠ এবং নির্মলপ্রকৃতির লোক নাই।

আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের প্রতি চন্দ্রনাথবাবুর অভিযোগ এই যে :

> তাঁহারা অসংযতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের সংযম শিক্ষা একেবারেই হয় না। এইজন্য তাঁহারা প্রায়ই সম্ভোগপ্রিয়, ভোগাসক্ত হইয়া থাকেন। শুধু আহারে নয়, ইন্দ্রিয়াধীন সকল কার্যেই তাঁহারা কিছু লুব্ধ, কিছু মুগ্ধ, কিছু মোহাচ্ছন্ন।

অসংযতেন্দ্রিয় এবং সংযমশিক্ষাহীন, সম্ভোগপ্রিয় এবং ভোগাসক্ত, মুগ্ধ এবং মোহাচ্ছন্ন, কথাগুলার প্রায় একই অর্থ। উপস্থিতক্ষেত্রে চন্দ্রনাথবাবুর বিশেষ বক্তব্য এই যে নব্যদের লোভটা কিছু বেশি প্রবল।

প্রাচীন ব্রাহ্মণবটুদের ঐ প্রবৃত্তিটা যে মোটেই ছিল না, একথা চন্দ্রনাথবাবু বলিলেও আমরা স্বীকার করিতে পারিব না। লেখকমহাশয় লুব্ধ পশুর সহিত নব্য পশুখাদকের কোনো প্রভেদ দেখিতে পান না। কিন্তু একথা জগদ্‌বিখ্যাত যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বশ করিবার প্রধান উপায় আহার এবং দক্ষিণা। অধ্যাপকমহাশয় ঔদরিকতার দৃষ্টান্তস্থল। যিনি একদিন লুচিদধির গন্ধে উন্মনা হইয়া জাতিচ্যুত ধনীগৃহে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং আহারান্তে বাহিরে আসিয়া কৃত

কার্য অম্লানমুখে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারই পৌত্র আজ ‘চপকট্‌লেটের সৌরভে বাবুর্চি বাহাদুরের খাপরেলখচিত মুর্গিমণ্ডপাভিমুখে ছোটেন’ এবং অনেকে তাহা বাহিরে আসিয়া মিথ্যাচরণপূর্বক গোপনও করেন না। উভয়ের মধ্যে কেবল সময়ের ব্যবধান কিন্তু সংযম ও সাত্ত্বিকতার বড়ো ইতরবিশেষ দেখি না। তাহা ছাড়া নব্য ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন পিতৃপুরুষেরা যে ক্রোধবর্জিত ছিলেন তাঁহাদের তর্ক ও বিচারপ্রণালীদ্বারা তাহাও প্রমাণ হয় না।

যাহা হউক, প্রাচীন বঙ্গসমাজে ষড়্‌রিপু যে নিতান্ত নির্জীবভাবে ছিল এবং আধুনিক সমাজে আমিষের গন্ধ পাইবামাত্র তাহারা সব ক’টা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, এটা অনেকটা লেখক-মহাশয়ের কল্পনামাত্র। তাঁহার জানা উচিত, আমরা প্রাচীন কালের যুবকদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; যাঁহাদিগকে দেখি তাঁহারা যৌবনলীলা বহুপূর্বে সমাধা করিয়া ভোগাসক্তির বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের সহজেই ধারণা হয়, তবে বুঝি সেকালে কেবলমাত্র হরিনাম এবং আত্মারই আমদানি ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যে-সকল পীতবর্ণ জীর্ণ বৈষয়িক এবং রসনিমগ্ন পরিপক্ক ভোগী বৃদ্ধ দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, সত্যযুগ আমাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিল না।

সামিষ এবং নিরামিষ আহারের তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি, আহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া একটা ঘরগড়া দৈববাণী রচনা করা আজকালকার দিনে শোভা পায় না। এখনকার কালে যদি কোনো দৈবদুর্যোগে কোনো লোকের মনে সহসা একটা অভ্রান্ত সত্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে অথচ সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রমাণ দেখা না দেয়, তবে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য সেটাকে মনে মনে পরিপাক করা। গুরুর ভঙ্গিতে কথা বলার একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপ ভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয়, কারণ সত্য কোনো লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না, আপনার যুক্তি দ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ মাত্র।

অবশ্য, রুচিভেদে অভিজ্ঞতাভেদে আমাদের কোনো জিনিস ভালো লাগে কোনো জিনিস মন্দ লাগে, সকল সময়ে তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পারি না। তাহার যেটুকু কারণ তাহা আমাদের সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত, সেটাকে টানিয়া বাহির করা ভারি দুরূহ। মনের বিশেষ গতি অনুসারে অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপরেও আমরা অনেক মত গঠিত করিয়া থাকি; এইরূপ ভূরি ভূরি অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাই। সেইরূপ মত ও বিশ্বাস যদি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হয় তবে তাহা বলিবার একটা বিশেষ ধরন আছে। একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্বসাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্যস্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাতজনক।

১২৯৮

কর্মের উমেদার

প্রকাণ্ড পিয়ানো অথবা বৃহদাকার অর্গান যন্ত্র সঙ্গে না থাকিলে য়ুরোপীয় সংগীত সম্পূর্ণ হয় না—য়ুরোপীয় সংসারযাত্রাও তেমনই স্তূপাকার সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। শোয়াবসা চলাফেরা, অশন বসন ভূষণ, সকল দিকেই তাহাদের এত সহস্র সরঞ্জামের সৃষ্টি হইয়াছে যে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক হইতে হয়। একটা শামুকের পিঠে কতটুকুই বা খোলা, কিন্তু মানুষের আসবাবের খোলস প্রতিদিন পর্বতাকার হইয়া উঠিতেছে।

মানুষও সেই পরিমাণে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে কি না সেই একটা জিজ্ঞাস্য আছে। একটা রোগ আছে তাহাতে মানুষের খাদ্যের অধিকাংশই চর্বিতে পরিণত করে। অস্থি মাংসপেশি স্নায়ু অনুরূপমাত্রায় খাদ্য পায় না, কেবল শরীরের পরিধি বিপুল হইয়া উঠিতে থাকে। সর্বাঙ্গীণ

স্বাস্থ্যের পরিবর্তে এরূপ অতিরিক্ত আংশিক উদ্যমকে কেহ কল্যাণজনক মনে করিতে পারে না। ডাক্তাররা বলেন, এরূপ বিপরীত রসাগ্রস্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের বিকার (fatty degeneration of heart) ঘটিতে পারে এবং মস্তিষ্কের পক্ষেও এরূপ অবস্থা অনুকূল নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতাও কি সেইরূপ বেশি মাত্রায় বহরে বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং জিনিসপত্রের প্রকাণ্ড চাপে তাহার হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, অথবা তাহা দৈত্যের মতো সর্বাংশেই বিপুলতা লাভ করিতেছে এবং অন্যের পক্ষে যাহা অত্যধিক তাহার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক পরিমাণ, ইহার মীমাংসা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং সে-চেষ্টাও বিদেশীর পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

কিন্তু সভ্যতার অসংখ্য আসবাব জোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মতো খাটিতেছে। যত সস্তায় যত বেশি জিনিস উৎপন্ন করা যাইতে পারে, সকলের এই প্রাণপণ চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই একান্ত চেষ্টা হইলে মানুষকে ক্রমে আর মানুষ জ্ঞান হয় না, কলেরই একটা অংশ মনে হয়, এবং তাহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব জিনিস আদায় করিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়। তাহার সুখদুঃখ শ্রান্তি-বিশ্রামের প্রতি অধিক মনোযোগ করিলে অচল হইয়া উঠে।

য়ুরোপে এইরূপ অবস্থা উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিকসম্প্রদায় লাভ করিতেছেন এবং ধনীসম্প্রদায় আরামে আছেন।

কিন্তু য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। কোনো প্রবল শক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার উপর চাপ দিলেই আমরা ধূলির মতো গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই; তা সে ব্রহ্মণ্যশক্তিই হউক আর রাজন্যশক্তিই হউক, শাস্ত্রই হউক আর শস্ত্রই হউক। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে কারণেই হউক, যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে তখনই সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে— সে ধর্মের বন্ধনই হউক আর কর্মের বন্ধনই হউক।

য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া উঠে— শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে, মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হউক বিলম্বেই হউক, সংশোধনের পথ মুক্ত আছে। সেখানে রোগ আরম্ভ হইলে একেবারে মৃত্যুতে গিয়া শেষ হয় না। যাহারা আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকার-চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে— জ্বর আরম্ভ হইলে বিকারে গিয়া দাঁড়ায়।

অতএব, আমাদের দেশে যদি অতিরিক্ত যন্ত্রচালনার প্রাদুর্ভাব হইত তবে তাহার পরিণাম ফল কী হইত বলা শক্ত নহে। আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে খুব বেশি পরিবর্তন হইত না। কারণ, আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কী খাইব, কী করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এবং দানধ্যান তপজপ প্রভৃতি ধর্মকার্যে আমরা এমনই বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়াছি যে, মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে— স্বাধীন ভাবে চিন্তাও করিতে পারি না, স্বাধীন ভাবে কার্যও করিতে পারি না। আকস্মিক ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলিয়া ফ্যাল ফ্যাল

করিয়া তাকাইয়া থাকি। প্রবল শক্তি মাত্রকেই অনিবার্য দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করি। য়ুরোপে গুটিপোকার মড়ক হইলে, দ্রাক্ষা কীটগ্রস্ত হইলে তাহারও প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়; আমাদের দেশে ওলাউঠা এবং বসন্তকে আমরা পূজা করিয়া মরি। স্বাধীন বুদ্ধির চোখ বাঁধিয়া, তুলা দিয়া তাহার নাসাকর্ণ রোধ করিয়া আমরাও সম্প্রতি এইরূপ পরম আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। অন্তরে যখন এইরূপ পরিপূর্ণ অধীনতা বাহিরে তখন স্বাধীনতা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না।

অতএব, যদি মজুরের আবশ্যক হয় তো আমাদের মতো কলের মজুর আর নাই।

য়ুরোপের মজুররা প্রতিদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কাছে যে কথা নূতন ঠেকিবে তাহারা সেই কথা উত্থাপিত করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, মজুর হই আর যা-ই হই, আমরা মানুষ। আমরা যন্ত্র নই। আমরা দরিদ্র বলিয়াই যে প্রভুরা আমাদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন তাহা হইতে পারে না, আমরা ইহার প্রতিকার করিব। আমাদের বেতন বৃদ্ধি করো, আমাদের পরিশ্রম হ্রাস করো, আমাদের প্রতি মানুষের ন্যায় আচরণ করো।

যন্ত্ররাজের বিরুদ্ধে যন্ত্রীগণ এইরূপে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রচার করিতেছে।

য়ুরোপে রাজা এবং ধর্মের যথেচ্ছ প্রভুত্ব শিথিল হইয়া ধনের প্রভুত্ব বলীয়ান হইয়া উঠিতেছিল। সারসরাজা ধরিয়া খায়, কাষ্ঠরাজা চাপিয়া মারে। য়ুরোপ পূর্বেই সারসরাজার চঞ্চু বাঁধিয়া দিয়াছে; এবারে জড়রাজার সহিত লাঠালাঠি বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ধনের অধীনতার একটা সীমা ছিল, সেই পর্যন্ত মানুষ সহ্য করিয়াছিল। শিল্পীর একটা স্বাধীনতা আছে। শিল্পনৈপুণ্য তাহার নিজস্ব। তাহার মধ্যে নিজের প্রতিভা খেলাইতে পারে এমন স্থান আছে। শক্তি অনুসারে সে আপন কাজে গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম। নিজের হাতের কাজ নিজে সম্পূর্ণ করিয়া সে একটি স্বাধীন সন্তোষ লাভ করিতে পারে।

কিন্তু যন্ত্র সকল মানুষকেই ন্যূনাধিক সমান করিয়া দেয়। তাহাতে স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাইবার স্থান নাই। জড়ের মতো কেবল কাজ করিয়া যাইতে হয়।

এইরূপে সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমন-কি, সে যে-কাজ করে সে-কাজের মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোক-সংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্বে যাহারা শিল্পী ছিল এখন তাহারা মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে যাহারা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে কাজ করিত এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে।

ইহাতেই নির্ধনের আন্তরিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কাজের সুখ নাই। সে আপনার মনুষ্যত্ব খাটাইতে পারে না।

বিলাসী রোম একসময়ে অসভ্য বিদেশীকে আপনাদের সেনারূপে নিযুক্ত করিয়াছিল। য়ুরোপের শূদ্রদল যদি বিদ্রোহী হইয়া কখনো কর্মে জবাব দেয়, পূর্ব হইতে জানাইয়া রাখা ভালো আমরা উমেদার আছি।

আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি। মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; পশুর মতো নিজের স্বাভাবিক চক্ষুতে ঠুলি পরিয়া পরের রাশ মানিয়া কী করিয়া চলিতে হয় বহুকাল হইতে তাহা তাঁহারা শিখাইয়াছেন, এখন আমাদিগকে যন্ত্রে জুতিয়া দিলেই হইল। শরীর কাহিল বটে, যন্ত্রের তাড়নায় প্রাণান্ত হইতে পারে, কিন্তু কখনো বিদ্রোহী হইব না। কখনো এমন স্বপ্নেও মনে করিব না যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ-অবস্থার কোনো প্রতিকার হইতে পারে।

কর্মে আমাদের অনুরাগ নাই। বৈরাগ্যমন্ত্র কানে দিয়া সেটুকু জীবনলক্ষণও আমাদের রাখা হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কলের কাজের কোনো ব্যাঘাত হইবে না, বরং সুবিধা হইবে। কেননা কর্মে যাহাদের প্রকৃত অনুরাগ আছে তাহারা সহিষ্ণুতাসহকারে কলের কাজ করিতে পারে না।

কারণ, যাহারা কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া সুখ পায় তাহারাই কর্মের অনুরাগী। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে বাধা অতিক্রম করিয়া একটা কার্য সমাধাপূর্বক তাহারা আপনারই স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, সে-ই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু সেরূপ কর্মানুরাগী লোক কলের কাজ করিয়া সুখী হয় না, কারণ কলের কাজে কেবল কাজের দুঃখ আছে অথচ কাজের সুখটুকু নাই। তাহাতে স্বাধীনতা নাই। কোনো কর্মপ্রিয় লোক ঘানির গোরু কিংবা স্যাক্‌রাগাড়ির ঘোড়া হইতে চাহে না। কিন্তু যাহার কর্মে অনুরাগ দূর হইয়া গেছে তাহাকে এরূপ কাজে লাগাইলে ললাটের লিখন স্মরণ করিয়া বিনা উপদ্রবে সে কাজ করিয়া যায়।

মাঝে ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। বহুদিবসের পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না। তাঁহারা উপদেশ দেন, অদৃষ্টবাদ অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন চেষ্টাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া দেয়। সর্ববিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন বুদ্ধিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখে! আমাদের যাহা আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র, কারণ এ কথা স্মরণ রাখিলে স্বাধীন বুদ্ধি এবং স্বাধীন চেষ্টাকে একেবারেই জবাব দেওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় এই-সকল জ্ঞানগর্ভ কথা সাধারণের খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে, বহুকাল হইতে হৃদয় এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া আছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে যন্ত্র যতই সম্পূর্ণ হইবে তাহা চালনা করিতে মানুষের বুদ্ধির আবশ্যক ততই হ্রাস হইয়া আসিবে, এবং স্বাধীনবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে সে-কাজ ততই অসহ্য হইয়া উঠিবে। আশা আছে, ভারতবর্ষীয়দের বিশেষ উপযোগিতা তখনই য়ুরোপ বুঝিতে পারিবে। যাহারা মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলে চাষ করিতেছে, যাহারা মনুর আমলের ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে, যাহারা যেখানে পড়ে সেইখানে পড়িয়া থাকাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় বলিয়া গর্ব করে, আবশ্যক হইলে তাহারাই সহিষ্ণুভাবে নতশিরে সমস্ত য়ুরোপের কল টানিতে পারিবে। যদি বরাবর পবিত্র আর্যশিক্ষাই জয়ী হয় তবে আমাদের প্রপৌত্রদিগের চাকরির জন্য বোধ হয় আমাদের পৌত্রদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না।

১২৯৮

আদিম আর্য-নিবাস

লেখাপড়া শিখিয়া আমাদের অনেকেই মা-সরস্বতীর কাছে আবেদন করিয়া থাকেন :

যে বিদ্যা দিয়েছ মা গো ফিরে তুমি লও,
কাগজ কলমের কড়ি আমায় ফিরে দাও।

মা-সরস্বতী অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা ফিরাইয়া লন, কিন্তু কড়ি ফিরাইয়া দেন না।

অনেক বিদ্যা, যাহা মাথা খুঁড়িয়া মাথায় প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল, হঠাৎ নোটিস পাওয়া যায়, সেগুলা মিথ্যা; আবার মাথা খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহির করা দায় হইয়া উঠে। শতদলবাসিনী যদি ইংরেজ-আইনের বাধ্য হইতেন তবে উকিলের পরামর্শ লইয়া তাঁহার নিকট হইতে খেসারতের দাবি করা যাইতে পারিত। জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য-অপবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

বাল্যকালে শিক্ষা করিয়াছিলাম, মধ্য-এশিয়ার কোনো-এক-স্থানে আর্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। সেখান হইতে একদল য়ুরোপে এবং একদল ভারতবর্ষে ও পারস্যে যাত্রা করে। কতকগুলি এশিয়াবাসী ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষার সাদৃশ্য দ্বারা ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

কথাটা মনে রাখিবার একটা সুবিধা ছিল। সূর্য পূর্ব দিক হইতে পশ্চিমে যাত্রা করে। শ্বেতাঙ্গ

আর্যগণও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্বাচলের কাছেও দুই-একটি মলিন জ্যোতিরেখা রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উপমা যতই সুন্দর হউক, তাহাকে যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আজকাল ইংলন্ড ফ্রান্স ও জার্মানিতে বিস্তর পুরাতত্ত্ববিৎ উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন য়ুরোপই আর্যদের আদিম বাসস্থান, কেবল একদল কোনো বিশেষ কারণে এশিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইঁহাদের দল প্রতিদিন যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাতে বেশ মনে হইতেছে, আমাদের পুত্রপৌত্রগণ প্রাচীন আর্যদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং আমাদের ধারণাকে একটা বহুকেলে ভ্রম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে ছাড়িবেন না।

আর্যদিগের পশ্চিমযাত্রা সম্বন্ধে ইংলন্ডে ল্যাথাম সাহেব সর্বপ্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন, শাখা হইতে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি হইতেই শাখা হয়। য়ুরোপেই যখন অধিকাংশ আর্যজাতির বাসস্থান দেখা যাইতেছে তখন সহজেই মনে হয়, য়ুরোপেই মোট জাতটার উদ্ভব হইয়াছে এবং পারস্য ভারতবর্ষে তাহার একটা শাখা প্রসারিত হইয়াছে মাত্র।

মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিৎ হুইটনি সাহেব বলেন, আর্যদিগের আদিম নিবাস সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান ইতিহাস অথবা ভাষা-আলোচনা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। অতএব মধ্য-এশিয়ায় আর্যদের বাসস্থান নিরূপণ করা নিতান্তই কপোলকল্পিত অনুমান।

জর্মান পণ্ডিত বেন্‌ফি সাহেব বলেন, এশিয়াই আর্যদিগের প্রথম জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিবার একটি কারণ ছিল। বহুদিন হইতে একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, এশিয়াতেই মানবের প্রথম উৎপত্তি হয়; অতএব আর্যগণ যে সেইখান হইতেই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার বিশেষ প্রমাণ লওয়া কেহ আবশ্যক মনে করিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের ভূস্তরে বহুপ্রাচীন মানবের বাসচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইজন্য সেই পূর্ব সংস্কার এখন অমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই— সংস্কৃত ও পারসিকের সহিত গ্রীক লাটিন জর্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় গার্হস্থ্য সম্পর্ক এবং অনেক পশু ও প্রাকৃতিক বস্তুর নামের ঐক্য আছে; সেই ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, নানা স্থানে বিভক্ত হইবার পূর্বে আর্যগণ যখন একত্রে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল ভাষা তুলনা করিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, যদি দেখা যায় সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ভাষায় লাঙ্গলের নামের সাদৃশ্য আছে তবে স্থির করা যায় যে, আর্যগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই যদি দেখা যায় কোনো-একটা বস্তুর নাম উভয় ভাষায় পৃথক তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভিন্ন হইবার পরে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেন্‌ফি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় সিংহ শব্দ যে-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে-ধাতু য়ুরোপীয় কোনো ভাষায় নাই। অপর পক্ষে গ্রীকগণ সিংহের নাম হিব্রুভাষা হইতে ধার করিয়া লইয়াছেন— গ্রীক লিস্‌, হিব্রু লাইশ। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে, আর্যগণ একত্র থাকিবার সময় সিংহের পরিচয় পান নাই। সম্ভবত গ্রীক লিস্‌ ও লিওন্‌ শব্দের ন্যায় সংস্কৃত সিংহ শব্দও তৎকালীন কোনো অনার্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অথবা পশুরাজের গর্জনের অনুকরণেও নূতন নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, এশিয়াই যদি আর্যদিগের আদিম নিবাস হইত তবে সিংহ শব্দের ধাতু য়ুরোপীয় আর্যভাষাতেও পাওয়া যাইত। উষ্ট্র হস্তী এবং ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

এদিকে আবার মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শ্বেতবর্ণ মানবেরা একটি বিশেষজাতীয় এবং এই-জাতীয় মানব য়ুরোপেই দেখা যায়, এশিয়ায় নহে। প্রাচীন বর্ণনা এবং বর্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে, আদিম আর্যগণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং বর্তমান আর্যদের অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। অতএব য়ুরোপেই এই শ্বেতজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি অধিকতর সংগত বলিয়া বিবেচনা হয়।

লিন্ডেন্‌স্মিট বলেন, ভাষার ঐক্য ধরিয়া যে-সমস্ত জাতিকে আর্য-নামে অভিহিত করা হইতেছে মস্তকের গঠন ও শারীরিক পরিণতি অনুসারে তাহাদের আদিম আদর্শ য়ুরোপেই দেখা যায়। য়ুরোপীয়দের শারীরিক প্রকৃতি, দীর্ঘ জীবন এবং দুর্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আর্যজাতির প্রবলতম প্রাচীনতম এবং গভীরতম মূল কোথায় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষে ও এশিয়ার অন্যত্র আর্যগণ তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া সংকর জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী ফিন্‌জাতি আর্যজাতি নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ কুনো সাহেব দেখাইয়াছেন, ফিন্‌ভাষার বহুতর সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম শব্দ, এবং পারিবারিক সম্পর্কের নাম ইন্ডোয়ুরোপীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাঁহার মতে এ-সকল শব্দ যে ধার করিয়া লওয়া তাহা নহে; কোনো-এক সময়ে অতি প্রাচীনকালে উক্ত দুই জাতির পরস্পরসামীপ্যবশত কতকগুলি শব্দ ও ধাতু উভয়েরই সরকারি দখলে ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় য়ুরোপেই আর্যগণের আদিম বাসস্থান, সুতরাং ফিন্‌জাতি তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিল।

ইতিমধ্যে আবার একটা নূতন কথা অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে, সেটা যদি ক্রমে পাকিয়া দাঁড়ায় তবে আবার প্রাচীন মতই বহাল থাকিবার সম্ভাবনা।

সেমেটিক জাতি (আরব্য য়িহুদি প্রভৃতি জাতিরা যাহার অন্তর্গত) আর্যজাতির দলভুক্ত নয়, এতকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজকাল দুই-একজন করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কোনো কোনো সেমেটিক শব্দের সহিত আর্যশব্দের সাদৃশ্য বাহির করিতেছেন। এবং কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, সেমেটিকগণ হয়তো এককালে আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; সর্বাগ্রে তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহাদের সহিত অবশিষ্ট আর্যগণের সাদৃশ্য ক্রমশই ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। আর্যদিগের সহিত সেমেটিকদের সম্পর্ক স্থির হইয়া গেলে আদিমকালে উভয়ের একত্র এশিয়া-বাসই অপেক্ষাকৃত সংগত বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু এ মত এখনো পরিস্ফুট হয় নাই, অনুমানের মধ্যেই আছে।

আমরা বলি, আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক, কুটুম্বিতা যতই বাড়ে ততই ভালো। এই এক আর্যসম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বাধিয়াছে। আরবিক ও য়িহুদিরা কম লোক নহে। তাহারা যদি জাতভাই হইয়া দাঁড়ায় সে তো সুখের বিষয়। বর্ণিত আছে যে, দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন— যখন আমার সে-ই পঞ্চস্বামীই হইল, তখন কর্ণকে সুদ্ধ ধরিয়া ছয় স্বামী হইলেই মনের খেদ মিটিত; তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার স্বামীর তুলনা মিলিত না। আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা। ইংরেজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা তো আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয়গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্যমাতার প্রথম-জাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

১২৯৯

আদিম সম্বল

যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোনো কাজে না খাটাইয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া যক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।

যেমন একটা আছে স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আর-একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার

কোনো স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর-একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ কথা স্বভাবতই অসংগত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনোই উন্নতির পথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর-একজনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তেমনই সত্যপ্রিয়তা আর-একটি। ছলনার প্রতি যে একটা ঘৃণা, সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্নত সরলতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তেমনই স্বভাবসুস্থ যুবক জাতি সহজেই সত্যাচরণ করে।

যদি-বা কোনো বয়স্ক বিজ্ঞলোক এমন মনে করেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও আমার স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে, অতএব সেইরূপ স্থলে অধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসংগত; কথাটা যেমনই প্রামাণিক হউক তবু এ কথা বলিতেই হইবে, যে-জাতির মাথায় এমন যুক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে।

আর-যাই হউক, জীবনের আরম্ভে এরূপ ভাব কিছুতেই শোভা পায় না। আমার কার্য আমাকেই করিতে হইবে; আর-একজন করিয়া দিলে কাজ হইতে পারে কিন্তু আমার ভালো হইবে না। কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কলে কাজ হয় কিন্তু কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে-জাতি কাজ করিতে আরম্ভ করে সে-ই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।

অন্যপক্ষে, যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া, মানুষের স্বাধীনতাসর্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মতো বানাইয়া তাহা হইতে নির্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ। সেখানে চিন্তা যুক্তি আত্মকর্তৃত্ব এবং সেইসঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম, কাজ করা, তাহাই চলিতে থাকিবে।

কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়, কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।

মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনই। অল্প বয়সে অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চিৎ বয়স হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন, সত্য সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত মিশাইয়া বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাঁহারা খুব পাকা কথা বলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত পাকা কথা কোনো মানুষের মুখে শোভা পায় না।

যে খাঁটি লোক, যাহার মন সাদা, যাহার পৌরুষ আছে, সে বলে, ফলাফল-বিচার আমার হাতে নাই, আমি যাহা সত্য তাহা বলিব, লোকে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক।

এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙালিরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কী হিসাবে দেখিব। যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না জীবনলীলা আর-একবার পাল্টাইয়া আরম্ভ করিব?

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে আমরা কখনো একজাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে

এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি; ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সংকল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই-সমস্ত সমবেতহৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার লাভ করিবে; এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসংকোচে অসীম জনতার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদানপ্রদান করিতে থাকিবে; তাহার জ্ঞানের খনি, তাহার কর্মের ক্ষেত্র, তাহার প্রেমের পথ সর্বত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে—তবে মনের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে-স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহাকে এক কথায় বীরত্ব বলে, বুড়ামানুষের মতো তর্ক করিয়া অভ্যাস আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া তাহাকে নির্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা-রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্মে সমাজে দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে-সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা-সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।

১২৯৯

কর্তব্যনীতি

অধ্যাপক হক্সলির মত[১]

জগতে দেখা যায়, সুখ দুঃখ প্রাণীদের মধ্যে ঠিক ন্যায়বিচার-মতে বণ্টন হয় না। প্রথমত, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এতটুকু বিবেকবুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা দণ্ডপুরস্কারের স্বরূপ সুখদুঃখের অধিকারী হইতে পারে। তাহার পরে মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই পাপাচরণ করিয়াও কত লোকে উন্নতিলাভ করিতেছে এবং পুণ্যবান দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে; পিতার দোষে পুত্র কষ্টভোগ করিতেছে; অজ্ঞানকৃত কার্যের ফল ইচ্ছাকৃত অপরাধের সমান হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং একজন লোকের উৎপীড়ন বা অবিবেচনায় শত সহস্র লোককে দুঃখবহন করিতে হইতেছে।

অতএব জগতের নিয়মকে ধর্মনীতির আইন-অনুসারে বিচার করিতে হইলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু সাহস করিয়া কোনো বিচারক সে-রায় প্রকাশ করিতে চান না।

হিব্রুশাস্ত্র এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ এবং গ্রীস আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ওকালতি করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষ বলেন, সকলকেই অসংখ্য পূর্বজন্মপরম্পরার কর্মফল ভোগ করিতে হয়। বিশ্বনিয়মে কোথাও কার্যকারণশৃংখলের ছেদ নাই; সুখদুঃখও সেই অনন্ত অমোঘ অবিচ্ছিন্ন নিয়মের বশবর্তী।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পরিবর্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্যসত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্তী সেই নিত্যপদার্থের নাম ব্রহ্ম এবং জীবের অন্তরস্থিত ধ্রুবসত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধিবাসনা প্রভৃতি মায়া দ্বারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়াকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকে।

---

[১] 'Evolution and Ethics' by Thomas H. Huxley, F.R.S.

এ মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়বাসনা, সমাজবন্ধন, পারিবারিক স্নেহপ্রেম, এমন-কি, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বিনাশ করিয়া একপ্রকার সংজ্ঞাহীন জড়ত্বকেই ব্রহ্মসম্মিলনের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের এই মত গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা আত্মা এবং ব্রহ্মের সত্তাও লোপ করিয়া দিলেন। কারণ, কোথাও কোনো অস্তিত্বের লেশমাত্রও স্বীকার করিলে পুনরায় তাহা হইতে দুঃখের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিতে হয়। এমন-কি, হিন্দুশাস্ত্রের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো এমন একটা নাস্তিবাচক অস্তিত্বকেও তাঁহারা কোথাও স্থান দিতে সাহস করিলেন না।

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কী আর মনই বা কী, কিছুর মধ্যেই নিত্যপদার্থ নাই; অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়, এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোনো নিত্যপদার্থ না থাকাতে একবার নির্বাণলাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

প্রাচীন গ্রীসে স্টোয়িক সম্প্রদায় যখন জগৎকারণ ঈশ্বরে অসীম সদ্‌গুণের আরোপ করিলেন তখন, তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল, ইহাই এক সমস্যা দাঁড়াইল।

তাঁহারা বলিলেন, প্রথমত জগতে অমঙ্গল নাই; দ্বিতীয়ত যদি বা থাকে তাহা মঙ্গলেরই আনুষঙ্গিক; এবং যেটুকু আছে তাহা আমাদের নিজদোষে নয় আমাদের ভালোরই জন্য।

হক্সলি বলেন, অমঙ্গলের মধ্যেও যে মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং দুঃখ কষ্ট যে অনেক সময় আমাদের শিক্ষকের কার্য করে তাহাও সত্য; কিন্তু অসংখ্য মূঢ় প্রাণী, যাহারা এই শিক্ষায় কোনো উপকার পায় না এবং যাহাদিগকে কোনো কাজের জন্য দায়িক করা যাইতে পারে না, তাহারা যে কেন দুঃখভোগ করে এবং অনন্তশক্তিমান কেনই বা সর্বতোভাবে দুঃখপাপহীন করিয়া জগৎসৃজন না করিলেন, স্টোয়িকগণ তাহার কোনো উত্তর দিলেন না। জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম, এ কথা স্বীকার করিলে কোথাও কোনো সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকাই কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু বাহ্যজগৎ যে মানুষের ধর্মশিক্ষাস্থল, সর্বমঙ্গলবাদী স্টোয়িকদের নিকটও তাহা ক্রমশ অপ্রমাণ হইতে লাগিল। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রকৃতির বিরোধী। এ-সম্বন্ধে হক্সলির মত আর-একটু বিবৃত করিয়া নিম্নে লিখা যাইতেছে।

মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া আজ সমস্ত জীবরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। নিজেকে যেন তেন প্রকারেণ বজায় রাখা, যাহা পাওয়া যায় নির্বিচারে তাহাকে আত্মসাৎ করা এবং যাহা হাতে আসে তাহাকে একান্ত চেষ্টায় রক্ষা করা, ইহাই জীবনযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যে-সকল গুণের প্রভাবে বানর এবং ব্যাঘ্র জীবনরক্ষা করিতেছে সেই-সকল গুণ লইয়াই মানুষ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার শারীর প্রকৃতির বিশেষত্ব, তাহার ধূর্ততা, তাহার সামাজিকতা, তাহার কৌতূহল তাহার অনুকরণনৈপুণ্য এবং তাহার ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে নিষ্ঠুর হিংস্রতাই তাহাকে জীবনরঙ্গভূমিতে বিজয়ী করিয়াছে।

ক্রমে আদিম অরাজকতা দূর হইয়া যতই সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ততই মনুষ্যের পাশব গুণগুলি দোষের হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সভ্য মানব যে-মই দিয়া উপরে উঠিয়াছে সে-মইটা আজ পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিতে চাহে। ভিতরে ব্যাঘ্র এবং বানরের যে-অংশটা আছে সেটাকে দূর করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্র-বানরটা সভ্য মানবের সুবিধা বুঝিয়া দূরে যাইতে চাহে না; সেই কৈশোরের চিরসহচরগুলি অনাদৃত হইয়াও মানবসমাজের মধ্যে অনাহূত আসিয়া পড়ে এবং আমাদের সংযত সামাজিক জীবনে শত সহস্র দুঃখকষ্ট এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সনাতন ব্যাঘ্রবানর-প্রবৃত্তিগুলাকে মানুষ আজ পাপ বলিয়া দাগা দিয়াছে এবং যাহারা এককালে আমাদিগকে দুরূহ ভবসংগ্রামে উত্তীর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধনে ছেদনে সবংশে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির আনুকূল্য করিতেছে এ কথা স্বীকার করা যায় না; বরঞ্চ দেখা যায়, আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার অহর্নিশি সংগ্রাম চলিতেছে। স্টোয়িকগণও তাহা বুঝিলেন এবং অবশেষে বলিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া তবে কিয়ৎপরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে। Apatheia অর্থাৎ বৈরাগ্য মানবপ্রকৃতির পূর্ণতাসাধনের উপায়; সেই বৈরাগ্যের অবস্থায় মানবহৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুশাসন পালন করিয়া চলে। সেই স্বল্পাবশিষ্ট চেষ্টাটুকুও কেবল অল্পদিনের জন্য; সে যেন বিশ্বব্যাপী পরমাত্মারই দেহপিঞ্জরাবদ্ধ একটি উচ্ছ্বাস, মৃত্যু-অন্তে সেই সর্বব্যাপী আত্মার সহিত পুনর্মিলনের প্রয়াস পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ভিন্ন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক বৈরাগ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

বৈদিক এবং হোমেরিক কাব্যে আমাদের সম্মুখে যে-জীবনের চিত্র ধরিয়াছে তাহার মধ্যে কী একটা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং আনন্দপূর্ণ সমরোৎসাহ দেখা যায়— তখন বীরগণ সুখদুঃখ, শুভদিনের সূর্যালোক এবং দুর্দিনের বজ্রপতন উভয়কেই খেলাচ্ছলে গ্রহণ করিতেন এবং যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিত তখন দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার পরে কয়েক শতাব্দী অতীত হইতেই পরিণত সভ্যতাপ্রভাবে চিন্তাজ্বরে জরাজীর্ণ হইয়া সেই বীরমণ্ডলীর উত্তরপুরুষগণ জগৎসংসারকে দুঃখময় দেখিতে লাগিল। যোদ্ধা হইল তপস্বী, কর্মী হইল বৈরাগী। গঙ্গাকূলে এবং টাইবরতীরে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিলেন বিশ্বসংসার প্রবল শত্রু এবং বিশ্ববন্ধনচ্ছেদনই মুক্তির প্রধান উপায়।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকদর্শন যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল আধুনিক মানবমনও সেইখান হইতেই যাত্রার উপক্রম করিতেছে।

কিন্তু আধুনিক সমাজে যদিও দুঃখবাদী ও সুখবাদীর অভাব নাই তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয়, আমাদের অধিকাংশ লোকই দুই মতের মাঝখান দিয়া চলিয়া থাকেন। মোটের উপর সাধারণের ধারণা, জগৎটা নিতান্ত সুখেরও নহে নিতান্ত দুঃখেরও নহে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ যে নিজকৃত কর্মের দ্বারা জীবনের অনেকটা সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে এ সম্বন্ধেও অধিকাংশের মতের ঐক্য আছে।

তৃতীয়ত, কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গলসাধন যে আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য এ সম্বন্ধেও লেখক কাহাকেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে শোনেন নাই।

এক্ষণে বর্তমানকালে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে-সকল নূতন জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কর্তব্যনীতির কতটা যোগ তাহাই আলোচ্য।

একদল আছেন যাঁহারা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় ধর্মনীতিরও ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করেন। লেখকের সহিত তাঁহাদের মতের বিশেষ অনৈক্য নাই, কিন্তু হক্সলি বলেন, আমাদের ভালোমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিরূপে পরিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্তিবাদ তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে, কিন্তু ভালো যে মন্দের অপেক্ষা কেন শ্রেয়, অভিব্যক্তিতত্ত্ব তাহার কোনো নূতন সদ্‌যুক্তি দেখাইতে পারে না। হয়তো কোনো একদিন আমাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, কিন্তু তাহাতে করিয়া এটা সুন্দর এবং ওটা কুৎসিত এই বোধশক্তির কোনো হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না।

ধর্মনীতির অভিব্যক্তিবাদ উপলক্ষে আর-একটা ভ্রম আজকাল প্রচলিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপরে জীবজন্তু-উদ্ভিদগণ জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমতা অনুসারেই টিঁকিয়া গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব সামাজিক মনুষ্য, নীতিপথবর্তী মনুষ্যও সেই এক উপায়েই উন্নতিসোপানে অগ্রসর হইতে পারে, এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগ্যতম এবং সাধুতম কথাটা এক নহে। প্রকৃতিতে যোগ্যতমতা অবস্থার উপরে নির্ভর করে। পৃথিবী যদি অধিকতর শীতল হইয়া আসে

তবে ওক অপেক্ষা শৈবাল যোগ্যতর হইয়া দাঁড়াইবে; সে-স্থলে অন্য কোনোরূপ শ্রেষ্ঠতাকে যোগ্যতা বলা যাইবে না।

সামাজিক মনুষ্যও এই জাগতিক নিয়মের অধীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জীবিকার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে—যাহার জোর বেশি, আপনাকে বেশি জাহির করিতে পারে, সে অক্ষমকে দলিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু তথাপি অভিব্যক্তির এই জাগতিক পদ্ধতি সভ্যতার নিম্নাবস্থাতেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক উন্নতির অর্থই, এই জাগতিক পদ্ধতিকে পদে পদে বাধা দিয়া তৎপরিবর্তে নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা, যাহাকে বলে নৈতিক পদ্ধতি; এবং যাহার শেষ উদ্দেশ্য, অবস্থানুযায়ী যোগ্যতাকে পরিহার করিয়া নৈতিক শ্রেষ্ঠতাকে রক্ষা করা।

জাগতিক পদ্ধতির স্থলে নৈতিক পদ্ধতিকে সমাজে স্থান দিতে হইলে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে আত্মসংযম অবলম্বন করিতে হইবে—সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত বিদলিত না করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে—যাহাতে করিয়া কেবল যোগ্যতম রক্ষা না পায়, পরন্তু সাধ্যমত সম্ভবমত অনেকেই রক্ষা পাইবার যোগ্য হয়। আইন এবং নীতিসূত্র সকল জাগতিক পদ্ধতিকে বাধা দিয়া সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে; তাহারই আশ্রয় ও প্রভাবে কেবল যে প্রত্যেকে জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা নহে, পাশব বর্বরতার আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছে।

অতএব এ কথা বিশেষরূপে মনে ধারণা করা কর্তব্য যে, জাগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অথবা তাহার নিকট হইতে সন্ত্রাসে পলায়ন করিয়া সমাজের নৈতিক উন্নতি হয় না, তাহার সহিত সংগ্রাম করাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া বিশ্বজগতের সহিত লড়াই করিতে বসিব এ কথা স্পর্ধার মতো শুনিতে হয়, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানোন্নতি পর্যালোচনা করিলে ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বজগতের মধ্যে একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিতেছে। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক সমাজে শাস্ত্র ও লোকাচারের দ্বারা মানবাশ্রিত জাগতিক পদ্ধতি সংযত ও রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বহিঃপ্রকৃতিতেও পশুপাল কৃষী ও শিল্পীর দ্বারা তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে ততই প্রকৃতির কার্যে মানুষের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া আসিয়াছে; অবশেষে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে মানব-বহির্ভূত প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভাব এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রজালেরও এত ক্ষমতা লোকে বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে ধরাধামে ভূস্বর্গপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলিয়া আশা হয় না। কারণ, যদিচ বহুযুগ ধরিয়া আমাদের পৃথিবী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, তথাপি এক সময়ে তাহার শিখরচূড়ায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার তাহাকে নিম্নদিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। একথা কল্পনা করিতে সাহস হয় না যে, মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি কোনোকালে কালের গতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে।

তাহা ছাড়া, জাগতিক প্রকৃতি আমাদের আজন্ম সঙ্গী, আমাদের জীবনরক্ষার সহায় এবং তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরের কঠিন সাধনায় সিদ্ধ; কেবল কয়েক শতাব্দীর চেষ্টাতেই যে তাহাকে নৈতিক নিগড়ে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে, এ আশা মনে পোষণ করা মূঢ়তা। যতদিন জগৎ থাকিবে বোধ করি ততদিনই এই কঠিনপ্রাণ প্রবল শত্রুর সহিত নৈতিক প্রকৃতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

অপরপক্ষে, মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা একত্র সম্মিলিত ও বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক অবস্থাকে যে কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহারও সীমা দেখা যায় না। এবং মানবপ্রকৃতিরও কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। যে-মানুষ নেকড়ে

বাঘের জাতভাইকে মেষরক্ষক কুক্কুরে পরিণত করিয়াছে, সে-মানুষ সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত বর্বর প্রবৃত্তিগুলিকেও যে বহুলপরিমাণে দমন করিয়া আনিতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।

জগতে অমঙ্গল দমন করা সম্বন্ধে আমরা যে পুরাকালের নীতিজ্ঞদের অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি সে-আশা সফল করিতে হইলে, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এ মতটা দূর করিতে হইবে।

আর্যজাতির শৈশবাবস্থায় যখন ভালো এবং মন্দ উভয়কেই ক্রীড়াসহচরের ন্যায় গ্রহণ করা যাইত সে-দিন গিয়াছে। তাহার পরে যখন মন্দর হাত হইতে এড়াইবার জন্য গ্রীক এবং হিন্দু রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নোদ্যত হইল সে-দিনও গেল; এখন আমরা সেই বাল্যোচিত অতিশয় আশা এবং অতিশয় নৈরাশ্য পরিহার করিয়া বয়স্ক লোকের ন্যায় আচরণ করিব, কঠিন পণ ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া চেষ্টা করিব, সন্ধান করিব, উপার্জন করিব এবং কিছুতে হার মানিব না। ভালো যাহা পাইব তাহাকে একান্ত যত্নে পালন করিব এবং মন্দকে বহন করিয়া অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিব; হয়তো সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে, হয়তো বা সুখময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, কিন্তু সেই অনিশ্চিত পরিণামের পূর্বে এমন অনেক নিশ্চিত কার্য সমাধা হইবে যাহাতে মহত্ত্বগৌরব আছে।

১৩০০

বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য

অল্পদিন হইল সুইডেনদেশীয় একটি যুবক বঙ্গদেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া বাঙালির বাড়িতে বাস করিতেন, বাঙালি ছাত্রদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন, যাহা-কিছু পাইতেন তাহাতে বহি কিনিতেন ও সেই বহি ছাত্রদিগকে পড়িতে দিতেন, এবং পথের দরিদ্র বালকদিগকে পয়সা বিতরণ করিতেন।

কোনো য়ুরোপীয়কে অতিথি-আত্মীয়-ভাবে সন্নিকটে পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। ইংরেজ কিছুতেই আপনার রাজগর্ব ভুলিতে পারে না, আমাদের কাছে আসিতে তাহার ইচ্ছাও নাই, তাহার সাধ্যও নাই। সেইজন্য এই সুইডেনবাসীর সঙ্গ আমাদের নিকট সবিশেষ মূল্যবান ছিল।

যে-লোকটির কথা বলিতেছি তিনি আকারে প্রকারে ব্যবহারে নিতান্ত নিরীহের মতো ছিলেন। কোটপ্যান্টলুনের মধ্যে এত নম্রতা ও নিরীহতা দেখা আমাদের অভ্যাস নাই।

কিন্তু এই সাহেবটি আমাদেরই মতো বিনম্র মৃদুপ্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার অস্থিমজ্জার মধ্যে য়ুরোপের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল। দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সহজ লোকের মতো, অথচ লোকটি যে-সে লোক নহে এমন দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর পাই না। আমাদের দিশি ভালো মানুষ মাটির মানুষ, দেবপ্রতিমা, কিন্তু ভিতরে কোনো চরিত্র নাই, বহুল পরিমাণে খড় আছে। যথার্থ চরিত্র-অগ্নি থাকিলে সেই তৃণনির্মিত নির্জীব ভালোমানুষি দগ্ধ হইয়া যায়।

এই কৃশ খর্বকায় শান্তস্বভাব য়ুরোপীয় যুবকটির অন্তরের মধ্যে যে একটি দীপ্তিমান চরিত্র-অগ্নি ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছিল তাহা তাঁহার প্রথম কার্যেই প্রকাশ পায়। তিনি যে স্বদেশ ছাড়িয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জন্মভূমি ও আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরজাতির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এই দুঃসাধ্য কার্যে কে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইল। কোথায় সেই মেরুতুষারচুম্বিত য়ুরোপের শীর্ষবিলম্বিত সুইডেন আর কোথায় এই এশিয়ার প্রান্তবর্তী খররৌদ্রক্লান্ত বঙ্গভূমি। পরস্পরের মধ্যে কোনো সভ্যতার সাম্য, কোনো আত্মীয়তার সম্বন্ধ, কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ নাই। ভাষা প্রথা অভ্যাস জীবনযাত্রার প্রণালী, সমস্তই স্বতন্ত্র। সমস্ত প্রিয়বন্ধন সমস্ত চিরাভ্যস্ত সংস্কার হইতে কোনো দেশের রাজশাসনও কোনো ব্যক্তিকে এমন সম্পূর্ণরূপে নির্বাসনদণ্ড বিধান করিতে পারে কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় বাঙালির নিমন্ত্রণসভায় উৎসবক্ষেত্রে ধর্মসমাজে এই শুভ্রকোর্তাধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে একপ্রান্তভাগে অনেকবার দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিবার জন্য যেন তাঁহার একটি বিশেষ আগ্রহ ছিল। অনেক সভাস্থলে আমাদের বক্তৃতার ভাষা আমাদের সংগীতের সুর তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না; ধৈর্যসহকারে হৃদয়ের অন্তরঙ্গতাগুণে আমাদের ভাবের মধ্যে যেন স্থানলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। পরজাতির গূঢ় হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিবার জন্য যে-নম্রতাগুণের আবশ্যক তাহা তাঁহার বিশেষরূপে ছিল।

ছাত্রশিক্ষার যে-কার্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে অসামান্য কষ্টস্বীকার করিতে হইত। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে অনাহারে অনিয়মে কলিকাতার পথে পথে সমস্তদিন পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহার অশ্রান্ত উদ্যমকে পরাভূত করিতে পারে নাই। রৌদ্রতাপ এবং উপবাস তিনি কিরূপ সহ্য করিতে পারিতেন বর্তমান লেখক একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব-উপলক্ষে গত বৎসর পৌষ মাসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়া প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হন। বিনা ছাতায় বিনা আহারে সমস্তদিন মাঠে মাঠে ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অপরাহ্নে উৎসবারম্ভকালে ফিরিয়া আসেন—তখন কিছুতেই আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পদব্রজে স্টেশনে গমনপূর্বক সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

একদিন তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া একেবারে বারাকপুরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে পুনর্বার পদব্রজে ফিরিতে রাত্রি দশটা হইয়া যায়। পাছে ভৃত্যদের কষ্ট হয় এইজন্য সেই দীর্ঘ ভ্রমণ দীর্ঘ উপবাসের পর অনাহারেই রাত্রি যাপন করেন। কোনো কোনো দিন রাত্রে তিনি আহারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে গৃহস্বামিনী যখন খাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তিনি বলিতেন, ভোজনে আজ আমার অধিকার ও অভিরুচি নাই—দিনের কার্য আজ আমি ভালো করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে আহার করিবার সময় তিনি রুটিখণ্ড গাছের শাখায় এবং ভূতলে রাখিয়া দিতেন, পাখিরা আসিয়া খাইলে পরে তবে তাঁহার আহার সম্পন্ন হইত।

তাঁহার একটি সাধ ছিল আমাদের দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের জন্য ভালো লাইব্রেরি এবং আলোচনাসভা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রৌদ্রবৃষ্টি অর্থব্যয় এবং শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহায়তাসাধনে প্রতিশ্রুত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহ অনবরত প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। অবশেষে আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে-না-হইতেই তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন।

শুনা যায় এই লাইব্রেরি-স্থাপন-চেষ্টার জন্য গুরুতর অনিয়ম ও পরিশ্রমই তাঁহার পীড়ার অন্যতম কারণ। মৃত্যুর পূর্বদিনে তিনি আমাদের দেশীয় কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন, দেশে আমার যে কোনো আত্মীয়স্বজন নাই তাহা নহে, খৃস্টিয়ান ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করাতেই আমি তাঁহাদের পর হইয়াছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার লাইব্রেরির কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কোনো-একটি ছাত্রের নিকট হইতে তিনি অগ্রিম বেতন লইয়াছিলেন, সেই টাকা তাহাকে ফেরত দিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় তাহার বিদেশীয় নাম স্মরণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ চেষ্টা; এবং সেই ছাত্রকে সন্ধান করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ অনুরোধ।

তিনি যদি এখানে আসিয়া তাঁহার স্বজাতীয়দের আতিথ্য লাভ করিতেন তবে আর কিছু না হউক হয়তো তাঁহার জীবনরক্ষা হইত, কারণ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য য়ুরোপীয়ের পক্ষে কী কী নিয়ম পালন করা কর্তব্য সে-অভিজ্ঞতা তিনি স্বজাতীয়ের নিকট হইতে লাভ করিতে

পারিতেন। যদি বা জীবনরক্ষা না হইত তথাপি অন্তত যেরূপ চিকিৎসা যেরূপ আরাম যেরূপ সেবাশুশ্রূষা তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত, বিদেশে মৃত্যুকালে সেটুকু হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না; এবং য়ুরোপীয় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার জন্য অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁহার যে-আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত ছিল তাহাও পূর্ণ হইতে পারিত।

সুইডেনবাসী হ্যামারগ্রেন সাহেবের বাংলায় আতিথ্যযাপনের সংক্ষেপ বিবরণ আমরা প্রকাশ করিলাম। তিনি এ দেশে অল্পকাল ছিলেন, এবং যদিও আমাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রেম ও আমাদের হিতসাধনে তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল এবং যদিও তাঁহার অকৃত্রিম অমায়িক স্বভাবে তিনি ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি এমন কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাতে সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইতে পারেন, সুতরাং এই বিদেশীর বৃত্তান্ত সাধারণের আলোচ্য বিষয় না হইবার কথা। আমরাও সে প্রসঙ্গে বিরত থাকিতাম, কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বাংলাসংবাদপত্র তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংকার সম্বন্ধে যেরূপ নিষ্ঠুর আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

হ্যামারগ্রেন মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তাঁহার সেই অন্তিম ইচ্ছা-অনুসারে নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ হইয়াছিল। শাস্ত্রমতে অগ্নি যদিও পাবক এবং কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তথাপি হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় ইহাতে কোনো কোনো হিন্দুপত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন এ পর্যন্ত মৃত্যুর পরে তাঁহারা 'হাড়িডোম' প্রভৃতি অনার্য অন্ত্যজ জাতির সহিত একস্থানে ভস্মীভূত হইতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যে-শ্মশানে কোনো সুইডেনবাসীর চিতা জ্বলিয়াছে সেখানে যে তাঁহাদের পবিত্র মৃতদেহ পুড়িবে, ইহাতে তাঁহারা ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

কিছুকাল পূর্বে একসময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশপ্রেমিকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, হিন্দুধর্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম নির্বিচার-আতিথ্য অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু জানি না কী দুর্দৈবক্রমে সম্প্রতি এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও হিন্দুধর্মকে নিষ্ঠুর সংকীর্ণ এবং একান্ত পরবিদ্বেষী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

শ্রুতিতে আছে, অতিথিদেবোভব। কিন্তু কালক্রমে আমাদের লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে, কোনো বিদেশীয় বিজাতীয় সাধুব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোনো হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসংকোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুক্কুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে; এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে, অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও কি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব। জীবিত কালে আমাদের গৃহে পরদেশীর স্থান নাই, মৃত্যুর পরে আমাদের শ্মশানেও কি পরদেশীর দগ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে না।

যদি আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধে কোনো নিষেধ থাকিত তাহা হইলেও আমাদের ধর্মশাস্ত্রের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া আমরা অগত্যা নীরব থাকিতাম। যখন সেরূপ নিষেধ কিছু নাই তখন ধর্মের নাম করিয়া অধর্মবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া, অকারণে গায়ে পড়িয়া বিদ্বেষবহ্নিকে প্রধূমিত করিয়া হিন্দুসমাজের কী হিতসাধন হইবে বলিতে পারি না।

শ্মশান বৈরাগ্যের মহাক্ষেত্র। সেখানে মতভেদ ধর্মভেদ জাতিভেদ নাই; সেখানে একদিন ছোটো-বড়ো ধনী-দরিদ্র দেশী-বিদেশী, সকলেই মুষ্টিকয়েক ভস্মাবশেষের মধ্যে সমান পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের হিন্দুসন্ন্যাসীরা শ্মশানে সমাজবন্ধনবিহীন মহাকালের নিরঞ্জন নির্বিকার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন। সেখানে সেই দেশকালাতীত

ধ্যাননিমগ্ন বৈরাগ্যের সমাধিভূমিতেও কি পরজাতিবিদ্বেষ আপন সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র জয়ধ্বজা লইয়া ফরফর শব্দে আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

আমাদের দেবতার মধ্যে যম কোনো জাতিকে ঘৃণা করেন না, মহাযোগী মহাদেবেরও সর্বজাতির প্রতি অপক্ষপাতের কথা শুনা যায়। কিন্তু আজ তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র বিহারভূমি শ্মশানের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহরীগণ মৃতদেহের জাতিবিচার করিতে বসিয়া গিয়াছেন—সে কি ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, না সংকীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য।

এই সুইডেনদেশীয় নিরীহ প্রবাসী প্রীতিপূর্বক বিশ্বাসপূর্বক অতি দূরদেশে পরজাতীয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পাছে কোথাও অনধিকারপ্রবেশ হয়, পাছে কাহারও অন্তরে আঘাত লাগে, পাছে অজ্ঞাতসারে কাহারও পীড়ার কারণ হন, এইজন্য সর্বত্র সর্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। সেই দয়ালু সহৃদয় মহদাশয় ব্যক্তি কাহারও কোনো অপকার করেন নাই, কেবল পরজাতি পরধর্মীর হিতচেষ্টায় আপন জীবনপাত করিয়াছেন মাত্র। সেই অসম্পন্ন চেষ্টার জন্য তাঁহার প্রতি কাহাকেও কৃতজ্ঞ হইতে অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু এই অকালমৃত বিদেশী সাধুর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুর অবমাননা করিতে কি নিষেধ করাও উচিত নহে।

যদি দৈবক্রমে কোনো বিদেশী আপন আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে হউক-না সে পরের সন্তান, হউক-না সে বিধর্মী, বঙ্গভূমি কি জননী-বাৎসল্যে আপন স্নেহক্রোড়ের এক প্রান্তভাগে তাহাকে স্থান দিতে পারিবে না এবং তাহার অকালমৃত্যুর পরে সকল ঘৃণার অবসানক্ষেত্র শ্মশানভূমির মধ্যেও তাহার প্রতি সুকঠোর ঘৃণা প্রকাশ করিবে? এই নিষ্ঠুর বর্বরতা কি অতিথিবৎসল হিন্দুধর্মের প্রকৃতিগত, না এই পতিত জাতির বুদ্ধিবিকারমাত্র।

এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে পবিত্র আর্যভূমির নিকটে কোন্ অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা? তিনি ব্রাহ্মণের ঘরের আসন, কুলীনের ঘরের কন্যা, যজমানের ঘরের দক্ষিণা চাহেন নাই; তিনি সুইডেনের উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার যে-শ্মশানে 'হাড়িডোম'[১] প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে, সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র।

হায় বিদেশী, বঙ্গভূমির প্রতি তোমার কী অন্ধ বিশ্বাস, কী দুঃসহ স্পর্ধা। মনে যত অনুরাগ যত শ্রদ্ধাই থাক্ পুড়িয়া মরিবার এবং মরিয়া পুড়িবার এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে জীবনে মরণে তোমাদের কোনো অধিকার নাই।

১৩০১

ব্যাধি ও প্রতিকার

ইংরেজিশিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে আমাদের বক্ষ যতটা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর ততটা নাই, এমন-কি, কিছুকাল হইতে নাড়ী স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও যেন দাবিয়া গেছে। জ্বরের মুখে যে-উত্তাপ দেখিতে দেখিতে একশো-চারপাঁচছয়ের দিকে উঠিতেছিল, এখন যেন তাহা আটানব্বইয়ের নীচে নামিয়া চলিয়াছে এবং সমস্তই যেন হিম হইয়া আসিতেছে। এমন অবস্থায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মতো সুযোগ্য ভাবুক ব্যক্তি 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিবেন তাহা আমাদের ঔৎসুক্যজনক না হইয়া থাকিতে পারে না।

---

[১] পাঠকগণ মনে করিবেন না যে আমরা ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক হাড়িডোম প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতেছি; আমরা সংবাদপত্রের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি।

তথাপি আমরা লেখকমহাশয়ের এবং তাঁহার প্রবন্ধের নামের দ্বারা স্বভাবত আকৃষ্ট হইয়াও অতিশয় অধিক প্রত্যাশা করি নাই। কারণ, আমরা নিশ্চয় জানি, সামাজিক ব্যাধির কোনো অভূতপূর্ব পেটেন্ট ঔষধ কবি বা কবিরাজের কল্পনার অতীত। আসল কথা, ঔষধ চিরপরিচিত, কিন্তু নিকটে তাহার ডাক্তারখানা কোথায় পাওয়া যায়, সেইটে ঠাহর করা শক্ত। কারণ, মানসিক ব্যাধির ঔষধও মানসিক এবং ব্যাধি থাকাতেই সে-ঔষধ দুষ্প্রাপ্য।

তবে এ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আসিয়াছে; কেননা আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্যজগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি।

কিছু পূর্বে এরূপ আন্তরিক দ্বিধা আমাদের শিক্ষিতসমাজে ছিল না। স্বদেশাভিমানীরা মুখে যিনি যাহাই বলিতেন, আধুনিক সভ্যতার উপর তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। ফরাসিবিদ্রোহ, দাসত্ববারণচেষ্টা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষকালীন ইংরেজি কাব্যসাহিত্য বিলাতি সভ্যতাকে যে ভাবের ফেনায় ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল, তখনো তাহা মরে নাই— সে-সভ্যতা জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মনুষ্যত্বকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে, এমনই একটা আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিতেছিল।

আমাদের তাহাতে তাক লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা সেই সভ্যতার ঔদার্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সংকীর্ণতার তুলনা করিয়া য়ুরোপকে বাহবা দিতেছিলাম।

বিশেষত আমাদের মতো অসহায় পতিতজাতির পক্ষে এই ঔদার্য অত্যন্ত রমণীয়। সেই অতিবদান্য সভ্যতার আশ্রয়ে আমরা নানাবিধ সুলভ সুবিধা ও অনায়াসমহত্ত্বের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। মনে আশা হইতে লাগিল, কেবল স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া আমরা বীরপুরুষ হইব, এবং কলেজ হইতে দলে দলে উপাধিগ্রহণ করিয়াই আমরা সাম্যসৌভ্রাত্রস্বাতন্ত্র্যমন্ত্রদীক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে স্বাধীনশাসনের দাবি করিব।

চৈতন্য যখন ভক্তিবন্যায় ব্রাহ্মণচণ্ডালের ভেদবাঁধ ভাঙিয়া দিবার কথা বলিলেন তখন যে-হীনবর্ণ সম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।

আমরাও সভ্যতার প্রথম ডাক শুনিয়া যখন নাচিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম, এই পাশ্চাত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতাবিজেতার ভেদ থাকিবে না— কেবল মন্ত্রবলে গোরে-শ্যামে একাঙ্গ হইয়া যাইবে।

এইজন্যই আমাদের এত বেশি উচ্ছ্বাস হইয়াছিল এবং বায়রনের সুরে সুর বাঁধিয়া এমন উচ্চ সপ্তকে তান লাগাইয়াছিলাম। এমন পতিতপাবন সভ্যতাকে পতিতজাতি যদি মাথায় করিয়া না লইবে, তবে কে লইবে।

কিন্তু আমরা বৈষ্ণব হইলাম, ব্রাহ্মণ হইলাম না। আমাদের যাহা-কিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্‌কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি, কিসের জন্য—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর!

বাঁশি বাজিয়াছিল মধুর, কিন্তু এখন মনে হইতেছে—

যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও।

এখন বিলাতি শিক্ষাটাকে ডালেমূলে উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কথা এই যে কেবলমাত্র বাঁশির আওয়াজে যিনি কুলত্যাগ করেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতেই হইবে। মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভ এত সহজ মনে করাই ভুল। আমরা কথঞ্চিৎপরিমাণে ইংরেজের ভাষা শিখিয়াছি বলিয়াই যে ইংরেজ জেতাবিজেতার সমস্ত প্রভেদ ভুলিয়া আমাদিগকে তাহার রাজতক্তায় তুলিয়া লইবে, এ কথা

স্বপ্নেও মনে করা অসংগত। জাতীয় মহত্ত্বের দুর্গমশিখরে কণ্টকিত পথ দিয়া উঠিতে হয়; কেমন করিয়া উঠিতে হয়, সে তো আমরা ইংরেজের ইতিহাসেই পড়িয়াছি।

আমি এই কথা বলি যে, ইংরেজ যদি আমাদিগকে সমান বলিয়া একাসনে বসাইত, তাহা হইলে আমাদের অসমানতা আরও অধিক হইত। তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরও কমিয়া যাইত। তাহারা পৌরুষের দ্বারা যে-আসন পাইয়াছে, আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইয়া যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকিতাম, আমাদের আত্মাভিমান শান্ত হইত, তবে তদ্দ্বারা আমাদের জাতির গভীরতর দারুণতর দুর্গতি হইত।

কিছু আদায় করিতে হইবে এই মন্ত্র ছাড়িয়া, কিছু দিতে হইবে কিছু করিতে হইবে, এই মন্ত্র লইবার সময় হইয়াছে। যতক্ষণ আমরা কিছু না দিতে পারিব, ততক্ষণ আমরা কিছু পাইবার চেষ্টা করিলে এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য হইলেও তাহা ভিক্ষাবৃত্তিমাত্র—তাহাতে সুখ নাই, সম্মান নাই।

সে কথাটা আমাদের মনের মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা ভিক্ষার সময় কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম কপিলের কথা পাড়িয়া থাকি। বলি যে, আমাদের পিতামহ জগতের সভ্যতার অনেক খোরাক জোগাইয়াছিলেন; অতএব ভিক্ষা দে বাবা।

পিতামহদের মহিমা স্মরণ করার খুবই দরকার কিন্তু সে কেবল নিজেকে মহিমালাভে উত্তেজিত করিবার জন্য, ভিক্ষার দাবিকে উচ্চ সপ্তকে চড়াইবার জন্য নহে। কিন্তু যে-ব্যক্তি হতভাগা, তাহার সকলই বিপরীত।

যাহাই হোক, পৃথিবীতে আমাদের একটা-কিছু উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। দরখাস্ত লিখিবার উপযোগিতা নহে, দরখাস্ত পাইবার। কিছু একটার জন্য পৃথিবীকে আমাদের দেউড়িতে উমেদারি করিতে হইবে, তবে আমাদের মুখে আস্ফালন শোভা পাইবে।

রাষ্ট্রনীতিতে মহত্ত্বলাভ আমাদের পক্ষে সর্বপ্রকারে অসম্ভব। সেই পথেই আমাদের সমস্ত মনকে যদি রাখি, তবে পথের ভিক্ষুক হইয়াই আমাদের চিরটা কাল কাটিবে। যে-শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় গৌরবের অধিকারী হওয়া যায়, সে-শক্তি আমাদের নাই, লাভ করিবার কোনো আশাও দেখি না। কেবল ইংরেজকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে-শাখায় দাঁড়াইয়া আছেন, সেই শাখাটাকে অনুগ্রহ-পূর্বক ছেদন করিতে থাকুন। সেই অনুরোধ ইংরেজ যেদিন পালন করিবে, সেদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে কালবিলম্ব হইবার আশঙ্কা আছে।

যেখানে আমাদের অধিকার নাই, সেখানে কখনো কপট করজোড়ে কখনো কপট সিংহনাদে ধাবমান হওয়া বিড়ম্বনা, সে কথা আমরা ক্রমেই অনুভব করিতেছি। বুঝিতেছি, নিজের চেষ্টায় দ্বারা নিজের ক্ষমতা-অনুযায়ী স্থায়ী যাহা-কিছু করিয়া তুলিতে পারিব, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যে জিনিসটা এ বৎসর একজন কৃপা করিয়া দিবে, পাঁচ বৎসর বাদে আর-একজন গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইবে, সেটা যতবড়ো জিনিস হোক, আমাদিগকে এক ইঞ্চিও বড়ো করিতে পারিবে না।

কোনো বিষয়ে একটা-কিছু করিয়া তুলিতে যদি চাই তবে উজান স্রোতে সাঁতার দিয়া তাহা পারিব না। কোথায় আমাদের বল, আমাদের প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে, তাহা বাহির করিতে হইবে। তাহা বাহির করিতে হইলেই নিজেকে যথার্থরূপে চিনিয়া লইতে হইবে।

হতাশ ব্যক্তিরা বলেন, চিনিব কেমন করিয়া। বিদেশী শিক্ষায় আমাদের চোখে ধুলা দিতেছে।

ধুলা নহে, তাহা অঞ্জন। বিপরীত সংঘাত ব্যতীত মহত্ত্বশিখা জ্বলিয়া উঠে না। খৃস্টধর্ম য়ুরোপীয় প্রকৃতির বিপরীত শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা মথিত হইয়াই য়ুরোপীয় প্রকৃতির সারভাগ এমন করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

তেমনই য়ুরোপীয় শিক্ষা ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির পক্ষে বিপরীত শক্তি। এই শক্তির দ্বারাই আমরা আপনাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিব এবং ফুটাইয়া তুলিব।

আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা গিয়াছে। অন্তত নিজেকে আদ্যোপান্তভাবে জানিবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম আবেগে অনেকটা হাতড়াইতে হয়, উদ্যমের অনেকটা বাজেখরচ হইয়া যায়। এখনো আমাদের সেই হাস্যকর অবস্থাটা কাটিয়া যায় নাই।

কিন্তু কাটিয়া যাইবে। পূর্বপশ্চিমের আলোড়ন হইতে আমরা কেবলই যে বিষ পাইব, তাহা নহে; যে-লক্ষ্মী ভারতবর্ষের হৃদয়সমুদ্রতলে অদৃশ্য হইয়া আছেন তিনি একদিন অপূর্বজ্যোতিতে বিশ্বভুবনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবেন।

নতুবা, যে ভারতে আর্যসভ্যতার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, সেই ভারতেই সুদীর্ঘকাল পরে আর্যসভ্যতার বর্তমান উত্তরাধিকারীগণ কী করিতে আসিয়াছে।

জাগাইতে আসিয়াছে। প্রাচীন ভারত তপোবনে বসিয়া একদিন এই জাগরণের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো, যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। কবিরা বলিতেছেন সেই পথ ক্ষুরধারা, শাণিত, দুর্গম।

য়ুরোপও আমাদের রুদ্ধহৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া সেই মন্ত্রের পুনরুচ্চারণ করিতেছে, বলিতেছে, যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা আর-কেহ ভিক্ষাস্বরূপ দান করিতে পারে না; আবেদনপত্রপুটে তাহা ধারণ করিতে পারে না, তাহা সন্ধান করিতে হইলে দুর্গম পথেই চলিতে হয়।

সে পথ কোথায়। অরণ্যে সে পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, তবু পিতামহদের পদচিহ্ন এখনো সে পথ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু হায়, পথের চেয়ে সেই পথলোপকারী অরণ্যের প্রতিই আমাদের মমতা। আমাদের প্রাচীন মহত্ত্বের মূলধারাটি কোথায় এবং তাহাকে নষ্ট করিয়াছে কোন্‌ বিকারগুলিতে, ইহা আমরা বিচার করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি না। স্বজাতিগর্ব মাঝে মাঝে আমাদের উপর ভর করে, তখন যেগুলি আমাদের স্বজাতির গর্বের বিষয় এবং যাহা লজ্জার বিষয়, যাহা সনাতন এবং যাহা অধুনাতন, যাহা স্বজাতির স্বরূপগত এবং যাহা আকস্মিক, ইহার মধ্যে আমরা কোনো ভেদ দেখিতে পাই না। যাহা আমাদের আছে তাহাকেই ভালো বলিয়া, যাহা আমাদের ছিল তাহাকে অবমানিত করি।

এ কথা ভুলিয়া যাই, ভালোর প্রমাণ, সে-ভালোকে যাহারা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারাই। সবই যদি ভালো হইবে তবে আমরা ভ্রষ্ট হইলাম কী করিয়া।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে-আদর্শ যথার্থ মহান তাহা কেবল কালবিশেষ বা অবস্থাবিশেষের উপযোগী নহে। তাহাতে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব দান করে, সে-মানুষ সকল কালে সকল অবস্থাতেই আপন শ্রেষ্ঠতা রাখিতে পারে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতে যে-আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে; বিলাতে গেলে তাহা নষ্ট হয় না, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা বিকৃত হয় না, বর্তমানকালোপযোগী কর্মে নিযুক্ত হইতে গেলে তাহা অনাবশ্যক হইয়া উঠে না। যদি তাহা হইত, তবে সে-আদর্শকে মহান বলিতে পারিতাম না।

সকল সভ্যতারই মূল মহত্ত্বসূত্রটি চিরন্তন এবং তাহার বাহ্য আয়তনটি সাময়িক; তাহা মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্য অবয়বটি যদি আমরা অবলম্বন করি, তবে আমরা ভুল করিব। কারণ, যাহা ইংলন্ডের ইতিহাসে বাড়িয়াছে, ভারতের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। এই কারণেই বিলাতে

গিয়া আমরা ইংরেজের বাহ্য আচারের যে-অনুকরণ করি, এ দেশে তাহা অস্থানিক অসাময়িক বিদ্রূপমাত্র। কিন্তু সেই সভ্যতার চিরন্তন অংশটি যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে তাহা সর্বদেশে সর্বকালেই কাজে লাগিবে।

তেমনই ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে। যেটা সাময়িক সেটা অন্যসময়ে শোভা পায় না। সেইটেকেই যদি প্রধান করিয়া দেখি, তবে বর্তমান কাল ও বর্তমান অবস্থা দ্বারা আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত উপহসিত হইব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।

এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান ছিল, তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।

তবে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় আদর্শের বিভিন্নতা কোন্‌খানে। কে কোন্‌টাকে মুখ্য এবং কোন্‌টাকে গৌণ দেখে তাহা লইয়া। ভালোকে সব সভ্যদেশই ভালো বলে কিন্তু সেই ভালোকে কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে, কোন্‌টা আগে বসিবে এবং কোন্‌টা পরে বসিবে সেই রচনার বিভিন্নতা লইয়াই প্রভেদ।

যেমন সকল জীবের কোষ-উপাদান একই-জাতীয় কিন্তু তাহার সংস্থান নানাবিধ, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু এই সংস্থানের নিয়মকে অবজ্ঞা করিবার জো নাই। ইহা আমাদের প্রকৃতির বহুকালীন অভ্যাসের দ্বারা গঠিত। আমরা অন্য কাহারও নকল করিয়া এই মূল উপাদানগুলিকে যেমন খুশি তেমন করিয়া সাজাইতে পারি না; চেষ্টা করিতে গেলে এমন একটা ব্যাপার হইয়া উঠে, যাহা কোনো কর্মের হয় না।

এইজন্য কোনো বিষয়ে সার্থকতালাভ করিতে হইলে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে উড়াইয়া দিতে পারিব না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহারই আনুকূল্যে আমাদিগকে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে।

কেহ বলিতে পারেন, তবে তো কথাটা সহজ হইল। নিজের প্রকৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টার দরকার হয় না তো?

হয়। তাহারও সাধনা আছে। স্বাভাবিক হইবার জন্যও অভ্যাস করিতে হয়। কারণ, যে-লোক দুর্বল, তাহাকে নানাদিকে নানাশক্তি বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। সে নিজেকে ব্যক্ত না করিয়া পাঁচজনেরই অনুকরণ করিতে থাকে। পাঁচজনের আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইলে নিজের প্রকৃতিকে সবল সক্ষম করিয়া তুলিতে হয়; সে একদিনের কাজ নহে, বিশেষত বাহিরের শক্তি যখন প্রবল।

কবি প্রথম বয়সে এর ওর নকল করিয়া মরে; অবশেষে প্রতিভার বিকাশে যখন সে নিজের সুরটি ঠিক ধরিতে পারে তখনি সে অমর হয়। তখনি সে-স্বকীয় কাব্যসম্পদে তার নিজেরও লাভ, অন্য সকলেরও লাভ। আমরা যতদিন ইংরেজের নকলে সব কাজ করিতে যাইব, ততদিন এমন-কিছু হইবে না যাহাতে আমাদের সুখ আছে বা ইংরেজের লাভ আছে। যখন নিজের মতো হইব, স্বাভাবিক হইব, তখন ইংরেজের কাছ হইতে যাহা লইব তাহা নূতন করিয়া ইংরেজকে ফিরাইয়া দিতে পারিব।

সেদিন নিঃসন্দেহই আসিবে। আসিবে যে তাহার শুভলক্ষণ এই দেখিতেছি, আমাদের পোলিটিক্যাল আন্দোলনের নেশা অনেকটা ছুটিয়া গেছে; এখন আমরা স্বাধীন চেষ্টায় স্বাধীন সন্ধানে আমাদের ইতিহাসবিজ্ঞানদর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজের প্রতিও দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন, অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষাকে আমরা প্রকৃতিগত করিতে পারি নাই, সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতেছে; সেইজন্যই বিলাতি সভ্যতার বাহ্যভাগ লইয়া আছি, তাহার মূল মহত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

কিন্তু তিনি আর-একটা কথা বলেন নাই। কেবল ইংরেজ-সভ্যতা নহে, আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা তাহার বাহ্যিক ক্ষণিক অংশ লইয়া যে-আড়ম্বর করিতেছি তাহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইতেই পারে না। কারণ, মনুর সময়ে যাহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক, মনুর সময়ে যাহা চিরন্তন, আমাদের সময়েও তাহা চিরন্তন।

এই যে নিত্যানিত্য-কালাকাল-বিবেক, ইহাই আমাদের হয় নাই। কেবল সেইজন্যই ইংরেজের কাছ হইতে আমরা ভালোরূপ আদায় করিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের কাছ হইতেও পারিতেছি না।

কিন্তু আমার এ কথার মধ্যে অত্যুক্তি আছে। কালের সমস্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চক্ষে পড়ে না। যে-শক্তি কাজ করিতেছে, তাহা অলক্ষ্যে সমাজ গড়িয়া তোলে বলিয়া তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ-পঞ্চাশ বৎসরে ভাগ করিয়া দেখিলে তবেই তাহার কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন হতাশের আক্ষেপ গাহিতেছি, তখনো সে বিনা-জবাবদিহিতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা পর-শিক্ষাবলেই পর-শিক্ষাপাশ হইতে নিজেকে কিরূপে ধীরে ধীরে এক-এক পাক করিয়া মুক্ত করিতেছি তাহা পঞ্চাশ-বৎসর-পরবর্তী বঙ্গদর্শনের সম্পাদক অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইবেন।

তখনো যে সমস্তটা সম্পাদকের সম্পূর্ণ মনোমতোই হইবে, তাহা নহে; কারণ, সংসারে হতাশের আক্ষেপ অমর— কিন্তু ত্রিবেদীমহাশয়ের পুস্তিকার সহিত মিলাইয়া সুসময়ের আলোচনা করিলে তিনি অনেকটা পরিমাণে সান্ত্বনা পাইবেন, এ কথা তাঁহার পূর্ববর্তী সম্পাদক জোর করিয়া বলিতে পারেন।

১৩০৮

আলোচনা

'নকলের নাকাল' সম্বন্ধে

'নকলের নাকাল' প্রবন্ধে লেখক সাহেবিয়ানার নকল লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমস্ত জাতি ও সমাজের মধ্যে চিরকাল অনুকরণশক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক ব্যাজট্ সাহেব তাঁহার 'ফিজিক্স্ অ্যান্ড পলিটিক্স' গ্রন্থে জাতিনির্মাণ কার্যে এই অনুকরণশক্তির ক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গোড়ায় একটা জাতি কী করিয়া বিশেষ একটা প্রকৃতি লাভ করে, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাহার পরে কালে কালে তাহার যে পরিবর্তনের ধারা চলিয়া আসে, প্রধানত অনুকরণই তাহার মূল। ইংলন্ডে রাজ্ঞী অ্যানের রাজত্বকালে ইংরেজ সমাজ সাহিত্য আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল, জর্জ-রাজগণের সময় তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন প্রসার এমন-কিছু হয় নাই, যাহাতে অবস্থাপরিবর্তনের গুরুতর কারণ কিছু পাওয়া যায়।

ব্যাজট্ সাহেব বলেন, এই-সকল পরিবর্তন তুচ্ছ অনুকরণের দ্বারা সাধিত হয়। একজন কিছু-একটা বদল করে, হঠাৎ কী কারণে সেটা আর-পাঁচজনের লাগিয়া যায়, অবশেষে সেটা ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো সেই বদলটা কোনো কাজের নহে, হয়তো তাহাতে সৌন্দর্যও নাই; কিন্তু যে-লোক বদল করিয়াছে, তাহার প্রতিপত্তিবশত বা কী কারণবশত সেটা অনুকরণবৃত্তিকে

পারে। এইরূপে পরিবর্তনের বৃহৎ কারণ না থাকিলেও, ছোটোখাটো অনুকরণের বিস্তারে কালে কালে জাতির চেহারা বদল হইয়া যায়।

ব্যাজট্‌ সাহেবের এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যেমন সবল সুস্থ শরীর বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত প্রভাব নিজের অনুকূল করিয়া লয়, অস্বাস্থ্যকর যাহা-কিছু অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারে, তেমনই সবলপ্রকৃতি জাতি স্বভাবতই এমন-কিছুই গ্রহণ করে না বা দীর্ঘকাল রক্ষা করে না, যাহা তাহার জাতীয় প্রকৃতিকে আঘাত করিতে পারে। দুর্বল জাতির পক্ষে ঠিক উল্টা। ব্যাধি তাহাকে চট করিয়া চাপিয়া ধরে এবং তাহা সে শীঘ্র ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। বাহিরের প্রভাব তাহাকে অনেক সময় বিকারের দিকে লইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়। সবল লোকের পক্ষে যাহা বলকারক, স্বাস্থ্যজনক, রোগা লোকের পক্ষে তাহাও অনিষ্টকর হইতে পারে।

মোগলরাজত্বের সময়েও কি মুসলমানের অনুকরণ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হয় নাই। নিশ্চয়ই তাহাতে ভালোমন্দ দুইই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজিয়ানার নকলের সহিত তাহার একটি গুরুতর প্রভেদ ছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

মুসলমানরাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা পরস্পর জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল। এইজন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচারব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দুভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুলপরিমাণে পারসিক ও আরবি। আধুনিক হিন্দুসংগীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। চাপকান-জাতীয় সাজ যে মুসলমানের অনুকরণ তাহা নহে, তাহা উর্দুভাষার ন্যায় হিন্দুমুসলমানের মিশ্রিত সাজ; তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেখক লিখিয়াছেন, বিলাতিয়ানার মূল আদর্শ বিলাতে, ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে। সুতরাং এই আদর্শ আমরা অবলম্বন করিলে বরাবর তাহাকে জীবিত রাখিতে পারিব না, মূলের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকাতে, আজ না হউক কাল তাহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

বিলাতের যাহা-কিছু সম্পূর্ণ আমাদের করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে অন্যায় আত্মবিরোধ না ঘটে, চারি দিকের সহিত সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, যাহা আমাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগকে পোষণ করিতে পারে, ভারাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত না করে, তাহাতেই আমাদের বলবৃদ্ধি এবং তাহার বিপরীতে আমাদের আয়ুক্ষয়মাত্র।

সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে বোঝা। তাহার কাঠখড় অধিকাংশ বিলাত হইতে আনাইতে হয়, তাহার খরচ অতিরিক্ত। তাহা আমাদের সর্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাহাতে আমাদের নিজের আদর্শ, নিজের আশ্রয় নষ্ট করে, অথচ তৎপরিবর্তে যে-আদর্শ যে-আশ্রয় দেয়, তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে পারি না। তীর ছাড়িয়া যে-নৌকায় পা দিই, সে-নৌকার হাল অন্যত্র। মাঝে হইতে স্বেচ্ছাচার-অনাচার প্রবল হইয়া উঠে।

সেইজন্য প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের দেশী সাহেবিয়ানার মধ্যে কোনো ধ্রুব আদর্শ নাই; ভালোমন্দ শিষ্ট-অশিষ্টর স্থলে সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছা দখল করিয়া বসিয়াছে। কেহ বা নিজের সুবিধামতে একরূপ আচরণ করে, কেহ বা অন্যরূপ; কেহ বা যেটাকে বিলাতি হিসাবে কর্তব্য বলিয়া জানে, দেশী সমাজের উত্তেজনার অভাবে আলস্যবশত তাহা পালন করে না; কেহ বা যেটা সকল সমাজের মতেই গর্হিত বলিয়া জানে, স্বাধীন আচারের দোহাই দিয়া স্পর্ধার সহিত তাহা চালাইয়া দেয়। একদিকে অবিকল অনুকরণ, একদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা। একদিকে মানসিক দাসত্ব, অন্যদিকে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য। সর্বপ্রকার আদর্শচ্যুতিই ইহার কারণ।

এই আদর্শচ্যুতি এখনো যদি তেমন কুদৃশ্য হইয়া না উঠে, কালক্রমে তাহা উত্তরোত্তর কদর্য

হইতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরেজের টাটকা সংস্রব হইতে নকল করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও যদি ইংরেজি সামাজিক শিষ্টতার বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষিত না হয়, তবে তাঁহাদের উত্তর-বংশীয়দের মধ্যে বিকার কিরূপ বিষম হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও লজ্জাবোধ হয়।

ব্যাজট্ বলেন, অনুকরণের প্রভাবে জাতি গঠিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা সংগত অনুকরণে— জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল অনুকরণে।

যে-জাতি অসংগত অনুকরণ করে—

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ।

১৩০৮

স্মৃতিরক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে বড়োলোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টায় সভা করা হইয়া থাকে। এই-সকল সভা যে বার বার ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যে দেশে কোনো একটা চেষ্টা ঠিক একটা বিশেষ জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে চায় না, সে দেশে সেই চেষ্টাকে অন্য কোনো একটা সহজ পথ দিয়া চালনা করাই আমি সুযুক্তি বলিয়া মনে করি। যেখানে দরজা নাই কেবল দেয়াল আছে, সেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া লাভ কী।

আমাদের দেশে মানুষের মূর্তিপূজা প্রচলিত নাই। এই পৌত্তলিকতা আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু এখনো কৃতকার্য হইবার কোনো লক্ষণ দেখিতেছি না।

ইজিপ্ট মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপ মৃতদেহকে কবরে রাখিয়া যেন তাহা রহিল এই বলিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখে। যাহা থাকিবার নহে তাহার সম্বন্ধে মোহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলা আমাদের দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা লক্ষ্য।

অথচ য়ুরোপে বার্ষিক শ্রাদ্ধ নাই, আমাদের দেশে তাহা আছে। দেহ নাই বলিয়া যে যাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব তিনি নাই এ কথা আমরা স্বীকার করি না। মৃত্যুর পরে আমরা দেহকে সমস্ত ব্যবহার হইতে বর্জন করিয়া অনশ্বর পুরুষকে মানিয়া থাকি।

আমাদের এই প্রকারের স্বভাব ও অভ্যাস হওয়াতে মানুষের মূর্তিস্থাপনায় যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করি না। অথচ আমাদের দেশে মূর্তিরক্ষার পরিবর্তে কীর্তিরক্ষা বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ মৃত্যুর পরে ইহলোকে মূর্তিরূপে নহে কীর্তিরূপে থাকে, এ কথা আমরা সকলেই বলি। 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' এ কথার অর্থ এই যে, যাঁহার কীর্তি আছে তাঁহাকে আর মূর্তিরূপে বাঁচিতে হয় না।

কিন্তু কীর্তি মহাপুরুষের নিজের; পূজাটা তো আমাদের হওয়া উচিত। কেবল পাইব, কিছু দিব না, সে তো হইতে পারে না।

তা ছাড়া মহাপুরুষকে স্মরণ করা কেবল যে কর্তব্য, তাহা তো নয়, সেটা যে আমাদের লাভ। স্মরণ যদি না করি, তবে তো তাঁহাকে হারাইব। যত দীর্ঘকাল আমরা মহাত্মাদিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্যরূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে।

বড়োলোককে স্মরণীয় করিবার একটা দেশী উপায় আমাদের এখানে প্রচলিত আছে, শিক্ষিত-লোকে সেদিকে বড়ো একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমাদের দেশে জয়দেবের মূর্তি নাই, কিন্তু জয়দেবের মেলা আছে।

যদি মূর্তি থাকিত, তবে এতদিনে কোন্‌ জঙ্গলের মধ্যে অথবা কোন্‌ কালাপাহাড়ের হাতে তাহার কী গতি হইত বলা যায় না। বড়োজোর ভগ্নাবস্থায় ম্যুজিয়মে নীরবে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভয়ংকর বিবাদ বাধাইয়া দিত।

মূর্তি মাঠের মধ্যে বা পথের প্রান্তে খাড়া হইয়া থাকে, পথিকের কৌতূহল-উদ্রেক যদি হয় তো সে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখে, না হয় তো চলিয়া যায়। কলিকাতা শহরে যে মূর্তিগুলো রহিয়াছে, শহরের অধিকাংশ লোকই তাহার ইতিহাসও জানে না, তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে না।

একবার সভা ডাকিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের শিল্পীকে দিয়া অনুরূপ হউক বা বিরূপ হউক একটা মূর্তি কোনো জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া গেল, তার পরে ম্যুনিসিপালিটির জিম্মায় সেটা রহিল; ইহা মৃত মহাত্মাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে 'থ্যাংকস্‌' দিয়া বিদায় দেওয়ার মতো কায়দা।

তাঁহার নামে একটা লাইব্রেরি বা একটা বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেও কিছুদিন পরে নানা কারণে তাহা নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু মেলায় যে-স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এক কাল হইতে অন্য কাল পর্যন্ত ধনী-দরিদ্রে পণ্ডিতে-মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না, ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিতসমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশী উপায়ে খর্ব না করিয়া, ব্যর্থ না করিয়া, কেবল নগরের কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশপ্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি।

১৩১২

পরিচয়

প্রকাশ : ১৯১৬

১৯৩৫ সালে ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’-এর নতুন সংস্করণে ‘পরিচয়’ গ্রন্থের চারটি প্রবন্ধ এবং ‘শিক্ষা’-র নতুন সংস্করণে ‘পরিচয়’-এর একটি প্রবন্ধ সংকলিত হওয়ায় পরবর্তীকালে ‘পরিচয়’-এর সংস্করণে এই প্রবন্ধগুলি বর্জিত হয়। কিন্তু ‘পরিচয়’ আর মুদ্রিত হয় নি, ফলে প্রথম সংস্করণের অপর পাঁচটি প্রবন্ধ বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী ‘পরিচয়’ মুদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত পাঠকের কাছে সহজলভ্য ছিল না। বর্তমান রচনাবলীতে ‘পরিচয়’ গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হল।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে; একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সছিদ্র, অর্থাৎ 'আছে' এবং 'নাই' এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিংবা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেন্ডের কাঁটা লক্ষ করিলেই দেখা যায় তাহা টিকটিক করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদন্ডটা যে একবার বামে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে থামিয়া বামে আসে তাহা ঐ সেকেন্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ঐ মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণ কালের সেকেন্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে থামিতেছে ও চলিতেছে— তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বদোলকটির এক প্রান্তে হাঁ অন্য প্রান্তে না, এক প্রান্তে এক অন্য প্রান্তে দুই, এক প্রান্তে আকর্ষণ অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ, এক প্রান্তে কেন্দ্রের অভিমুখী ও অন্য প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিসটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই, দুইয়ের উল্টাটানে বিশ্বের সকল জিনিসই নম্র হইয়া গোল হইয়া সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না— তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই; এইজন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাক্ষর— পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সংকোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে— কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়। এক দিকে আত্ম এক দিকে পর, এক দিকে অর্জন এক দিকে বর্জন, এক দিকে সংযম এক দিকে স্বাধীনতা, এক দিকে আচার এক দিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে।

এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতি-সংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য-উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা-প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড়ো করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে— তাহার এক প্রান্তে বিচ্ছেদ, আর-এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্যদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন, জানি না তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য সর্প উপাসক অনার্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণকথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজা ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিনজনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা এক-অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি, রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা— এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়— তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য হারাইয়া যায়— কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণকথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্য-ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা আর্থার

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খৃস্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধীদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দলের এই ভাবটা কী, তাহার পুরাপুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয়-পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কী আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক-এক কুলের আর্যদলের মধ্যে এক-একটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধি-বিধান রক্ষিত ছিল। যাঁহারা এই-সমস্ত ভালো করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধন-লাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃপণের ধনের মতো ইহা সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। এই-সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে যাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাঁহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই-সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার যদি না লন তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর-এক শ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনি বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনি সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মতো এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন, সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে, অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই-সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। এইজন্যই তখন আর্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ-বিস্তারের উপলক্ষে সমস্ত আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের

অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ-কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড়ো ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে, দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক; অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে, বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনি আমরা কেবলই বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনি একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকার্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তি-অনুসারেই ফলের তারতম্য কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহস্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ— তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির; আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে; ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাভব চাই; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনি অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়— সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। দ্বৈতবাদী য়িহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেস্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনি তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনি সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা

করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনো অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন— বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই— এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই— প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়— একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর-একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধদলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে-একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রুপক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণপক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করিয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ— কৃপ ও অশ্বত্থামাও বড়ো সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম,

বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিতবংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিঁকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো-এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনি দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া ঘটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর-এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়-বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই-সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবলমাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের আশ্চর্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ কীর্তি। আমাদের দেশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্মকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর-এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল—ভারতবর্ষেও সেরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন—ইহা হইতে জানা যায় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে—কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ

আর্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারংবার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনি তিনি হরধনু-ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনি তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্য রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বীগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন;[১] তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য-অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা। প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড়ো বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। জ্যু-দের সঙ্গে জেন্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা জ্যুরা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অনুশাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের

---

[১] অল্পদিন হইল 'রাক্ষস-রহস্য' নামক একটি স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই 'অহল্যা' শব্দটির এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ধারণা ছিল। তেমনি আর্য-দেবতা ও আর্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ জাতিগতভাবে সংকীর্ণ ছিল তখন আর্য-অনার্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল— বাহিরের ভেদবিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনি আর্য-অনার্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখনি বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আর-একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক-একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যদলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তো বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহ্যধর্মের স্থলে ভক্তিধর্মকে জাগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, খৃস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সুফি, কবীরপন্থী প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অনুবর্তীদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহারাও যেন দেবত্বের সহিত মনুষ্যত্বের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর-এক ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্যদের ইতিহাসে সংকোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের এক দিকে তাহার বিশেষত্ব আর-এক দিকে তাহার বিশ্বত্ব এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণ শক্তির দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী দলের চাতুরী। তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলন্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারাল ও কন্সারভেটিভ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে— ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন-কি, ঘুষ এবং অন্যায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মতো করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়— বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির মতো বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই সৃজনশক্তির এ-পিঠ ও-পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে— কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই— সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতিসংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

তুষারাবৃত আলপ্‌স্‌ গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়— তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে— সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দীশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির

সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলই দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে কেননা নিজের পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্যের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এইজন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্মপ্রসারণীশক্তির অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন-আলোচনায় আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না—হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগস্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য-উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষে শিবের অনার্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য-অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে—সেই সংগ্রামে রুদ্র বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীশক্তি বারংবার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তি-পূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনোদিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তেই সংকোচন আপনাকে বারংবার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভালো হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে

বন্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল— মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্যজাতি অনার্যের কাছ হইতে যাহা-কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুগত করিয়া লইতেছিল— এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্যে অনার্যে একটি আন্তরিক সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলনব্যাপারের মাঝখানে কোনো-এক সময়ে বাঁধাবাঁধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড়ো বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্যবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সাংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল— যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনো উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এইজন্য তখনকার জাতি-রচনাকার্য আর্যদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্যেরা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্যদের সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য আকারে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসংগতিরূপে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্যেরা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্লাবনে আর্যসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্যজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনো ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্যের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এইজন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশ নহে।

এ দিকে শক হূন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া যাইতে লাগিল— বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই-সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, বাধা দিবার ব্যবস্থাটা তখন সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মেকর্মে অনার্যসংমিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃংখলতার মধ্যে যখন কোনো সংগতির সূত্র রহিল না তখনি সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্য-

প্রকৃতি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্যত হইয়া উঠিল।

আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের— চারি দিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহ-কর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিদ্যামাত্র ছিল এবং সে বিদ্যাকেও সকলে পরাবিদ্যা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানাপ্রকার তর্ক করিতে পারিবে না— যাহা আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এইজন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিস বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্রেও তো চাই— সেই পরিধিসূত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর-এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এই-সমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু-বা স্পষ্ট কিছু-বা লুপ্ত, কিছু-বা সুসংগত কিছু-বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতসকাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি

সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন-কি, পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিকগত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারত-সংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধতা-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হউক যোগই হউক বেদান্তই হউক সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না; অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন-কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞব্যাপার এমন একটি বড়ো ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে-সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি সূত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন এক দিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আর-এক দিকে তেমনি সমষ্টিকেও প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন; তাঁহার সংকলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সঞ্চয় নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে

একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজিক ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রকে লজিক নানা বাদ-বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আর্যধর্মের মূলতত্ত্বটি-দ্বারা সমস্ত আর্যধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল আর্যধর্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আর্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আর্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন— ইহা ভাবগত যুগ— অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব— শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো একসঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। এক পক্ষ বলিতেছেন যে-সকল মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরমসিদ্ধি লাভ করা যায়। অপর পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হউক এই মতদ্বৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্য-সমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংকলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্য-অনার্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

এ-কথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্যেরা আমাদিগকে দিবার মতো কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা, রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মূঢ়তার ভারে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দেয়।

আর্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদর্যতার সীমা দেখি না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে, বর্বর অনার্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসংকোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই অনধিকার-প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সুতীব্র হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে—কেননা অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য-সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এইজন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপে সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতেছে যে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজানস্রোতে গুণটানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সংকটগ্রস্ত আর্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রযত্ন। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য-দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অন্য দিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। এক দিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্য দিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য-অনার্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একত্র হইল তবু তাহার দুই রঙ পাশাপাশি রহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যে-সমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পান্ডবসখা ভাগবতধর্মপ্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণবধর্মের এক দিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-এক দিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তান্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে

তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্য-সভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক—ত্যাগই ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির-ঐশ্বর্য; এইখানে আর্যসভ্যতার দ্বৈতসূত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীরসম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ, এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানা স্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেই-সমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও এক দিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি, অন্য দিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শত সহস্র অসংগতি থাকিয়া যায়। এই-সমস্ত অসংগতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না—কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসংগতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক্‌। ইহা একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই মিলাইতে পারা যাইবে না তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, যাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করিয়া রাখিতে হয়—তাহারা জীবনধর্মের নিয়ম-অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য-অনার্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এইপ্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এইজন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগে যখন আর-এক দিন অনার্য-বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন

যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এইজন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবি করে না। এইরূপ যখন সমাজের এক ভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর-এক ভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে; ভারতবর্ষে আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্য-বিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিদ্বেষের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে দ্বিতীয় বিদ্বেষের নীচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষপ্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এশিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শত্রুতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাঁধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না—ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিল।

এ দিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য অনার্যদের ন্যায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সমাজের সৃষ্টিকার্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুবর্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সংকোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা স্ফূর্তি পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কালের ধর্মই জাগে ও জীবনের ধর্মই হ্রাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্মে

কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জন্যই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্য-ইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তর বাহিরের জিনিস জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিত্তবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর-এক দিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিস আরও অনেক বেশি এবং আরও অনেক অসংগত। তাহা আমাদের জাতির চিত্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এই-সকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও কর্মকে সংরুদ্ধ করিবেই—সেই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিত্তশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্তশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্‌বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইঁহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য-ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনো অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনো চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে; ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই-সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো

হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুধুমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনোমতে সহ্য করা যাইত—কিন্তু তাহাকে যে খোরাক দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা; কখনোই তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না; ইহাই তামসিকতা—এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যে-সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনি দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

১৩১৮

আত্মপরিচয়

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা—আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর-একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্বোপার্জিত—আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি; তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি—সেইখানে সে উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর-একটা দিক আছে যেখানে সে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে—সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর-একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার জায়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা। আবার যদি তাহার অতীতকালের কোনো একটা চিরন্তন ধারা না থাকে তাহার সমস্তই যদি আকস্মিক হয় কিংবা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আগাগোড়াই আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।

মানুষের এই প্রকৃতি অনুসারেই মানুষের পরিচয়। তাহার খানিকটা পাকা খানিকটা কাঁচা, তাহার এক জায়গায় ইচ্ছা খাটে না আর-এক জায়গায় ইচ্ছারই সৃজনশালা। মানুষের সমস্ত পরিচয়ই যদি পাকা হয় অথবা তাহার সমস্তই যদি কাঁচা হয় তবে দুইই তাহার পক্ষে বিপদ।

আমি যে আমারই পরিবারের মানুষ সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার পরিবারের কেহ-বা মাতাল, কেহ-বা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ঠেকিয়া গেল এবং লোকসমাজেও উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইল না। এই কারণেই আমি আমার পারিবারিক পরিচয়টাকে একেবারে চাপিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া হইবে।

কিংবা হয়তো আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিংবা দুইদিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া আমিও যে পুল পার হইব না কিংবা স্নানসম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে এ কথা মানা যায় না।

অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টমপুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসিপিসি ও খুড়োজ্যাঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, ‘তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে শুরু করিয়াছিস! ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল!’ চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই। কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা। মা-মাসিরা রাগ করিয়া তাহা স্বীকার না করিলেও পাকা, আমি নিজে অভিমান করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেও পাকা। বস্তুত পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য, কিন্তু চলাফেরাসম্বন্ধে অভ্যাসটা নিত্য নহে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এ দিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন-কি, যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না— কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনোদিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা বলিতেছি আমরা আর কিছু নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না। আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো-একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?

এরূপ কখনো সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

কথা-এই, সেই আমার অতীতের পরিচয়ে আমি হয়তো গৌরব বোধ করিতে না পারি। সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এইরূপ যে-সকল গৌরব পৈতৃক তাহার ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বিধাতা আমাদের সম্মতি লন না, এই-সকল সৃষ্টিকার্যে কোনোরূপ ভোটের প্রথাও নাই। আমরা কেহ-বা জর্মনির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও-বা এমন বংশে জন্ম—ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার কোনো উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই।

অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ, বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিল-আদালতের জজ পাইব কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঔদার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

বস্তুত পরিচয়মাত্রেরই এই অসুবিধা আছে। এমন-কি, যদি আমি বলি আমি কিছুই না, তবে যে বলে আমি কিছুই, তাহার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে; হয়তো সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার মারামারি লাঠালাঠি বাধিয়া যাইতে পারে। আমি যাহা এবং আমি যাহা নই এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে—পরিচয়মাত্রই সেই বিচ্ছেদেরই পরিচয়।

এই বিচ্ছেদের মধ্যে হয়তো কোনো একপক্ষের অপ্রিয়তার কারণ আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াই হয়তো কোনো একজন বা একদল লোক আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে। এটা যদি আমি বাঞ্ছনীয় না মনে করি তবে আমার সাধ্যমত আমার তরফ হইতে অপ্রিয়তার কারণ দূর করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য—যদি এটা কোনো সংগত ও উচিত কারণের উপর নির্ভর না করে, যদি অন্ধসংস্কারমাত্র হয়, তবে আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে এই অহেতুক বিদ্বেষটুকুকেও আমার বহন করিতে হইবে। আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে কেহই প্রশংসা করিতে পারিবে না।

ইহার উত্তরে তর্ক উঠিবে, ওটা তুমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিলে। নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু একটা বড়ো জাতির বা সম্প্রদায়ের সমস্ত দায় আমার স্বকৃত নহে সুতরাং যদি তাহা অপ্রিয় হয় তবে তাহা আমি নিঃসংকোচে বর্জন করিতে পারি।

আচ্ছা বেশ, মনে করা যাক, ইংরেজ এবং আইরিশ; ইংরেজের বিরুদ্ধে আইরিশের হয়তো একটা বিদ্বেষের ভাব আছে এবং তাহার কারণটার জন্য কোনো একজন বিশেষ ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে দায়ী নহে; তাহার পূর্বপিতামহেরা আইরিশের প্রতি অন্যায় করিয়াছে এবং সম্ভবত এখনো অধিকাংশ ইংরেজ সেই অন্যায়ের সম্পূর্ণ প্রতিকার করিতে অনিচ্ছুক। এমন স্থলে যে ইংরেজ আইরিশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আইরিশকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্য বলেন না আমি ইংরেজ নই; তিনি বাক্যে ও ব্যবহারে জানাইতে থাকেন তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুত এরূপ স্থলে স্বজাতির অধিকাংশের বিরুদ্ধে আইরিশের পক্ষ লওয়াতে স্বজাতির নিকট হইতে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে সকলে গালি দিবে, তাঁহাকে Little Englander-এর দলভুক্ত ও স্বজাতির গৌরবনাশক বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, কিন্তু তবু এ কথা তাঁহাকে বলা সাজিবে না, আমি ইংরেজ নহি।

তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এইজন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু-

মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।

এ স্থলে অপর পক্ষে বলিবেন, আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া। হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না। অতএব আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়; তাহার দ্বারা দুই কাজই হয়। এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি।

এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর-একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তুমি কি চৌধুরীবংশীয়,' আর সে, যদি তাহার উত্তর দেয়, 'না আমি দপ্তরির কাজ করি,' তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না। হইতে পারে চৌধুরীবংশের কেহ আজ পর্যন্ত দপ্তরির কাজ করে নাই, তাই বলিয়া তুমি দপ্তরি হইলেই যে চৌধুরী হইতে পারিবেই না এমন কথা হইতে পারে না।

তেমনি, অদ্যকার দিনে হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে। এ সম্বন্ধে বৈদিককাল হইতে অদ্য পর্যন্তের ইতিহাস হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিতে ইচ্ছাই করি না। আমি একটা সাধারণতত্ত্বস্বরূপেই বলিতে চাই, কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। হাঁসের পক্ষে জলে সাঁতার যেমন, মানুষের পক্ষে বিশেষ ধর্মমত কখনোই সেরূপ নহে। ধর্মমত জড় পদার্থ নহে—মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে—এইজন্য ধর্ম কোনো জাতির অবিচলিত নিত্য পরিচয় হইতেই পারে না। এইজন্য যদিচ সাধারণত সমস্ত ইংরেজের ধর্ম খৃস্টানধর্ম, এবং সেই ধর্মমতের উপরেই তাহার সমাজবিধি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তথাপি একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহার যত অসুবিধাই হউক তবু সে ইংরেজই থাকে।

তেমনি ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কাল আমি প্রটেস্টান্ট পরশু রোম্যানক্যাথলিক এবং তাহার পর দিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাহাতে কোনো বাধা নাই, অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়—কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছি, সেই সুবৃহৎকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।

হিন্দুরা এ কথা বলে বটে আমার ধর্মটা অটল; এবং অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদের এই আচরণ আমার হিন্দু পরিচয়কে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুমাত্রই বৈদ্যমতে ও হাকিমিমতে মুসলমান আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এমন-কি, এমন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা থাকিতে পারেন যিনি ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না। তথাপি অভিজ্ঞতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজও ইহা লইয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন যে, বিদেশী চিকিৎসা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ইহাতে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া গেল, দেশ উজাড় হইবার জো হইল কিন্তু তবু কুইনিনমিকশ্চার যে অহিন্দু এমন কথা কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা আজও প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। ডাক্তারের ভিজিটে এবং ঔষধের উগ্র উপদ্রবে যদি আমি ধনেপ্রাণে মরি তবু আমি হিন্দু এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না। অথচ হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত খুঁজিলে ঔষধতালিকার মধ্যে কুইনিনের নাম পাওয়া যাইবে না।

এই যেমন শরীরের কথা বলিলাম, তেমনি শরীরের চেয়ে বড়ো জিনিসেরও কথা বলা যায়।

কারণ, শরীর রক্ষাই তো মানুষের একমাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে তাহাকেও বাঁচাইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোকের এমন মত হইতে পারে যে, তাহাকে বাঁচাইয়া চলিবার উপযোগী ধর্ম— আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এমনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো কথা চলিতে পারে না। এটা তো একটা বিশ্বাসমাত্র, এরূপ বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অতএব যে লোকের প্রাণ লইয়া কথা সে যদি নিজের বিশ্বাস লইয়া অন্য কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করে তবে গায়ের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি কিন্তু সত্যের জোরে পারি না। গায়ের জোরের তো যুক্তি নাই। পুলিস দারোগা যদি ঘুষ লইয়া বলপূর্বক অন্যায় করে তবে দুর্বল বলিয়া আমি সেটাকে হয়তো মানিতে বাধ্য হইতে পারি কিন্তু সেইটেকেই রাজ্যশাসনতন্ত্রের চরম সত্য বলিয়া কেন স্বীকার করিব? তেমনি হিন্দুসমাজ যদি ধোবানাপিত বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে বলে অমুক বিশেষ ধর্মটাকেই তোমার মানিতে হইবে কারণ এইটেই হিন্দুধর্ম— তবে যদি ভয় পাই তবে ব্যবহারে মানিয়া যাইব কিন্তু সেইটেই যে হিন্দুসমাজের চরম সত্য ইহা কোনোক্রমেই বলা চলিবে না। যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সত্য নহে তাহা হিন্দুসমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়— কারণ, ইহাই সত্য।

হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে যত ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল দেবতা ও পূজা আর্যসমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে— সংখ্যাহিসাবে তাহারাই সব চেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষে উপাসকসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে-কোনো বই পড়িলেই আমরা দেখিতে পাইব হিন্দুসমাজে ধর্মাচরণের কেবল যে বৈচিত্র্য আছে তাহা নহে, তাহারা পাশাপাশি আছে, ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের আর কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধর্ম হিন্দুর ধর্ম, যেটা না মানিলে তুমি আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে না? তখন এই উত্তর পাওয়া যায়, যে-কোনো ধর্মই কিছুকাল ধরিয়া যে-কোনো সম্প্রদায়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধর্মের এমনতরো জড়সংজ্ঞা আর হইতেই পারে না। যাহা শ্রেয় বা যাহার আন্তরিক কোনো সৌন্দর্য বা পবিত্রতা আছে তাহাই ধর্ম, এমন কোনো কথা নাই; স্তূপের মধ্যে কিছুকাল যাহা পড়িয়া আছে তাহাই ধর্ম— তাহা যদি বীভৎস হয়, যদি তাহাতে সাধারণ ধর্মনীতির সংযম নষ্ট হইতে থাকে তথাপি তাহাও ধর্ম। এমন উত্তর যতগুলি লোকে মিলিয়াই দিক-না কেন তথাপি তাহাকে আমি আমার সমাজের পক্ষের সত্য উত্তর বলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিব না। কেননা, লোক গণনা করিয়া ওজন দরে বা গজের মাপে সত্যের মূল্যনির্ণয় হয় না।

নানাপ্রকার অনার্য ও বীভৎস ধর্ম কেবলমাত্র কালক্রমে আমাদের সমাজে যদি স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এতবড়ো অন্যায় আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্যায়, সুতরাং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

প্রশ্ন এই, হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমন্দ সকলপ্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করিয়া রাখে এবং যদি কোনো নূতন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে এই সমাজকে তোমার সমাজ বলিয়া স্বীকার করিবার দরকার কী? ইহার একটা উত্তর পূর্বেই দিয়াছি— তাহা এই যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়া আমি যে হিন্দু এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো তর্কই নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটা বলিবার আছে। তোমার পিতা যেখানে অন্যায় করেন সেখানে তাহার প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃঋণ শোধ করিতেই হইবে— পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্যাকে সোজা করিয়া তোলা সত্যাচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পররূপেই

করিব—পৃথক্‌রূপে নয়। কেন? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব?

জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করিয়া আমরা যে-কোনো সম্প্রদায়কেই তাহার স্থলে বরণ করি-না কেন সে সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দায় কি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হয় না? যদি কখনো দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশি চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তবে এ কথা কখনোই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্মে উদাসীন তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারাই অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অন্য আর-একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাঁহারা সত্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক; তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদেরই উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য ওজন দরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না—তাহা ছোটো হইলেও তাহা বড়ো। পর্বতপরিমাণ খড়বিচালি স্ফুলিঙ্গপরিমাণ আগুনের চেয়ে দেখিতেই বড়ো কিন্তু আসলে বড়ো নহে। সমস্ত শেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচ্যগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেইখানেই সমস্ত শেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে তাহার পরিমাণ যতই হউক সেইটেকে আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজ-প্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যাহিসাবে নহে সত্যহিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে—সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

অতএব, যদি এমন কথা সত্যই আমার মনে হয় যে, আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে এই কথা আমাকে নিশ্চয় বলিতে হইবে এই ধর্মই আমার সমাজের ধর্ম। সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস-পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধকাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য। এইরূপ সকল বিষয়েই। রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকে বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দু-সমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নীচে ছিল, এবং নীচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা এ কথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন—অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পীয়র নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে—তবে অপারিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু-সমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর

দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

আমি জানি এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন—না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশকুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা তো দেশকালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপগাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, তাহা তো অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত, নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর-একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে, তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ-সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়—কিন্তু এই-সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিত্তের মধ্যে দেবসিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিত্তশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশশক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা-বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্তমানযুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই-একজন মানুষ আপন খেয়ালমত আপন ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে হিন্দুসমাজের মাঝখানে মাথা তুলিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল ইহার কি একেবারে কোনো মানেই নাই—ইহা কি বিশ্ববিধাতার দ্যূতক্রীড়া-ঘরে পাশাখেলার দান পড়া? মানুষের ইতিহাসকে আমি তো এমন খামখেয়ালির সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ। হিন্দু-সমাজের এই বিকাশটিকে আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া চারি দিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য আরোপ করিতেছি—এ কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

অন্যপক্ষে আমাকে বলিবেন ভাবের দিক হইতে এ-সমস্ত কথা শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু কাজের বেলা কি করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র নহে—তাহাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার মিল করিব কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুসমাজ বলিতে যদি এমন একটা পাষাণখণ্ড কল্পনা কর যাহা আজ যে অবস্থায় আছে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিসমাপ্ত তবে তাহার সঙ্গে কোনো সজীব মানুষের কোনোপ্রকার কারবারই চলিতে পারে না—তবে সেই পাথর দিয়া কেবলমাত্র মৃত মানব-চিত্তের গোর দেওয়াই চলিতে পারে। আমাদের বর্তমান সমাজ যে কারণে যত নিশ্চল হইয়াই পড়ুক-না, তথাপি তাহা সেরূপ পাথরের স্তূপ নহে। আজ, যে বিষয়ে তাহার যাহা-কিছু মত ও

আচরণ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাই তাহার চরম সম্পূর্ণতা নহে—অর্থাৎ সে মরে নাই। অতএব বর্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত বাঁধা মত ও আচারের সঙ্গে নিজের সমস্ত মত ও আচারকে নিঃশেষে মিলাইতে পারিলে তবেই নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব এ কথা সত্য নহে। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনি নিজেকে সমাজের বহির্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া?

এ কথা স্বীকার করি, সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তালে সে তখনি-তখনি অগ্রসর হইয়া চলে না। তাহার নড়িতে বিলম্ব হয় এবং সেরূপ বিলম্ব হওয়াই কল্যাণকর। অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক আসিতেও পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধে যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে, যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি, দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার করিলেই যথার্থ নিজে উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাকে যদি স্বতন্ত্র নীচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন সেও আমাকে সেই নীচেই মিলাইয়া লইবে; কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি-না কেন তাহার সঙ্গে আমার নানা দিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে—সেগুলি বহুকালের সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিদ্ধিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীণতা হইবে না—সে দিনে দিনে নিঃসন্দেহই কৃশ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।

অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু এ কথা কখনোই বলিব না যে, সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। এ কথা জোর করিয়াই বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে এইজন্যই। সমাজের মঙ্গলসাধনে, মানুষের কর্তব্যনিরূপণে সেই বুদ্ধি একেবারেই খাটাইতে দিব না এমন পণ যদি করি তবে সমাজের সর্বনাশের পথ করা হয়। কেননা সর্বদা হিতসাধনের চিন্তা ও চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিলেই তবে সেই বিচারবুদ্ধি নিজের শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং তবেই, কালে কালে সমাজে স্বভাবতই যে-সমস্ত আবর্জনা জমে, যে-সমস্ত অভ্যাস ক্রমশই জড়ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথরোধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কাটাইয়া তুলিবার শক্তি সমাজের মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রম ও বিপদের আশংকা করিয়া সমাজকে চিরকাল চিন্তাহীন চেষ্টাহীন শিশু করিয়া রাখিলে কিছুতেই তাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

এ কথা যখন নিশ্চিত তখন নিজের দৃষ্টান্ত ও শক্তিদ্বারাই সমাজের মধ্যে এই মঙ্গলচেষ্টাকে সজীব রাখা নিতান্তই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যাহা ভালো মনে করি তাহা করিবার জন্য কখনোই সমাজ ত্যাগ করিব না।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছি, জাতিভেদ। যদি জাতিভেদকে অন্যায় মনে করি তবে তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে অন্যায়—অতএব তাহাই যথার্থ অহিন্দু। কোনো অন্যায় কোনো সমাজেরই পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। যাহা অন্যায় তাহা ভ্রম, তাহা স্খলন, সুতরাং তাহাকে কোনো সমাজেরই চিরপরিণাম বলিয়া গণ্য করা একপ্রকার নাস্তিকতা। আগুনের

ধর্মই যেমন দাহ, অন্যায় কোনো সমাজেরই সেরূপ ধর্ম হইতেই পারে না। অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অন্যায় করিতে হইবে অধর্ম করিতে হইবে এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে চাই না। সকল সমাজেই বিশেষ কালে কতকগুলি মনুষ্যত্বের বিশেষ বাধা প্রকাশ পায়। যে-সকল ইংরেজ মহাত্মারা জাতিনির্বিচারে সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়াচরণের পক্ষপাতী, যাঁহারা সকল জাতিরই নিজের বিশেষ শক্তিকে নিজ নিজ পন্থায় স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন— তাঁহারা অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন বর্তমানে ইংরেজজাতির মধ্যে সেই উদার ন্যায়পরতার, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার, সেই মানবপ্রেমের খর্বতা ঘটিয়াছে— কিন্তু তাই বলিয়াই এই দুর্গতিকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তাই তাঁহারা ইহারই মাঝখানে থাকিয়া নিজের উদার আদর্শকে সমস্ত বিদ্রূপ ও বিরোধের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন— তাঁহারা স্বজাতির বাহিরে নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন নাই।

তেমনি, জাতিভেদকে যদি হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া জানি তবে তাহাকেই আমি অহিন্দু বলিয়া জানিব এবং হিন্দুসমাজের মাঝখানে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে লড়াই করিব। ছেলেমেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না এবং তাহাকেই আমি নিজে হইতে অহিন্দুবিবাহ বলিব না— কারণ বস্তুত আমার মতানুসারে তাহাই হিন্দুবিবাহনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি এমন হয় যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে জাতিভেদ ভালোই, কেবলমাত্র আমাদের কয়েকজনের পক্ষেই তাহার অসুবিধা বা অনিষ্ট আছে তবেই এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া শোভা পায় নতুবা কদাচ নহে।

হিন্দুসমাজে কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ ছিল না এ কথা সত্য নহে, কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না ইহাও সত্য নহে— হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীত-ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া যে সমাজ, সেই বর্তমান সমাজকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহার আশা ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়াকে আমি ধর্মসংগত বলিয়া কখনোই মনে করি না।

অপর পক্ষ বলিবেন আচ্ছা বেশ, বর্তমানের কথাই ধরা যাক, আমি যদি জাতিভেদ না মানিতেই চাই তবে এ সমাজে কাজকর্ম করিব কাহার সঙ্গে? উত্তর, এখনো যাহাদের সঙ্গে করিতেছ। অর্থাৎ যাহারা জাতিভেদ মানে না।

তবেই তো সেই সূত্রে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিল। না, ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি— ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?

তবে কি মুসলমান অথবা খৃস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দুখৃস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দুখৃস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুখৃস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃস্টান। খৃস্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে, এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ— কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা— তাহাকেই আমি

সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃস্টান হইয়াছিলেন বলিয়াই এই সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোনো একটা পৌরাণিক মতকে যখন আমি বিশ্বাস করিতাম তখনো আমি যে জাতি ছিলাম, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত যখন বিশ্বাস করি তখনো আমি সেই জাতি। যদিচ আজ ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কোনো অণ্ডবিশেষ বলিয়া মনে করি না ইহা জানিতে পারিলে এবং সুযোগ পাইলে আমার প্রপিতামহ এই প্রকার অদ্ভুত নব্যতায় নিঃসন্দেহ আমার কান মলিয়া দিতেন।

কিন্তু চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমানসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না। এমন-কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না। অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কন্‌ফ্যুসীয় অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে। পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রাচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমানধর্মই স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি পারস্যে মুসলমানধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে—আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখানেও আমার জাতিপ্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক। হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। যে-সকল আচার আমাদের শাস্ত্রে এবং প্রথায় অহিন্দু বলিয়া গণ্য ছিল আজ কত হিন্দু তাহা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে; কত লোককে আমরা জানি যাঁহারা সভায় বক্তৃতা দিবার ও কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বেলায় আচারের স্খলন লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না অথচ যাঁহাদের পানাহারের তালিকা দেখিলে মনু ও পরাশর নিশ্চয়ই উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিবেন এবং রঘুনন্দন আনন্দিত হইবেন না। তাঁহাদের প্রবন্ধের মত অথবা তাঁহাদের ব্যাবহারিক মত, কোনো মতের ভিত্তিতেই তাঁহাদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ভিত্তি আরও গভীর। সেইজন্যই হিন্দুসমাজে আজ যাঁহারা আচার মানেন না, নিমন্ত্রণরক্ষায় যাঁহারা ভাটপাড়ার বিধান রক্ষা করেন না, এবং গুরু বাড়ি আসিলে গুরুতর কাজের ভিড়ে যাঁহাদের অনবসর ঘটে, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তাহার একমাত্র কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজ দুর্বল—তাহার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতন ভাবে অনুভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই-সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও তবু বাহিরের—যথার্থ হিন্দুত্বের সীমা এইটুকুর মধ্যে কখনোই বদ্ধ নহে।

যে কথাটা সংকীর্ণ বর্তমানের উপস্থিত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎভাবে সত্য, অনেক পাকা লোকেরা তাহার উপরে কোনো আস্থাই রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন এ-সমস্ত নিছক আইডিয়া। মনে করেন করুন কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এই আইডিয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এখানে জড়ত্বের আয়োজন যথেষ্ট আছে যাহা পড়িয়া থাকে, বিচার করে না,

যাহা অভ্যাসমাত্র, যাহা নড়িতে চায় না তাহা এখানে যথেষ্ট আছে, এখানে কেবল সেই তত্ত্বেরই অভাব দেখিতেছি, যাহা সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, অগ্রসর করে, যাহা বিচিত্রকে অন্তরের দিক হইতে মিলাইয়া এক করিয়া দেয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই আইডিয়াকেই জন্ম দিয়াছে, যাহা তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবে, যাহা তাহাকে চিন্তা করাইবে, চেষ্টা করাইবে, সন্ধান করাইবে; যাহা তাহার নিজের ভিতরকার সমস্ত অনৈক্যকে সত্যের বন্ধনে এক করিয়া বাঁধিয়া তুলিবার সাধনা করিবে, যাহা জগতের সমস্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে তাহার প্রাণক্রিয়ার যোগসাধন করিয়া দিবে। এই যে আইডিয়া, এই যে সৃজনশক্তি, চিত্তশক্তি, সত্যগ্রহণের সাধনা, এই যে প্রাণচেষ্টার প্রবল বিকাশ, যাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আকার গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজের বলিয়া অস্বীকার করিব? যেন আমরাই তাহার মালেক, আমরাই তাহার জন্মদাতা। হিন্দুসমাজের এই নিজেরই ইতিহাসগত প্রাণগত সৃষ্টি হইতে আমরা হিন্দুসমাজকেই বঞ্চিত করিতে চাহিব? আমরা হঠাৎ এত বড়ো অন্যায় কথা বলিয়া বসিব যে, যাহা নিশ্চল, যাহা বাধা, যাহা প্রাণহীন তাহাই হিন্দুসমাজের, আর যাহা তাহার আইডিয়া, তাহার মানসরূপ, তাহার মুক্তির সাধনা, তাহাই হিন্দুসমাজের নহে, তাহাই বিশ্বের সরকারি জিনিস। এমন করিয়া হিন্দুসমাজের সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাই কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা?

এতদূর পর্যন্ত আসিয়াও আমার শ্রোতা বা পাঠক যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে শেষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন— যদি জাতিভেদ না মানিয়াও হিন্দুত্ব থাকে, যদি মুসলমান খৃস্টান হইয়াও হিন্দুত্ব না যায় তবে হিন্দুত্ব জিনিসটা কী? কী দেখিলে হিন্দুকে চিনিতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আমি বাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই তিনিও বাধ্য। হিন্দুত্ব কী— ইহার যে-কোনো উত্তরই তিনি দিন-না, বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার প্রতিবাদ আছে। শেষকালে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইবে, হিন্দুসমাজে যে সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম। এই কারণে যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না, যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

বাহিরের দিক হইতে হিন্দুকে বিচার করিতে গেলেই এত বড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাহিরের দিক হইতেই এইরূপ বিচার করাটাই অবিচার— সেই অবিচারটা হিন্দুসমাজ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে প্রয়োগ করিয়া থাকে বলিয়াই যে সেটা তাহার যথার্থ প্রাপ্য এ কথা আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে নিজে যাহা বলিয়া জানি তাহা যে প্রায়ই সত্য হয় না এ কথা কাহারও অগোচর নাই।

মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না— কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবলমাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে— কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।

এইজন্যই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে পারি না। ইংরেজের লক্ষণ কী, যদি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা বলিতে হয় তবে বলিতেই পারিব না— এক ইংরেজের সঙ্গে আর-এক ইংরেজের বাধিবে— এক যুগের ইংরেজের সঙ্গে আর-এক যুগের ইংরেজের মিল পাইব না। তখন কেবলমাত্র এই একটা মোটা কথা বলিতে পারিব যে, এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক ইংরেজজাতি। ইহাদের মধ্যে যে

খৃস্টান সেও ইংরেজ, যে কালীকে মানিতে চায় সেও ইংরেজ; যে পরজাতির উপরে নিজের আধিপত্যকে প্রবল করিয়া তোলাকেই দেশহিতৈষিতা বলে সেও ইংরেজ এবং যে এইরূপে অন্য জাতির প্রতি প্রভুত্বচেষ্টা দ্বারা স্বজাতির চরিত্রনাশ হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হয় সেও ইংরেজ— যে ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বিধর্মী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ এবং যে লোক সেই বিধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে সেও ইংরেজ। তুমি বলিবে ইহারা সকলেই আপনাকে ইংরেজ বলিয়া মনে করে সেইখানেই ইহাদের যোগ; কিন্তু শুধু তাই নয়, মনে করিবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; ইহারা যে যোগসম্বন্ধে প্রত্যেকে সচেতন তাহারই একটি যোগের জাল আছে। সেই জালটিতে সকল বৈচিত্র্য বাঁধা পড়িয়াছে। এই ঐক্যজালের সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করাই যায় না অথচ তাহা স্থূলবন্ধনের চেয়ে দৃঢ়।

আমাদের মধ্যেও তেমনি একটি ঐক্যজাল আছে। জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা আমাদের সকলকে বাঁধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাঁদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা খায় না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং সবর্ণে বিবাহ করে সেই হিন্দু তবে বড়ো সত্যকে ছোটো করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।

এইজন্যই, যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জ্ঞানে ভাবে কর্মে যাহা-কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে তাহা আমার সমস্ত সমাজের। আমার মধ্য দিয়া আমার সমস্ত সমাজ তপস্যা করিতেছে— সেই তপস্যার ফলকে আমি সেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো সমাজ নাই, এবং যাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ তাহারাই মানুষের প্রতিনিধি, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানুষের বিচার হয়। আজ আমাদের সম্প্রদায়ই যদি জ্ঞানে ও আচরণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে তবে আমাদের সম্প্রদায়ের দ্বারাই ইতিহাসে সমস্ত হিন্দুসমাজের বিচার হইবে এবং সে বিচার সত্য বিচারই হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেইসঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই— এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশতবৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে— এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের সাধনাকে আমরা অন্ধ অহংকারে নূতন বলিতেছি কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি সত্য অহংকারে বলিব ইহা আমাদেরই ভিতরকার চিরন্তন— নবযুগে নববসন্তে সেই আমাদের চিরপুরাতনেরই নূতন বিকাশ হইয়াছে। য়ুরোপে খৃস্টানধর্ম সেখানকার মানুষের কর্মশক্তি হইতে একটি বিশ্বসত্যের বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য খৃস্টানধর্ম নিউ টেস্টামেন্টের শাস্ত্রলিখিত ধর্ম নহে, ইহা য়ুরোপীয় জাতির সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট জীবনের ধর্ম; এক দিকে তাহা য়ুরোপের অন্তরতম চিরন্তন, অন্য দিকে তাহা সকলের। হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ যদি কোনো সত্যের জন্ম ও প্রচার হয় তবে তাহা কোনোক্রমেই হিন্দুসমাজের বাহিরের জিনিস হইতেই পারে না— যদি তাহা

আমাদের চিরদিনের জীবন হইতে জীবন না পাইয়া থাকে, যদি সেইখান হইতেই তাহার স্তন্যরস না জুটিয়া থাকে, আমাদের বৃহৎ সমাজের চিত্তবৃত্তি যদি ধাত্রীর মতো তাহার সেবা না করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের হিন্দুসমাজে নহে পৃথিবীর কোনো সমাজেই এই পথের ধারের কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস শ্রদ্ধার যোগ্য হয় নাই—তবে ইহা কৃত্রিম, ইহা অস্বাভাবিক, তবে সত্যের চির-অধিকারসম্বন্ধে এই দরিদ্রের কোনো নিজের বিশেষ দলিল দেখাইবার নাই, তবে ইহা কেবল ক্ষণকালের সম্প্রদায়ের, ইহা চিরকালের মানবসমাজের নহে।

আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খৃস্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই—এমন-কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি—কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া পাই। এইজন্য বেতনের চেয়ে মানুষ সামান্য উপরি-পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায়, তাহা আমাদের মানসপ্রকৃতির তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না, তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না—এইজন্য ইংরেজি পাঠশালার পড়া মুখস্থ করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্পপরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ীরূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়িটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়, তাই বলিয়া এ কথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়িটা আছে; সে পাগড়ি বহুমূল্য রত্নমাণিক্যজড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না। সেইজন্য আমরা বিদেশ হইতে যাহা পাইয়াছি দিনরাত্রি তাহাকে লইয়া ধ্যান করিলে এবং প্রচার করিলেও, তাহাকে আমরা সকলের উচ্চে চড়াইয়া রাখিয়া দিলেও, আমার অগোচরে আমার প্রকৃতির গভীরতার মধ্যে নিঃশব্দে আমার চিরন্তন সামগ্রীগুলি আপন নিত্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। উর্দুভাষায় যতই পারসি এবং আরবি শব্দ থাক-না তবু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী;—ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটাই তাহার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির কাজ চলে সেটা বিদেশী সামগ্রীতে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া তবুও গৌড়ীয়। আমাদের দেশের ঘোরতর বিদেশীভাবাপন্নও যদি উপযুক্ত তত্ত্ববিদের হাতে পড়েন তবে তাঁহার চিরকালের স্বজাতীয় কাঠামোটা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রচুর আবরণ আচ্ছাদনের ভিতর হইতে ধরা পড়িয়া যায়।

যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে এ কথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার

উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা-সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

য়ুরোপের যে-সকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেনে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লন্ড আপনার স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহুদিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন-কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে আইরিশরা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েল্‌সবাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসি ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল; আজ ফ্লেমিশরা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে; অস্ট্রিয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোটো ছোটো জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে— তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দূরপরাহত হইয়াছে। রুশিয়া আজ ফিন্‌দিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলন্ডে হঠাৎ একটা ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলন্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলন্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিঁকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেইখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে সবলতা এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় এ কথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো-না-কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলনরক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনি সে বড়ো হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না— জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যের সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে— যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনি ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনি ফুল সার্থক হয়। আজ পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্ত্বা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোটো সেও যখনি আপনার সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনি সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে— ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোটো হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না।

ফিনরা যদি কোনোক্রমে রুশ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়— তবে একটি বড়ো জাতির শামিল হইয়া গিয়া ছোটোত্বর সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো-একটা নেশনের মধ্যে কোনোপ্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায়

ফিনল্যান্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুশের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিনল্যান্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্য পদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মতো অন্যায়। আয়র্লন্ডকে লইয়াও ইংলন্ডের সেই সংকট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোটোখাটো একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনি নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্‌বোধন উপস্থিত হইল তখনি অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক-সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেননা, মূর্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কী? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড়ো হইয়া উঠিলে তখনি পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্যপরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলাভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত— কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা-কিছু শক্তি যাহা-কিছু সৌন্দর্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতম প্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে, বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচে ঢালা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালি পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ঐ বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে?

অতএব, বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়োরকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না— এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে

সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলাসাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।' সকল-প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি— বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়— সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে, ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে— আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব— কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন— কারণ, সেখানে কোনোপ্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু, যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন

পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষ্যা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু-মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনি সেই পথের পাথেয় কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম, তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষ্যা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্যলাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সিধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্‌যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক-এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের

শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে; বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্তসম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এ দেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব-মহলের সন্তানেরা পশ্চিম-মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম-মহলের সন্তানেরা পুবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বত্রই প্রাচ্য বিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমান-শাস্ত্র অধ্যয়নে একজন জর্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্মবশত; আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখি হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভালো করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিকমত পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আহ্নিকতর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর-একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড়ো আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসংগত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বার বার করিয়া কেবলই আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই চিরস্থায়ী

করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন, তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনোই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত যিনি যতবড়ো খুশি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেইসঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে-প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন—কোনো দেবতার মুখ-হস্ত-পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারও কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই—কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসংগত। কেননা কার্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্‌ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায় এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্যশাস্ত্র আমরা স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে—অন্য জায়গায় বড়ো জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না। আমি পূর্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড়ো একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষত এতদিন আমরা আমাদের যাহা-কিছু সমস্তকেই নির্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল

প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান করি, কিন্তু তাহা নির্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনোই চিরদিন টিঁকিতে পারে না— এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই— তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে এ কথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত-কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার-ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ— যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না; বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খৃস্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর-এক মহাপুরুষ কর্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়াছিলেন এবং ধর্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না— যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি; প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ-বর্জনের ধর্ম।

এইজন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্‌যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড়ো হইবার দিকে যাইবেই— তাহাকে গর্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র— কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সংকীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পুরা বিশ্বাস রাখি; ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভালো, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। ছাড়া পাইলে সে চলিবেই। এইজন্য যে-সমাজ অচলতাকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে-সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্বাগ্রে মানুষের মন-জিনিসকেই

অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন-সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাধা-নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হোক মনকে তো সে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মতো দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব— তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই— তাহা স্থাবর পদার্থ— বর্তমানকালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এইজন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া রাখাই হিন্দুসন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য— তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দীশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চারি দিকে বড়ো বড়ো দরজা ফুটাইবার উদ্‌যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবেচনাবশতই করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজ-বোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষত যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু এ কথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে— এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। এ কথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোনো চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। খেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য পরিবর্তনের কার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনীশক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্মই এই, তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনো জিনিসকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে— যে জিনিস বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুকেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতেছে— এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড়ো সত্য— তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড়ো কথা নহে— ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের তো মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইব? যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে! ইহা আর কিছু নয়, অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে

পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেইজন্য আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর-এক কালের কথা। আধুনিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই, সেইজন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মতো প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব, জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে— চিরসঞ্চিত ধুলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধুলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে— এই-সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ-বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে তো স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না, এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারংবার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারি দিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্‌বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই— সেই জাগরণই চারি দিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনোমতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই-সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জন দিতেছে— যাহা অসংগত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের— যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্মকে আঘাত করে— যাহা কারাগারের প্রাচীরের মতো, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনোপ্রকার পথই নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই— তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলংকার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে, আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহংকার করিতে পারিব না। আমাদের যে-সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে-সকল থাকাতে কেবলই আমাদের সকল দিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্মে বাধা— সেই-সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে— নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। এ কথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিসকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি, যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার-অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকেই লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব— কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনো একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসংগতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া

গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে— তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না— তাহা সোনার পাথরবাটি! কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইঁহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইঁহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন-কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে— বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদান-প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না— কেহ বা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের— চলিতে চলিতে কাহারও বা রথ পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারও বা বৎসরের পর বৎসর টিঁকিয়া থাকে— কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে! কোন্ রথ কোন্ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না— কিন্তু আমাদের বড়োদিন আসিয়াছে— আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূপ-দীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না— আজ বিশ্বের আলোকে আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারই একটি রথ নির্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিণাম কী তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে, সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা এই-সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখো। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারি দিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনো আমাদের যতটা আছে তখনো তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এ পর্যন্ত তাহার তো কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই এক মুহূর্তেই আমাদের মনের মতো কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মতো কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিল না অতএব আমি ইহাকে ত্যাগ করিব— এইখানটাতে আমার মনের মতো হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো-আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবি করিয়া থাকি— তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মতো করিয়া তুলিব— একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে— এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা

সকল উদ্‌যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁতখুঁত করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যেটুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত—তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনি গোসাঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক্‌ সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এইজন্যই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কী ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনোপ্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রৎ চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই-সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে; বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সংকোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব

সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়— তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালীমতই কাজ করিবেন, আমি কোনোপ্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো-একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেইসঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন— মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর-এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর-কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনোপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা-কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া

গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড়ো আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সে দিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি, তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন এ কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষের অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এইজন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে

প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এইজন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্‌বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এ দেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই— তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না— কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু— তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন,

আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এ দেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল—তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই ‘পীপ্‌ল’কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন-কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনো-একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান-রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়, আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা-কিছু ভালো, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই

প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এইজন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানাপ্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষি যেমন নিরর্থক নহে—তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানাপ্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই-সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই-সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যমূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা এক দিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর-এক দিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না—অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই-সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার 'পীপ্‌ল'দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা-কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে, সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই-সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই—এইজন্যই তিনি এই-সকল বিদেশীয় দিঙ্‌নাগদের 'স্থূলহস্তাবলেপ' হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যে-সকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে—তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এইজন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্‌বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমত বুঝিতেই পারি না, এইজন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোটো ছোটো রুচি,

অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড়ো বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোটো ছোটো কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন, তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল-প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন 'ভাবৈকরস' হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের

এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা-কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।[১] তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরও বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্র হাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস, তার খোসার কাছে তলতল করে, তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণসূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা। এ কথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা

---

[১] তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুনো; পশ্চিমেও পেডান্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু এ কথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বন্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কী গ্রামের নিরক্ষর চাষি, কী অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেচ পাইত। সুতরাং এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কী চিন্তায়, কী কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই— তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টো দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরও সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা, ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বৈ কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ, এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখনকার জলহাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে-খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা একরকম দাঁড়াইয়া গেছে— শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো— অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ— অবশ্য ইনস্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান, এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে— এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়— উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান-বাজনা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে; এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক— এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না, এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে; সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে, দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনাবাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া— তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে; মেয়েদের মাথার টুপিগুলা হইতে মরা পাখি, পাখির পালক ও নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে; শিক্ষা বল, কর্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ঐটেই প্রাথমিক; ইঁটের কোটা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি-না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও—সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কিনা, ঐ কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই ঐ কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা এ কথা জানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও সমস্তটাকেও সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না!

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এইজন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সেজন্যে শিক্ষাবিভাগে উদ্‌বেগ নাই। এই উপলক্ষে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে, এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে—যদি গোখলের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের পরে জুলুম করাই হইত।

এ-সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলন্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই-সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ—বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনো এমন-কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই

এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টিসংকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কিনা, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে একরকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনাবাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি, অনিষ্টকর। জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো-একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কনফারেন্স নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এইজন্যই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না—তার কারণ এই যে, আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্‌।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি, সেইজন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্‌, তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্‌—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জর্মান শিখিলে আরও ভালো। সেইসঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাসনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যে মশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক।

কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন-কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন-পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম্‌দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক— আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না-হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়— উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়— কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন-কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আন্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলন্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত— কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী

করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না-হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? স্টীমার না হয় তো পানসি?

ভালো মতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক— বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু-সংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে-বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্য-পরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু-পাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা

তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্য-পরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরও অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ন-নামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদের নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেইসঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়োগোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যাবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি

বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যাবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলাসাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল; তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কালেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে—এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের শামিল হইয়া থাক্-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি-না কেন? গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই

বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্‌-না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—'আমরা চাই!' এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

১৩২২

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ। এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাত করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ এক দিকে আপনাকে মানিতেছে, আর-এক দিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎসৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন এক দিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র, আর-এক দিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে, এইজন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে একককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্পশাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

‘রূপভেদাঃ’—ভেদ লইয়া শুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্যে যদি তার সেটা অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো, তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত, তখনি একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ—তখনি সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সংগীত প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে ‘রূপভেদ’ আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে ‘প্রমাণানি’ অর্থাৎ পরিমাণ জিনিসটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এইজন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এইজন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারি দিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা। তাই দেখি সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। এক দিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারি দিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-এক দিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারি দিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র ‘রূপভেদাঃ প্রমাণানি’তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন—‘ভাবলাবণ্য যোজনং’—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেননা শুধু কারু কাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের একরকম সহজে জানা আছে। এইজন্যই তাহাকে

বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি 'ভাব' কথাটা অনেকগুলো অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ-সকল কথার মুশকিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকারমত ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরও কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে অর্থাৎ আপনার চারি দিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনি তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিংবা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিসকেই মনের জিনিস করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী? অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। 'আমাকে দেখো' 'আমাকে জানো' তাহাদের দাবি এই পর্যন্ত। কিন্তু 'আমাকে রাখো' এ দাবি করিতে হইলে আরও কিছু চাই। মনের আম্‌দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিস হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, 'বোসো', কাহাকেও বলে, 'আচ্ছা যাও'।

যাহারা আর্টিস্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে, তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে-সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদি, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সংগে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিস যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিস সে 'নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'র পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায়

ঠিক এক লাইনে চলিয়া পোটো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এইজন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা দুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক। সেটার নাম ‘সাদৃশ্যং’। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এতবড়ো উদ্‌যোগপর্ব কেন? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্‌যোগ পর্ব, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে; একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনই রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনি বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখা ভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না; হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো ভাবের দিকে— পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে! চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কি না, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন সূর্যের কিরণকে চারি দিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্যকে লোকালয়ের সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না— সে জানে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সর্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্তা— এরা নানা দিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায়— সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে; সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই— এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল— এই তো সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনো যে ফুরাইল না! স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা বর্ণিকাভঙ্গং— রঙের ভঙ্গিমা।

এইখানে বিষম খটকা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে, আর এই রঙের ভঙ্গি যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল, চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বৈকি! দুটির 'পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রঙ আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এইজন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উল্টা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালির মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালির পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালিরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রঙগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়— এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্যায়ে পর্যায়ে ইশারায় দেখাইয়া দেয়— ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গি দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট— আর রঙ জিনিসটা নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রঙ জিনিসটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালির নৃত্য সেখানে এই রঙগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাত কম নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙের ছবি হয় না। তার কারণ রঙ জিনিসটা মধ্যস্থ— দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে— তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক

করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতায় লক্ষ্য নহে উপলক্ষ মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস-পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনি সে আর থাকিতে পারে না, বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এইজন্যই মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর-বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত। এইজন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য এক দিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আর-এক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য। মনের সৃষ্টিকার্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস-পদার্থটা এক দিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্য দিকে সৌন্দর্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি— যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তার পরে ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর-একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই— অর্থাৎ একটা রূপ, আর-একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর-বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা— কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে— তখন তাহা কতটা যে বলিতেছি তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না— তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

১৩২২

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের জাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনার পুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মানিকের অলংকারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাকবে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তা হলে তার চৈতন্যকে অপমান

করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এইরকম। সে মোহ-রাক্ষসের হাতে পড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই; চারি দিকে কারুকার্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চৌড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা-যাওয়ার পথ আগলে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কালটা চলছে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারে নি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য যত সৌন্দর্যই থাক্‌ তার গতিশক্তি যদি না থাকে তা হলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়— তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন, গান জিনিসটা তো চলবার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে; কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা-কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলছি সে নদী চলছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামি নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারে স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে, অতএব বর্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামি চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস বসত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতাসভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকি গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এতবড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই বলেই চর্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে— সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে এ কথা বললে অন্যায় হবে। আমি বলছি নে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে— কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিঁকতে হবে— সে যে বর্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুলবে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তা হলে কী হত? পনেরো-আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা-কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তা হলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি নে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তা হলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা-বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো করে মানে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী! তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুয়ো; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তা হলে এ কথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ! তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নি। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা খেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়মনের সঙ্গে আর্যমনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্য তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে-সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার-বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়—কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করি নে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চলতে পারি। পথ নানা; অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তা হলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তা হলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছয় নি। সেইজন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেইজন্যে সংগীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্ছে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠছে সে আচারভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম

করে ফেলে। লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে শুরু করল। প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে—সে বাঁধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিঁদুসংগীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে—সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল করে ঘিরে রাখলে তবেই সত্য টিঁকে থাকবে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পল্‌তেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না! চার দিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

১৩২২

কৃপণতা

দেশের কাজে যাঁরা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন তাঁদের কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, টাকা কেহ সহজে দিতে চাহেন না, এমন-কি, যাঁদের আছে এবং যাঁরা দেশানুরাগের আড়ম্বর করিতে ছাড়েন না, তাঁরাও।

ঘটনা তো এই কিন্তু কারণটা কী খুঁজিয়া বাহির করা চাই। রেলগাড়ির পয়লা দোসরা শ্রেণীর কামরার দরজা বাহিরের দিকে টানিয়া খুলিতে গিয়া যে ব্যক্তি হয়রান হইয়াছে তাকে এটা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, দরজা হয় বাহিরের দিকে খোলে, নয় ভিতরের দিকে। দুই দিকেই সমান খোলে এমন দরজা বিরল।

আমাদের দেশে ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের ধাক্কাতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকব্জা তো একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তির ভাগ আছে। সেই শক্তি মানুষের নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। জন্তুর শক্তি পরিমিত বলিয়াই তারা কিছু সৃষ্টি করে না, মানুষের শক্তি পরিমিতের বেশি বলিয়াই তারা সেই বাড়তির ভাগ লইয়া আপনার সভ্যতা সৃষ্টি করিতে থাকে।

কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সেখানে মানুষ আপন বাড়তি অংশ দিয়া কী সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য আপন বসতির জন্য কোন্‌ ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে?

ইংলন্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালি পড়িল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিসের জন্য? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্য তো নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইকটিকে পড়াইতে হইবে, দুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।

এ দিকে জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়া গেছে, জিনিসপত্রের দাম বেশি, চাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ব্যাবসাবুদ্ধির কোনো চর্চাই হয় নাই। কাঁধের জোর কমিল, বোঝার ভার বাড়িল, এই বোঝা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর-কোনো কথায় পুরা মন দিতে পারা যায় না। উঞ্ছবৃত্তি করি, লাথিঝাঁটা খাই, কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেলে ইস্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল, আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন ফলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে—পরিবারের ক্রিয়াকর্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই-সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালপার্বণ আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিসপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এইজন্য ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এ দিকে সময় বদলাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজও খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্বের মতো সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কী? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না—এ তো ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান। যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ ছিল। আজকাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড়ো হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি—সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত নানা জিনিসে নানা মূর্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্তে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমত সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম যা-কিছু করি-না কেন সেই সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া খাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই এ কথা ভুলিবার জো কী!

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্‌বৃত্ত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যেহেতুক মানুষ এইজন্য সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্য খরচ করা তার

ধর্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের মতো আহারের দ্বারাই আপনাকে সংহার করে। এমনতরো আত্মঘাতকগুলো পয়মাল হইয়া বাকি যারা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এ দিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিস। লোকহিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী— দেশবোধ বলিয়া একটা বড়োরকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালিহাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড়ো দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভরতি করিতে পারে না; বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বলে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত তো প্রায় দেখি না। এইজন্য এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সর্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা, ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এইজন্যই চাঁদা তুলিতে, বড়োলোকের স্মৃতি রক্ষা করিতে, বড়ো ব্যাবসা খুলিতে, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে ধিক্‌কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এইজন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবারবৃদ্ধিকে লোকবলবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতরো বৃহৎ পরিবারকে একত্র রাখিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্তাকে নির্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দানধ্যান পুণ্যকর্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক অন্যজনের মতোই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারি দিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুঠপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব হয় ইহারা কেবলই তার চেষ্টা

করিতে থাকে। রাজা থাক্‌ কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইহাদের সাধনা, ধন আছে কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্যায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের ঠেলা বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম ও শক্তিকে কেবলই স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সংকীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপদাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হোক, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন-দেবতাদের পূজা যথাসর্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলই নরবলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কৃপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ-অনুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। যতদিন পর্যন্ত এই পরিবর্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যত-কিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ। কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কৃপণ এত বড়ো কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কী পর্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে, হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ববন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্‌ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল ‘সেবা’ কথাটাকে খুব বড়ো অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তকমাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিলটি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভর্তি করিব? কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া? দেশে বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিসটা কোনো-একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ

বলেন যৌথ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায়-প্রণালীই দেশে দুঃখ-নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এইরকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাঁচা আছে যা লক্ষ্মীকে আপনিই উড়াইয়া আনে।

য়ুরোপে আমাদের নজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলই ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে—সেখানে তাদের ঈর্ষ্যা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেননা চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড়োরকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

সকলের চেয়ে সর্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চলো।

তার পরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবাধর্মই প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

১৩২২

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ-সমস্ত বিপর্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো

বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্‌বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালীবনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এ দিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্‌যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর-একজন গ্রীষ্মের তল্পি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কলকা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে-পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রঙ-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাত জোড় মিলাইবার জন্য। তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো— ৩৬ পর্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচটি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এইজন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যতরকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না; সেই তো নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়—সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সংবৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এইজন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিস একটি হইলেও সেটাকে

অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দি তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এইজন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল— বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণ গ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না; গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনো দিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্‌বৃত্ত।

এইজন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে; কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা-ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূলে। এইজন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পালকির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দানশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী-বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এ দিক-ও দিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক ওআর্কস ডিপার্টমেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাব-পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামকা এতবড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না— এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ-সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এইজন্য ফলের চেয়ে ফুলেই

তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়। বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেইজন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে তাহার গাম্ভীর্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি— কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা-না-একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্‌ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব— কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার— আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরও বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা-মাঠ ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না— যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিস নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ঐ বায়ুমণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারী, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ঐ শূন্যে— যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারি দিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়— তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না— কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ, সেইজন্যে উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত— সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারি দিকে আকাশের অবকাশ আছে,

একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই-সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশবিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রঙ ফলাইবার সুযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভংগিতে হিল্লোলিত হয়।

এই-সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এইজন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারি দিকে অবকাশ চাই। এইজন্য হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেকদিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তুঅংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ—পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরেজিতে যতিকে বলে pause কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগসাধন হইতেছে—অণুর সংগে অণুর, পৃথিবীর সংগে সূর্যের, নক্ষত্রের সংগে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত-কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তুবাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগযুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই-সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তা-ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা 'আষাঢ়ে' বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল কাজের বাহির,

ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল কাজের বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক— আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এসো সমস্ত খ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে— জাতীপুষ্পসুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল— কোন্‌ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

১৩২১

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ও দিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে; এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, 'তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্য শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।'

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচিগায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রঙ আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ। সেই রঙ দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রঙ ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রঙ-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন যা আছে কেবল-মাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরও-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রঙই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রঙ থাকে না।

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে

কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না, জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসি-কান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে—তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসি-কান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর-এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সে দিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসল-খেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি-দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই-সব ছোটোদের এই-সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি-দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া—তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই; হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, 'বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে

সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!'—তিনি বলিতেছেন, 'ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জৈষ্ঠ্যের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের নায়ন-সভায় তোমার ঝ'ড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!'

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, 'তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।'

১৩২২

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

প্রকাশ : ১৯১৭

‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ ভাষণটি সভায় পঠিত হবার পর ‘প্রবাসী’তে (ভাদ্র ১৩২৪) মুদ্রিত হয়। দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়ার পর ‘কালান্তর’ গ্রন্থে (১৯৩৭) অন্তর্ভুক্ত হয়।

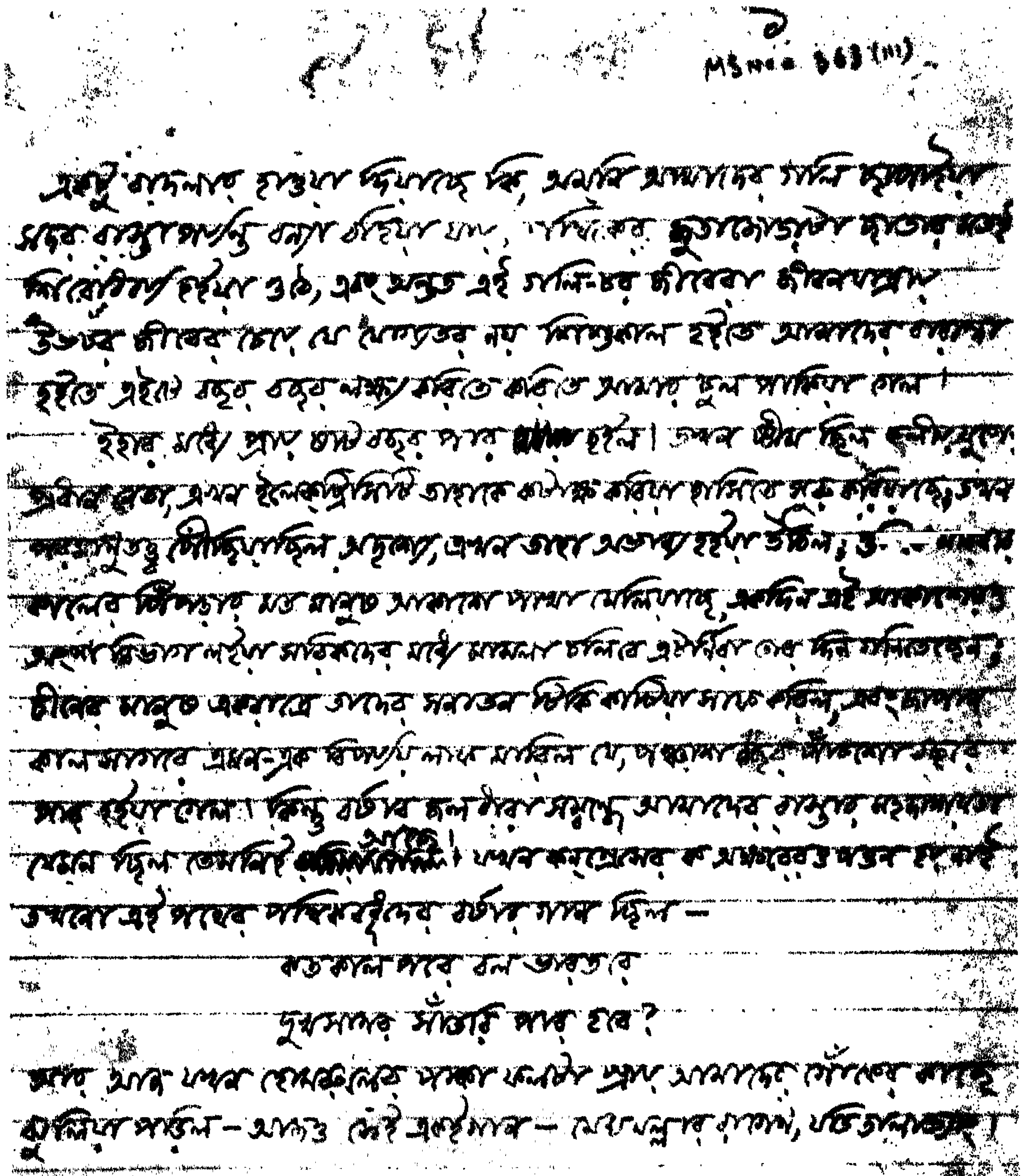

৩

MS no. 363 (iii)

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া উঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবকে জীবনযাত্রায় উভচর জীবের চেয়ে যে শ্রেয়তর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর পার হইল। তখন স্টীম ছিল কলিযুগের প্রবীণ রাজা, এখন ইলেকট্রিসিটি তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে, তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অজ্ঞেয় হইয়া উঠিল; [illegible] কালের চিলের মত মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও অংশ বিভাগ লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে এটর্নিরা তো দিন গনিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন-এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জল নিকাশ সম্বন্ধে আমাদের গলির মহল্লাতে যেমন ছিল তেমনি আছে। যখন কনগ্রেসের ক অক্ষরেও পত্তন হয় নাই, তখনো এই পথের পথিকবৃন্দের বর্ষার গান ছিল —

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে?

আজ আর যখন হোমরুলের দমকা ফেনাটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল — আজও সেই একই গান — মেঘমল্লার রাগিণী, একতালা।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ও দিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবখরা লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে, অ্যাটর্নি তার দিন গনিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারি করে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার-রাগেন, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল; বর্ষাও নামিয়াছে ট্র্যামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্র্যামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেকদিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন।

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গি অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই শহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই—আমাদের সয় ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো-আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, 'সে কী কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামত হইবে না?'

'হইবে বৈকি! কিন্তু এমন আশ্চর্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।'

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, 'সে কি সম্ভব?'

যা হইতেছে তার চেয়ে আরও ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাতরার মতো সেটাকে দেশের চার দিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোনো কর্তৃত্ব আছে এটা

আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদের হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তার পর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন-কি, পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমন-কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'

আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে নাহয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরও কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর-গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পান নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো-বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়র্লন্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ দেওয়া যায়; ভারত-বিভাগের ফর্দটাও নেহাত ছোটো নয়— কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্যাতন উপলক্ষে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়। এ-সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ কথায় কারও মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে

পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। ‘ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।’ অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কোনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সে দিক হইতে সে ইন্‌টার্নড্‌ হইতে পারে কিন্তু এ দিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি, ‘তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য করিবার জন্যই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না,’ তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনি সামাজিক ইন্‌টার্নমেন্ট-এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝট্‌পট্‌ করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গির তফাত। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিৎ হইয়া রহিল। চৌরঙ্গি বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গি এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিৎপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উল্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ সমৃদ্ধিলাভ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড়ো মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজি পাঠক বলিবেন—আমরা তো এ-সব মানি না। আমরা তো বসন্তর টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকারি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি; এবং সেই সঙ্গে

সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোনোটাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলই বলে, কী জানি কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এইরকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো-একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজরক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে—এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই তো বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিংবা ছোটো লোভ, কিংবা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাস করি, 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম' এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কী গুণ রুটিরই বা কী, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কী আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কী, কর্তার ইচ্ছার উপর বরাত দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মতো সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানিপাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বালতিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি মিঞা ফিলটার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসৎকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়াছোঁয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ

সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয়, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এতবড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিঁকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে। নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এতবড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্চর্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এ দেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত মূঢ়তাই থাক্‌ উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন-কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, 'যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে,' অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ও দিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, 'যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ,' আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকো।' এইজন্যই এ দেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

য়ুরোপে ঠিক ইহার উল্টা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর সব কথা ভুলিয়া

কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হোক— উপর হইতে যেমন-খুশি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুশিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে, এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে আত্মাভিমানে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, 'খবরদার, ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন-কি, ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওপড়াও ঐ বেতবনটাকে।' ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। অপরাধটা এই যে সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেতবন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময়ে য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলন্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলন্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়োঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। একসময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্বদস্তুরমতো বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাবরাব যদি পূর্বের মতো থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারো আজ টুঁশব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলন্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনো সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী? তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেক-দিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায় যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা তাঁর নৌযুদ্ধ-বিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া

লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি, তার কৌলীন্য যেমনি থাক্, সে ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজের সর্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারও অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই—যেমন রাশিয়ায়—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাস-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, ‘আপনার মুখে পান!’ গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই ‘সারথি যেই হোক মুখের পান ফেলা যায় কেন?’ ধর্মবুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন করিতে প্রস্তুত সে দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টিসৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এ দেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেইভাবেই দেখেন একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। স্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলওয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানত-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির

অন্তরায়কে আকাশপরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কানা-বুদ্ধি কিংবা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে-সম্পদ দিয়াছেন—ত্যাগ-স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবি বাজে খরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়েপুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই তো ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে। যে অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়ো আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পান্ডার না আছে বিদ্যা, না আছে চরিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পুজো করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবু তো সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পান্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিংবা নিজের জন্য করিত। সে কথা ঠিক, কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিংবা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না, এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এইজন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া 'হায় হায়' করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, 'নিজের মজুরি দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব।' তারা ভাবিল, পুণ্য হইবে ঐ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি। সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দশা, এর কারণ, গ্রামের যা-কিছু পূর্তকার্য তা এ পর্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার 'পরে, নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন-কি, কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব; বলেন, ওগো বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না; বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচারবুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, 'ঐ অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।' অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলো-আনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্জয় কানমলা, সমস্ত গুরুপুরোহিত তাগাতাবিজ সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক, পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হোক বলিয়াই যখন আশীর্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ কথাও বলিতে বাধ্য যে, মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও। যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কুলকে একসঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্তের ঘড়াঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।

অনেকে বলেন, এ দেশে পদে পদে এত দুঃখদারিদ্র্য, তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে, এ কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগজামিন পাস করি। এ কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে, ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো, কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশো ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, 'এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।' তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজারজন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, 'এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো।'

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না, এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মে কর্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা

কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই, অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপসোস করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো-একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি, কিন্তু তবু এ কথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত—এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিংবা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয়তো আমাদের সুদিন হইবে, নয়তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না; এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তরই লীলা চলিতেছে; কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্র লোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়; সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভিতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ-গবর্মেন্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনি জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনি গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা প্রায়ই বল, পুলিস তোমাদের 'পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।' বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো, এ কথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই তো গায়ের জোরে নয়, সে তো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেন্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টীমার, আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, 'বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর।' এর পরে আর হাত-পা চলে না। প্রেস্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ঐ তো কর্তা, ঐ তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঐ তো

বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেস্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিদ্যা, ইহাই তো মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্মেন্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ-গবর্মেন্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে শুনিব 'রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা—নয়তো প্রেস অ্যাক্টের মুখ-থাবার নীচে পরম-নিঃশব্দ নরম-পন্থা।'

'হাঁ, বিপদ আছে বৈকি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।'

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিংবা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে।'

'এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।'

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকই প্রশংসা কিংবা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।'

'এ কথাও ঠিক। তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।'

'এতটা কি আশা করা যায়?'

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়। গবর্মেন্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরও বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবি টিঁকিবে না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেকদিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্বপ্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'

অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়। ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে করো ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড়ো কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়াধরিয়া ভূতের ওঝার মতো বিষম ঝাড়াঝুড়ি শুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়া বলিব, 'দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।' তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, 'তুমি কে হে! আমি ডাক্তার যাই করি-না তাই ডাক্তারি।' ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া

না যায় তবে তাঁকে আমার এ কথা বলিবার অধিকার আছে ‘যে ডাক্তারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য’।

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ঐ ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন-কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে— কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়িতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়ো। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেন্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব পারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব, এ কথা তাকে কখনোই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড়ো সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ শাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে— ‘জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।’ এ কথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাংলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ

খুলিয়া দাও— সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু-পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেইসঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে— সে-সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই-সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপে স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে দিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই— তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে— তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদ্‌গদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়ার নামে সে স্টেশন পর্যন্ত ছুটিয়া যায়— আর গরিবের বেলায় তার ব্যবহার উল্টা— এটা তো সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধরূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধারকরা বার্ধক্যের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ-ইতিহাসবৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্‌কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ

আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন। ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু, সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞান-জ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এসো প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর, তুমি তাহারই প্রভু—ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চিরনির্বাসন গ্রহণ করুক।

১৩২৪

কালান্তর

প্রকাশ : ১৯৩৭

‘কালান্তর’ (১৯৩৭) গ্রন্থে যে ১৫টি প্রবন্ধ সংকলিত তার মধ্যে ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ প্রবন্ধটি পূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান রচনাবলীতেও তদনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে। ‘কালান্তর’ গ্রন্থের সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক অন্যান্য রচনা, যা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, ‘সংযোজন’ অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পে-গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা-তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে-আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে-জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই-সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল— কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি— একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণবপদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণবগীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত শহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বদ্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে— তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল

না কষে ভাগেরই অংকফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে— কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির ’পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক’রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অংকুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গিতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্‌বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলন্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না— এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।

বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস ক’রে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

যদিও আমাদের চার দিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পঙ্‌ক্তি একই, তার শাসনও সমান— কোনো মুনি ঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের

অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয় প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য-উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান-আমলের বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন-শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত। ধর্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম-সাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', এই কথাটার অর্থ এই যে, জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজসাম্রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে, উইলিংডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম, যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব এক দিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি,

সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, 'A man is a man for a' that।'

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে— অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারোশো খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলন্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্টো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসন-কর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক, আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাবত্রুটিসত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি-সম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্ট-ক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বলতে পারতুম না যে, সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম অনুসারেই, মানুষ বলেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবি আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহুকালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্র-জাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডর', বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডরের' প্রকান্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমন্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলন্ড ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র 'ল' এবং 'অর্ডর' বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্ন-সংস্থান রইত আধপেটা-পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে। সর্বজনের সর্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মন্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিন্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনো-দিন কোথাও হয় নি— এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিন্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারের *Strangling of Persia* বইখানা পড়লে। ও দিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ

করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস-উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লন্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃস্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম লিখছেন :

> So after the war I was sent to Guiana...Condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment—banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill....One arrives in Guiana honest—a few months later one is corrupted...They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land—fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all, leprosy.

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস, সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মানি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না! যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে—বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি, তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে

বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্‌কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

শ্রাবণ ১৩৪০

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন-কি, হিন্দুমুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এ-সব হয় নাই—কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারও পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিংবা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে শুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে-লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিম সমুদ্রপারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, 'তোমরা মরিতে বসিয়াছ! আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্তুচাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ—তোমরা স্থূলের উপাসক।' এ-সব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, 'হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি—ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।' এই বলিয়া ইহারা

আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা যে চলিতেছে; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, এ কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে—বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রায় সংকটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর-একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এইজন্য, নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই, হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া। তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিস নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনই হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বকশিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয়, 'হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।'

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয়, খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয়, ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা-ঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে-শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য—কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে-সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে-সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক— বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবা মাত্রই সে বলে, কাজ কী। বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো রোসো', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক-না'।

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে। আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদিয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই শরিক বটে কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ জলই পৃথিবীতে গতিসঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কী ভয়ংকর তাহা মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত-বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে-পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালুচাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জটি সেখানে একা স্থাণু হইয়া ঊর্ধ্বনেত্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ গণিতেছেন— কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া। নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কী উপায়ে।

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ংকর হইয়া বসিয়া আছে— এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এককালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর-এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে— মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালুচাপা পড়িয়া গেছে। এখানে-সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো-একটা ভাঙা টুকরা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে, কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কী। সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলই তলাইয়া যাইতেছে।

চারি দিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনোই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহুপূর্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত— সেই লীলায়

কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে! কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাই-করা ও কারিগরের ছাপমারা সামগ্রী ছিল না—তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁত নয়, নিটোল নয়; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত 'মমি' মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন। তাহাদের সিন্দুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্-না কেন, সেই ইজিপ্টের নীলনদীর পলিপড়া মাঠে আর যে 'ফেলাহীন্' চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোটো ভাই; আগে প্রাণ তাহার পরে মৃত্যু। যাহা-কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে—যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে-যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে-যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে-যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর-কিছুই নাই; কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তায় স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্‌বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত এ কথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই। নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে— সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ-সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরস্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠ্‌বোস্‌ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল। ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর-কোথায় ঘটিয়াছে।

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর-কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এ দেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন—এইজন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর-কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!' আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্যই লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ংকর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকালবেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়দাড় শব্দে ঘরের দরজাজানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরও অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেক দিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্তিগুলি চারি দিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে

বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য-সাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

বৈশাখ ১৩২১

লোকহিত

লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ—যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে-রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে-রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়। সে-সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান; সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের

মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি—দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।

হিন্দুমুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারও গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গ বিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধুলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপখননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেইসঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত শুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোকসাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এইজন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গিটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্টসাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারি দিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত—কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসনকর্তা। লোকসাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতিকৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়ো; এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা এবং সেই-সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্বকালের ক্ষত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক্‌, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী-নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর-সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকুমাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ওদেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো, কেহ-বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ-বা আপন উদ্‌বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া লোকসাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না—এবং তাহারা যে কেহ বা কিছু তাহা কাহারও খবরে আসিত না। এখন ও দেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সস্‌-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এইজন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে-সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ এক-একবার আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে। বলে, তবে তো আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্তব্য।

ভুলিয়া যাই ও দেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে—যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ-সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা-কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই-

জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও—সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে—সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা—সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পার, তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারি দিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরিব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণামাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি—আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা

যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি—সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবি করি। সেই দাবি ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের। কিন্তু লোক-সাধারণেরও সেই জোরের দাবি আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি এ কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেইদিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাত ছোটো হয়—দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুইচার জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুই পক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর-কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি; নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

ভাদ্র ১৩২১

লড়াইয়ের মূলে

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাঁসও আছে রসও আছে। ইহার উপরে আর-বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই— সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পণ্যজীবীর 'পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে— বৈশ্যের কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্মানি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃস্টসংঘ বর্তমান য়ুরোপের শিশু বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত হাতে গুরু-মহাশয়গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে— সাবেক কালের খাতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই। এখন তাহাকে এই শিষ্যটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, য়ুরোপ যতকিছু অন্যায় করিয়াছে খৃস্টসংঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই বরঞ্চ ধর্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

এ দিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে 'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া'। দ্বাপর যুগে আমাদের হলধর বলরামদাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলিযুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়টিতে হাত পড়িবা মাত্র তিনি হুংকার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই— রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোঁক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই আচম্‌কা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশংকা আছে।

ইহার পরে আর-একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে— কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।

বণিকে সৈনিকে লড়াই তো বাধিল কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাবেক-কালের ইতিহাসে দেখা যায় যারা কারবারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই। সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেহ খাতির করিত না, বরঞ্চ অবজ্ঞাই করিত।

কেননা জিনিস লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যে কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে। কেননা তখন ব্রাহ্মণ তো কেবলমাত্র যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন লইয়া ছিল না— মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয়-প্রভু ও ব্রাহ্মণ-প্রভুতে সর্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত; বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে আপস করিয়া থাকা শক্ত। য়ুরোপেও রাজায় পোপে বাঁও-কষাকষির অন্ত ছিল না।

কারবার জিনিসটা দেনাপাওনার জিনিস; তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার

গরজ আছে। প্রভুত্ব জিনিসটা ঠিক তার উল্টা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে, অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভুত্ব জিনিসটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এইজন্য প্রভুত্বই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পালকির বেহারা তাই বার বার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বার বার কাঁধ বদল করিতে হয়—কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এইজন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল—এই কারণে তখনকার যত-কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক-কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই—জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মানির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ-বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্মানির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ ক্ষুধিত জর্মানির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন-পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মানিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

পৌষ ১৩২১

ছোটো ও বড়ো

যে সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত, যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৈসুম-হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্মবিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্তমানকালে পশ্চিম মহাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া। সেখানে খনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থূল বাধাইয়া তোলে; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সে-দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আর-এক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে দুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কানমলার কাজে তিনি প্রস্তুত।

ইংলন্ডে এক সময় ছিল, যখন এক দিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্ট্যান্ট্ ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বে দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর সুবিচার করিয়াছে তাহা নহে। এমন-কি, বহুকাল পর্যন্ত ক্যাথলিকরা বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চের ব্যয়ভার ইংলন্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সে-দেশের অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্যায়। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও মানসিক কারণগুলি আজ ইংলন্ডে নিরুপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে কেন। যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর 'পরে থাকিত তবে যেখানে জোড়া মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্থায়ী হইত। একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটলন্ড ও ইংলন্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা ভাব রুচি প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ ও স্কচ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা উভয়েরই স্বাধিকারে; যাহাতে সম্পদে ও বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, আজ ইংলন্ডে স্কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমান ক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যান্টে অনৈক্য ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্যে মঙ্গলসাধনের যোগে তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাথার উপর একটি তৃতীয় পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামত ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনোকালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত। আয়র্লন্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মেলে নাই কেন। অনেকদিন পর্যন্তই আয়র্লন্ডের সঙ্গে ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না। এই 'ডগমা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন-করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের

ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সে দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্পদিন হইল, রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হাঙ্গামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন— সাহাবাদে কিংবা কোনো এক জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার রায়তদের তোমরা তো ঠেকাইতে পারিলে না। তোমরাই আবার হোমরুল চাও!' জমিদার কী জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লম্বা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, 'না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম। আপাতত আমার রায়তদের তুমি ঠেকাও।' বেচারা জানিতেন হোমরুল তখন সমুদ্রপারের স্বপ্নলোকে, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর হাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, 'হিন্দু মুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে তো ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি-সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে তাকাইয়াছিলেন। উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতরো শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল— সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি সদাসর্বদা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা জয়পুর বরোদা মৈশুরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি-সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হইত।'

আমাদের নালিশটাই যে এই। কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি; সেজন্য উলটিয়া কর্তারাই আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ভয়ে ভয়ে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে মনে যে-ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃংখলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের ভিত্তিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে— রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব। আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে একমাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ধ্রুব হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না; চিরদিনের মতোই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র,

তাহাদের শক্তি অবরুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছার পাষাণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত?

এ পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্মক, ইহা সজীব সকর্মক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই; সুতরাং ইহা আনন্দ করিবার নহে; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, তখন আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক, সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারি দিকের দাবি ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই যে নানা দিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকারবাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া খাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সবান্ধবে শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে সে-পরিমাণে ভার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিক্ষা দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুষিয়া লন কিন্তু তাঁর কোনো দায় নাই, ভদ্র-সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্মে খরচপত্র বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই, অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয় সমাজব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়। তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এ দিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে। যে-গাভীর বাঁধা খোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাঁকা শিঙের গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে-ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুব্যবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলা পাথরের টুকরা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলা-বদ্ধরূপে সাজাইয়া কাজে লাগানো যায় সেইটেই সব চেয়ে বড়ো কথা হইত। কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই এ কথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতিহিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে-অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔদ্ধত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে; আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া জগৎসংসারটাকে একলা দুহিয়া লইবার জন্য লম্বা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো উদ্যোগ ও বড়ো উৎসাহ রাখি বলিয়া শয়তানকে লজ্জা দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে-শ্লেষ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাঞ্ছিত রাখিব; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের ’পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই শরশয্যায় শেষ পর্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না— আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্মণ্যতার দুঃখ ভিতরে ভিতরে অসহ্য হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জনসেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ শান্তির

আওতায় মানুষ বাঁচে না। কেননা যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে গর্জিয়া ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মতো পোলিটিকাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কথা আত্মহত্যা-কালে শচীন্দ্র দাশগুপ্তের মর্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্ষণে ক্ষণে বন্যাদুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিত্যকর্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বদ্ধ হইয়া আন্তরিক নৈরাশ্যের উত্তাপে বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপদ্রবের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায় দেশের ধর্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র। যে-লোক স্বার্থপর বেইমান, যে-উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ংকর হইয়াছে। কেননা সন্দিগ্ধের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন যে, মহৎ অধ্যবসায়ে তোমার দরকার কী। তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার, তখন ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে যাও কেন। বস্তুত কর্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মুক্ত হইবার চেষ্টা। যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। গুপ্তচরের যুক্তি বলে, পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ। কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, মাটির তলায় ঐ যে দারুণ সুড়ঙ্গপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাই, শব্দ নাই, বিচার নাই, নিষ্কৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই, এইটেই কি সুপথ হইল। দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে একদমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে। ক্ষুধার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি এমন কথা তো বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না।

এইরকম চোরা-উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। দেশ আমার দেশ, সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়, এ দেশের ইতিহাসসৃষ্টি-ব্যাপারে আমার তপস্যার উপরে সমস্ত দেশের দাবি আছে বলিয়াই এ দেশ আমার দেশ, এই গভীর মহত্ত্ববোধ যদি দেশের লোকে অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এ দেশে ইংরেজরাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। কালক্রমে বাহিরে সে ইতিহাসের অবসান ঘটিলেও অন্তরে তাহার মহিমা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তা ছাড়া নিরতিশয় দুর্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মতো। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতিতুচ্ছ ফাটলগুলিই মুশকিল বাধায়। রাগ করিয়া তার উপরে পুলিসের রেগুলেশন বা নন্-রেগুলেশন লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে। ফাঁকগুলিকে বুজাইবার জন্য সময়মত সামান্য খরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে। এই কথা যে ইংলন্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।

কিন্তু রিপু অন্ধ; সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্মের

দোহাইকে সে দুর্বলতা এবং শৌখিন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীয় প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিপুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে-সমস্ত ইংরেজ এ দেশে রাজসেরেস্তার আমলা বা পণ্যজীবী, তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমুচ্চ, আর ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া ছায়ার মতো অস্পষ্ট অবাস্তব ও ম্লান। এই কাছের ওজনে, এই উপস্থিত কালের মাপে ভারতবর্ষের দাবি ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে-কোনো বরলাভের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা ক্ষীণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্ধপথে অপঘাতমৃত্যুতে মরিয়া ভারত-ভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা দিবার শক্তি যারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা মাতোয়ারা, কঠিন স্বাজাত্যাভিমানের স্তরসঞ্চিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের মানুষ-সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারি বা সওদাগরি আপিস। এ দিকে ইংলন্ডের যে-ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপরে ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিকাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলন্ডের ইংরেজ-সমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পক্ককেশের শপথ করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি' এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশ্রয় দাবি করে। এই অভ্রভেদী অভিমানের ছায়ান্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়। ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া, আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব।

যে দূরবর্তী ইংরেজ য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধস্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, ইহারা তাহাদিগকে জানায় যে, নীচের আকাশের ধুলা-নিবিড় বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্র-বিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ করাকে ইহারা স্পর্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে-একটি মহৎ জাতি আছে প্রকৃত-পক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে; ভারত-দফতরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে-একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে-মানুষ তার সমস্ত মনপ্রাণহৃদয় লইয়া মানুষ, সে নয়, যে-মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ—সেই তো কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হায়, ভারতশাসনে তিনি এ কী দিলেন। যে বড়ো-ইংরেজ ষোলো-আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো-আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই, অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে সে-সমস্তই কি বাদ পড়িল। এই ছোটোখাটো ছাঁটাছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না

এমন অত্যন্ত দামী ও নিখুঁত ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন। বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলন্ডের সরকারি অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন ত্রাহি-ত্রাহি করে। কেননা, ঐ ওআর্ক-হাউস সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারি বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা-সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাধ্যক্ষ এই অকৃতজ্ঞতায় ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেননা, এই কার্যাধ্যক্ষ পুরা মানুষ নয়, ইহার পুরা দৃষ্টি নাই, এই ছোটো মানুষ মনে করে দুর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর জন্য মুক্তির অসীম আশায় ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতোই বণিকের ঘরে বাঁধা রাখিতে পারে।

বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না—সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য-ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে, এবং ভারতবর্ষ বড়ো-ইংরেজের কাছে আপিসের দফতরে এবং জমাখরচের পাকাখাতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার স্ট্যাটিস্টিক্সের সমষ্টি। সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় কত আমদানি কত রপ্তানি; কত আয় কত ব্যয়; কত জন্মিল কত মরিল; শান্তিরক্ষার জন্য কত পুলিস, শাস্তি দিবার জন্য কত জেলখানা। রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয়তলা উচ্চ। কিন্তু সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অংকমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেন্ট্‌ দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

এ কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক্‌ তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্বলতারই পরিচয় হয়—সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো। ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড়ো জাতিই যে-ধর্মের বলে বড়ো হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়ো; অত্যন্ত রাগ করিয়াও এ কথা বলা চলিবে না যে, সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিংবা টাকার থলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিংবা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে এ কথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজজাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছলনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।

এই বড়ো-ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্মী; য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎ শিক্ষা তার চিত্তকে প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্যোগটা কী। সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে না-ও বুঝিয়া থাকে, একদিন সে বুঝিবেই যে,

হাওয়া যেখানেই পাতলা, ঝড়ের কেন্দ্রই সে জায়গাটায়—কেননা চারি দিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যে-সব দেশ দুর্বল, সবলের দ্বন্দ্বের কারণ সেখানেই; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই; মানুষ সেখানে আপন মহৎস্বরূপে বিরাজ করে না; মানুষ প্রত্যহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মনুষ্যত্বকে শিথিল করিয়া বর্জন করিতে থাকে। শয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্বল বলিয়া বিদ্রূপ করে। বড়ো-ইংরেজ এ কথা বুঝিবেই যে, বালির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনোই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে-দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আর-এক পিঠে আমোদ। যে-পিঠে আপিস সে-পিঠে সে ভারতের বহুকোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে-পিঠে আমোদ সে-পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মতো, বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবি করে। ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে এইটেই বিশ্বের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। কিন্তু আপিসের জানলার বাহিরে রাস্তার ধুলার উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন এই চালনাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষমের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া এ কথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যেমন তারা বর্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। আমরা এখানে আসিয়াছি এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করে না, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তারা স্পর্ধা করে।

অতএব ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে, ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের 'মাইন' সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে। তার পরে লোনা জলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

দেখিতে পাই, বড়ো-ইংরেজের দাক্ষিণ্যকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোটো-ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে শুরু করিয়াছেন। ছোটো-ইংরেজের জোর যে কতটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন, মাঝখানের পুরোহিতের মামুলি বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্তীর জোর কতটা এবং ইঁহাদের মেজাজটা কী ধরনের সে কি বারে বারে দেখি নাই। ছোটো-ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর-একদিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বার বার বলি, 'কিসের জোরে স্পর্ধা কর। গায়ের জোর? তাহা তোমার নাই। কণ্ঠের জোর? তোমার যেমনই অহংকার থাক্ সেও তোমার নাই। মুরুব্বির জোর? সেও তো দেখি না। যদি ধর্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখো। স্বেচ্ছাপূর্বক দুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, লোকশ্রেয়ের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বর যদি পাই তবে অন্তর্যামীর কাছ হইতে পাইব।'

দেখ নাই কি, বরদানের সংকল্প-ব্যাপারে ভারত-গবর্মেন্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে

শুনিয়া এ-দেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিতেছে, ‘ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি। এমন কী উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্টমেন্ট্ হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে।’ অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্যন্ত ধরিয়া যখন দলে দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয় তখন ইঁহারাই বলেন, ‘উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মুল্লুকের বেআইনের আমদানি করিতে হইল।’ অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য, মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচা আছে। কিন্তু তাও বলি, মারিবার খরচার বিল কালে মলমের খরচার চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে ইতিহাস ভারতবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে বহিতেছে না; তাহা ঘূর্ণির মতো একটা প্রবল কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নক্‌শার রেখা ছাড়াইয়া কিছুদূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জাইতে গর্জাইতে বল, পাথর দিয়া বাঁধো উস্‌কো, বাঁধ দিয়া দিয়া উহাকে ঘেরো। প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নীচের দিকে তলাইতে থাকে—সেই চোরা-প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের বক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে থাক।

আমার সঙ্গে এই ছোটো-ইংরেজের যে-একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল সে কথা বলি। বিনাবিচারে শতশত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইঁহারা ভারত-শাসনের তকমাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন-কি, আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই, গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে দুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই ‘একস্ট্রীমিজ্‌ম্’ বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, ‘একস্ট্রীমিজ্‌ম্’ গবর্মেন্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেল্‌জিয়ামের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো ‘একস্ট্রীমিজ্‌ম্’ কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে ‘শর্টকাট্’ বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। ‘লে আও, উস্‌কো শির লে আও’ এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহংকার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিলটারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষও পক্ষপাত-পরিশূন্য করিয়া সভ্য-সমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে

স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরও লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই এ কথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌টিক্ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্—বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরু-মশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে ধর্মের জোরে গুরুমশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও এ কথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে,

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়। তাই বলিতেছি, গুরুমশায়দের কাছে আমাদের ধর্মবুদ্ধিরও যে এত বড়ো পরাভব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগ-সঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য এক-এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্মাণ করিবে; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এ দেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল। দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়—এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে-দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদ-লাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না। এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে; আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তার পর পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা

নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বলমাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোটো-ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিংবা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এইরকমের দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ; আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ-ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিমকালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে একপ্রান্ত হইতে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নীচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন-সকল ছেলেকে সন্দেহমাত্রের 'পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মতো পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মতো মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি। এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার খেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে—বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।

আর-একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনোকালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুলমাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা করিতে পারিত। পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলা-স্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর বেশি কিছু করিবার দরকার নাই; উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন-কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্ণ দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলাদেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গনি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।

যে অধ্যক্ষদের 'পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের ভার তাঁরা তো রক্তমাংসের মানুষ; তাঁরা তো রাগদ্বেষবিবর্জিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্প প্রমাণেই ছায়াকে বস্তু বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই তখন তাঁদের

ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিশ্বাস করাটাই তাঁদের স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাসমাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরাপদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়—কেননা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারি পাশের লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, আর পিছনে ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত সেখানে কার্যপ্রণালী যদি গুপ্ত এবং বিচারপ্রণালী যদি বিমুখ হয় তবে সেই ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ধর্ম রক্ষিত হইতেছে এ কথা কি আমাদের ছোটো-ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই যে, কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ দেখিয়াছি, জর্মানিও এই বিশ্বাসের জোরে ইন্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়াধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ জিতিবার নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জর্মানিতে আজ বড়ো-জর্মানের চেয়ে ছোটো-জর্মানের প্রভাব বড়ো হইয়াছে, যে-জর্মান কাজ করিবার যন্ত্র এবং যুদ্ধ করিবার কায়দামাত্র। আবার বলি, 'শির লে আও' বলিতে পারিলে রাজকার্য উদ্ধার হইতে পারে, যে-রাজকার্য উপস্থিতের কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে, যে-রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্য ইংলন্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির ব্যভিচারেই জর্মানির প্রতি মহৎ ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ইংরেজ যুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্মদৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্বল বা কলুষিত না হয় আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন-উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরমসত্যকে আমি কোনো বড়ো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্‌ঝে ও ট্রীট্‌স্কের ইংরেজ ও এ-দেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক; আমাদের বর্তমানের ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারি দিকে সংকীর্ণ; আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিবিকাশের উৎসাহ ক্ষীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত; বড়ো বড়ো উদ্ধত পদমান ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতায় কৃশ ও খর্ব হইয়া আমরা যে-ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাটে হাটে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ; অথচ সেই খর্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মতো গুল্মের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে। এই অবস্থায় যে-অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই কারণেই ভয়দ্বেষবিবর্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এ দেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না। তবু আমার বিশ্বাস, এই-সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। কেননা, বাধা দুরূহ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সামনে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না—এমন-কি, আমাদের দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয়। আমাদের এই স্বভাব সম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে। কিন্তু এক-এক সময়ে এমন দুর্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে। কেননা, রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়। আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে-দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে-দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই-সমস্ত দুশ্চিন্তার

দুঃখে এই শিশু-দুটিকেও পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলে-দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না— কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই-সকল লোকের বিদ্রূপহাস্যকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চকমকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে; এমনি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে-বোমাগুলো আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatants বলিবে না।

যদি জিজ্ঞাসা কর এই দুষ্ট সমস্যার মূল কোথায়, তবে বলিতেই হইবে স্বাধীন শাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর, এমন-কি, চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন, এ কথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তার পরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই— এত বড়ো মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতেই পারে না। তার পরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে সতর্ক সন্দিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে দেশের যে-সব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অবৈতনিক গুপ্তচরবৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিষাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ংকর অর্ধসত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড়ো জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিসের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপি চুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে-ঝাড়ে ঘোরা— আর কিছু নয়, এই যে অবিরত পুলিসের সঙ্গ করা— এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে-শাসনকর্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদারুণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য আমাদের ঘরে যখন মা কাঁদিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ; যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু দুঃখের সৎচেষ্টাগুলি সি. আই. ডি.-র বাঁকা ইশারামাত্রে চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে; তখন অপর পক্ষের কোনো মানুষের ডিনারের ক্ষুধা বা নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এই-সব মানুষই যেখানে ষোলোআনা মানুষ, সেখানে আপিসের শুকনো পার্চমেন্টের নীচে হইতে তাদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্বত্রই সেই কর্তাদের বোঝায় যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্বজাল বিস্তার করে। স্বাধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। অধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও ফাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে মাথা তুলিবার জন্য ফাঁকের দরবার করি, তখন ইহাদের ছোটোবড়ো শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে, তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি— ফাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়। তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি; কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্যন্ত সঙিনের আগায় সিধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয় এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কী। না, শাসনপ্রণালী যেমনি হোক আর যারই হোক, দেশের লোকের সঙ্গে

দেশের শাসনতন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঔদাসীন্য বিতৃষ্ণায় পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে যাঁরা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিদ্বেষে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্যা কেবলই জটিলতর হইতে থাকে।

বর্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এ-দেশে আসিয়াছেন। যে-কালের যাহা সব চেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। যাঁরা সেই সম্পদের বাহন, তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া কৃপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁরা যে-আগুন বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে, কেননা এ দানে তাঁহারা উপলক্ষ, এ দান এখনকার যুগের দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক শুক্লপক্ষের দিকে তাঁরা যে-সত্যকে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণপক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক অংশকে তাঁরা আর-এক অংশ দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড়ো-ইংরেজকে ছোটো-ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখ-দুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনি ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্য ঠোকর খাইয়া উল্টাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানবসম্বন্ধ নাই; তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না; পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে, 'never the twain shall meet'; এতবড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনোই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকা পতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, তারও তো পালা অনেক যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি; যে-অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম, অন্যকে কেবলই তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; আমরাও 'স্বধর্ম' বলিয়া একটা বড়ো নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাঁধন দিয়াও এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেবদ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বল এইখানেই, কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতি পদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো-ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের

উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরেও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। একতরফা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সংগে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের শক্তিকে ত্যাগের শক্তিকে ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৪

বাতায়নিকের পত্র

এক দিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আর-এক দিকে আমাদের কর্মসংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এইজন্যে জগতের সংগে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কমতি প'ড়ে কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারোমাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে, দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেননা বিশ্বটা সত্য। সত্যের সংগে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে, তবু অন্য সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অন্যমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বদ্ধ আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা খাতা বন্ধ করে বলে ওঠে, বিশ্বকে আমরা চাই, নইলে আর বাঁচি নে।

কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটোনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হল কেন বলি। তোমরা সবাই জানো, পুরাকালে একসময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলুম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল বিশ্বজগতের সংগে। তার পরে কিছুকাল থেকে সেই আমার প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃতকর্মের বকেয়া শোধে লেগে গিয়েছিলুম। অর্থাৎ এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হল সংসারের সংগে। অথচ তখনকার সংগে এখনকার দিনের যে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্ছে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দু নৌকোয় পা দেয় না; সে যখন একটা নৌকোয় থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে।

এমন সময় আমার শরীর অসুস্থ হল। সংসারের কাছ থেকে কিছুদিনের মতো ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পুব দিকের প্রান্তে খোলা জানালার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। দুটো দিন না-যেতেই দেখা গেল অনেক দূরে এসে পড়েছি, রেলভাড়া দিয়েও এতদূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথ-খরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের

পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে— মাঝে মাঝে লিখব। মুশকিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। আরও একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাত হাল্কা হওয়া উচিত—লেখনীর পক্ষে সেই হাল্কা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না; কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয় আমি অত্যন্ত দরকারী; আমাকে না হলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনেয় খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহংকারটা সকলের সেরা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে—বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান বলে গণ্য করে। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই, লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে করে এতদিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলেছে, 'এইখানেই বাস্‌ করো, একটু থামো।' আমি বলেছি, 'আমি থামলে চলে কই।' ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেছে; না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারও অভাবে, কারও শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা এক পল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখি নে। 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পৌঁচেছি কেবলমাত্র ঐ ডেস্কের থেকে এই জানলার ধারটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি বা মানি, মন মানে না। আমি থাকলেও যা আমি গেলেও তা, এইটেই যদি সত্য হবে তবে আমার অহংকার এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বে কোথাও স্থান পেলে কী করে। তার টিঁকে থাকবার জোর কিসের উপরে। দেশকাল জুড়ে আয়োজনের তো অন্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হলে চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমি আছি।

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি ততক্ষণ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিঁকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিঁকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক, এই মূল্য তো কোনো-একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো-এক জায়গায় আছে; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম-ইচ্ছার গৌরবই আমার অহংকারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতিক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের খেয়াল, কেউ বলেছে এ হচ্ছে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেছে, এ হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলুম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না, প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে-যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে

আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উল্টো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা— অর্থাৎ তার সসীমতা। মানুষের ইতিহাসে যত-কিছু দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অন্যের সীমানা কাড়তে হয়। অতএব শক্তির অহংকার যেহেতু আয়তন বিস্তারেরই অহংকার, সেইজন্যে এই দিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দূরবীন কষলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শান্তির কূল কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না। বেড়ে চলবার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তত্ত্ব পথ আগলে। দেখি কেবলই গতি নয়, যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অন্ধ অহংকারে অতিক্রম করতে যায় তখনি তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যে মানুষ বলেছে, অতি দর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখছি, শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্ছে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে এঁকে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই-না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতিবড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিসপত্র বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে এই অঙ্ক-কষার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনি মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্! বহু, বহু, বহু, সব বহুকে জুড়ে জুড়েও, অঙ্কের পর অঙ্ক যোগ করে করেও তবু তো অমৃতে গিয়ে পৌঁছনো যায় না। শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হল হুংকার আর শব্দকে সুর দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেইটেই হল সংগীত; ঐ হুংকারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়, আর সংগীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহংকারের স্রোত নিজের উল্টো দিকে, উৎসর্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলই সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যেই শান্তি। কোনো বাহ্যব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত

করার দ্বারা. কখনোই সেই শান্তি পাওয়া যাবে না যে-শান্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে-শান্তি অলোভে, যে-শান্তি সংযমে, যে-শান্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম—আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে। শক্তিময়ের শক্তিতে, না, আনন্দময়ের আনন্দে?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য বলে বরণ করি তা হলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন বলে মানতেই হবে। য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, শান্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, দুর্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ; বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না; শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়—অতএব ভীরু ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম বলে নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্যদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে :

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

ঐশ্বর্যগর্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না—যে ক্রূর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপসুরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্তি নয়; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্-কন্ফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্লক্ করছে।

অপর পক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভবগানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্মের নাম করেই একদল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীরুতা; বলছি, যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ, দুইয়েরই সুর এক জায়গায় এসে মেলে। ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে—সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো জোর নয়।

এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি, শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না—তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক, যে-অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয়; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে; বলতে পারে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন, এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত—যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শান্ত হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে-শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করি।

২

কারও উঠোন চষে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য। কেননা উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেছে, যেটাকে বলে ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক দুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিসকে ভিতরের করে আপনার করে না তুললে তাকে পেয়েও না পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিস করে তোলে; ঐখানে সূর্যের আলো তার ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের খেত বানিয়ে তোলা যায়, তা হলে যে-বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব, তারই বাসা ভেঙে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড়ো করে রাখতে পারে। যে-সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে ধনী আপনার ঘর বোঝাই করে তার দাম খুব বেশি, কিন্তু যে-ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তার বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্ছে সব চেয়ে দামী। সদাগরের দোকানঘর জিনিসপত্রে ঠাসা; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর কৃপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগরের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকল দিকেই প্রয়োজনকে ধিক্‌কার করে ফাঁকটাকেই বেশি আদর দিয়েছে, আর বাগানের তো কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিনতে পায়। তার ঐশ্বর্যের প্রধান লক্ষণ এই যে, লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চষতে পারে না।

আর-একটা ফাঁকা, যেটা সব চেয়ে দামী, সে হচ্ছে মনের ফাঁকা। যা-কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে দুশ্চিন্তা। গরিবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁকড়ে থাকে, অশথগাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে-রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিসটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্ছে শারীরচৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক দেখি বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা, অমনি শারীরচৈতন্যের ফাঁক বুজে যায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভরে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায়, দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা, চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো করে ভাবতে পারে না; সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়। সেই ছোটো-সত্য মিটমিটে আলোর মতো ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জানলার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জানলার ফাঁক গেছে বুজে; জীবনের এ-কোণে ও-কোণে একটু-আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাঁটাগাছে ভরে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপকার সব চেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখছিল, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট হল। আজকের দিনের ভারতবাসীর আর ছুটি নেই; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনি এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে

দুর্বলের কান্না; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ংকর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর-কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জয়। পালোয়ান আজ জল স্থল আকাশ সর্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণহৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি, তখনো যদি দেখা যায় এতবড়ো বলবানেরও ভীরুতা ঘুচল না, তা হলে সেই ভীরুতার কারণটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এইজন্যে যে, য়ুরোপে আজকের যে-শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে সেই শান্তি টেঁকসই হবে কি না সেটা বিচার করতে হলে এই-সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির শর্তভঙ্গ, অস্ত্রাদিপ্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ-পক্ষ 'ক্রাইম' অর্থাৎ অপরাধ বলে অভিযোগ করেছিলেন। মানুষ 'ক্রাইম' কখন করে? যখন সে ধর্মের গরজের চেয়ে আর-কোনো একটা গরজকে প্রবল বলে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জর্মানি ন্যায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ-পক্ষ যখন সেজন্যে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জর্মানির পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্ছে না; হোক-না যুদ্ধ, তাই বলে কি আইন নেই, ধর্ম নেই। আর যখন বিজিতপ্রদেশে জর্মানি লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে দয়াবোধ করে নি তখন আশু প্রয়োজনের দিক থেকে জর্মানির পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ-পক্ষে বলেছিল, আশু প্রয়োজন-সাধনাটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব। সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই। সেই দায়িত্বরক্ষার চেয়ে যারা উপস্থিত কাজ-উদ্ধারকেই বড়ো মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে।

ধর্মের দিক থেকে এ-সকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা পরিবর্তনে কখনোই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশানবৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনের আশু মৃত্যুতে মন যখন দুর্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তায় মন যখন দুর্বল তখনকার ধর্মবাক্যকে ষোলো-আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ-পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথা-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হল না, মন বদল হয় নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোন্‌খানে। লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্যেই অতিবড়ো বলিষ্ঠের ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানি লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্মের দোহাই মিথ্যে। সেখানে অন্যায়কে কর্তব্য বলে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না; সেখানে দোষের বিচার দোষের পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ংকর লোভের দিনে সবলকে সবল যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চতানের ধর্মের দোহাই দিয়ে রফারফির কথা হতে থাকে, তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল এতটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উত্তেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না, তখন আইনের মধ্যে বড়ো বড়ো ছিদ্র খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাত আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-একদিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে। যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট—এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে-ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শান্তি টিঁকতে পারে না।

জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখছেন :

It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung-chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i.e, the right of trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France. . . . He did not burn Verseilles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee.

No indeed! Monsieur Edmond Thery himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he foresee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to possess our virtues? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China organised by Japan, threaten us in all the markets of Europe, with a competition frightful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end.

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্যে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই নীচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্-কন্‌ফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। কর্মিক-ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, একরাজ্য-অন্যরাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ,

আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপসনিষ্পত্তির যোগে শান্তিকামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকা বাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে-জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে, নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে; হঠাৎ একদিন ভরাডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায় আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ ফাঁকটুকু পর্যন্ত বন্ধ, যে-আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

৩

অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয়।

একটা উপমা দেওয়া যাক। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্মল দূরত্বের সংগীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনর্বার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মতো মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা ঘটে।

কিন্তু এমন-সকল মরুপ্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নীচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায়, কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির শুভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়। সেখানে বর্ষণমুখরিত রসের উৎসব হল না। সেখানে মনের মধ্যে চিরবিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।

এ তো গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিশুদ্ধতা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর নানা আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখনি এই-সব কাণ্ড ঘটে। তখন আকাশের বাণীও নির্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্যোগ ঘটেছে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামছে। নির্মল ধারায় পুণ্যস্নানের জন্যে অনেক দিনের যে-প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে কাদা লাগছে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়ছে; বার বার কত আর মুছব।

রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে। ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে তারা শান্তি চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবলপক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করি। তিনি চীনদেশের সঙ্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ আলোচনা উপলক্ষে লিখছেন :

> In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility. ...In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves.

পীকিনে যে ভাঙচুর, লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা-পাওয়া এবং লজ্জা-দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে রাখে দুর্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়— বলে, ভালোমন্দর বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে-একটা নিরন্তর লড়াই চলছে অমুক-অমুক চৌহদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঢিল দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও এ কাজ করেছি, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা, না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।

যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ংকর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নীচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নীচের দিকের টান ততই ভয়ংকর। যে-মাটি বাধা দেয় না, তাকে পদাঘাত যত জোরেই করবে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘটবে।

যে-জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্যে য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ন্যায়পরতার য়ুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখবার প্রেরণা দুর্বল। এবং আশ্চর্য এই যে, সেই ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। এইটেই হচ্ছে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এতদূর পর্যন্ত যায় যে, এক-এক সময়ে তার কাণ্ড দেখে বড়ো দুঃখেও হাসি আসে। য়ুরোপের সুঁড়িখানা থেকে পোলিটিক্যাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের তো অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করছে তারা আমাদের কলুষের ভার আরও দুর্বহ করে তুলছে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা এই-সমস্ত পোলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করে বলে বসলেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্মবুদ্ধি য়ুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র : তিনি বলেন, বাঙালি জানে, খুন করা আর-কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আর-এক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র।[১] যে-পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালি ছাত্র এই-সমস্ত অপকর্ম শিখেছে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার! পলিটিক্সের হাটে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কী রকম ভয়ংকর সস্তা করে তুলেছেন, সেটা বোধ হয় অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন না বাইরের লোকে যেমন দেখতে পায়। এই-সব পলিটিক্স-বিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই। তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বের শিক্ষাটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেছে, এ কথা তাঁরাও ভুললেন?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা, এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধকে গোড়া ঘেঁষে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে-নিয়ম ওদের সম্বন্ধে সে-নিয়ম চলতেই পারে না বলে তারা নিজের ধর্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে; অন্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখতে চায়। যতদিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েছে ততদিন থেকেই এই-সব বুলির উৎপত্তি। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্যায় করা সহজ, তাদের সম্বন্ধে অন্যায় করতে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে সেইজন্যে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখতে চায়।

আমি পূর্বেই বলেছি, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ংকর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এতরকমের সংগত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্ছি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্তিমান, এবং যেটা অসংগত সেটা তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্তে ধরা পড়ে; পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনোদিন ঘটে নি। চীনেদের কথাই চলছে :

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its

---

[১] ১৯১২ খৃস্টাব্দে বৃটিশ দ্বীপে প্রতি লক্ষ লোকে ·১৭ অংশ লোকের খুনের অভিযোগে বিচার হয়েছিল। ১৯১১ খৃস্টাব্দে বাংলা দেশে প্রতি লক্ষ লোকে ·০৮ অংশ লোকের খুনের চার্জে বিচার হয়েছিল। হাতের কাছে বই না থাকাতে সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারলাম না।

young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. 'I was powerless,' says Mr. Du Chaillu, 'to correct its evil nature.'

তাই বলছি, সবলের সব চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে দুর্বলের কাছে। দুর্বল তার ধর্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পায় না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বেড়ে উঠছে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্বলকে শাসন করা ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আসছে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাঁধা যে, এর জালে যে-বেচারা পড়েছে কোথাও কোনোকালে এতটুকু ফাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটছে না, কেননা লোভ যে ভীরু, সে অতিবড়ো শক্তিমানকেও নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে, শাসনের ইস্ক্রু-কলে এমনি কষে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ করে ফেলে যারা সেই শাসনের ভার নিচ্ছে, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতিসহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্ছে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখছে না।

এই তো প্রবলপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এ-সব কথা বেশি করে আলোচনা করতে বড়ো লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মতো, কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। এক দিকে ভয় আর-এক দিকে কান্না, দুর্বলের এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের করতেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা করব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুলব না।

দুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্বলে মরব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না এটা হলেই সব চেয়ে বড়ো লোকসান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করো, ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যই তত বড়ো। বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি। ও অভিভূত করতে পারে কিন্তু শক্তি দান করতে পারে কি। আজ প্রায় দু-হাজার বছর আগে সামান্য একদল জাল-জীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয় নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কাকে। আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ। আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

৪

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর-এক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তা হলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন

দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উল্টো। এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এইরকম— বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিঁকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাত ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু য়ুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের পান-সভার বুলি। যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল। যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল। কখন। যখন—

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল আছে ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।

শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে-চরণে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্ছে না কি। য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পুজো করছেন; মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতো টক্‌টক্‌ করছে; খাঁড়া শাণিত; বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা

কেউ কেউ বলছেন, আমরা যিশুকে মানি নে, আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিলন দিয়ে বলছেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ, একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আর-এক দল পুল্‌পিটে চড়ে।

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাত।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী। ঐ দেখো-না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো; কিন্তু হল কী। হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে—মা মা মা!

যখন মোগলপাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তা হলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদসদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয় নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারি দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে আমার পূজা আদায় করবই। নইলে? নইলে আমার প্রেস্টিজ যায়। ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট করে। যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড়ো বলে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।

আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পুজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পুজো করব? সে চলবে না; কেননা পুজো করতে হবে ধর্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে দিক গে। কিন্তু হারিয়ে দেবে? কিছুতে না। মরার বাড়া গাল নেই; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তা হলে তার চেয়ে সর্বনেশে মৃত্যু আর নেই।

মহান্তং বিভুম্‌ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

৫

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড়ো ধাক্কা খেয়েছে এমন আর কোনোদিনই খায় নি। তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বহু কৌশলে ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক-একটা এঞ্জিনের পিছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েছে। তার পরে ওর পথ চলেছে জগৎ জুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি। কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল, যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারল, তা হলে সেই দুর্যোগে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কায় ঘটেছে, কী মাল কী সওয়ারি নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। তাই চারি দিকে প্রশ্ন উঠেছে, এ কী হল, কেমন করে হল, কী করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না। তখন শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব। নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না?

আমি পূর্বেও আভাস দিয়েছি এখনো বলছি দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাই নে সেখানে আমাদের ব্যথা পেঁছয় না; মাটির উপর যে-সব পোকামাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি কিন্তু যদি সামনে একটা পাখি এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারি নে। পাখির সম্বন্ধে যে-বিচার করি পিঁপড়ের সম্বন্ধে সে-বিচার করি নে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্তব্য তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয় মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেননা, যেখানেই আমরা মানুষকে বড়ো দেখি সেখানেই আপনাকে বড়ো বলে চিনতে পারি— এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড়ো রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।

প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো ক'রে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারই সামনে আসুক, তার চোখে সে পড়বেই, কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতেই হবে। তাকে বিচার করবার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবি তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে-জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে-জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এইজন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কী হয়েছে। আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে

নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজের হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি, তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চালচলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তা হলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এই-সব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানবসভায় স্বভাবতই জোরগলায় সম্মান দাবি করতে না পারে, যখন তারা এত সংকুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম বলে গ্রহণ করব না।

আমরা নিজেরা সমাজে যে-অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়।

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না। এ কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দরবার করতে থাকব এমন কথা বলি কোন্ মুখে। আর যদি আমাদের দরবার মঞ্জুর হয়? যদি আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তা হলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না।

আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্মবুদ্ধিতে যখন অন্যপক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তা হলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি করবে না বরং বাড়াবে। কিন্তু সেখানেও কি আমরা বলব ধর্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে বড়ো হয়ে থাকো; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে-রকম ব্যবহার করবার আশা করি নে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই করো? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড়ো করে তোলো। সমস্ত বরাতই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরও বেশি নিকৃষ্ট নয়।

অল্পকাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দুমুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন-কি, সেই আহারে হিন্দুমুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্মের দাবি নিজের উপরে তাঁদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে

পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনোমতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে, বিরুদ্ধপক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো-আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সংগত কারণ নির্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি— সে ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে বলে মানতে অভ্যাস করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখদুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে এ কথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি করে যে-দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে-দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে-দেশে এই-সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোটো এবং অপমানিত করে রাখে সেখানে তার কোনো দাবি স্বভাবত কারও মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেইজন্যে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অন্যায়, ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানবস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ংকর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র এক দিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চার দিকে বেড়ে ধরেছে, আর-এক দিকে, যে-বুদ্ধি যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে সেই যুক্তিকে একেবারে নির্মূল করে কেটে দিয়েছে। তার পরে অন্য দিকে অতি লঘু ত্রুটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। এক দিকে মূঢ়তার ভারে অন্য দিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত করে জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার পরে? তার পরে ভিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না। এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তা হলে সকল প্রকার মারের চেয়ে অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড়ো দুর্গতির কারণ হবে। নিজেকে আমরা নিজে ছোটো করে রাখব, আর অন্যে আমাদের বড়ো অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনি জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু এ কথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ,

খোলের জল সেঁচে ফেলা। এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বৈ মন্দ নয়— কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শক্তিপূজা

'বাতায়নিকের পত্রে' আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃংখল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন-কি, রাজ-সভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গল-কাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়-বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সব চেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে-সময়ে কবিকংকণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে-সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থান-পতন বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হত। তখন চারি দিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্‌দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে-ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমত স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক এ কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্য-ভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।

খৃস্টধর্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাই। য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদিজাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড্ টেস্টামেন্ট্ পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখৃস্টের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজও

তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগাভাগির দেবতা, সাম্প্রদায়িক দেবতা। অখৃস্টানের প্রতি খৃস্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর-কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার— এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই ‘শক্তি’ শব্দের সাধারণ যে-অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরও একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন-কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। এক দিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে-পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে— অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন-সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে— সে-সম্বন্ধে আমার যা বলবার অন্যত্র বলেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে— ‘বাতায়নিকের পত্রে’ আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন-কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

কার্তিক ১৩২৬

সত্যের আহ্বান

পরাসক্ত কীট বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ করে বাঁচে; খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র তাদের বিকল হয়ে যায়; এমনি করে শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণীলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে। মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে। কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বলতে কেবল যে পরের প্রতি জড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয়। চিরদিন যা চলে আসছে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়, প্রচলিতের স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত। কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর, সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুদ্যম হয়ে ওঠে এবং মানুষের ’পরে অসাধ্যসাধন করবার যে-ভার আছে সে সিদ্ধ হয় না।

এই হিসাবে জন্তুরা এ জগতে পরাসক্ত। তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে। তারা

প্রাকৃতিক নির্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগোয় বা পিছোয়। এইজন্যেই তাদের অন্তঃকরণটা বাড়তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁত-মতো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানা দিকে মেলে দিতে পারছে না। এই-সকল জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখতে পাই। সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায়, পাছে নিজে চলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসে—এই ভয়ে এদের অন্তরের চলৎশক্তিকে ছেঁটে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল—আমি অসাধ্য সাধন করব। অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে। সেইজন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চারি দিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল, তখন সে হরিণের মতো পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মতো লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে—চকমকি পাথর কেটে কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে। যেহেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান এইজন্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'পরেই এই নখদন্তের পরিবর্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অন্তঃকরণের সৃষ্টি; এইজন্যে সেই পাথরের বর্শাফলকের 'পরেই সে ভর করে রইল না, তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয় মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান করছে; যা তার চারি দিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই, যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আনছে। পাথর আছে তার সামনে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; লোহা আছে মাটির নীচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়, পাথরকে ঘষে-মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে যা সব চেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সব চেয়ে অনুগত করে তুললে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্মই হচ্ছে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ; সে কেবলই উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনো একদল মানুষ যদি বলে, 'এই পাথরের ফলা আমাদের বাপ-পিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা-কিছু করতে যাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে,' তা হলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে; তা হলে যাকে তারা জাতরক্ষা বলে তা হতে পারে, কিন্তু তাদের সব চেয়ে যে বড়ো জাত মনুষ্যজাত সেইখানে তাদের কৌলীন্য মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয় নি মানুষ তাদের জাতে ঠেলেছে, তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের জিন-লাগামের টানে চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে; তারা অন্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্য-সাধন করতে হবে; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাকবে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে; তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন 'সাধনা' কাগজে আমি লিখছিলুম, তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা; বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি

বলেছিলেম, অধিকার-বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে ‘আবেদন আর নিবেদনের থালা’। তার পরে যখন আমার হাতে ‘বঙ্গদর্শন’ এসেছিল তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টরের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যেহেতু ইংরেজ সরকারের ’পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জনের মূলে, সেইজন্যে সেই দিন এই কথা বলতে হয়েছিল ‘এহ বাহ্য’। এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া। মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড়ো দেখায় যতক্ষণ রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ— তাকে চাই নে বললেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আর চাই বললে তো কথাই নেই। মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো, বাইরের দিক থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে। সত্য আলোর মতো, তার শিখাটা জ্বলবামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছেন : স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা, তাকে না-এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না, উপস্থিতমত তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আর-একটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না-কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনি আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে বহুকাল পূর্বে ‘স্বদেশী সমাজ’ নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ, ইংরেজ-রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা

আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন : ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এইজন্যই দেশ আমার প্রিয়— এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন-কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর-কারও মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই-সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ; প্রথম— ক্রোধ, দ্বিতীয়— লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল— আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে। এই-সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন। কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।' তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল যে, 'উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম ক'রে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ করে দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না।' যাই হোক সেদিন ঠিক যে সময়ে বাঙালি কিছুকালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব— হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবামাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোট কথা সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল, ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন, আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর-এক হাত তার পায়ে। অর্থাৎ কোনো হাতই বাকি ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্তী কালে এই দ্বিধা হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর-এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্ছে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার হাঁ-ই বল আর না-ই বল দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

সেদিন চারি দিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে— সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এতবড়ো একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়াবেগ, আর-এক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করে নি; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এইজন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাদুমন্ত্র আওড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অন্তঃকরণের জড়তায় যে ক্ষতি সে ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কোনোমতে যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, ও জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না এ কথা খুব জোরের সঙ্গে সে-মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি অথচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চিৎকার করতে থাকে যেন তার সর্বস্বান্ত করা হল।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা— পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না, মাঝের থেকে পা-দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে-জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই জিনিসও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ডক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন, অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ করে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে, এর পিছনে দেশ ব'লে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আর-এক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি-করাত এবং কলকব্জা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরও এমন দেশ আমরা দেখেছি, সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টানতে থাকে তখন তার ঝড়্‌ঝড়্‌ খড়্‌খড়্‌ শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি-দড়া দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে দিন

কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক আর মন্দ হোক, স্ক্রু আলগা হোক আর চাকা বাঁকা হোক, এ গাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে জিনিসটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোনো-একটা প্রবৃত্তির বাহ্যবন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়— কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে। এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিস। অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সব চেয়ে দরকার নয়। যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা পড়ে কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা-সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্‌বোধিত হয় না, অভিভূত হয়, এ কাজের পক্ষে তা অন্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো-একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্বেই বলেছি মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না। তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে— সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি, তুমি চিন্তা কোরো না, কর্ম করো, তা হলে যে মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে মানবমনের সর্বোচ্চ অধিকার অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি। বলেছি, আমরা সমুদ্রপারে যাব না, কেননা মনুতে তার নিষেধ; মুসলমানের পাশে বসে খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী। অর্থাৎ যে প্রণালীতে চললে মানুষের মন বলে জিনিসের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাসনিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো-আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর করে চলে তার যেরকম পঙ্গুতা, যারা বাহ্য আচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেইরকম। কেননা পূর্বেই বলেছি অন্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানাঘরে সে তৈরি; এইজন্যে এক চালকের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আর-এক চালকের হাতে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনর্শিয়া বলে, যে মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা বলে অভিমান করে তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন, উভয়েই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের যে জড়ত্ব সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মতো বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক্‌ গ্লাড্‌স্টোন ম্যাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয়

করে আর কে দেখেছে। আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরী দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি; কিন্তু চাতুরী হচ্ছে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়োখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্‌বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়— এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া— ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ— কোনো না-এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই-যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি— প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে— অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারে নি— সমুদ্রমরুপারেও যে দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে উদ্ঘাটন করেছে। আজকের দিনের কোনো বণিক কোনো সৈনিক এ কাজ করতে পারে নি; তারা পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে। কেন। কেননা, লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চেষ্টা করে তখন সে জবর্দস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে। বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ করেছি— সেদিন গরিবদের আমরা ত্যাগদুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেছি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানাপ্রকারে চাপ দিয়ে। তার কারণ, লোভ অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ফললাভের চেষ্টা করে; প্রেমের যে ফল সে একদিনের নয়, অল্পদিনের জন্যও নয়, সে ফলের সার্থকতা আপনার মধ্যেই।

এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে— সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে, অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে ওঠে। কোনো একটি খবরের কাগজে একদিন কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে একটুখানি আপত্তির আভাস-

মাত্র প্রকাশ পেয়েছিল; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুললে। যে আগুনে কাপড় পুড়েছে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়তে কতক্ষণ। দেখতে পাচ্ছি এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আর-এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা। আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এইরূপে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' এটা যে ভারতের কথা সে ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরও মুশকিল এই যে, যে লাভের দাবি করা হচ্ছে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট হলে সে যেমন অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, লোভের বিষয়টা অস্পষ্ট হলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়—কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে পারে। জিজ্ঞাসা দ্বারা তাকে চেপে ধরতে গেলে সে এক আড়াল থেকে আর-এক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে এক দিকে লোভের লক্ষ্যটাকে অনির্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড়ো করে তোলা হয়েছে, অন্য দিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তার পরে যখন তাকে বলা হয়, তোমার বুদ্ধিবিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত দাও ছাই করে, কেবল থাক্ তোমার বাধ্যতা, তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে এ কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না। এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করি নে। কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তা হলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হলে ফল হল কী। প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কন্‌গ্রেস প্রভৃতি কোনোরকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস করব না। উদ্‌বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জন দিয়ে বসব?

মনে করো আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হল না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজগার করে যথেষ্ট, কিন্তু, তাদের বাহাদুরিতে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি তাঁর তারে দুটি-চারটি মীড় লাগাবামাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এতদিন যে পাথর চাপা ছিল সেটা যেন এক মুহূর্তে গেল গলে। এর কারণ কী। এই ওস্তাদের মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিস, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতি সহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাঁকে ওস্তাদ বলে মানলুম। তার পর আমার দরকার হল একটি বীণা তৈরি করানো। কিন্তু এই বীণা তৈরির বিদ্যায় যে সত্যের দরকার সে আর-এক জাতের সত্য। তার মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তুতত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া করে হঠাৎ বলে বসেন, 'বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝংকার দাও; তা হলে অমুক মাসের অমুক তারিখে এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজতে থাকবে,' তবে সে কথা খাটবে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। এ কথা তাঁর বলাই চাই, 'এ-সব জিনিস সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।' তিনিই তো আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তর, এর রচনা প্রণালী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ত্রুটি হলে বেসুর বাজবে, অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্বক সযত্নে পালন করতে হবে। দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদজির বীণা বাজানো— এই বিদ্যায় প্রেম যে কত বড়ো সত্য জিনিস সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ করে শিখে নিতে বসেছি. এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌। কিন্তু স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়। এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে। সকল ডাকে তো দেশ সাড়া দেয় না, পূর্বে তো বারংবার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্যে আজ পর্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারে নি বলেই তো এতদিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এতকাল অপেক্ষা করে আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিকে নিযুক্ত করে দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্‌।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা॥

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনো বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না, কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্বতঃ

স্বাহা— তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা— তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'। এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক। বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই-যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দীদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা কাটা এক দিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স্ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে; তার সেই জয়পতাকা আজও মানবসভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে। য়ুরোপে সৈনিকাবাসে কারখানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন করছে না কি— লোভের বশে উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে ছেঁটে দিচ্ছে না কি। আর এইজন্যেই কি য়ুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠছে না। বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকার দ্বারাও। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে— মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশি জন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের সুতা কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা দরকার। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে পরিমাণ জীবিকা অর্জন করে সুতাকাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন করবে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারও মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না, আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাই নে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই-বা অল্পকালের জন্যে। যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়। স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা, স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজসৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয় নি— সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্ত। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন

চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়। যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তা হলে আশু প্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে, অন্য সকল রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে যাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো-না-কোনো কর্তার আসন পড়বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে বসে আছে, আগায় জল ঢেলে কোনো ফল হবে না। এ কথা মানছি, আমাদের দেশে দৈববাণী, দৈব ঔষধ, বাহ্যব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি— কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের দেশে স্বরাজের ভিতপত্তন করতে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে। কেননা, আমার পূর্বের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধিভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা করতে পারবে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে পারে— যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত করতে চায় না। এই-যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো চলছে, কোন্‌ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে। সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়। কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ-সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে; বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেননা এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো। অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা— অর্থের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় বলেই যে তা নয়। হোক বা না হোক, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল— এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটেই অধর্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেই দুঃখ আছে— জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিত বাঁকা হয়, সাঁকো নির্মাণে এমন গলদ ঘটে যে, তার উপর রেলগাড়ি চললে ভয়ংকর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন ধর্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে খাতায় জিয়োমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র বলে সেই খাতা নষ্ট ক'রে এ ভুলের সংশোধন হয় না, জিয়োমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাস্টারমশায়ের মনে এ কথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি, তা হলে এরা ভুলকে ভুল বলে গণ্য করবে না। তা যদি সত্য হয়, তা হলে অন্য-সব কাজ ছেড়ে সকলপ্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন করতে হবে, তবেই এ ছেলেরা মানুষ হতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে— এক হুকুম থেকে আর-এক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই, ও কাপড় আমি পোড়াবার কে। যদি তারা বলে 'পোড়াও' তা হলে অন্তত আত্মঘাতীর 'পরেই আত্মহত্যার

ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ করবার ভার আমাদের উপর পড়ে না। যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবর্দস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বার বার বলেছি আবার বলব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড়-পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন করে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড় পরে আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরও বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস তাতে পরিমাণে ও পরিণামে আরও কঠিন হয়ে উঠবে না? এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত করছি নে, কেননা আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই করছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলি নে। কিন্তু সুবিধা এই যে, বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই—ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগান্তরের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী কাল হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কী রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল তখন এই কথাটা আর লুকোনো রইল না। হঠাৎ এক দিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত করে দেখবার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সামনে থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে—যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্ছে; এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাকলেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব করেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। মানুষের মধ্যে এই-যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্তন ঘটছে, তার চিত্ত সংকীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্ছে, তারই হাত এই ভারতরাষ্ট্রনীতি-পরিবর্তনের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে—স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ করবেই; তাই বলে এ কথা মনে করা অন্যায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা

এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেছি যে কপটতার মতো দুঃসাধ্য অতএব দুর্লভ জিনিস আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্ছে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্র্যের দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরী। আজকের দিনে পৃথিবীতে সর্বজনীন যে-সকল প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্র্যের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে অবস্থায় তাকে যদি তার অতীতযুগের দিক থেকে বিচার করি তা হলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে করব খাঁটি, কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বুঝব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করবার জন্যে। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। এই-যে লীগ অফ নেশন্‌স্‌-প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্ছে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি-বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে, এর চেষ্টা হচ্ছে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্‌বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার-অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক—কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিম দেশে এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখছি যারা এই সংকল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে। সেই-সব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেইরকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে, যেমন রোম্যাঁ রলাঁ—তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত। সেইরকম সন্ন্যাসী আমি য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেছি। দেখেছি য়ুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে; সর্বমানবের ঐক্যসাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্যমান। তারা ভাবী যুগের মহিমায় বর্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে চায়, সমস্ত অপমান বীর্যের সঙ্গে ক্ষমা করতে চায়। আর আমরাই কি কেবল যেমন ‘পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং’ তেমনি করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকব। আমরা কি

এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না—য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে সাদা কালো নেই; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি বহুধাশক্তির যোগে অনেক বর্ণের লোকের জন্য তাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বিধান করেছেন; আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন!

কার্তিক ১৩২৮

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ-বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালিতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্যে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করেও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক-এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেনসিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুমণ্ডলে ঝড় জিনিসটাকে আমরা দুর্যোগ বলেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা তো হল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ। আসল কথা, যে বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড়ো বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে। এ তো সহ্য হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়্‌গড়্ করে ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু হু-হু করে হুংকার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পঙ্‌ক্তিভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চলবার সম্বন্ধ তাদের মধ্যে ভেদ ঘটলেই তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ-যে অরণ্যটার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ-যে সমুদ্রটা পাগলামি করতে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্ত্যে এই রব উঠল, 'ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে।'

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তা হলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ। যতক্ষণ সেটা আছে ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন করবার চেষ্টা করে ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন কী চাই, সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারও কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারও প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না তা নয়, পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্‌সন্ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনি ফ্রাইডে এল তখনি তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল।

তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর-সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। এমন-কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি। কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়। যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সহজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হত, তা হলে তার সম্বন্ধে রবিন্‌সন ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসম্বন্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে— সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা-উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ ক'রে তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে— তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলই ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে। যে মুক্তিতে অহংকার দূর করে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য— এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেছে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, য়ুরোপ যখন বলেছে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজদেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল— সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ— নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলি-রূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজোবউ বলছেন যে তিনি স্বামীর মুখ দেখতে চান না, সন্তানদের দূরে রাখতে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, কিন্তু বড়োবউয়ের হাত থেকে ঘরকরনা নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘ'টে তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে এক দিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্য দিকে প্রজা, যদিচ একই জাতের মানুষ তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি

হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম সেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আর-একটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে, আর যারা মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে, দয়া ক'রে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল। ধনীর অনুগ্রহের ছিটেফোঁটায় সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।

বহুকাল হল ইংলন্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলন্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ মেটে নি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অস্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ করে সমস্যার সমাধান করেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভেদের দুঃখ থেকে, ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। এমন-কি, আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মূল কথাটা হচ্ছে ঐ—তাতে বলে, ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আর-এক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড়ো আর-এক পা ছোটো, সে আর-এক রকমের ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ; এই সবরকম ভেদই স্বাধীনশক্তিযোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে চালাতে গেলে তার বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঐ-যে পূর্বেই বলেছি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয় নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরও গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু সেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্বন্ধে ছড়ায় বলছে :

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।

তিন কন্যেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল—কিন্তু দ্বিতীয় কন্যেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না; অতএব উদর এবং আহার-সমস্যার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন—বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্যের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বহু শতাব্দী ধরে বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবি করেছেন, শেষে শিবঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন— নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আর-একজন পাত শূন্য করে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা ঘটে আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিবঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন সেটা সর্বাগ্রে দূর করে দেওয়া; আবদার করে বললেই হবে না যে, মেজোবউ যেমন করে খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে খাব।

আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে-পাশে চার দিকেই ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুশকিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী বলেই ফেলো। বলতে সংকোচ হচ্ছে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে বলবেন, ও তো সবাই জানে। এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু অনিদ্রা না বলে যদি ইন্‌সমনিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে যোলো টাকা ফি দেওয়া যোলো-আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি— ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন। যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক; যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়; তার তর্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়; যার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে, অন্য দেহটা জুতো জামা প'রে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের 'পরে নিজের ভুল যোগ করে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়তো বলে থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক্‌, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি

ঘটে উঠবে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্বনেশে; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই করে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজর্‌ল্যান্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! শুনে ভাবতুম, যাক, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল 'ভয় কী, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো' তখন সে সান্ত্বনা পায় নি; কেননা দুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুইজর্‌ল্যান্ডের লোকেরাও নেশন আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে সান্ত্বনাটা কী— ফলের বেলায় দেখি, আমরা ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনিতে করে জল এনে কলঙ্কভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনিটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্কভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। সুইজর্‌ল্যান্ডের ভেদ যতগুলোই থাক্‌, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়িতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ির মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। একবার এইরকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য করো কেন। সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, উয়ো তো বেনিয়াকী লড়্‌কী। 'বেনিয়াকী লড়্‌কী' হিন্দু আর যে-ব্যক্তি তার হরণ ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে তখন আপনাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্যে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমত চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এ-সব কথা শুনলে অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ বলে ওঠেন, আমাদের চার দিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ

বহু শতাব্দী ধরে বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবি করেছেন, শেষে শিবঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন—নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আর-একজন পাত শূন্য করে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা ঘটে আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিবঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন সেটা সর্বাগ্রে দূর করে দেওয়া; আবদার করে বললেই হবে না যে, মেজোবউ যেমন করে খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে খাব।

আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে-পাশে চার দিকেই ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুশকিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী বলেই ফেলো। বলতে সংকোচ হচ্ছে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে বলবেন, ও তো সবাই জানে। এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু অনিদ্রা না বলে যদি ইন্‌সমনিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো-আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি—ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন। যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক; যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়; তার তর্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়; যার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে, অন্য দেহটা জুতো জামা প'রে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের 'পরে নিজের ভুল যোগ করে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়তো বলে থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক্, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি

ঘটে উঠবে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্বনেশে; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই করে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজর্‌ল্যান্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! শুনে ভাবতুম, যাক, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল 'ভয় কী, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো' তখন সে সান্ত্বনা পায় নি; কেননা দুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুইজর্‌ল্যান্ডের লোকেরাও নেশন আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে সান্ত্বনাটা কী— ফলের বেলায় দেখি, আমরা ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনিতে করে জল এনে কলঙ্কভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনিটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্কভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। সুইজর্‌ল্যান্ডের ভেদ যতগুলোই থাক্, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়িতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ির মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। একবার এইরকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য করো কেন। সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, উয়ো তো বেনিয়াকী লড়্‌কী। 'বেনিয়াকী লড়্‌কী' হিন্দু আর যে-ব্যক্তি তার হরণ ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে তখন আপনাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্যে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমত চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এ-সব কথা শুনলে অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ বলে ওঠেন, আমাদের চার দিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ

তারই—ইতিপূর্বে আমরা হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি নির্বিরোধেই ছিলুম, কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি।—শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ করে সর্বনাশের পালা আরম্ভ করে দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্ছে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে লোনা জল সেঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখবার মতো নয়। যেদিন তুফান উঠল সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে। কাপ্তেন যদি বলে, যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্, তা হলে ঐ কাপ্তেনের মতো নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয় পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয় তা হলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে, তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসে নি। তারা ভয়ংকর বেগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাম্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করছি ততক্ষণ যথাসর্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগলে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন, কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুরও এতবড়ো আবদার তিনি শুনবেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়ছি, যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন, সে দিকে যে আমাদের লক্ষ আছে তার একটা প্রমাণ দেখো যে, যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই। আমি বলি, এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্বে অন্যত্র বলেছি, ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে থাকে, ধর্ম শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তা হলে বাঁচি নে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চলছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই; সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে বারে বারে আপসনিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচি নে। এই নিত্যপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো, কিন্তু তাই বলে ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে; পৃথিবী ধর্মের মতো ধ্রুব হলেই আমার পক্ষে ভালো, তার নড়চড় হতে থাকলেই সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে; সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে তুলি তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোনো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত

করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরোতে হয়, আর গাড়িটা কাত হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার পূর্বে বিধান নেবার জন্যে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো' তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, কেন করব না। এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এ-সব কথা স্বাধীন-বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্‌কার আছে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য-মিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভুতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, ব'লে ভূতের কোনো জবাবদিহি নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এতবড়ো জোর তার কিসের। না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বাস্তব যে সে বাস্তবের নিয়মে সংযত; যদি বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারি ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুরুদুরু করে, গা ছম্‌ছম্‌ করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে 'কেন', জবাব দিতে পারি নে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো-আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি, ঐ যে! তার পরেও যদি বলে 'কই যে', তাকে নাস্তিক বলে তাড়া করে যাই। মনে ভাবি, গোঁয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি— ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে 'কেন' তা হলে উত্তরে বলি, 'আর যেখানেই কেন খাটাও, এখানে খাটাতে এসো না বাপু, মানে মানে বিদায় হও— মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।'

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক কারায় অবরুদ্ধ অকালজরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা পূর্বেই বলেছি, ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ করে ব'লে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটূক্তি করে থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে; যেহেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্মকে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু

লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশজোড়া মানুষ-পেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারো চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে এতবড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্‌ভাবিত হয়েছে বলে আমি তো জানি নে। চটকল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয় জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্যেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটাকাটা যে-সব অতি-ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হতেই আর-একটা বোঝা তাদের অধিকার করে বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, য একঃ অবর্ণঃ— যিনি এক, যিনি বর্ণভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চান নি। বুদ্ধ্যা শুভয়া, শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন— অন্ধ বশ্যতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন করে বোঝাপড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড়ো কাজ। আমরা বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই, আকস্মিক— বিজ্ঞানে যাকে variation বলে— আচমকা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে একঘরে, কিন্তু বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে নেন। অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহূত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করলে এই নূতন আগন্তুকটি চার দিকের সঙ্গে সুসংগত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে রুচিকে চারিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে, পীড়িত অবমানিত না করে, সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে করা যাক, একদা এক ফকির বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সদ্গতি হয়ে গেল। উচিত ছিল, এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে। অবুদ্ধি করে না, কেননা তার কাজ হচ্ছে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা; বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেছে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে। যে দেশে যা আছে তাকেই স্বীকার করা— যা ছিল তাকেই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তিগদ্‌গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল, শুক্লপক্ষের কার্তিকসপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। এমনি করে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোকচলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা পড়ে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম থাকে না। যাঁরা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন-কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, আহা, একেই তো বলে আধ্যাত্মিকতা— নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপড়াতে চায় না। সেইসঙ্গে এও বলে, আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ করতে চাই নে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে

ধর্মের বেড়াজালে এইরকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে— কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।

সৌন্দর্য নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্মের নিজের অধিকারে ধর্ম বড়ো, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়ো। আমার মতো অর্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতরো খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে। বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে তার ঘুম হয় না। যেহেতু গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে বলেন, ‘ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কী জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমরা চুপ করে থাকো-না। কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মতো ডানপিটে ছেলের তো অভাব নেই।’ শুনে আমাদের মতো নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুক্‌ধুক্ করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে সংস্কারটাকে তো ছেঁকে ফেলতে পারি নে। কাজেই পরের দিন ভোরবেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগদুগ্ধ, তিন তোলার বেশি রজত খরচ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই তো গেল আমাদের সব চেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটি-রূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হল বড়ো কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা তো উপলক্ষ। আমাদের মতো আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হল বড়ো কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল। কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান হাত বাঁধা রেখে আসেন তার কী অনির্বচনীয় মাধুর্য! আধুনিক বলে, যেখানে ডান হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য; কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তার কুশ্রী কবলে সেই মাধুর্যকে গিলে খাচ্ছে সুন্দর সেখানে পরাস্ত— কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দুমুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা-নির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে— আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বুশ্‌ম্যান-জাতীয় লোক পরকে দেখবা মাত্র তাকে নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্ছে, পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ্‌ম্যানের তা হতে পারে নি, সে চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই-যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্য-যোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম

স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, মানবজগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক্‌ হিন্দুর এই ব্যবস্থা; সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উলটো। ধর্মগণ্ডির বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর বলে জানে; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশি। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে-বের-করা শ্লোক কী বলে সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধরে ধর্মকে আপন দুর্গম দুর্গ করে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে করে এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে— আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত, ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল— সে হচ্ছে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতিন এই দুই পোলিটিকাল allyদের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত। পদ্মায় ঝড়ের সময়ে দেখেছি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আটকাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝট্‌পট্‌ করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে। বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যত মিলি নি; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চু দুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে তোলা গেল সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয়, মুসলমানের গায়ে জোর আছে,

হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। এক দল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর-এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপস ঘটবে কী করে। অত্যন্ত দুর্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশরকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর করে সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশানবৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপসনিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপসনিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালোরকম রফা করবার জন্যে আপনিই আমাদের ডাক পাড়ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফানিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। ঝরনার জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে একটা আপসের কন্‌ফারেন্স বসেছিল; ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কিরকম অত্যন্ত সরল করে এনেছিল সে কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দুমুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপলাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎসূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেসমঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বার বারই বলে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক্‌, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব; আগে স্বরাট হব, তার পরে মানুষ হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই তো গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে দক্ষিণের হিন্দু-সমাজগুরু শঙ্করাচার্যের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন; তাতে বলেছেন :

> The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the almighty and the Omnis-

cient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf.

ডাক্তার মুঞ্জের এ কথাটির মানে হচ্ছে এই যে, হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যাস করে নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে বলেই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আর-একটা অংশে তিনি বলছেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এমন-কি, হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হত। এর প্রধান কারণ, ধর্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্রযাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলেই মেনে নিয়েছিলেন, তাই মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যরক্ষার ভার সেই-সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মানত, মনুকে মানত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এইজন্যেই তাদের

ঠিক দুপ্‌প’র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোশ-মাত্র প’রে অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দুসিংহাসনে এখনো রাজা আছে। তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে— সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ। এরা এক-একটা ঢেলামাত্র, এরা ভূত নয়। আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম। তাই ঠিক দুপ্‌প’র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর—

ঠিক দুপ্‌প’র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারি দিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে— সেই আমাদের এতদূর অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চীৎকারশব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য বলে তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না; কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে— কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে : য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

সমাধান

সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক করে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে, আমরা তো একটা তবু যা হোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এমনি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক তোমারই বা কত বড়ো যোগ্যতা।

আমি জানি, কোনো ঔষধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে 'জ্বর' অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্ন রস গিলিয়ে দিলেন, সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের, তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলতে পারতেন যে, তবে তুমিই চিকিৎসা করো-না; আমি তো তবু যা হয় একটা-কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে। আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয়, মেয়ের জ্বর, অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন— শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান 'শিক্ষা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই, অতএব সকলকেই চরকায় সুতো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই এ কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা, তার পরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশ কোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকার সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারছি নে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জ্বলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে— এমন-কি, স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু দিনে বশ মানবে এ কথা মেনে নিতে পারি নে। আজ দুশো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেইসঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে সেখানে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে চলে, কিন্তু যেখানে বহু লোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায় সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালোরকম করে চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড়ো সভ্যতারই অন্নরূপের আশ্রয় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে তো অন্নের চেয়ে বড়ো বৈ ছোটো নয়। ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ-ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে

অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় অহরহ ছুটোছুটি করে মরছে সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখি নি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেছে। যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসার-যাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে। তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাঁকে তারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে দৈববাণী বলে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে কোনো এক সময়ে কোনো-একটা কাজ তারা মরিয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনো অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন করে নিতে পারে। কিন্তু ক্বচিৎ-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বলবে না এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সদুপায়।

এমন লোককে জানা আছে যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর যে, সে পথের সামনে বসে বসে পথটাকে হ্রস্ব করবার দৈব উপায়-চিন্তায় আধ-বোজা চোখে সর্বদা নিযুক্ত; তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কমছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বললে, তিন মাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি করে দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়তা ছুটে গেল। সেই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামত সে দুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই তাকে অলৌকিক-শক্তি-পথের আভাস দেবা মাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগাতাবিজ বিক্রি হবে কেন। যারা রোগ তাপ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসংগত উপায়ের 'পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগাতাবিজ স্বস্ত্যয়ন তন্ত্র মন্ত্র মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কথা ভুলে যায় যে, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই রোগ-তাপ-বিপদ-আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারও কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শতধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে চোখ বুজে ঠিক করে বসে থাকে সে দেশে মা-শীতলাও থেকে

যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজচ্যুতির কদর্য লক্ষণ।

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্ছে এই যে দেশের একদল লোক তো বিদ্যাশিক্ষা করেছে। তারা তো পরীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণবিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির 'পরে, বিশ্ববিধির 'পরে বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্ছে? তারাও কি বুদ্ধির অন্ধতায় সংসারে সকল রকমেরই দৈন্য বিস্তার করে না।

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধিমুক্তির জোর বড়ো বেশি দেখতে পাই নে; তারাও উচ্ছৃংখলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত; অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ংকর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের 'পরে আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ। এইজন্যে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক করে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ব-বশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় করে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে ঠেকে যে একে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস— বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

শূদ্রধর্ম

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমত নানা কাজ করে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তার কর্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তার সমস্ত সংকীর্ণতা সমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকানির্বাচন সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে

হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তার বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুশকিল এই যে, রাজসংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন-কি, যে স্থলে তার পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তার খেতাব নিয়ে মানের দাবি করে। ফরাস এ দিকে খেটে খেটে হয়রান হয় আর মনে মনে ভাবে, তার প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠত, তা হলে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চলত তা নয়, ফরাসের কাজও একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে, ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা করে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হত তা হলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না। পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবি করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু-না-কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুত জীবিকানির্বাহকে ধর্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার করে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তার দ্বারা তার জীবিকানির্বাহ হলেও সেটা জীবিকানির্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম। চাষী যদি চাষ না করে তবে একদিনও সমাজ টেঁকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম বলে স্বীকার করে তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয় নি যে, চাষ করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যে-সব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, এ কথা সুস্পষ্ট।

যে দেশে জীবিকা-অর্জনকে ধর্মকর্মের সামিল করে দেখে না সে দেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হলে সমাজের সর্বনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ করতেই হবে। সুযোগের সংকীর্ণতাবশত সেরকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিঁকে আছে। আজকাল মাঝে মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্মা বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আর্জি-মঞ্জুরির দ্বারা সমাজরক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।

যে-সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার, যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার

বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়নপ্রথা এক সময়ে আর্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল—তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়তজাগরূক চিৎশক্তির দরকার, সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখবার নয়, সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়নপ্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, উপনয়ন যে আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা; কোথায় যে সে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত, জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এ দিকে শাস্ত্রে বলছেন : স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ কথা বললেই তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্বতা ঘটে ঘটুক, তার ক্ষতি হয় হোক। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালোমন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোটে সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্যে অহংকার ও অন্যের প্রতি অবজ্ঞায় তার চিত্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিক কালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজকর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম পালন করা খুবই সহজ যেখানে সেই স্বধর্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়—বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হয়ে আসে। এই-সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক, আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিঁকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের-নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে? লাথিঝাঁটা-বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্মরক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবি করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদলাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্বভার ঠেলে তবে করতে হবে—তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল, দেখলুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের-লাঞ্ছন-ধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশে বিদেশে এরা শূদ্রধর্মপালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না; কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহু দূরে লঙ্ঘন করে যায়; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে— সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং-হিউয়েন্‌সাঙের চীন।

মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এশিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলছে, য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এশিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চার দিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন এশিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ। তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে করে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে, এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ। সে বলবে : স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজ-সাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না— ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা বয়ে মরে, যে বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়, যে পর তার শত্রু নয়; কাজ সিদ্ধ হবা মাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ’ এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্ছে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য বলে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে : I miss my best servant।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

বৃহত্তর ভারত

বৃহত্তর ভারত পরিষদ্‌-কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়সংবর্ধনা উপলক্ষে

যবদ্বীপ যাবার পূর্বাহ্ণে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চার দিকের দাবির দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবির আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হয়ে যায় দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবি সত্য হয় অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পারি নে, সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হয়ে ওঠে। আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে যে-আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো করে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্বরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সংকীর্ণসীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কাল ও বর্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত করে রাখে বলে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্যেই জ্ঞানে কর্মে সে দুর্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে : যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অর্থাৎ, ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো করে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পেঁছয় না এবং অতি ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হতে হয়। নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। নিজের পরিচয়কে সংকীর্ণ দেশ-কালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্ছে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে বসে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখি নি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্মতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের, যা এক দিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা— চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল, যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

তার পর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে শুরু করলাম। তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বার বার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিন ক্ষণ তারিখ ও নামমালা-সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি।

এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কিরকম উপবাসী হয়ে ছিল। দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন বলে জানি তা হলে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস পড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাই নে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো করে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব-অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে বসে বসে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ্য ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্যকর অত্যুক্তি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণরচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চলে গেছে তা বলতে পারি নে।

যে তারার আলো নিবে গেছে নিজের মধ্যেই সে সংকুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য। এই দৈন্যের গণ্ডির মধ্যেও তার প্রতিমুহূর্ত-গত কাজ হয়তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তার সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ, এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে করে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বার বার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, নেশনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পারলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানবসভ্যতার সৃষ্টিকার্যে তার স্থান হল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদসমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম; সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্যসঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটরকোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা— সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি।

আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকদীপ্ত ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বন্ধ রাখতে পারে নি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্য! আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তা হলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।

ক্ষুধা হলেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে। আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানা কারণে সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইজন্যে নিরন্তর তারই ভোজটাই স্বপ্নে দেখছি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক বলে উপেক্ষা করবার তর্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্‌ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন বলে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই; এখানে আমাদের কারও কারও কল্পনা বল্‌শেভিজম্‌ কারও সিন্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ কারও বা সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই— আমাদের দুর্ভাগ্যতাপ-দগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে Made in Europe-এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে অভিভূতি-বিহ্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্বেই বলেছি নিজের ব্যক্তিস্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গড়ে তুলতে পারি। পলিটিক্‌স্‌-ইকনমিক্‌স্‌-এর বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে, এ কথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা করে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশকুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য করে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি, এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়, এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়— নিজে দুঃখস্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের

চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্‌সের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেই সময় ধারাবাহিক-ভাবে এমন-সকল সাধুসাধকদের জন্ম হয়েছিল— তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন, যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। অর্থাৎ, তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক করে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেছেন, বিদেশী-ছাঁচে-ঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্তি লিখিত হয়েছে। সে-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃত কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন। কিন্তু আজও ভারতের প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই-সকল সাধকের অমরবাণী-ধারা প্রবাহিত আছে; সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তা হলে তারই জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্‌বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টিশক্তির সচেষ্টতা।

বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনায় গুহাগহ্বরে চৈত্য-বিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করে নি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি-মহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখো, দেখবে তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন-সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাললে দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্য বেশভূষা-ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে তা নয়; সৃষ্টি করবার সুপ্ত শক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে— সে কী পরমাদ্ভুত সৃষ্টি। এই-সকল দ্বীপেরই আশেপাশে আরও তো অনেক দ্বীপ আছে, সেখানে আমরা 'বরবুদর' দেখি নে কেন, সে-সব জায়গায় 'আঙ্করবট'এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন। সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায় নি। মানুষকে অনুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের সুপ্ত শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এতবড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে।

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা বলে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মালমসলা ভগ্নস্তূপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে।

এমনি করে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের ধিক্‌। অহংকার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক করে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই, বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্যে যেন তাকে অলংকার মাত্র না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্যেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত করে সত্যের অমৃতমন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই, তা হলেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রাবণ ১৩৩৪

হিন্দুমুসলমান

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশরঙ্গভূমিতে জল-বাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ, ওরা কোন্‌ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে। ওরা মানুষের মতো আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে অবজ্ঞা করে না। এইজন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগি করে প্রাণের খেলাঘরে ডাকতে থাকে—আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করছি—সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সব চেয়ে কম মানুষ হয়েছি—আমার মন ঘাসের মতো কাঁপছে, পাতার মতো ঝিল্‌মিল্‌ করছে। কালিদাস এই উপলক্ষেই বলেছিলেন : মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ। অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চলছে, মনের মাস্টারি শুরু হয় নি—আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেছে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল-হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে, আর ছোটোছোটো চঞ্চল জলধরা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মতো চার দিকে খিলখিল করছে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েছে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেছে—তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মত্তদাদুরী। এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ করে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পরে মেঘের মতো আমারও গান চলেছে দিনের পর দিন; তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, মেঘ যেমন 'ধূমজ্যোতিঃসলিল-

মরুতাং সন্নিপাতঃ’ সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে—

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান-সমস্যার সমাধান কী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে আমার কাজ আছে— শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপরধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। ‘য়ুরোপীয় বৌদ্ধ’ বা ‘য়ুরোপীয় মুসলমান’ শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নমে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। ‘মুসলমান বৌদ্ধ’ বা ‘মুসলমান খৃস্টান’ শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দুমুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে ‘হিন্দু’-যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব

থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল—এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকলপ্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়। মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯[১]

শ্রাবণ ১৩২৯

নারী

নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মীসম্মিলন উপলক্ষে লিখিত

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই পেটাই করা মিস্ত্রির কাজে। সেটা আধখানা শেষ হতে-না-হতেই প্রকৃতি শুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদি-প্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেইজন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত—তা প্রয়োজন-অনুসারে বিধিপূর্বক খনন করা জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো যার কারণ আপন অহেতুক রহস্যে নিহিত।

---

[১] শান্তিনিকেতন থেকে কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র।

প্রেমের রহস্য, স্নেহের রহস্য অতি প্রাচীন এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্যে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্যা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনি প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধাতরঙ্গের ওঠাপড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় বিপর্যস্ত করে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন করে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা। পালটিয়ে পালটিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম কেবলই দেহপরিবর্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্যপরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটিসংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবনবাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রলয়াবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মতো, ঝড়ের মতো, দাবদাহের মতো— আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কতবার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধিবিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর-এক কালে, উল্টিয়ে গেল তার ইতিহাস, করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলটপালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ঘোরায়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্যে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার ইচ্ছার তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই— তাতে বারো-আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহিণী-রূপে জননী-রূপে মেয়েদের যে কাজ সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসংগত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালী করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে, কোনো শিক্ষায়, কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে সম্বল অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অন্যের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ-ঐশ্বর্যবান দেশকে বলবান নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ করে রাখতে চায়। অনুর্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখির ডানা সুন্দর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী করে মানুষ গর্ব অনুভব করে; তার সৌন্দর্য সমস্ত অরণ্যভূমির, এ কথা সম্পত্তি-লোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেইজন্যে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে

তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন-কি, মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সব চেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে-সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দীশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এশিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না—তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পালকির যুগ। মানী ঘরে সেই পালকির উপরে পড়ত ঘটাটোপ। বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সর্বপ্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পালকির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তন আপনিই ঘটেছে—এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই-যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে, বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে। সংকীর্ণ সীমায় পূর্বে মন যেরকম করে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় করে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোটো পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না বলেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল যে মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্তাদের। তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছশাসনের সুযোগ রচনা করে; মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি, বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য বাজারদরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো-আনা খাটছে না। যে বিদ্যার মূল্য সার্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা-যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিতে আরম্ভ হল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনিই একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ তা ভেদ করে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে যা মুক্ত আকাশের, যা সর্বলোকের। বহু দিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি, তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারে দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঙ্কস্তরের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত সেই অরণ্য বহু লক্ষ বৎসর ধরে প্রতিদিন সূর্যতেজ সঞ্চয় করে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই-সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদ্ঘাটিত হল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্যতেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে; তখনি নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনি অন্তরের সম্পদের

একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায় বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতাদুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে—তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে; রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবন্ধ করে। এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত করে এ সভ্যতা বধ করে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ করে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তি-হননকারী সভ্যতা টিঁকতে পারে না।

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পেঁচেছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে—এমন-কি, না আসতেও পারে—কিন্তু যোগ্যতালাভের কথা সর্বাগ্রে। শান্তিনিকেতন। ২ অক্টোবর ১৯৩৬

অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

সংযোজন

কর্মযজ্ঞ

হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম-উৎসব করতে হয়; কিন্তু, মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না— তার জন্মের পূর্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয় নি— আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে-সমস্ত পথে চলতে চলতে হবে— কিন্তু যাত্রার আরম্ভের পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই তো সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেছি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেছে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্বল তাই আমরা দুর্বল, এর আর নড়চড় নেই। এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছে। দেশ জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন— তার কারণ এ নয় যে, আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেছে— তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করি নে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কী পরিমাণ কাজ আমাদের সামনে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তার পরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কিরকম সাড়া দিলেন যদি জানতে পারি সেও ভালো। কিন্তু সব চেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকারগ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মতো পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই, তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলছে— না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই। এ আশা তো কোনোমতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখছি— হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখদুর্গতির ডালপালা বাড়ছে, তবু প্রাণের ভিতর আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনোমতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড়ো ক্ষীণ। যে-সব জিনিস নির্জীব তাকে এক মুহূর্তেই ফরমায়েশমত ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে কিন্তু প্রাণের উপরে তো সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরমদুর্বলরূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে— সে তো অণু আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারই মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, কজন লোকেরই বা এতে উৎসাহ— এ-সব কথা বলবার কথা নয়। কেননা, বাইরের আয়োজন ছোটো, অন্তরের আশা বড়ো। আমরা কতবার এরকম সভাসমিতির আয়োজন করেছি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েছি— এ কথাও আলোচ্য নয়; ফিরে ফিরে যে এরকম চেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছে তার মানেই আমাদের আশা মরতে চায় না, তারও মানে প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেছে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনোই সত্য নয়; সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরে নি, এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে, কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত করেছেন সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তা তো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তা হলে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বেহিসেবি আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্ছে শক্তি— নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে

হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন তাঁকে শ্রদ্ধা করি না বলেই তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারছেন না। তাঁর কাছে খাজানা নিয়ে এসো; বলো, হুকুম করো তুমি, প্রাণ দেব তোমার কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব। আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বাইরের পর্বতপ্রমাণ বাধাকে বড়ো করে দেখো না, অন্তরের মধ্যে যদি কণা-পরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখো। বিশ্বের সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, আপনাকে বিচিত্ররূপে উদ্ঘাটিত করে সার্থক করে তুলছেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েছেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটোমাত্র ছোটো চোখ দিয়ে লোকলোকান্তরে-উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণধারাকে গ্রহণ করতে পারছি, তেমনি আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্মীলিত করবামাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে সে শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বলছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরছে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারছে না—এর জন্য নালিশ করব না। এই বারংবার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন্ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্বলতা। আমরা এটা দেখতে পেলাম যে, যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড়ো আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি। তাই মনে কেবল আলোচনা করছি, অন্য দেশ এইরকম করে অমুক বাণিজ্য করে; এইরকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে; অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি—আমাদের তা নেই—এইজন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি; মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব। কিন্তু জানি না, আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিসগুলো তুলে এনে কী ভয়ংকর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে—তখন তার ভার বইবে কে। বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্তাকে দেখি নি—কেননা নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলাতে পারি নি। কর্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে; কর্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি, সেইজন্যে এ দেশে যে জিনিসটা গোড়াতেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করি নে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে জাদুকরের গাছের মতো মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোটো হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড়ো আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে, সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হয়, তা হলে এক রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক, তিন রাত্রের মধ্যে সে 'সমূলেন বিনশ্যতি'। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্বে এবং কাঠ-খড় জোগাড়ের গোড়াতেই, এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি পৃথিবীর একার্ধকে ধর্মের আশ্রয় দান করেছেন তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা-কিছু বড়ো ও সার্থক তার যে কত ছোটো জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা

জানি নে—অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয় করবে—সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার ’পরে জন্মগ্রহণ করেছে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি; বলছি—তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেছে যে মানুষের উন্নতিসাধন ভালোবেসে নয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ, যেন কেবলমাত্র পুড়িয়ে-পিটিয়ে কেটে-ছেঁটে জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না। তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্গীরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি—আমরা শয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার-পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন—বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের, বহুযুগের; আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো! কে করবে। দেশের যৌবন—যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরার ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এইজন্য কোনো জায়গায় ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মানে প্রকাশ। চারি দিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ যখন একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় তখনি ব্যক্তিত্ব। সংকীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে। দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল, কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ততাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব; তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে sentimentalism সেই দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যুষে, যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায় নি, তখন আমরা জেগেছি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্বগগনে দেখা দিয়েছে—ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। মায়ের

পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন, তেমনি সৌভাগ্য তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার আলোক অতিথি হয়ে এল তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে, এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেছেন—ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য ভোগ করছে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন জীর্ণ কন্থার উপরে—আমাদের তিনি ভার দিয়েছেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেছেন, অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীর পুত্র সব। আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা ছোটো নই। আমরা বড়ো, এ কথা হবেই প্রকাশ—নইলে এ সংকট আমাদের সামনে কেন। সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

ফাল্গুন ১৩২১

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

দেড়শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কি না, তার ধনসম্পদ শিল্পবাণিজ্য পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে কিংবা তার আত্মশক্তির ও আত্মশাসনের সুযোগ বিস্তৃত হইয়াছে কি না, সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিবে না এবং বর্তমানের দুঃখ ঘুচিবে না। ঐতিহাসিক কৌতূহলের তরফ হইতেও ইহার মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ, অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্মরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই। অতএব এমন আলোচনায় আমার দরকার কী যার পরিণাম শুভ বা সন্তোষজনক না হইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা আছে যার সম্বন্ধে কোনো ঢাকাঢাকি নাই। এ কথা সকল পক্ষেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এতকালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাই, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল। যখন দুই জাতি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে বাধ্য অথচ উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিলন অসম্ভব, তখন এ সংস্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড়ো ভারী। অতএব যখন আমরা বলি যে এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়ভারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে-মাসে এক হইল, তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায় বা প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমন্দকে ছাড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়। যে সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধতভাবে দাবি করিতে থাকে, অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সভ্যতার মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কমতি আছে যে সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। এইজন্যই যে-সব জাত এই আধুনিক সভ্যতার হাতে গড়িয়া উঠিল তারা কোনো মুশকিলে ঠেকিলেই প্রথমেই বাহিরের দিকে হাতড়ায়; মনে করে তাদের আপিসে, তাদের কার্যপ্রণালীতে একটা-কিছু লোকসান ঘটিয়াছে, মনে করে সেই প্রণালীটাকেই সারিয়া লইলে তারা উদ্ধার পাইবে।

তাদের বিশ্বাস মানুষের সংসারটা একটা শতরঞ্চ খেলা, বড়োগুলোকে বুদ্ধিপূর্বক চালাইলেই বাজি মাৎ করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে, এই বুদ্ধির খেলায় যাকে জিৎ বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই সব চেয়ে বড়ো হার হইতে পারে।

মানুষ একদিন স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক এই একটি বিশ্বাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, কোনো-একটি সত্তা আছেন যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতেই আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ সত্য হইয়াছে। সেইদিন হইতেই তার ইতিহাস শুরু হইয়াছে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বলে, এই বিশ্বাসের গোড়া ভূতের বিশ্বাসে। কিন্তু আমরা জানি, ওটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যবোধের ভিতরেই ঐ বিশ্বাসের মূল, এবং এই ঐক্যবোধেই মানুষের কর্তব্যনীতির ভিত্তি। এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে প্রাণ ও জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাতেই সে আপন আত্মানুভূতির মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করিল।

স্বভাবতই ইতিহাসের আরম্ভে মানুষের ঐক্যবোধ এক-একটি জাতির পরিধির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যেমন বড়ো খেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোটো খেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়, এও ঠিক তেমনি। এইজন্য গোড়ায় মানুষ আপন দেবতাকে স্বজাতির বিশেষ দেবতা বলিয়াই গণ্য করিত, এবং তার কর্তব্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সংকীর্ণ ছিল।

আর্যরা যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন সে যেন তাঁদের নিজের বিশেষ সম্পত্তির মতোই ছিল। অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধিল—সে লড়াই কিছুতেই মিটিতে চায় না, অবশেষে যখন আর্যসাধক সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি ও প্রচার করিলেন তখনই ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে মনীষা না জাগিলে বিভেদের মধ্যে মিলন আসে কী করিয়া।

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আরও অনেক বড়ো লোক এবং বুদ্ধিমান লোক আমাদের কালে দেখিয়াছি। তাঁরা পশ্চিমের গুরুর কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়—এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতির প্রতি সন্দেহসংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে; সেইখানেই মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার

জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই-যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই-যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর-এক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিক্ষায় বিপুল ও প্রবল মিথ্যার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে সেটুকু আমাদিগকে লইতে হইবে; নহিলে আমাদের প্রকৃতি একঝোঁকা হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা চাই যে, ভারত যদি এমন কোনো সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে যাহার অভাবে অন্য দেশের সভ্যতা আপন সামঞ্জস্য হারাইয়া টলিয়া পড়িতেছে, তবে আজ সেই সত্যকে বলের সঙ্গে প্রকাশ করাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ।

আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সব চেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে। ইহাতে কিছুদূর পর্যন্ত তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পার করিবে না। বালকবয়সে একপ্রকার দুর্দান্ত আত্মম্ভরিতা তেমন অসংগত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে; তখনো যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্যেরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না।

আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কী বুঝায়। এতদিন যে স্বাজাতিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

এতদিন মানুষ বলিতে ইহারা মুখ্যত আপনাদিগকেই বুঝিয়াছে। তাহাতে ইহাদের আত্মোপলব্ধি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রচণ্ডরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই সীমার বাহিরে নিজের সুবিধা এবং অসুবিধা অনুসারে নিজের লাভক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া ইহারা ধর্মবুদ্ধিকে কমাইয়া বাড়াইয়া বেশ সহজ করিয়া আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সুবিধার মাপে সত্যকে ছাঁটিতে গেলে সত্যও আমাদিগকে ছাঁটিতে আসে। কিছুদিন ও কিছুদূর পর্যন্ত সে অবজ্ঞা সহ্য করিয়া যায়। তার পরে একদিন হঠাৎ সে সুদে-আসলে আপনার পাওনা আদায় করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন সময়ে আসে যেটা অত্যন্ত অসুবিধার সময়, এমন উপলক্ষে আসে যেটা হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ। তখন সেটাকে আমরা বিধাতার অবিচার মনে করি। অধর্মের টাকায় ভদ্র সমাজে যে মানুষ গৌরবে বয়স কাটাইল, হঠাৎ একদিন যদি তার খাতা ধরা পড়ে তবে সেটাকে সে অন্যায় অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। বড়ো বড়ো সভ্য জাতি তেমনি আপন সমৃদ্ধিকে এমনি স্বাভাবিক এবং সুসংগত বলিয়া মনে করে যে, দুর্দিন যখন তার সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া কৈফিয়ত তলব করে তখন সেটাকে সে সুবিচার বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

এইজন্য দেখিতে পাই, য়ুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কুল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে, সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিংবা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক বিলম্বেই হোক তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কী পরিমাণে সত্য

হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে—নহিলে, তার আমদানি-রফতানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসংকোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশবিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধুলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে; যে পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধুলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল; কত সাম্রাজ্যের অহংকার ঐ পথের ধুলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন-তারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টা-পাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী—সত্যের বলে যায় বল, একদিন যাহা অন্য-সকল কলগর্জনের ঊর্ধ্বে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে।

একদিন ছিল যখন য়ুরোপ আপন আত্মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। তখন নানা চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও সে এ কথা বুঝিয়াছিল যে, বাহিরের লাভের দ্বারা নয়, কিন্তু অন্তরের সত্য হইয়া মানুষ আপন চরম সম্পদ পায়। সে জানিত, এ লাভের মূল্য কেবল আমাদের মনগড়া নয়, কিন্তু ইহার মূল্য সেই পরম প্রেমের মধ্যে যাহা চিরদিন মানুষের সংসারের মধ্যে সচেষ্ট হইয়া আছে। তার পরে এমন দিন আসিল যখন বিজ্ঞান বহির্জগতের মহিমা প্রকাশ করিয়া দিল এবং য়ুরোপের নিষ্ঠাকে আত্মার দিক হইতে বস্তুর দিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল।

মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব একটা বড়ো তাৎপর্য আছে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহযোগিতা আছে, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির নিয়মের সাহায্যে প্রাকৃতিকই নির্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া মানুষ আপন ধর্মবিবেকের স্বাধীন নির্বাচনের গৌরব লাভ করিতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতালাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপদান করিয়া তাহার বাস্তুপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, য়ুরোপের প্রতি এই সত্য প্রচারের ভার আছে।

বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু, যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড রূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।

তথাপি এই আশা করি, য়ুরোপের এতদিনের তপস্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া পায়ের তলায় ধুলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সংকটের বিপাকে য়ুরোপ আর-কোনো একটা নূতন প্রণালী, আর-একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বারংবার মৃত্যুর পাঠশালায় শিক্ষালাভের পরে য়ুরোপকে আজ না হয় তো আর-একদিন এ কথা মানিতেই হইবে যে, কেবল কার্যপ্রণালীর পিরামিড-নির্মাণের প্রতি আস্থা রাখা অন্ধ পৌত্তলিকতা; তাহাকে এ কথা বুঝিতে হইবে, বাহিরের প্রণালীকে নয়, অন্তরের

সত্যকে পাওয়া চাই; এ কথা বুঝিতে হইবে যে, ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে একদিন জগদ্‌ব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। একদিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহংকারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উপকরণই যে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য।

ঈর্ষ্যার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থানসন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসমবায়, এমনভাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আর-এক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। এক দিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবির কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না; অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনায় পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে একে বিশ্বের গূঢ়রহস্যসকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়—তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে য়ুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই কোথায় যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তুসঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। রোম একদিন আপন সাম্রাজ্যের বিপুলতার দ্বারাই আপনি বিহ্বল হইয়াছিল। বস্তুর অপরিমিত বৃহত্ত্বের কাছে তার সত্য যে প্রতিদিন পরাভূত হইতেছিল তাহা সে নিজে জানিতেই পারে নাই। অথচ সেদিন য়িহুদি ছিল রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র, অপমানিত। কিন্তু, সেই পরাধীন জাতির একজন অখ্যাতনামা অকিঞ্চন যে সত্যের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল তাহাই তো স্তূপাকার বস্তুসঞ্চয়ের উপরে জয়লাভ করিল। য়িহুদি উদ্ধত রোমকে এই কথাটুকু মাত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে, আপন আত্মাকে তুমি আপন ধনের চেয়ে বড়ো করিয়া জানো। এই কথাটুকুতেই পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল।

দরিদ্রের কথায় আপনার উপর মানুষের শ্রদ্ধা জন্মিল, আত্মাকে লাভ করিবার জন্য সে বাহির হইল। বাহিরে তাহার বাধা বিস্তর, তবু নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে অমৃতলোকের দিব্যসম্পদ অর্জন করিবার জন্য সে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দিক হইতে আবার আসিল প্রলোভন। বাহিরের জগৎকে তার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য বিজ্ঞান তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপ আবার আত্মার চেয়ে আপন বস্তুসংগ্রহকে বড়ো করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বস্তু চারি দিকে বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, ইহাই অসত্য। যেমন করিয়া যে নাম দিয়াই এই বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন, ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ক্রমাগতই সন্দেহ, ঈর্ষ্যা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতারণা, অন্ধ অহংকার এবং অবশেষে অপঘাতমৃত্যুর মধ্যে মানুষকে লইয়া যাইবেই; কেননা মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য এই যে : তদেতৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। অন্তরতর এই-যে আত্মা, বাহিরের সকল বিত্তের চেয়ে ইহা প্রিয়।

য়ুরোপে ইতিহাস একদিন নূতন করিয়া আপনাকে যে সৃষ্টি করিয়াছিল, কোনো নূতন কার্যপ্রণালী, কোনো নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে তাহার মূলভিত্তি ছিল না। মানুষের আত্মা অন্য সব-কিছুর চেয়ে সত্য, এই তত্ত্বটি তাহার মনকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সৃজনীশক্তি সকল দিকে জাগিয়া উঠিল। অদ্যকার ভীষণ দুর্দিনে য়ুরোপকে এই কথাই আর-একবার স্মরণ করিতে হইবে। নহিলে একটার পর আর-একটা মৃত্যুবাণ তাহাকে বাজিতে থাকিবে।

আর আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কী দিতে পারে। পূর্বে এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল, তাহার বদলে আর-এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড়ো জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।

য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না। যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়। যে হাত দিয়া সে কোনো সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তাহার সে হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই, সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত সেই মুক্তি দান করে।

যদি সে বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ পাইয়া আমাদিগকে কিছু দিতে আসে তবে সে নিজের দানকে নিজে কেবলই খণ্ডিত করিবে। এক হাত দিয়া যত দিবে আর-এক হাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব তাহাতে এত ছিদ্র যে, সে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, এ কথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না—সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

য়িহুদি যখন পরাধীন ছিল তখন রোমের হাত হইতে দক্ষিণাস্বরূপ তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, য়িহুদি দেশছাড়া হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্রও নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই। কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। ইহার চেয়ে অনেক বড়ো কথা এই যে, তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া য়ুরোপকে নূতন মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। সে যাহা দিয়াছে তাহাতেই তাহার সার্থকতা। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পায় নাই, সেটা সত্ত্বেও সে বড়ো, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

বাহিরের পরিমাণে মানুষের পরিমাণ নহে, এ কথা আমরা বার বার ভুলি কিন্তু তবু ইহা বার বার মনে করিতে হইবে। চীনদেশকে য়ুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু বড়ো কথা এই যে, ভারত একদিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল। ভারত আজ যদি সমুদ্রের তলায় ডুবিয়া যায় তবু যাহা সে দান করিয়াছে তাহার জোরেই সে মানুষের চিত্তলোকে রহিল। যাহা সে ভিক্ষা করিয়াছিল, চুরি করিয়াছিল, স্তূপাকার করিয়াছিল, তাহার জোরে নয়।

তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, এ কথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে : তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তাঁহাকে

জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নাই। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। মন্টেগ্যুর ডাক খুব বড়ো ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতের সভা হইতে সভায়, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন : তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও; মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্য-ব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

মাঘ ১৩২৪

চরকা

চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার 'পরে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এতে আমার ব্যথা দূর হল, তা ছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারও সঙ্গে কারও বা মতের মিল হয়, কারও সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ, সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বন্যদ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুললে নারায়ণের দরবারে হিসাবনিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পান্সির মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু কোনো একটার 'পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত তখন সেজন্যে কারও কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পান্সি ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু, যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পান্সিই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবরদস্তি ঠেকাত কে। এ দিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, ওরে পালোয়ান, কূল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা—কোনোটা উত্তরে কোনোটা দক্ষিণে।

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের: বিশেষফললুব্ধ শাসনকর্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এককলের মজুর, এক-উর্দি-পরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায় নি সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তা হলে সেই 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ বলবান। এই মরণের ধর্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের 'পরেই এক-একটি বিশেষ কাজের বরাত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরির বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম। এইরকমে পিঁপড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্তা, যে সৃষ্টি করে, এতে তার মন যায় মারা; যে মানুষ দাস, যে মজুরি করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্ম-জন্মান্তরের পুনরাবর্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম ও কর্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাবছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান শুধু এইটুকু নয়, এমনি করে যারা কল বনে গেল তারা বীর্য হারালো, কোনো আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধরে চতুর তাদের ঠকাচ্ছে, গুরু তাদের ভোলাচ্ছে, প্রবল তাদের কান-মলা দিচ্ছে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবনমৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন-না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাত। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন ব'লে অত্যন্ত ছটফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল করে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা করে তবে কর্তারা এক দলের কাছে কেবলই আদায় করছেন তাঁতের কাপড়, আর-এক দলের কাছে কেবলই ঘানির তেল; এক দল কেবলই জোগাচ্ছে তাঁদের ফরমাশের হাঁড়ি, আর-এক দল বানাচ্ছে লাঙলের ফাল; তার পরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড়ো কাজে তাদের মন পেতে তারা ব'লে বসে, 'মন? সেটা আবার কোন্ আপদ। হুকুম করো-না কেন। মন্ত্র আওড়াও।'

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরি করতে গেলে সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়। তেমনি করে আমাদের এই ছাঁটা মনের মুল্লুকে মানুষের চিত্তধর্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এ দিকে ও দিকে তার গোটাকতক ডালপালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌষম্যকে অতিক্রম করে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মতো মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান-অনুকরণ না করে, তা হলে কেউ যেন উদ্‌বিগ্ন বা বিরক্ত না হন; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনি হবে খাঁটি।

এইজন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন। কেননা, বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে মাছটা ফসকে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি, আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত; কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্তা বহন করে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবি

বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেন নি যে, আগে বাহ্যিক, তার পরে আন্তরিক; আগে অন্নবস্ত্র, তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড়ো দাবি করে তাকে বড়ো সম্মান দিয়েছিলেন; আর সেই বড়ো সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ; অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি— তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশ জুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে তা হলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশসুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয় পান না। মানুষ পাথরের মতো জড়পদার্থ হলে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্তি বদল করা যেত; কিন্তু মানুষের মূর্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই— হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল-পাঠানের ধাক্কা যেই লাগল হিন্দুরাজত্বের ছোটো ছোটো আলগা পাটকেলের কাঁচা ইমারত চার দিক থেকে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে, আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই; কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, মোগল-পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও তো ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম তখনো বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মতো জল ধরে রাখা যায়। এ দিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সব চেয়ে বড়ো দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগ্য মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তা হলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলেভোলানো ছড়ায় বাংলাদেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে; কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত-চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই তা হলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্তক হৃদ্যতার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরানির কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরানিগিরির দেশে সকলেই জানে। সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বন্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইজন্যেই, যে-সব কাজ মুখ্যত কোনো-একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরি করে তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের, লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র : সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অর্থাৎ, না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধানতর অর্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা বলে তাকে সান্ত্বনা

দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড়ো সভ্যতাই হয় মরেছে নয় জীবন্মৃত হয়েছে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরির আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিকসাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতবড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই; মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই-সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনোই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবতার মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই। বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈবশক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকি নি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে, তখন যে চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোনো কাজ কোরো না এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না-বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়। স্বরাজসাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দিষ্ট আর তার চার দিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে না। বস্তুত সে কি এতই মস্ত। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্যনির্বিচারে এই

ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে—চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে। একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু, তাও কি সম্ভব হয়েছে। পূজাবিধিই কি এক হল, না দেবতাই হল একটি। দেবতাকে আর দেবার্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসছে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজতীর্থের সাধনমন্দিরে একমাত্র চরকা-দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে। মানবধর্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের 'পরে এত অশ্রদ্ধা?

গুপী বলে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হল। সে বার বার মনে মনে সকলরকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনোটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সব চেয়ে অন্যায় দাবি। স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই। বড়ো যখন ডাক দেন তখন বড়ো দাবি করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়ো।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পুজোর 'পরে আমাদের ভরসা বেশি। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন করে বলতে হচ্ছে যে, স্বরাজের ভিত বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড়ো হতে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষের বাইরে পড়ে থাকবে।

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিলবে এমন চর্চা এখানে কোনোদিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে—সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এইজন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়—যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য—তা হলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে, কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়-

বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্যন্ত এমনিই চলছে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারী হয়ে উঠছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্‌যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয় আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁট যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য— মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সংগে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরেজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সংগে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লন্ডের কবি ও কর্মবীর A. E.-রচিত *National Being* বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়— অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সংগে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবিসাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বৈকি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সংগে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা

পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ, তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু, দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না। দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু-ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না-হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুৎকারপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা-চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লন্ডে সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে *National Being* বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লন্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল করে দেখে; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বললেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্য দূর বা স্বরাজলাভ বললে যতখানি বোঝায় তোমার মতে চরকায় সুতো কাটার লক্ষ্য ততদূর পর্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কী। চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন চাষির এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থর হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চালিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাও-না কেন। মনে আছে, এইজাতীয় আর-একটা কথা পূর্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি তা হলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন-সমেত ভাত খেতে পেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ করে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইরকম এমন আরও অনেক জিনিস আছে যাকে আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন-না, তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনোটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্যদোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজলাভের যে-একটা বিশেষ উদ্‌যোগ চলছে, দেশসুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারও তো

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ও মহাত্মা

মনেও হয় না। তার কি কোনো কারণ নেই। এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার করে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশংকা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্মহানি হওয়ার আশংকা আছে—এ-সব কথাই সত্য বলে মানলেও তবু বলতেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেইজন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটোকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এইজন্যেই জলের শুচিতা-রক্ষার ধর্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্মের সঙ্গে আচারধর্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করছে, আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চারী দুর্বলতার আর-একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর-একদিন আর-কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়তো স্বারাজ্য-সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয় সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণা-সভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশি দিন চলে তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে একদিন সাধুলোকে নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের ফেন-পাত উপলক্ষে মানুষের রক্তপাত করতে থাকবে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তা হলে সেদিন ঈদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচারপরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি সে অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দারিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।

কেউ কেউ বলবেন, তুমি যে সমবায়জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তো তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দুসমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণু-তত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না; ওটা একটা কর্ম, ওটা একটা সত্য নয়। এইজন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকছে পুকুরের জল তখন মলিন হচ্ছে, ঘরের কানাচের কাছে গর্তয় ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহত প্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করছে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই—এই সাবধানতার মূলে প্যাস্টার-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতোই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্মটা পরিস্ফীত পিলেটারই মতো প্রকাণ্ড সেইজন্যেই এই কর্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচছে, মানুষ বাঁচছে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বসুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতোই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী

হতে পারে। তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক; তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক—এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি—অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণেই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু, সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে। ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু, আমার বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্বেও বার বার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য রক্ষা করেছেন আজও করবেন; আচার্য রায়মশায়ও জনাদরনিরপেক্ষ মত-স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতাসভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না করে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর, যাঁরা আমার দেশের লোক, যাঁদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদি বা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনোদিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি কালও তেমনি হয়তো এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

ভাদ্র ১৩৩২

স্বরাজসাধন

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুশি কথায় বলো, লেখায় লিখো না। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি, সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করি নে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয় তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে—কেবল উত্তরবায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে-একটা জিনিস আমাদের পেয়ে বসে সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে বিশ্বাস করি, সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি বলেই যুক্তি জুটিয়ে আনি, সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো-আনাই রাগ-বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে, যখন মতটা কোনো ফললোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না; কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। গণমনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগ্‌বিতণ্ডার

সাইক্লোন আকার ধরে; সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয় তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে এ কথায় যারা মেতে ওঠে তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হল, স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে বলে দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠল, শর্ত পালন করা হয় নি বলেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখলেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে শর্ত-প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার শর্ত আমরা পালন করি নে বলেই স্বরাজ পাই নে, এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুমুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে তা হলে স্বরাজ পাবার একটা বড়ো ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেকছে ঐখানেই যে, হিন্দুমুসলমানের মিলন হল না; যদি মিলত তবে পাঁজিতে প্রতি বৎসরে যে ৩৬৫টা দিন আছে সব কটা দিনই হত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির করে দিলে নেশা লাগে, তাই বলে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয় তা বলতে পারি নে।

পাঁজির নির্দিষ্ট দিন অনেক কাল হল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সংকীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা।

তা হলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসরকাল সুতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যাঁরা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্ছেন তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে তো। দরিদ্রের পক্ষে সেই বা কম কী। দেশের চাষিরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সুতো কাটে তা হলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে নেওয়া যাক, এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষিদের উদ্বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত সহজ তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধানভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে দিলেই হল না—ওরা চরকা কাটুক।

চাষি চাষ করা কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনি সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সংবৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর-একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরির কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা চলে ট্রামগাড়ির মতো। হাজার প্রয়োজন হলেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষিকে চাষের বাইরে যে কাজ

করতে বলা যায় তাতে তার মন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে যায়। তবু ঠেলেঠুলে তাকে হয়তো নড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষিরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তার পরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আর-এক জেলায় চাষি ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষি এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষি এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষি পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট একচেটে তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষিতে। অথচ আমি দেখেছি, এই চাষিই তার বালুজমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখাসত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো-একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে কী করে এক পথ থেকে আর-এক পথে চালানো যায় সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়, কোনো-একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাতলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয় তা বিশ্বাস করি নে—মানুষের মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। হিন্দুমুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষে হিন্দুরা খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন-কি, নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই, তবু ‘এহ বাহ্য’। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর-সমস্তই রুচিপূর্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট-ইস্টার্নের ভাতটা বাদ দিতেন; বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে। ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে; খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

আমাদের দেশের এই-সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ-উপার্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়োমানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই

হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধরেই নেওয়া যাক যে, চাষিরা তাদের অবসরকাল যদি লাভবান কাজে লাগায় তা হলে আমাদের স্বরাজ-লাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে; ধরেই নেওয়া যাক, এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

তা হলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে, চাষিদের অবকাশকালকে সম্যক্‌রূপে কী উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসংকট ঘটে তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে আমি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যরচনাতেই অভ্যস্ত। বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়তো হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি তা হলে শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড়ো করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি যে নিজেকে সর্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চা-ওয়ালার মতো আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চা-ওয়ালার মতো আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখতে বা স্কুলকলেজ-পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকলে হয়তো সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস, চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তাতে আমার সর্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদি বা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে চাষির দেহমনের যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে তার থেকে তাকে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি, মনের চর্চা যাদের কম গোঁড়ামি তাদের বেশি, সামান্য পরিমাণ নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগবশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে তাতে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষিকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোনো কোনো কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে-সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ-আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষির উদ্যমকে ষোলো-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষিকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল এটা এই মনে করেই করেছি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হলে তাতে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু, সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেও থাকেন; আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণ-

সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে, দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকেও ছোটো করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়। এ হল হিসাবি লোকের ছবি; এতে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবি শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না যা বৃহতের উপলব্ধি-জনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখতে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতেও পারে না, তখনো এইটেই তাকে কেবলই আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চার দিকে কেবলই ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধব্যাকরণের সূত্র, তা হলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হত, এবং তাও শিখতে লাগত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে এ কথা বলি নে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত; তার পরে সেটা ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা; তার পরে ১৫/২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে তোলবার কঠিন দুঃখও মা-বাপ স্বীকার করতে পারে। নইলে যদি একখানা আজানু পা নিয়েই তাদের চার-পাঁচ বছর কাটাতে হত, তা হলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর প'রে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত

ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তা হলে আত্মপ্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব; ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না; এইজন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন; নানা পথে এক লক্ষ্য-অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্‌যোগকে আমরা আয়তনে ছোটো বলে অবজ্ঞা করি তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি— স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব— আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে— তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে আমার প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়তো বলতেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিসটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে মানুষ সুতো কাটছে সেও একলা; তার চরকার সূত্র অন্য কারও সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্তভাবে নিজের চার দিকে রেশমের সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন তখন সেইসঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্‌-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন— চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু, যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্‌যোগ করছে তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব, গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজলাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম

নয়। অর্থাৎ শতকরা একশোর হারে লাভ না হলেও হয়তো শতকরা একের হারে লাভ; এই লাভই শতকরা একশোর সগোত্র, এমন-কি, সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণ-পথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

আশ্বিন ১৩৩২

রায়তের কথা

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে, আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর মহলে— কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্ধ্বলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স্‌। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা— কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা-রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বলছে 'অদৃষ্ট'। দেশের সেই পোলিটিশান্‌ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্‌স্‌ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বলছে, 'কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী'। তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার, এখন চলছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম 'চাই', আজ তেমনি জোরেই বলছি 'চাই নে'। সেইসঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ, এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু 'চাই নে' 'চাই নে' বলবার হুহুংকারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু 'চাই' জুড়ি তার আওয়াজ বড়ো মিহি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্রসমাজের পোলিটিকাল বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না।

তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন— কি শব্দসম্বলে কি অর্থসম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে। আর, যাদের অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করবার জন্যে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাঁকা ভঙ্গিটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপ্‌নি— তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিক্‌স্‌ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্‌সের সাজ-ফরমাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে-ছেঁটে বদলে জুড়ে যে সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দর্জির দোকানে চালান করলেই হবে। সাজের নামও জানি— একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য-মুখস্থ--কেননা, আমাদের কারখানাঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লেমেন্ট, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি, এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার বালাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তার পরে স্বরাজ যাদের জন্যে তারা। পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের মানুষ নিজের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেছে; জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো-একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজ্যের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিসের পেয়াদা আছে, গলায়-ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই-সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার ‘রায়তের কথা’ স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোতবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না; শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোতবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কি না, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে— আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভ লগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তার পরে পৌঁছবা মাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্‌ল তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্‌লের দোষ নয়; ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক; এতবড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাশানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এ দিকে হাল ফাশানের উৎসাহী মানুষ কোচ্‌বাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘষছে; ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলেছে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার ‘রায়তের কথা’ সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কম্যুনিজ্‌ম্‌, সিন্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি, রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, পিষে ফেলো, দলে ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বউয়ের দল বলছে, শাশুড়িগুলোকে গুন্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে! ভুলে যায় যে, মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভববন্ধন ছেদন করা যায় না— স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে— তাদের সে তর সয় না, তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্‌সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব-কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এল প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল, বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়; এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্‌ ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে গুন্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুন্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়— কিন্তু সেই দেখাদেখি নকল পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম; তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত-পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত-নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ-অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায় তাদের 'নামে রুচি' আছে, কিন্তু কাল যখন 'জীবে দয়া'র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তা হলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরা গাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটিবদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। 'রায়তের কথা'য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি—রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু, কাকে ছেড়ে দেব। অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারই হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্‌ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু, বই যদি পটলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি বিদ্যা নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়। সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে, মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু, চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষির সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-স্বত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীলচাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তা হলে নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মতলব এদের কারও মাথায় যে কোনোদিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই-সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল-খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো। মূল কথাটা এই— রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরুপ— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যাবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষির সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা-পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে— এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের অনুকূল করে নেওয়া মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন

বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু ততবড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশুবুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্বদা মোটর-চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম; কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

৫

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়! এও তেমনি। কিন্তু দেখতে দেখতে চাষির জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষির পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া—যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপ্‌রি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সংগে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষি নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো-মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে—জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে। নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিঁকবে কি না সন্দেহ।

আষাঢ় ১৩৩৩

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রত গ্রহণ করবার অধিকারী এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে যাঁরা পালন করবার শক্তি রাখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্য যেখানে, সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অতবড়ো বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি করেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী করতে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী করে তুলতে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু, যতক্ষণ তা উদ্ভিদে প্রাণীতে জৈব আকার না ধারণ করে ততক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। শুধুমাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে তাকে জীবনগত করবার শক্তি ক'জনারই বা আছে। সত্যকে জানে অনেক লোকে, তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান; প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের করে দিই। এই মানতে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিস। এই শক্তির সম্পদ যাঁরা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য; সত্যের প্রতি সেই নিষ্ঠার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব করে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মতো হয়ে উঠে তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন ক্ষয়হীন ক্লান্তিহীন অমৃতচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতায়।

অপঘাতের এই যে আঘাত শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ্য করতে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলতে পেরেছেন জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর তো শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করেই ফিরে যাবে না। ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্বেই, সে তো আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের তো কিছুই অবশেষ থাকে নি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের ক্ষতি যে চরম ক্ষতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সান্ত্বনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই-যে নিষ্ঠুরতা যা সমস্তকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে তো সহ্য করতে পারা যায় না। দুর্বল স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এতবড়ো হিংসার বোঝা বইবে কী করে। এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর দুঃখ সইবে কে।

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিপদ আসবে না এমন হতে পারে না— সংকটের সময় উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু, কী ভাবে বিপদকে আমরা ব্যবহার করি তারই উপরে প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করে। এই-যে পাপ কালো হয়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব, না এর কাছে মাথা নত করব? না যে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপুর উন্মত্ততাকে জাগ্রত করব? শিশুর আচরণে দেখা যায়, সে যখন আছাড় খায় তখন মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম। কিন্তু, যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায় তবে সে চিন্তা করে,

বাধাটা কোথায়— বাধা যদি থাকে তো সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসারণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধ-দ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়। আগুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ে ভস্ম হয়ে যায় তবে আগুনের রুদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় তো আগুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে যে, কূপ খনন করে রাখি নি সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের ঘর পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরও আজকে তাই বলতে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না, একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে, অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে না। বিদেশীয় রাজত্বে এইটেই আমাদের সব চেয়ে পীড়া দেয়। গায়ে-পড়া যোগটা দুর্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সম্বন্ধে সে আরও কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে— সেইখানেই যে ছিদ্র— ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণে রথযাত্রায় যখনি সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা-দ্বারা, সে রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে? যেখানে গর্তগুলো হাঁ করে আছে হাজার বছর ধরে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল; জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি। তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য! কিন্তু, এতবড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে, ডোবার কোনো দোষ নেই— ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে। কিন্তু, যখনি তাতে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি। আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম,

যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোশে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক্‌টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলেই যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই মার খাচ্ছি। এই মার নানা রূপে আসে— কিন্তু, আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে। মহাপুরুষেরা এই মারকে বক্ষে গ্রহণ করে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন। তাতেই আমাদের চৈতন্য হয়। এই-যে চৈতন্য এসেছে, রিপুর বশবর্তী হয়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করব, না, শুভবুদ্ধিদাতাকে বলব, যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদী গেঁথেছি, তার থেকেই বাঁচাও!

এই-যে রুদ্রবেশে পাপ দেখা দিল এ তো ভালোই হয়েছে এক ভাবে। আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কী করে একে চিরকালের মতো পরাভূত করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্‌ উপায় অবলম্বন করব। সহসা এ প্রশ্নের একটা পাকারকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা-আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা-আরম্ভের আয়োজন। আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্‌ ছিদ্র, কোন্‌ পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে; বলতে হবে, পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য; এসো আজ সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি। আমাদের পক্ষে এ বড়ো সহজ কথা নয়। কেননা, অন্তরের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহুদিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর। মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানসমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি— এক ঈশ্বরের নামে 'আল্লাহো আক্‌বর' বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব 'হিন্দু এসো' তখন কে আসবে। আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডি কত প্রাদেশিকতা— এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে। কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনো কখনো ইতিহাস উদ্ঘাটন করে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে; বলি, শিখরা তো একসময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সে তো শিখধর্ম দ্বারাই। পাঞ্জাবের কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্‌ জাতি সব, শিখধর্মের আহ্বানে একত্র হতে পেরেছিল; বাধাও দিতে পেরেছিল; ধর্মকেও রক্ষা করতে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজি একসময় ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভিত গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্দ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না; শিবাজির হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না; পেশোয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে। আমার কথা এই

যে, আমাদের মধ্যে এই-যে পাপ পুষে রেখেছি এতে কি শুধু আমাদেরই অকল্যাণ, সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করি নে, তাদের মধ্যে হিংসা জাগিয়ে তুলি নে? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না—কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে—কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সে তো ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায়। আর, তার শ্বাসই বা কতক্ষণ। আজ আমাদের অনুতাপের দিন, আজ অপরাধের ক্ষালন করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

মাঘ ১৩৩৩

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'

যখন খবর পাই রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা, অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা করে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই[১] লেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ; তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি, শ্রদ্ধা করেই লিখেছেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হল। কেননা, আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কিরকম প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারি নি। আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। যেমন এ কথা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ

---

[১] Sachindranath Sen, *Political Philosophy of Rabindranath* , 1929.

সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি— জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন বাধা পেল। বাধা পাবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, এর মধ্যে অনেক তর্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে। আর যাই হোক, নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয় কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

তবু এই ত্রুটিকেও উপেক্ষা করা চলে— কিন্তু এ কথা বলতেই হল যে, নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে একটা মূর্তি দেওয়া হয়েছে তাতে অংশত হয়তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এরকম হওয়াটা বোধ করি অবশ্যম্ভাবী। কোন্ কথাটার গুরুত্ব বেশি কোন্‌টার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেইভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে হল। রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি কী বলতে চেয়েছি তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এজন্যে দলিল ঘাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা জেগে আছে তারই অনুসরণ করব।

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হত, তাঁদের মনকে হয় য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃস্টান-ধর্মপ্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।

বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা-কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে মুগ্ধ হই তখন লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা-বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়; তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র, অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ

করতে চেষ্টা করি জিনিসটা আমারই—অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিসকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যতক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে, ভিতরে মিলে না যায়, ততক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগাবোলানো অক্ষরের মতো, মূলের চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তার গায়ে গায় সংলগ্ন। তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সে অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায়, বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে নি বলেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা করি—এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হল।

'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্নমেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমত কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজসাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজিভাষা-শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।

ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য—পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ পেতেন—সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত—তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই 'পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে

স্বীকার করাবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ-দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে, কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এইরকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি—একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বৈ কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা-দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল—লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না—কিন্তু তবু

দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে. তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে—তার কারণ, সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে; জীর্ণ মন্দিরে, শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ; জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না; রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকার-বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও যা আর আগে ধনলাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত—বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বৈ কমে না। 'স্বদেশী সমাজে' তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিংবা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে 'স্বদেশী সমাজে' আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার বহুধা শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকায় সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন—সে কি এই চরকা-চালনায়। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি। আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তরপ্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন ক'রে। স্বরাজ-সাধনযাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী

এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করছে—কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মতো পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সে দিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারংবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে 'আগে ফাউন্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব' বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে, 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব' তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার 'পরেই। একজন আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেক দিন থেকে বলে এসেছিলেন, 'রীতিমত স্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না।' তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন স্টুডিয়ো ছিল না ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল, স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না, মুখও চলে না। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

হিন্দুমুসলমান

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিসটা অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্টিট্যুশ্যন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকার-নির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তক্‌রার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি-বা আধ-রাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁশ হল, এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উল্টে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এতদিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার 'পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষ্যা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভ গ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমসলার ফর্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে; মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে, এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে।

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে।

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চ্‌কে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করে নি, কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খৃস্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা

দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত, অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনো নিজের অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খৃস্টান তা হলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয়কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইরেজ বন্ধু অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণ-পল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। অ্যান্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশ নিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি-অনুসারে অ্যান্ড্রুজের আচার বিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে— ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন। অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়।

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্ছে। জোর গলায় যেখানে বলছি আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, ‘ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই।’ এর ফল ফলছে— আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেইসঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে

অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসীতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসীর উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী। গরজ আমাদের যতই থাক্, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা-নিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে এমন আশা আছে কি। বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

একদল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারী করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপস করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এপর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, একজনের বা এক-দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার-পরিবেশনে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি একজোট হয়ে প্রসন্নমনে একঝোঁকা আপস করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো-একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল-বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না। এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোলো-আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোলো-আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপস করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের

এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপসের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতি-স্বীকার দাবি করছি সেটা য়ুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না—তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়ে ভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দুমুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশিদূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না। এমন-কি, পলিটিক্‌সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গামা বাধে নি। কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোর্‌বানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দুমুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু ‘এহ বাহ্য’। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খেলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করি নে, এমন-কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনি পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনি মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধস্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা দূত-সহযোগে কলকাতার

বাইরে ছড়িয়ে চলেছে তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে, এইসঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনি তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ-পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মত-বিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দুমুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক্‌— আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্‌কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষাব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে: অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এইরকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এরকম দানবিক কাণ্ড কখনো শোনা যায় নি। বৃটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের law and order পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিস-পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দুমুসলমান কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এইরকমের অমানুষিক ঘটনায় লোকস্মৃতিকে চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরও আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্তমানের ঝাঁঝে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে হিন্দুমুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে, সেইজন্যেই অবিলম্বে

এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদ্‌যোগে বোম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সব চেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ, সেখানে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয় নি। কারণ, পার্সি-সমাজ সাধারণত শিক্ষিতসমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনি নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্যোগের কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েছে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের উপায় উদ্ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ, নিজের বোঝাকে অবস্থাপরিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল-সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিঁকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবামাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

শ্রাবণ ১৩৩৮

হিজলি ও চট্টগ্রাম

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই-যে হিজলির গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক-নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা-দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমল হোম, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
হিজলি-রাজবন্দী-হত্যা-প্রতিবাদসভার পথে

হিজলি-রাজবন্দী-হত্যার প্রতিবাদে ভাষণদান-রত রবীন্দ্রনাথ
কলিকাতা মনুমেন্ট (শহীদ মিনার)-এর সম্মুখে

যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায়-প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে সেই-সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক-না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উগ্র উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্ককলাঙ্কিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে অত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্‌কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিন দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেইসঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।

কার্তিক ১৩৩৮

২

হিজলি কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র[১] খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশি অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই-সব অত্যন্ত-চড়া-নাড়ী-ওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে; এদের বাসা আরামের, আহারবিহার স্বাস্থ্যকর; এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই-সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।

অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি এবং লোভ ক্লেশ ক্রোধের এত দুর্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃত কার্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এরকম

---

[১] *The Statesman*

অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদ্‌ভূত হলেও আইন তার সমর্থন করে না; করে না বলেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারি হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক করে জোগান দেওয়া হয় এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশাস্তির আশা পোষণ করছে, যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাকে অপমানিত করা হবে এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ-প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে এ কথা মুহূর্তের জন্যেও আশা করি নে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে-সব গোঁড়ার দল যথারীতি-প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়—এমন-কি, যদিও বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে। বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তারা কোনো কঠোর দায়িত্ব কল্পনা করে নেয়, তবে সেইসঙ্গে এ কথাও যেন মনে স্থির রাখে যে সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় ইস্কুলমাস্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ংগম করে নিয়েছে, এবং এও বলা বাহুল্য যে, সেই ইতিহাস রাজা প্রজা উভয়পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইনবিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ—অনতিকাল পূর্বে আয়র্লান্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

তথাপি বে-আইনি অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে, যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

পরিশেষে আমি বিশেষ ভাবে গবর্মেন্টকে এবং সেইসঙ্গে আমার দেশবাসীগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনই শান্ত হোক। ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশকে বাধামুক্ত করে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারো পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এরকম উভয়পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক—এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

নবযুগ

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহতের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা; এই হল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে

না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি, সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক; এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য বলেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য, বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই-যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ কাজ মালীও করতে পারত; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না; সে কেবল তার কর্তব্য করে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করছি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'এর সমষ্টি; কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়, 'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঙর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি, ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক; নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য ও অনার্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল; ভারতবর্ষ তখনো প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার পরে আর-একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য-অনার্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরও দেখেছি, এক সময় যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মকাণ্ড আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেছে। তখন এই বাণী উঠল যে, নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্মপীড়ন নয়, সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়, সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে কার কী এল গেল। কিন্তু, যিনি সত্যকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত; তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য, তাই তপস্যা। তখন বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবামাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি। ইহুদিদের মধ্যেও দেখি, ফ্যারিসিরা সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড়ো স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড়ো কথা নয়—কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়।

তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরে বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত করে হীন করে রেখে পুণ্য বলি কাকে!

আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্‌ণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত বলে একটা কোন্‌ পদার্থ তাদের আছে মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো বলে জেনেছে। যদি কারও মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ করে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত, তা হলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাত তা নয়, সে দণ্ডনীয় হত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তা হলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে মানবধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্ধ্বে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে।

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয়রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের ক্ষালন। এর থেকে মনে হয়, যে অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারি নে।

আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেছে। আর্যে-অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজ যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে তবে বাঁচব কী করে। রাউন্ড টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না।

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশজোড়া এতবড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন।

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, এখনো তার শেষ হয় নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্যবস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সংকোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এতবড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন

এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।

৭ পৌষ ১৩৩৯

প্রচলিত দণ্ডনীতি

আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক্, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এইরকম পোলিটিকাল দশা পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় বলে আমি মনে করি নে।

দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে কিছু যদি বলতে হয় তবে আমি বলব, প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।

মনে আছে, ছেলেবেলায় পুলিসকে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা-বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানবজীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব-ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেইরকম। তাই তখন মনে করতুম, চোরও বুঝি মানুষজাতির স্বভাবগণ্ডির অত্যন্ত বাইরেকার বিকৃতি। এমন সময় চোরকে স্বচক্ষে দেখলুম, আমাদেরই বাড়ি থেকে অত্যন্ত ত্রস্ত হয়ে দারোয়ানদের লক্ষ এড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, সে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মতো, এমন-কি, তার চেয়ে দুর্বল।

আমার সেদিনকার চমক আজও ভাঙবার সময় আসে নি। যারা যে কারণেই হোক আইন ভেঙে অপরাধীর শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করতে মন বাধা পায় না। ধরে রেখেছি তারা আমাদের মতো নয়; আর যারা আমাদের মতো নয় তাদের প্রতি আচরণ অত্যাচার হয়ে উঠলে সমস্ত সমাজেরই যেন সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজের গূঢ় অন্তরে যে নির্দয় প্রবৃত্তি আছে তাই চরিতার্থ করবার উপলক্ষ হয়ে ওঠে এরা।

আমার আর-একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, এ ঘটেছিল পরের বয়সে। একদিন কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম, পুলিস একজন আসামীকে— সে অপরাধ করে থাকতেও পারে, নাও পারে— কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে। মানুষকে এমন জন্তুর মতো করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া, এতে আমাদের সকলেরই অপমান। আমার মনে এটা এত যে লেগেছিল তার একটা কারণ, এরকম কুদৃশ্য আমি ইংলন্ডে বা য়ুরোপের আর-কোথাও দেখি নি। এর মধ্যে দুটো আঘাত একত্রে ছিল— এক হচ্ছে মানুষের প্রতি অপমান; আর-এক, বিশেষভাবে আমার দেশের লোকের প্রতি অপমান— এক হচ্ছে আইনভাঙা অপরাধীর প্রতি নির্দয়তা; আর-এক, আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা। সুতরাং সেই অবজ্ঞার ভাগী আমরা সকলেই। আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে।

নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী, এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসংগত। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে পাগলাগারদ পর্যন্ত এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, মানুষের মনে যে বর্বর মরে নি

নির্দয়তায় সে রস পায়। সভ্য দেশে সেই রসসম্ভোগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তার কারণ, কালক্রমে মানুষ খানিকটা সভ্য হয়েছে, সেই খানিকটা-সভ্য মানুষ আপনার ভিতরকার বর্বর মানুষকে লজ্জা দেয় এবং সংযত করে। যেখানে সেই সংযমের দাবি নেই সেখানে বর্বর সম্পূর্ণ ছাড়া পায়, নির্দয়তাই বৈধ হয়ে ওঠে। জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন পীড়িত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশি অতিক্রম করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম যদি জেলখানা আশ্রয় করে না থাকত, তা হলে ওখান থেকে দণ্ডবিধির দুর্বিষহ উগ্রতা লজ্জিত হয়ে চলে যেত। পাপকে সমাজের যে-কোনো জায়গাতেই ছোটো বড়ো যে-কোনো আকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তলে তলে সে আপন সীমা বাড়িয়ে চলতে থাকে। তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপে। সেখানে সভ্যনামধারী বড়ো বড়ো দেশে শাস্তিদানের দানবিক দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে সর্বত্র সভ্যতাকে যেরকম বিদ্রূপ করতে উদ্যত হয়েছে, তার মূল রয়েছে সকল দেশের সব জেলখানাতেই। অনেক কাল থেকে অনেক খরচ করে শয়তানকে মানুষের রক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্যে বড়ো বড়ো পিঞ্জর রাখা হয়েছে। হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক ফাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এই-সব জেলখানায়।

এই-সব শাসনকেন্দ্র আপন আশেপাশে মনুষ্যত্বের কিরকম বিকৃতি ঘটাতে থাকে তার একটা দৃষ্টান্ত অনেক দিন পরে আমি আজও ভুলতে পারি নি। চীনযাত্রাকালে আমাদের জাহাজ পৌঁছল হংকং বন্দরে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একজন চীনা ফেরিওয়ালা জাহাজের যাত্রীদের কাছে পণ্য বিক্রি করবার চেষ্টায় তীরে এসেছিল। তাদের নিষেধ করবার নিয়ম হয়তো ছিল। সেই কর্তব্য পালনের উপলক্ষে দেখলুম, আমাদের স্বদেশীয় শিখ কন্‌স্‌টেবল তার বেণী ধরে টেনে অনায়াসে তাকে লাথি মারলে। রূঢ়তা করার ঔদ্ধত্যের যে আনন্দ আদিম অসংস্কৃত বুদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে দণ্ডনীতির অসভ্যতাই তাকে অবারিত করবার সুযোগ দেয়।

মনে মনে কল্পনা করলুম, একজন য়ুরোপীয়—সে ফেরিওয়ালা নয়, হয়তো সে চোর, সে প্রতারক, সে দুর্বৃত্ত—তাকে ঐ শিখ কন্‌স্‌টেবল গ্রেফ্‌তার করত, কর্তব্যের অনুরোধে মাথায় এক ঘা লাঠিও বসাতে পারত, কিন্তু তাকে কানে ধরে লাথি মারতে পারত না। ঐ কন্‌স্‌টেবল নিষেধ করেছিল ফেরিওয়ালাকে, লাথি মেরেছিল সমস্ত জাতকে। অবজ্ঞাভাজন জাতির মানুষ কেবল যে অপমান ভোগ করে তা নয়, সহজেই তার সম্বন্ধে দণ্ডের কঠোরতা প্রবল হয়ে ওঠে। হয় যে, তার কারণ মানুষের গূঢ় দুষ্প্রবৃত্তি এই-সকল ক্ষেত্রে বর্বরতার রসসম্ভোগের সুযোগ পায়।

বেণী ধরে টেনে লাথি মারতে যারা অকুণ্ঠিত সেই-শ্রেণীয় রাজানুচর এ দেশে নিঃসন্দেহ অনেক আছে। যে কারণে চীনে তাদের দেখেছি সেই কারণ এখানেও প্রবল। সেই অবজ্ঞা এবং তার আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতা স্থায়ীভাবে এ দেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, এ কথা আমরা অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের কথা আমি বলব। তখন শিলাইদহে ছিলুম। সেখানকার জেলেদের আমি ভালোরকম করেই জানতুম। তাদের জীবিকা জলের উপর। ডাঙার অধিকার যেমন পাকা, জলের অধিকার তেমন নয়। জলের মালেকরা তাদের উপর যেমন তেমন অত্যাচার করতে পারত; এই হিসাবে চাষিদের চেয়েও জেলেরা অসহায়। একবার জলকলের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে কোনো নৌকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ তুলে নিল নিজের ডিঙিতে। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটত। অন্যায় সহ্য করে যাওয়াই যার পক্ষে বাঁচবার সহজ উপায় এইবার সে সইতে পারল না, দিলে সেই কর্মচারীর কান কেটে। তার পরে রাত্রি তখন দু'পহর হবে, জেলেদের কাছ থেকে আমার বোটে লোক এল; বললে, সমস্ত জেলেপাড়ায় পুলিস লেগেছে। বললে, কঠোর আচরণ থেকে আমাদের মেয়েদের ছেলেদের রক্ষা করুন। তখনি একটি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলুম। সরকারি কাজে বাধা দেবার জন্যে নয়, কেবল উপস্থিত থাকবার জন্যে। তার অন্য শক্তি নেই, কিন্তু ভদ্র

ব্যবহারের আদর্শ আছে। উপস্থিতি-দ্বারা সেই আদর্শকে প্রকাশ করেই অন্যায়ের সে প্রতিবাদ করতে পারবে।

আমাদের দেশের কারাবাসীদের সম্বন্ধেও তার বেশি আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা জানাতে পারি কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা ভদ্র নয়, মানবধর্মের দোহাই দিতে পারি। কিন্তু জানাব কাকে, দোহাই দেব কার সামনে দাঁড়িয়ে। জানাতে হবে তাদেরই যারা বেণী ধরে টান দেবার দলে, যারা মধ্যবর্তী, যারা বিদেশী রাজ্যশাসনের আধারে স্বদেশীর প্রতি অসম্মান ভরে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেবার পূর্বে আইনে বাঁধা অত্যন্ত সতর্ক বিচারের প্রণালী আছে। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। এই নীতির 'পরে আমাদের দাবি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এক সময়ে সরাসরি কাজির বিচার প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত আন্দাজের উপর, পক্ষপাতের উপর যে বিচারপ্রণালীর ভিত্তি ছিল তাকে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এ কথা আজ আমাদের কাছে সহজ হয়েছে যে, অপরাধের অপবাদ-আরোপের পর থেকেই কোনো অভিযুক্তের প্রতি অন্যায় করা সহজ ছিল যে যুগে সে যুগের দণ্ডনীতি সভ্য আদর্শের ছিল না; মানুষের স্বাধীনতার অধিকার তখন অনিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। সভ্য-দেশে এ কথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্য প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের ভিতর দিয়ে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর প্রয়োজন আছে। এই বিশ্বাসের 'পরে যদি আস্থা না রাখি তা হলে আইন-আদালতকে প্রকাণ্ড অপব্যয়ের খেলা বলতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে নির্বিশেষে সকল মানুষের 'পরে যে সম্মান আছে এতদিন ধরে সেই নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখছি। এও জানি, এত সাবধান হয়েও অনেক ঘটনায় অপরাধের শেষ মীমাংসা হয় নি। বহু নির্দোষী দণ্ডভোগ করেছে।

তবু যদি স্থির হয় যে বিশেষ স্থলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোপনে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আন্দাজে বিচার ও আশু শাস্তিদান অনিবার্য, তবে তা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে এমন স্থলে শাস্তির পরিমাণ দুঃসহ না হওয়াই উচিত, এমন হওয়া চাই যাতে বিচারের ভুলে নিরপরাধের প্রতি শাস্তি অতি কঠোর হয়ে অনুতাপের কারণ না ঘটে। কেবলমাত্র বন্দীদশাই তো কম দুখকর নয়, তার উপরে শাসনের ঝালমসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে তোলাকে তো কোনোমতেই সভ্যনীতি বলতে পারি নে। ঝালমসলা যে কটুজাতীয়, বাহির থেকে তার আন্দাজ করতে পারি মাত্র। যখন বৈধ উপায়ে নিঃসন্দেহে দোষ-প্রমাণ-চেষ্টার অসুবিধা আছে বলে মনে করা হয়, অন্তত তখন এই সংশয়ের ক্ষেত্রে করুণার স্থান রাখা চাই।

কারাগার থেকে অন্তিম মুহূর্তে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যক্ষ্মারোগে মরবার জন্যে, তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের নিশ্চিত যোগ্য—এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি!

বহুদিনসঞ্চিত একটা দুঃখের কথা কি আজ বলব। অল্প কালের মধ্যে দেশে অনেক বড়ো বড়ো মারকাট খুনোখুনি হয়ে গেছে। যাঁরা চক্ষে দেখেছেন, আত্মীয়স্বজনসহ তাঁরা অসহ্য দুঃখ পেয়েছেন। যাঁরা ভিতরের কথা জানেন তাঁদের যোগে যে-সব জনশ্রুতি দেশে রাষ্ট্র হয়েছে, দেশের লোক তাকে বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ পেয়েছেন। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ এই নির্দয় ব্যাপারকে পোলিটিকাল অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করেন নি বলে অনুমানকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিনা জবাবদিহিতে কারো কোনো দণ্ডবিধান করেন নি। অপর ক্ষেত্রে তাই করেছেন এবং দেশের প্রতিনিধিরা একে ন্যায্য বলে সমর্থনও করেন। পলিটিক্সে খুনজখম লুঠপাটের জন্যে যারা দায়ী তারা ঘৃণ্য, অপর ক্ষেত্রেও যারা দায়ী তারা কম ঘৃণ্য নয়। এক ক্ষেত্রে গোপন সন্ধানে তাদের আবিষ্কার করা সহজ, অপর ক্ষেত্রে সহজ নয়, এমন অদ্ভুত কথা বলা চলে না। উভয় ব্যাপারেই শাসনের প্রয়োজন আছে। হয়তো গুপ্ত পাপচক্রান্তের বিধিনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়—তবুও পাপের হেয়তা ও পরিমাণ কোনো পক্ষেই কম নয়।

পূর্বেই বলেছি, দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোনো পক্ষেই হিংসার মূল্যে হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে; কিন্তু সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্‌কারের দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, উভয় পক্ষেই। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনো-প্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ করব।

২৯ শ্রাবণ ১৩৪৪

সভ্যতার সংকট

প্রকাশ : ১৯৪১

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপিয়রের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজচরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বন্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

‘সিভিলিজেশন’, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বন্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন

আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম—সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষ্যা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল।

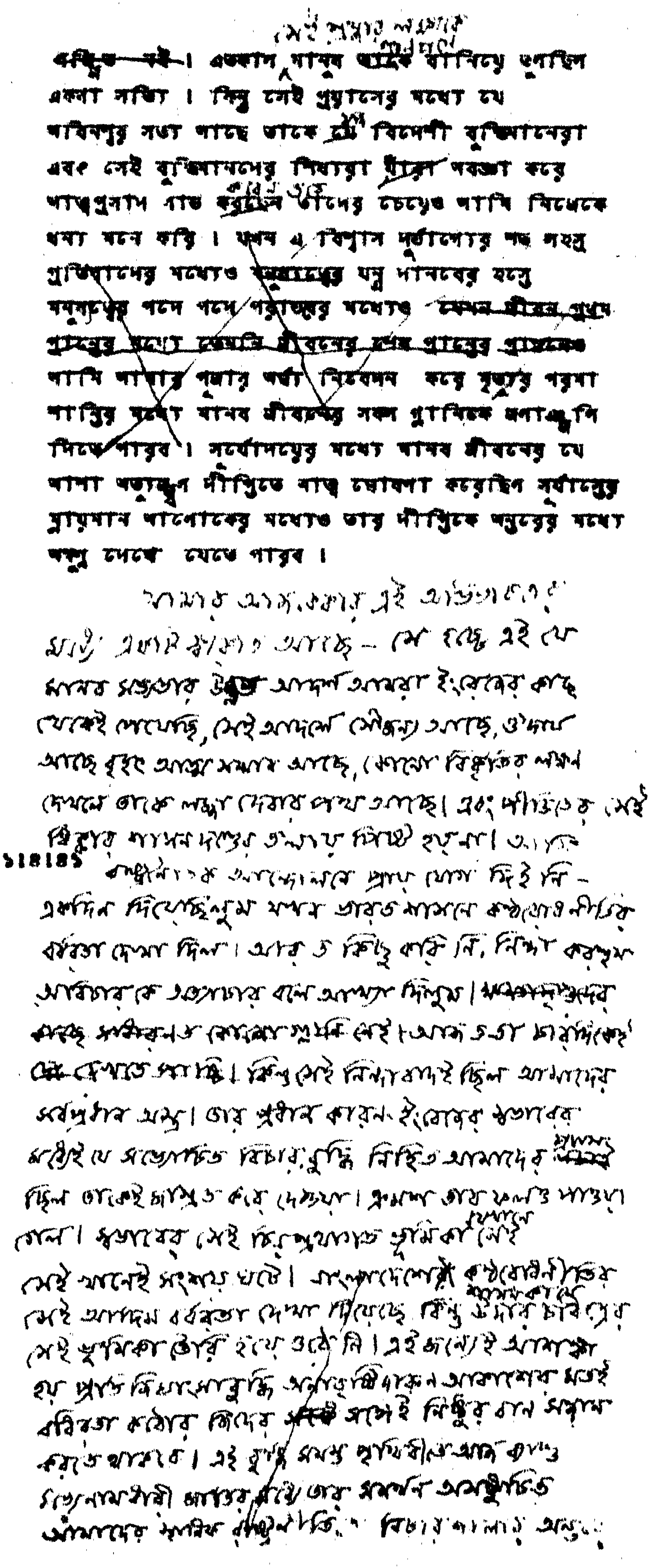

সেই সভ্যতার লক্ষ্মীকে
আনন্দে

~~ঘনীভূত হবে~~। একদিন মানুষ ~~যাকে~~ বাঁধিয়ে তুলেছিল
একদা সত্যি । কিন্তু সেই প্রত্যয়ের মধ্যে যে
আবিষ্কার সত্য আছে তাকে ~~যারা~~ ঐ বিদেশী বুদ্ধিমানেরা
এবং সেই বুদ্ধিমানদের শিষ্যেরা ~~যারা~~ অবজ্ঞা করে
আত্মপ্রসাদ লাভ ~~করুন~~ করবেন ওঁরা তাঁদের চেয়েও আমি নিজেকে
ধন্য মনে করি । যখন এ বিশ্বাস দুর্ভাগ্যের শত শত
প্রতিঘাতের মধ্যেও ~~মানুষের~~ দস্যু দানবের দন্ত
মনুষ্যত্বের পদে পদে পরাভবের মধ্যেও ~~যেমন জীবনের প্রথম~~
~~প্রভাতের মধ্যে দেখেছি জীবনের শেষ প্রান্তের প্রারম্ভেও~~
আমি আমার পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে মৃত্যুর পরম
শান্তির মধ্যে মানব জীবনের সকল গ্লানিকে জলাঞ্জলি
দিতে পারব । সূর্যোদয়ের মধ্যে মানব জীবনের যে
আশা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে আত্মঘোষণা করেছিল সূর্যাস্তের
ম্লায়মান আলোকের মধ্যেও তার দীপ্তিকে অন্তরের মধ্যে
অক্ষুণ্ণ রেখে যেতে পারব ।

আমার আজকার এই আক্ষেপের
মাত্র একটুখানি আছে — সে হচ্ছে এই যে
মানব সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আমরা ইংরেজের কাছ
থেকেই পেয়েছি, সেই আদর্শে সৌজন্য আছে, ঔদার্য
আছে বৃহৎ আত্মসম্মান আছে, (কোনো বিকৃতির লক্ষণ
দেখলে তাকে লজ্জা দেবার পথ আছে। এবং সাহিত্যেও সেই
বিকৃতির শাসনদণ্ডের উদ্যত নিষেধ হয় না। আমরা
১।৪।৪১ রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে প্রায় যোগ দিই নি —
একদিন দিয়েছিলুম যখন ভারত শাসনে কর্তৃপক্ষীয়ের
বর্বরতা দেখা দিল। আর তো কিছু করি নি, নিন্দা করলুম
অবিচারকে অত্যাচার বলে আখ্যা দিলুম। ~~[illegible]~~
[illegible] আজ পর্যন্ত কোনো সুফল নেই। আজও তা চারদিকে
~~চোখে~~ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই নিন্দাবাদই ছিল আমাদের
সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তার প্রধান কারণ ইংরেজের স্বভাবের
মধ্যেই যে সত্যোচিত বিচারবুদ্ধি নিহিত আমাদের ~~[illegible]~~ সুশাসন
ছিল তাকেই জাগ্রত করে দেওয়া। প্রায়শ তার ফলও পাওয়া
গেল। স্বভাবের সেই চিরাভ্যস্ত ভূমিকা যেখানে সেই
সেই স্থানেই সংশয় ঘটে। আমাদের দেশেও কর্তৃত্বপ্রভাবে
সেই আদিম বর্বরতা দেখা দিয়েছে কিন্তু ওঁদের চরিত্রের
সেই ভূমিকা তৈরি হয়ে ওঠে নি। এই জন্যেই আশঙ্কা
হয় প্রবল বিধ্বংসবুদ্ধি [illegible] আকাশে যতই
বর্বরতা করবার জিদের ~~[illegible]~~ সঙ্গেই নিষ্ঠুর দান সন্ধান
করতে থাকবে। এই যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীতে আজ ব্যাপ্ত
[illegible] জাতির মধ্যে তার সর্বশেষ অসঙ্কোচিত
আমাদের [illegible] [illegible] বিচারশালায় অনু[illegible]

‘সভ্যতার সংকট’; প্রাথমিক খসড়ার পাণ্ডুলিপিচিত্র। মুদ্রিত পাঠ থেকে স্বতন্ত্র।

সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলন্ড কিরকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষী-রূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ-শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে অ্যান্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণবয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি

এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন
১ বৈশাখ ১৩৪৮

পরিশিষ্ট

১ ১৯২৮ সালে শ্রীনিকেতনে এক সম্মিলনের উদ্‌বোধন উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ‘সমবায়নীতি’ নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৫৪ সালে অপর তিনটি প্রবন্ধসহ এই প্রবন্ধটি একই নামে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালাভুক্ত হয়, ‘পরিশিষ্ট’ রূপে মুদ্রিত ‘কালান্তর’ গ্রন্থভুক্ত ‘চরকা’ প্রবন্ধের অংশটি বর্তমান রচনাবলীতে বর্জিত। ভূমিকারূপে ব্যবহৃত বাণী ১৯২৮ সালে বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের কর্মীদের উদ্দেশে রচিত হয়েছিল।

২ ‘পল্লীপ্রকৃতি’ নামে ‘বিচিত্রা’-য় (বৈশাখ ১৩৩৫) প্রকাশিত প্রবন্ধটি পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়। ১৯৬২ সালে এই প্রবন্ধটিসহ ভারতবর্ষে পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও প্রবন্ধসমূহ একত্র গ্রন্থাকারে ‘পল্লীপ্রকৃতি’ নামে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বর্তমান রচনাবলীতে স্থান পায় নি।

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

সেই আসন অনেককাল প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা বহুকাল ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষ্যা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই। শ্রীহীন অনাদৃত দেশে যমরাজের শাসন দিনে দিনে রুদ্রমূর্তিতে প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লিভূমির রিক্তস্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহার নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, সেবা-দ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন-দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিনসঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দেবতার অভিশাপকে সেই সাধকেরা দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন এই আমি একান্তমনে কামনা করি।

[১৯২৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায় ১

সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। তাই, যখন আমরা পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দিই; বিধাতা কিংবা মানুষ যদি বাহির হইতে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধুলার উপর আধ-মরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিজের হাতে যে কোনো উপায় আছে, এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এইজন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে—শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, হার মানিবার ধর্ম নয়। মানুষ যেখানে আপনার সেই ধর্ম ভুলিয়াছে সেইখানেই সে আপনার দুর্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ দুঃখ পায় দুঃখকে মানিয়া লইবার জন্য নয়, কিন্তু নূতন শক্তিতে নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিবার জন্য। এমনি করিয়াই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি কোনো দেশে এমন দেখা যায় যে সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ অচল হইয়া পড়িয়া দৈবের পথ তাকাইয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানুষ সে দেশে মানুষের হিসাবে খাটো হইয়া গেছে।

মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো-আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামি এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

মানুষ যে পরস্পর মিলিয়া তবে সত্য মানুষ হইয়াছে তার গোড়াকার একটা কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। মানুষ কথা বলে, মানুষের ভাষা আছে। জন্তুর ভাষা নাই। মানুষের এই ভাষার ফলটা কী। যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অন্যের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা কওয়ার জোরে আমার মন দশ জনের হয়, দশ জনের মন আমার হয়। ইহাতেই মানুষ অনেকে মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড়ো হইয়া উঠে। এই বড়ো ভাবনার ঐশ্বর্যেই মানুষের মনের গরিবিয়ানা ঘুচিয়াছে।

তার পরে মানুষ যখন এই ভাষাকে অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে শিখিল তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ আরও অনেক বড়ো হইয়া উঠিল। কেননা, মুখের কথা বেশি দূর পৌঁছায় না। মুখের কথা ক্রমে মানুষ ভুলিয়া যায়; মুখে মুখে এক কথা আর হইয়া উঠে। কিন্তু লেখার

কথা সাগর পর্বত পার হইয়া যায়, অথচ তার বদল হয় না। এমনি করিয়া যত বেশি মানুষের মনের যোগ হয় তার ভাবনাও তত বড়ো হইয়া উঠে; তখন প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার মানুষের ভাবনার সামগ্রী লাভ করে। ইহাতেই তার মন ধনী হয়।

শুধু তাই নয়, অক্ষরে লেখা ভাষায় মানুষের মনের যোগ সজীব মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়, যে মানুষ হাজার বছর আগে জন্মিয়াছিল তার মনের সঙ্গে আর আজকের দিনের আমার মনের আড়াল ঘুচিয়া যায়। এত বড়ো মনের যোগে তবে মানুষ যাকে বলে সভ্যতা তাই ঘটিয়াছে। সভ্যতা কী। আর কিছু নয়, যে অবস্থায় মানুষের এমন-একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতি মানুষের শক্তি সকল মানুষকে শক্তি দেয় এবং সকল মানুষের শক্তি প্রতি মানুষকে শক্তিমান করিয়া তোলে।

আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না। য়ুরোপে যখন প্রথম আগুনের কল বাহির হইল তখন অনেক লোক, যারা হাত চালাইয়া কাজ করিত, তারা বেকার হইয়া পড়িল। কলের সঙ্গে শুধু-হাতে মানুষ লড়িবে কী করিয়া? কিন্তু য়ুরোপে মানুষ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না। সেখানে একের জন্য অন্যে ভাবিতে শিখিয়াছে; সে দেশে কোথাও ভাবনার কোনো কারণ ঘটিলেই সেই ভাবনার দায় অনেকে মিলিয়া মাথা পাতিয়া লয়। তাই বেকার কারিগরদের জন্য সেখানে মানুষ ভাবিতে বসিয়া গেল। বড়ো বড়ো মূলধন না হলে তো কল চলে না; তবে যার মূলধন নাই সে কি কেবল কারখানায় সস্তা মাহিনায় মজুরি করিয়াই মরিবে এবং মজুরি না জুটিলে নিরুপায়ে না খাইয়া শুকাইতে থাকিবে? যেখানে সভ্যতার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে দেশের কোনো-এক দল লোক উপবাসে মরিবে বা দুর্গতিতে তলাইয়া যাইবে ইহা মানুষ সহ্য করিতে পারে না; কেননা, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগে সকলের ভালো হওয়া, ইহাই সভ্যতার প্রাণ। এইজন্য য়ুরোপে যাঁরা কেবল গরিবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তাঁরা এই বুঝিলেন যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোনো উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড়ো হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে কাজ আপনিই বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। গরিবের সংগতিলাভের উপায় এই-যে মিলনের রাস্তা য়ুরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো উপার্জনের রাস্তা হইবে।

আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পরে খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এই-সব জমি চাষ করে। কারও-বা দুই বিঘা জমি, কারও-বা চার, কারও-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয়, হালের গোরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টর চেয়ে বেশি, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকাবাঁকা সীমানায় হাল বার বার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে; প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি

মুনফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। এইজন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থাকিত না।

এইরূপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ার মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া যতই কান্নাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

এ কথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এ-সব কথা পরের কারখানাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে-কলমে ব্যবহার করিলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই হুহু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল-লাঙলে অল্প জমিতে অল্প একটু আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী-বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়তো কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় দুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাটা যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।

কিন্তু কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরিব চাষীদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মস্ত একটা মরণের গর্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া, সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলা-ঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যাবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যাবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যাবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেনমার্ক্ প্রভৃতি ছোটো-ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়ের যোগে

সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে। এমনি করিয়া শুধু টাকার নয়, মনে ও শিক্ষায় সে বড়ো হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কোঅপারেটিভ-প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ্ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। কোন্ কাজটা বিশেষ দরকারি এ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া— বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বমানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে— আর-এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক দিকে তাহারা দুর্বল ও একঘরে হইয়া আছে। এখানেও তাহাদিগকে মানুষের বড়ো সংসারের মহাপ্রাঙ্গণে ডাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে তাহাদিগকে বড়োমানুষ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা যাহাতে মাটির দিকে তাহারা প্রশস্ত অধিকার পায় এবং ডালপালার দ্বারা বাতাস ও আলোকের দিকে তাহারা পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাই করা চাই। তাহার পরে ফলফুল আপনিই ফলিতে থাকিবে, কাহাকেও সেজন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

শ্রাবণ ১৩২৫

সমবায় ২

মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোলো-আনা পেয়ে থাকে।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ ক্রোধ মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন। কেননা, এই-সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মনকে দখল করে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল সে আপনার নিজের লাভকেই বড়ো করে দেখে, এই অংশে সে অন্য সকলকে খাটো করে দেখে; তখন অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে দুঃখ দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়। এইরকম যে-সকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অন্যের কথা ভুলে

যাই, তারা যে কেবল অন্যের পক্ষেই শত্রু তা নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু; কেননা, সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই-যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহুমানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না; পোস্ট অফিস জিনিসটি বহু মানুষের সংযোগ-সাধনের ফল, সেই ফল এতই বড়ো যে তাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোস্ট অফিসের যোগে ধর্মে অর্থে শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মানুষের কী প্রভূত উপকার করছে হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার কত-যে অনুষ্ঠান চলছে তা বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই; সকলেরই তা জানা আছে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায়-বশত সেই সুযোগে কোনো বাধা ঘটে সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানেই মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা, পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে, মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম-উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই হচ্ছে ধর্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় ধনেও কল্যাণের দাবি খাটে, না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেয়ে তা উপরের জিনিস। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি করে, রক্তপাত করে ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ-সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানবসমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড়ো মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবলমাত্র তাঁর নিজের চিঠি-চালাচালির বন্দোবস্ত করতে চান তা হলে সামান্য চাষার চেয়েও তাঁকে ঠকতে হবে; অথচ পূর্বকালে এমন এক দিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনো ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম-উপদেশ দিতেন তবে হয়তো তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েকজনের চিঠিপত্রের

ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্রচালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এক দিকে রাজশক্তি অন্য দিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। রাজার প্রতি ধর্ম-উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গলসাধনই তাঁর কর্তব্য। সে কথা কেউ-বা শুনতেন, কেউ-বা আধাআধি শুনতেন, কেউ-বা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখসম্ভোগ, নিজের প্রতাপ-বৃদ্ধিকেই মুখ্য করে প্রজার মঙ্গলসাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ অনেক দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকলরকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই 'য়ুনাইটেড স্টেটস্'-এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।

এইজন্যে, যথেষ্টপরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা-আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পাবে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনি সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায়-প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকলরকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাংক-স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।...

ফাল্গুন ১৩২৯

ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা

বহুদিন পূর্বে, এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা যখন অনেকেই বালক ছিলেন বা জন্মান নি, তখন একদা ভেবেছিলাম যে, পূর্বকালে আমাদের সমাজদেহে প্রাণক্রিয়ার একটা বিশেষ প্রণালী সুস্থ ও অব্যাহত ভাবে কাজ করছিল। পাশ্চাত্য মহাদেশে এক-একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রাণশক্তিকে সংহত করে জনচিত্ত আর্থিক ও পারমার্থিক ও বুদ্ধিগত ঐশ্বর্য সৃষ্টি করছে। সেই-সকল কেন্দ্র থেকেই তাদের শক্তির যথার্থ উৎস। ভারতবর্ষে সর্বজনচিত্ত ধর্মে কর্মে ভোগে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছিল। সেইজন্যেই নানা কালে বিদেশী নানা রাজশক্তির আঘাত অভিঘাত তার পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে নি। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এই-সকল পাঠশালার অধিষ্ঠানস্থল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আবহমান আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরই ছিল। তখনকার কালে ঐশ্বর্যের ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। এক-একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহুশাখাবিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানা দিকে প্রসারিত হত। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনি ভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয় নি, অন্নের অভাব হয় নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি। সেইটাতে আঘাত করলে যখন ইউরোপীয় আদর্শে নগরগুলিই দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠতে লাগল। আগে গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই যে একটা সামাজিক যোগ ছিল বাইরের আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল খণ্ড খণ্ড হওয়াতে গ্রামে গ্রামে আমাদের প্রাণদৈন্য ঘটল। একদিন যখন বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে আমার নিত্যসংস্রব ছিল তখন এই চিন্তাটাই আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। সেদিন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখেছি যে, যে ব্যাপক ব্যবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণকে সকলরকমে মানুষ করে রেখেছিল আজ তাতে ব্যাঘাত হচ্ছে, দেশের সর্বত্র প্রাণের রস সহজে সঞ্চারিত হবার পথগুলি আজ অবরুদ্ধ। আমার মনে হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টা ভিত্তিহীন, আমাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই কথাই আমি তখন (১৩১১ সালে) 'স্বদেশী সমাজ'-নামক বক্তৃতায় বলেছি। কিন্তু কেবলমাত্র কথার দ্বারা শ্রোতার চিত্তকে জাগরিত করে আমাদের দেশে ফল অল্পই পাওয়া যায়, তাই কেজো বুদ্ধি আমার না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো গ্রাম নিয়ে সেগুলিকে ভিতরের দিক থেকে সচেতন করার কাজে আমি নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন তরুণ যুবক সহযোগীরূপে ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে একটি জিনিস আমার শিক্ষা হয়েছে সেটি এই—দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞান হোক, মানুষ যে গভীর দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরে যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে; এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনি বিকৃত হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনি তার জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেত্রে শস্য সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনাকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যেই সে সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

গ্রামে আগুন লাগল। দেখা গেল, সে আগুন সমস্ত গ্রামকে ভস্ম করে তবে নিবল। এটি হল বাইরের কথা। ভিতরের কথা হচ্ছে, অন্তরের যোগে মানুষে মানুষে ভালো করে মিলতে পারল না; সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধিকে জীর্ণ

করে, সাহসকে কাবু করে, সকলরকম কর্মকেই বাধা দেয়, এইজন্যেই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না; এইজন্যেই জ্বলন্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে কেবল হাহাকারেই কণ্ঠ মিলিয়েছে, আর কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয় নি।

পর্বে পর্বে মানবসভ্যতা এগিয়েছে। প্রত্যেক পর্বেই মানুষ প্রশস্ততর করে এই সত্যটাকেই আবিষ্কার করেছে। মানুষ যখন অরণ্যের মধ্যে ছিল তখন তার পরস্পরের মিলনের প্রাকৃতিক বাধা ছিল। পদে পদে সে বাইরের দিকে অবরুদ্ধ ছিল। এইজন্যে তার ভিতরের দিকের অবরোধও ঘোচে নি। অরণ্যের থেকে যখন সে নদীতে এসে পৌঁছল সে এমন-একটা বেগবান পথ পেলে যাতে দূরে দূরে তার যোগ বাইরের দিকে ও সেই সুযোগে ভিতরের দিকে প্রসারিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই উপায়ে মানুষ আপন সত্যকে বড়ো করে পেতে চলল। অরণ্যের বাইরে এই নদীর মুক্ত তীরে সভ্যতার এক নূতন অধ্যায়। প্রাচীন ভারতে গঙ্গা সভ্যতাকে পরিণতি ও বিস্তৃতি দেওয়ার পুণ্যকর্ম করেছে। পঞ্চনদের জলধারায় অভিষিক্ত ভূখণ্ডকে একদা ভারতবাসী পুণ্যভূমি বলে জানত, সেও এইজন্যেই। গঙ্গাও আপন জলাধারার উপর দিয়ে মানুষের যোগের ধারাকে, সেইসঙ্গেই তার জ্ঞান ধর্ম কর্মের ধারাকেও, ভারতের পশ্চিমগিরিতট থেকে আরম্ভ করে পূর্ব-সমুদ্রতট পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। সে কথা আজও ভারতবর্ষ ভুলতে পারে নি।

সভ্যতার আরণ্যপর্বে দেখি মানুষ বনের মধ্যে পশুপালনদ্বারা জীবিকানির্বাহ করছে; তখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে নিজের নিজের ভোগের প্রয়োজন সাধন করেছে। যখন কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হল তখন বহু লোকের অন্নকে বহু লোকে সমবেত হয়ে উৎপন্ন করতে লাগল। এই নিয়মিতভাবে প্রচুর অন্ন-উৎপাদনের দ্বারাই বহু লোকের একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হল। এইরূপে বহু লোকের মিলনেই মানবের সত্য, সেই মিলনেই তার সভ্যতা।

এক কালে জনকরাজা ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি। তিনি এই সভ্যতার অন্নময় ও জ্ঞানময় দুটি ধারাকে নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। কৃষি ও ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। এই দুয়ের মধ্যেই ঐক্যসাধনার দুই পথ। সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন না। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞসম্ভবা রামায়ণের সীতা তেমনি কৃষিসম্ভবা। হলবিদারণ-রেখায় জনক তাকে পেয়েছিলেন। এই সীতাই, এই কৃষিবিদ্যাই, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাক্ষস-দমন বীরের সঙ্গিনী হয়ে সে-সময়কার সভ্যতার ঐক্যবন্ধনে আর্য-অনার্য সকলকে বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল। ধর্মসাধনায় ব্রহ্মবিদ্যার সেই একই কাজ। যখন প্রত্যেক স্তবকারী আপন স্তবমন্ত্র ও বাহ্যপূজাবিধির মায়াগুণে আপন দেবতার উপরে বিশেষ প্রভাব-বিস্তারের আশা করত— তখন দেবত্ববোধের ভিতর দিয়ে মানুষ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের ঐক্যবোধ সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক মহলে এক কালে প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র সৃষ্টির মত প্রচলিত ছিল। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তখন মানুষের ধারণা ছিল খণ্ডিত। ডারুইন যখন জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মূলগত ঐক্য আবিষ্কার ও প্রচার করলেন তখন এই একটি সত্যের আলোক বৈজ্ঞানিক ঐক্যবুদ্ধির পথ জুড়ে জীবে অবারিত করে দিলে।

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকল-প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপারে ঐক্যবোধের যোগে য়ুরোপে জ্ঞান ও শক্তির আশ্চর্য উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এত উন্নতি মানুষের ইতিহাসে কোথাও আর-কখনো হয়েছে বলে আমরা জানি নে। এই উৎকর্ষলাভের আর-একটি কারণ এই যে, য়ুরোপের জ্ঞানসমৃদ্ধিকে পরিপূর্ণ করবার কাজে য়ুরোপের সকল দেশের চিত্তই মিলিত হয়েছে।

আবার অন্য দিকে দেখতে পাই, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতায় য়ুরোপ মানুষের ঐক্যমূলক মহাসত্যকে একেবারেই অস্বীকার করেছে। তাই এই দিকে বিনাশের যজ্ঞহুতাশনে য়ুরোপ যেরকম প্রচণ্ড বলে ও প্রকাণ্ড পরিমাণে নররক্তের আহুতি দিতে বসেছে মানুষের ইতিহাসে কোনোদিন এমন কখনোই হয় নি। সত্যবিদ্রোহের মহাপাপে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ আর শান্তি নেই। জগৎ জুড়ে সর্বত্রই মানুষের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিত্ত মিথ্যায়, কপটতায়, নরঘাতী নিষ্ঠুরতায় নির্লজ্জভাবে কলুষিত। দেখে মনে হয়, সত্যবিচ্যুত মানুষ একটা বিশ্বব্যাপী আত্মসংহারের আয়োজনে তার সমস্ত ধনজন জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সামাজিক দিকে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিকে করে নি। অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে; এইখানেই সে আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অনিচ্ছুক। এইখানে তার মনের ভাবটা একলা-মানুষের ভাব, এইখানে তার নৈতিক দায়িত্ববোধ ক্ষীণ।

এই নিয়ে যখন আমরা বিপ্লবোন্মত্ত ভাব ধারণ করি তখন সাধারণত ধনিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ নিয়েই উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ খাটে, অনেক সময়ে সে কথা ভুলে যাই। একজন আইনজীবী হয়তো একখানা দলিল মাত্র পড়ে কিংবা আদালতে দাঁড়িয়ে গরিব মক্কেলের কাছে পাঁচ-সাত শো, হাজার, দু হাজার টাকা দাবি করেন; সেখানে তাঁরা অন্যপক্ষের অজ্ঞতা-অক্ষমতার ট্যাক্‌সো যথাসম্ভব শুষে আদায় করে নেন। কারখানার মালিক ধনিকেরাও ঠিক তাই করেন। পরস্পরের পেটের দায়ের অসাম্যের উপরেই তাঁদের শোষণের জোর। আমাদের দেশে কন্যাপক্ষের কাছে বরপক্ষ অসংগত পরিমাণে পণ দাবি করে; তার কারণ, বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য। কন্যার বিবাহ করতেই হবে, বরের না করলেও চলে, এই অসাম্যের উপর চাপ দিয়েই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর দণ্ড দাবি করতে বাধা পায় না। এ স্থলে ধর্মোপদেশ দিয়ে ফল হয় না, পরস্পরের ভিতরকার অসাম্য দূর করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমান যুগে ধনোপার্জনের অধ্যবসায়ে প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের নানা রুদ্ধ কক্ষ খোলবার নানা চাবি যখন থেকে বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে তখন থেকে যারা সেই শক্তিকে আয়ত্ত করেছে এবং যারা করে নি তাদের মধ্যে অসাম্য অত্যন্ত অধিক হয়ে উঠেছে। এক কালে পণ্য-উৎপাদনের শক্তি, তার উপকরণ ও তার মুনফা ছিল অল্পপরিমিত সুতরাং তার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হতে পারে নি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজের অন্য সকল সম্পদকেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটা বিপুল অসাম্য সৃষ্টি করছে যাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পড়ছে। ধন আজ যেন মানবশক্তির সীমা লঙ্ঘন করে দানবশক্তি হয়ে দাঁড়াল, মনুষ্যত্বের বড়ো বড়ো দাবি তার কাছে হীনবল হয়েছে। যন্ত্রসহায় পুঞ্জীভূত ধন আর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধারণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জস্যের সুযোগটা যাদের পক্ষে তারাই অপর পক্ষকে একেবারে অন্তিম মাত্রা পর্যন্ত দলন করে নিজের অতিপুষ্টি সাধন করে এবং ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠে সমাজদেহের ভারসামঞ্জস্যকে নষ্ট করতে থাকে।

সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনি সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন-সকল রিপু প্রবল হয়—এমন-সকল ব্যবস্থাবিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ, যাতে করে অল্প লোকে বহু লোকের সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে বহু লোকের দুঃখ ও দাস্য-ভারে আধ-মরা হয়ে থাকে নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

য়ুরোপে এই বিদ্রোহের বেগ অনেক দিন থেকেই ক্রমে বেড়ে উঠছে। য়ুরোপে সকল-রকম অসামঞ্জস্য আপন সংশোধনের জন্যে সর্বপ্রথমেই মার-কাটের পথ নেবার দিকেই ঝোঁকে।

তার কারণ য়ুরোপীয়ের রক্তের মধ্যে একটা সংহারের প্রবৃত্তি আছে। দেশে বিদেশে অকারণে পশুপক্ষী ধ্বংস করে তারা এই হিংসাবৃত্তির তৃপ্তি করে বেড়ায়; সেইজন্যেই যখন কোনো-একটা বিশেষ অবস্থার ক্রিয়া তাদের পছন্দ না হয় তখন সেই অবস্থার মূলে যে আইডিয়া আছে তার উপরে হস্তক্ষেপ করবার আগেই তারা মানুষকে মেরে উজাড় করে দিতে চায়। বাতাসে যখন রোগের বীজ ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সেই বীজ যে মানুষকে পেয়ে বসেছে সেই মানুষটাকে মেরে ফেলে রোগের বীজ মরে না। বর্তমান কালে সমাজে অতি পরিমাণে যে আর্থিক অসামঞ্জস্য প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে তার মূলে আছে লোভ। লোভ মানুষের চিরদিনই আছে। কিন্তু যে পরিমাণে থাকলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তার কাজে লাগে, সেই সাধারণ সীমা খুব বেশি ছাড়িয়ে যায় নি। কিন্তু এখন সেই লোভের আকর্ষণ প্রচণ্ড প্রবল; কেননা, লাভের আয়তন প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে। অর্থ-উৎপাদনের উপায়গুলি আগেকার চেয়ে বহুশক্তিসম্পন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত লোভের কারণগুলি বাইরে আছে ততক্ষণ এক মানুষের মধ্যে সেটাকে তাড়া করলে সে আর-এক মানুষের উপর চাপবে; এমন-কি, যে লোকটা আজ তাড়া করছে সেই লোকটারই কাঁধে কাল ভর দিয়ে বসবার আশঙ্কা খুবই আছে। লোভটাকে অপরিমিতরূপে তৃপ্ত করবার উপায় এক জায়গায় বেশি করে সংহত হলেই সেটা তার আকর্ষণশক্তির প্রবলতায় লোকচিত্তকে কেবলই বিচলিত করতে থাকে। সেটাকে যথাসম্ভব সকলের মধ্যে চারিয়ে দিতে পারলে তবে সেই আন্দোলন থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক মানুষের মধ্যে যে অর্থকরী শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বড়ো মূলধন তাদের নিজের আয়ত্ত করে বড়ো ব্যাবসা ফাঁদে; এই সংঘবন্ধ শক্তির কাছে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে হার মানতে হয়। এর একটিমাত্র উপায় বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি যদি স্বতঃই একত্রিত হতে পারে এবং সম্মিলিত ভাবে ধন উৎপাদন করে। তা হলে ধনের স্রোতটা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। ধনীকে মেরে এ কাজ সম্পন্ন হয় না, ধনকে সকলের মধ্যে মুক্তিদানের দ্বারাই হতে পারে, অর্থাৎ ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

প্রাচীন যুগে অতিকায় জন্তুসকল এক দেহে প্রভূত মাংস ও শক্তি পুঞ্জীভূত করেছিল। মানুষ অতিকায় রূপ ধরে তাদের পরাস্ত করে নি। ছোটো ছোটো দুর্বল মানুষ পৃথিবীতে এল। এক বৃহৎ জীবের শক্তিকে তারা পরাস্ত করতে পারল বহু বিচ্ছিন্ন জীবের শক্তির মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করে। আজ প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্য-শক্তির ঐক্যে বিরাট, শক্তিসম্পন্ন। তাই মানুষ পৃথিবীতে জীবলোক জয় করছে।

আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হয়েছে সমবায়-প্রণালীতে ধন-উপার্জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে। আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার-কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে মানবনীতির স্থান ছিল না বলেই এত অশান্তি ছিল সেখানে সেই মানবসত্যের আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজও দুর্বল হবে জয়ী— প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য করে। সেই জয়ধ্বজা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশের সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডেনমার্কের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি কথা তিনি ভুলেছেন, ভারতবর্ষের অবস্থা ও ডেনমার্কের অবস্থা ঠিক সমান নয়। ডেনমার্ক্ আজ dairy farm-এ যে উন্নতি করেছে তার মূলে শুধু সমবায় নয়; সেখানকার গবর্মেন্টের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় dairy farm-এর উন্নতির জন্য প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। ডেনমার্কের মতো স্বাধীন দেশেই সরকারের তরফ থেকে সাধারণকে এমন সাহায্য করা সম্ভব।

ডেনমার্কের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, সে দেশ রণসজ্জার বিপুল ভারে পীড়িত নয়। তার সমস্ত অর্থই প্রজার বিচিত্র কল্যাণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হতে পারে। প্রজার শিক্ষা

স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সম্পদের জন্যও আমাদের রাজস্বের ভারমোচন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রজাহিতের জন্য রাজস্বের যে উদ্‌বৃত্ত থাকে তা শিক্ষাবিধান প্রভৃতি কাজের জন্য যৎসামান্য। এখানেও আমাদের সমস্যা হচ্ছে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির নিরতিশয় অসাম্য। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণের জন্যে সমবায়-প্রণালীর দ্বারাই, নিজের শক্তি-উপলব্ধি-দ্বারাই অসাম্য-জনিত দৈন্যদুর্গতির উপর ভিতর থেকে জয়ী হতে হবে। এই কথাটি আমি বহুকাল থেকে বার বার বলেছি, আজও বার বার বলতে হবে।

আমাদের দেশে একদিন ছিল ধনীর ধনের উপর সমাজের দাবি। ধনী তার ধনের দায়িত্ব লোকমতের প্রভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হত। তাতে তখনকার দিনে কাজ চলেছে, সমাজ বেঁচেছে। কিন্তু সেই দানদাক্ষিণ্যের প্রথা থাকাতে সাধারণ লোকে আত্মবশ হতে শিখতে পারে নি। তারা অনুভব করে নি যে, গ্রামের অন্ন ও জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও আনন্দ তাদের প্রত্যেকের শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে। সেই কারণেই আজ যখন আমাদের সমাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে, ধনের ভোগ যখন একান্ত ব্যক্তিগত হল, ধনের দায়িত্ব যখন লোকহিতে সহজভাবে নিযুক্ত নয়, তখন লোক আপন হিতসাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। আজ ধনীরা শহরে এসে ধনভোগ করছে বলেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে এ কথা বিশ্বাস করবার শক্তি তাদের নেই। গোড়ায় অন্নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলেই দেশ ক্রমে সকল দিকেই বাঁচবে। অতএব সমবায়নীতির দ্বারা এই সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য। লঙ্কার বহুখাদ্যখাদক দশমুণ্ডধারী বহু-অর্থ-গৃধ্নু দশ-হাতওয়ালা রাবণকে মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধ শক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্যে সেই প্রেমকে চাই, সেই মিলনকে চাই।

২ জুলাই ১৯২৭

সমবায়নীতি

সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশি বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে এই তার গৌরব।

সামাজিকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনোই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর-একটা কারণ এই যে, নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে ওঠে। সেখানে মুখ্যত মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। এইজন্যে শহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনাশুনো না থাকলেও লজ্জা নেই। জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাল্যকালে দেখেছি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়ভাবে নিয়তই মেলামেশা করত। আমাদের পুকুরে আশপাশের সকল লোকেরই স্নান, প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন এবং পূজার ফুল তুলতে কারও বাধা ছিল না। আমাদের বারান্দায় চৌকি পেতে যে যখন খুশি তামাক দাবি করত। বাড়িতে ক্রিয়াকর্মের ভোজে ও আমোদ-আহ্লাদে পাড়ার সকল লোকেরই অধিকার এবং আনুকূল্য ছিল। তখনকার ইমারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আঙিনার ব্যবস্থা কেবল যে আলোছায়ার অবাধ প্রবেশের জন্য তা নয়, সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশের জন্যে। তখন নিজের প্রয়োজনের মাঝখানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত;

নিজের সম্পত্তি একেবারে কষাকষি করে নিজেরই ভোগের মাপে ছিল না। ধনীর ভাণ্ডারের এক দরজা ছিল তার নিজের দিকে, এক দরজা সমাজের দিকে। তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারি দিকের লোকের মধ্যে ছিল ছড়ানো। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ম তার মানেই ছিল রবাহূত অনাহূত সকলকে নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ।

এর থেকে বুঝতে পারি, বাংলাদেশের গ্রামের যে সামাজিক প্রকৃতি শহরেও সেদিন তা স্থান পেয়েছে। শহরের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের চেহারার মিল তেমন না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাতন কালে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আপন নাগরিকতার অভিমান সত্ত্বেও গ্রামগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করত। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর-অন্দরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর বেশি বটে, কিন্তু আরাম এবং অবকাশ অন্দরে; উভয়ের মধ্যে হৃদয়সম্বন্ধের পথ খোলা।

এখন তা নেই, এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে ‘ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ’; গ্রামগুলি শহরকে চারি দিকেই ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে।

এরকম অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। বলা আবশ্যক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত পাশ্চাত্য হাওয়ায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে এসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এতে যে কেবল মানবজাতির সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণঘাতক। অতএব এই সমস্যার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সে সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ করে বিশেষ শক্তিকে সংহত করে তোলে, সে যেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিঃশেষিত করে। বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক-ঝোঁকা হয়ে ওঠে; তারই কেন্দ্রবহির্গত ভারে সমস্তটার মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্য। য়ুরোপে সেই ফাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই নানা আকারের আত্মবিদ্রোহে। কু-ক্লুক্স্-ক্ল্যান, সোভিয়েট, ফ্যাসিস্ট, কর্মিক বিদ্রোহ, নারী-বিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ আত্মঘাতীরূপে সেখানকার সমাজের গ্রন্থিভেদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে এক্স্প্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র-বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভুত্বের শক্তিচর্চার জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা আবশ্যক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়, এই বিধানে মানবধর্মের চেয়ে যন্ত্রধর্ম প্রবল। এই যন্ত্রব্যবস্থাকে আয়ত্ত যে করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতাবৃত্তি যথোচিত উৎসাহ পায় না।

শক্তি-উদ্ভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখনি তা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তখনি তার ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়। আধুনিক সভ্যতায় সেই পরিমিতি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, এ সভ্যতা বিরলাঙ্গিক নয়, বহুলাঙ্গিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার জন্যে বহু আয়োজনের দরকার; একে ব্যয় করতে হয় বিস্তর। এই সভ্যতায় সম্বলের স্বল্পতা একটা অপরাধেরই মতো, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাঁড়িয়ে আছে; যেখানেই অর্থদৈন্য সেখানেই এর বিরুদ্ধতা। বিদ্যাই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, আমোদ-আহ্লাদ হোক, রাস্তাঘাট, আইন-আদালত, যান-বাহন অশন-আসন যুদ্ধচালনা শান্তিরক্ষা সমস্তই বহুধনসাধ্য। এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতিক্ষণেই অপমানিত করে। কেননা, দারিদ্র্য একে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে।

এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত আজ-

কালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধন-অর্জনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারের লোভ। সভ্যতা যখন এখনকার মতো এমন বহুলাঙ্গিক ছিল না তখন পণ্ডিতের গুণীর বীরের দাতার কীর্তিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল; সেই সমাদরের দ্বারা যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের সম্মান করা হত। তখন ধনসঞ্চয়ীদের 'পরে সাধারণের অবজ্ঞা ছিল। এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতার পূজায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে, আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোনো দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্যবাহুচালনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মথিত এবং এই লোভপরিতৃপ্তির আয়োজন তার অন্য-সকল উদ্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই জানতে হবে যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কারণ, লোভ সামাজিকতার প্রতিকূল প্রবৃত্তি। যাতেই মানুষের সামাজিকতাকে দুর্বল করে তাতেই পদে পদে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, অশান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দেয় না, শেষকালে মানুষের সমাজস্থিতি বিভক্ত হয়ে পঞ্চত্ব পায়।

পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি, যারা ধন-অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। মেটবার উপায়ও নেই। কেননা, যে মানুষ টাকা করছে তারও লোভ যতখানি যে মানুষ টাকা জোগাচ্ছে তারও লোভ তার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার সুযোগ যথেষ্টপরিমাণে ভোগ করবার জন্যে প্রচুর ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জায়গায় এসে থামবে, এমন আশা করা যায় না।

লোভের উত্তেজনা, শক্তির উপাসনা, যে অবস্থায় সমাজে কোনো কারণে অসংযত হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-সাধনার দিকে মন দিতে পারে না; সে প্রবল হতে চায়, পরিপূর্ণ হতে চায় না। এইরকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন জোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন-একটা ভাগ হয় যাতে এক দিকে পড়ে তীব্র আলো, আর-এক দিকে গভীর অন্ধকার। য়ুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্বাঙ্গীণতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে। প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত সভ্যতা তার নগরে সংহত ছিল; তাতে ক্ষণকালের জন্য ঐশ্বর্যসৃষ্টি করে সে লুপ্ত হয়েছে। প্রভু এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালি ছিল নাগরিক। কিছুকাল সে প্রবলভাবে শক্তির সাধনা করেছিল। কিন্তু শক্তির প্রকৃতি সহজেই অসামাজিক—সে শক্তিমান ও শক্তির বাহনকে একান্ত বিভক্ত করে দেয়, তাতে করে অল্পসংখ্যক প্রভু বহুসংখ্যক দাসের পরাশিত হয়ে পড়ে. এই পারাশিত্য মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক; সেখানকার লোকে কেবল নিজের দেশে নয়, জগৎ জুড়ে মানবলোককে আলো-অন্ধকারে ভাগ করছে। তাদের এত বেশি আকাঙ্ক্ষা যে, সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সহজে তাদের নিজের অধিকারের মধ্যে হতেই পারে না। ইংলন্ডের মানুষ যে ঐশ্বর্যকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে জানে তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরূপে পেতেই হবে; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অতিভোগী সভ্যতার আদর্শকে খর্ব না করে তার উপায় নেই। যে শক্তিসাধনা তার চরম লক্ষ্য সেই সাধনার উপকরণরূপে তার পক্ষে দাস-জাতির প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমস্ত ব্রিটিশ জাতি সমস্ত ভারতবর্ষের পরাশিতরূপে বাস করছে। এই কারণেই য়ুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এশিয়া-আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে ব্যস্ত; নইলে তাদের ভোগবহুল সভ্যতাকে আধ-পেটা থাকতে হয়। এই কারণে বৃহদাংশিকের উপর ন্যূনাংশিকের পারাশিত্য তাদের নিজের দেশেও বড়ো হয়ে উঠেছে। অতিভোগের সম্বল সর্বসাধারণের মধ্যে সমতল্য হতেই পারে না, অল্পলোকের সঞ্চয়কে প্রভূত করতে গেলে বহুলোককে বঞ্চিত হতেই হয়।

পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই আজ সবচেয়ে উগ্রভাবে উদ্যত। সেখানে কর্মিক ও ধনিকে যে বিরোধ, তার মূলে এই অপরিমিত ভোগের জন্য সংহত লোভ। তাতে করেই ধনিক ও ধনের বাহনে একান্ত বিভাগ, যেমন বিভাগ বিদেশীয় প্রভুজাতির সঙ্গে দাস-জাতির। তারা অত্যন্ত পৃথক। এই অত্যন্ত পার্থক্য মানবধর্মবিরুদ্ধ; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য যেখানেই পীড়িত সেইখানেই বিনাশের শক্তি প্রকাশ্য বা গোপন ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এইজন্যেই মানবসমাজের প্রভু প্রত্যক্ষভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রত্যক্ষভাবে তার চেয়ে বড়ো মার মারে; সে ধর্মবুদ্ধিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে সেইটে গোড়া ঘেঁষে সাংঘাতিক; কেননা অন্নের অভাবে মরে পশু, ধর্মের অভাবে মরে মানুষ।

ঈশপের গল্পে আছে, সতর্ক হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিকেই সে বাণ খেয়ে মরেছে। বর্তমান মানবসভ্যতায় কানা দিক হচ্ছে তার বৈষয়িক দিক। আজকের দিনে দেখি, জ্ঞান-অর্জনের দিকে য়ুরোপের একটা বৃহৎ ও বিচিত্র সহযোগিতা, কিন্তু বিষয়-অর্জনের দিকে তার দারুণ প্রতিযোগিতা। তার ফলে বর্তমান যুগে জ্ঞানের আলোক য়ুরোপের এক প্রদীপে সহস্রশিখায় জ্বলে উঠে আধুনিক কালকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছে। জ্ঞানের প্রভাবে য়ুরোপ পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহাদেশের উপর মাথা তুলেছে। মানুষের জ্ঞানের যজ্ঞে আজ য়ুরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিত; তার হোমানলে সে বহু দিক থেকে বহু ইন্ধন একত্র করছে, এ যেন কখনো নিববে না, এমন এর আয়োজন এবং প্রভাব। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের এমন বহুব্যাপক সমবায়নীতি আর কখনো দেখা যায় নি। ইতিপূর্বে প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিদ্যা নিজে উদ্ভাবন করেছে। গ্রীসের বিদ্যা প্রধানত গ্রীসের, রোমের বিদ্যা রোমের, ভারতের চীনেরও তাই। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয় মহাদেশের দেশপ্রদেশগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, তাদের প্রাকৃতিক বেড়াগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়— অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমি বা উত্তুঙ্গ গিরিমালা-দ্বারা তারা একান্ত পৃথক্‌কৃত হয় নি। তার পরে এক সময়ে এক ধর্ম য়ুরোপের সকল দেশকেই অধিকার করেছিল; শুধু তাই নয়, এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল অনেক কাল পর্যন্ত ছিল এক রোমে।

এক লাটিন ভাষা অবলম্বন করে অনেক শতাব্দী ধরে য়ুরোপের সকল দেশ বিদ্যালোচনা করেছে। এই ধর্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিদ্যার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক, এক খৃস্টের প্রেমই তার কেন্দ্র এবং সর্বমানবের সেবাই সেই ধর্মের অনুশাসন। অবশেষে লাটিনের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ আপন ভাষাতেই বিদ্যার চর্চা করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু সমবায়নীতি অনুসারে নানা দেশের সেই বিদ্যা এক প্রণালীতে সঞ্চারিত ও একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকেই জন্মাল পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমবায়মূলক জ্ঞানের সভ্যতা— বিদ্যার ক্ষেত্রে বহু প্রত্যঙ্গের সংযোগে একাঙ্গীকৃত সভ্যতা। আমরা প্রাচ্য সভ্যতা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্তের সমবায়-মূলক নয়; এর যে পরিচয় সে নেতিবাচক, অর্থাৎ এ সভ্যতা য়ুরোপীয় নয় এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু মেলে নি যে তা নয়, অনেক বিষয় তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সভ্যতার বাহ্যিক রূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতীয় হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া-বাসী সেমেটিকের অত্যন্ত বৈষম্য। এই উভয়ের চিত্তের ঐশ্বর্য পৃথক ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন কালের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে খণ্ডিত। ঐতিহাসিক সংঘাতে কোনো কোনো অংশে কিছু-কিছু দেনা-পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এশিয়ার চিত্ত এক কলেবর ধারণ করে নি। এইজন্য যখন ‘প্রাচ্য সভ্যতা’ শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখতে পাই।

এশিয়ার এই বিচ্ছিন্ন সভ্যতা বর্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, য়ুরোপ পেরেছে; তার কারণ সমবায়নীতি মনুষ্যত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।

কিন্তু এই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্‌খানে বিনাশের বীজরোপণ চলেছে? যেখানে তার মানবধর্মের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারে নি। সে হচ্ছে তার বিষয়ব্যাপারের দিক। এইখানে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলীকৃত। তার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পরবিরুদ্ধতা জেগেছে। এক দিকে দেখছি মানুষকে বাঁচাবার বিদ্যা সেখানে প্রত্যহ দ্রুতবেগে অগ্রসর—ভূমিতে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব মানুষ এমন ক'রে আর কোনোদিন লাভ করে নি; এরা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবার আর-এক দিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনোদিন দেখা যায় নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহোৎসাহে প্রবৃত্ত। এত বড়ো আত্মঘাতী অধ্যবসায় এর আগে মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারত না। জ্ঞানসমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে আত্মবিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্যে উদ্যত। মানুষের সমবায়নীতি ও অসমবায়নীতির বিরুদ্ধফলের এমন প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখি নি। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান যুগে মানুষ বাঁচাবার পথে চলেছে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মারবার পথে। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। চতুষ্পদ পশুদের আছে চার পা, হাত নেই; জীবিকার জন্যে যতটুকু কাজ আবশ্যক তা তারা একরকম করে চালিয়ে নেয়। সেই কোনো একরকমে চালানোতেই দৈন্য ও পরাভব। মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে দুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করবার জন্যে। তাতে তার কাজের শক্তি বিস্তর বেড়ে গেছে। সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীবজগতে অন্য-সব জন্তুর উপরে সে জয়ী হয়েছে; আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখনি কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্রসাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায় তখনি জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিকটা পশুদের দিক, এর পূর্ণতাই মানুষের। মানুষের এই শক্তিকে খর্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাভব।

শক্তিকে খর্ব করব না, অথচ সংহত শক্তি-দ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কী করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ একজন বা একদল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয় তখনি বাকি লোকদের পক্ষে মুশকিল ঘটে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি একজনের এবং তারই অনুচরদের মধ্যে প্রধানত সংকীর্ণ হয়ে ছিল। এমন অবস্থায় সেই একজন বা কয়েকজনের ইচ্ছাই আর-সকলের ইচ্ছাকে অভিভূত করে রাখে। তখন অন্যায় অবিচার শাসনবিকার থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্মের দোহাই পাড়তে হত। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। অধিকাংশ স্থলেই শক্তিমানের কান ধর্মের কাহিনী শোনবার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা জোর করে রাজার শক্তি হরণ করেছে। তারা এই কথা বলেছে যে, 'আমাদেরই সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জায়গায় সংহত করার দ্বারাই আমরা বঞ্চিত হই। যদি সেই শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তা হলে আমাদের শক্তি-সমবায়ে সেটা আমাদের সম্মিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।' ইংলণ্ডে সেই সুযোগ ঘটেছে। অন্যান্য অনেক দেশে যে ঘটে নি তার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে কর্মে মিলিত করবার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তি সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদায়ের

মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমত করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব' তা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্বলতায় কোনো বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।

বিষয়ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপন মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে আসছে। এই ক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্তভাবে আপনারই লোভের বাহন করেছে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের দুঃখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই অসংখ্য দাসকে বল্গায় বেঁধে ও চাবুক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্ছে। আর্তরা ও আর্তবন্ধুরা কেবল ধর্মের দোহাই পেড়েছে, বলেছে 'অর্থও জমাতে থাকো, ধর্মকেও খুইয়ো না'। কিন্তু শক্তিমানের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে, 'আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি নে; জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্যে লাভ করা।'

একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোক-ব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষ্যা দ্বেষ মিথ্যাচার নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।

পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব-ইতিহাসে মহাবিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনোই করতে পারবে না, অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত-অশক্তের যে ভেদ সেইটেই আজ বড়ো সাংঘাতিক। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানের অধিকার নিয়ে মানুষ প্রাচীর তোলে না, বুদ্ধি ও প্রতিভা দলবাঁধা শক্তিকে বরণ করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে ঘরে ঘরে যে-সব ভেদের প্রাচীর উঠছে তাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেঁট করতে হবে। পূর্বে এই পার্থক্য ছিল, কিন্তু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণত লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল; সুতরাং মানুষের সামাজিকতা তার ছায়ায় আজকের মতো এমন অন্ধকারে পড়ে নি, লাভের লোভ সাহিত্য কলাবিদ্যা রাষ্ট্রনীতি গার্হস্থ্য সমস্তকেই এমন করে আচ্ছন্ন ও কলুষিত করে নি। অর্থচেষ্টার বাহিরে মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র আরও অনেক প্রশস্ত ছিল।

তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাটকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই 'পরে। অর্থোপার্জনের কঠিন-বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বললাভ ক'রে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায়নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেখানে সুবিধা এই যে, মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস সেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা, অন্তত হিন্দুসমাজের লোকে, এই দিকে দুর্বল। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যে মিলনের মূলে অন্নবস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা সে মিলনের পথ দুঃসহ দৈন্যদুঃখের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশ সহজ হতে

পারে। নিতান্ত যদি না পারে তবে দারিদ্র্যের হাত থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। না যদি পারে তা হলে কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না।

এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, এক কালে আমাদের জীবনযাত্রা যেরকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা হলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।

এক কালে যা নিয়ে মানুষ কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নূতন উদ্ভাবনার দ্বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নূতন কাল মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবি করে; যারা জোগান বন্ধ করে তারা বরখাস্ত হয়। মানুষ আপনার এই উদ্ভাবনী শক্তির জোরে নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতেই পূর্বযুগের চেয়ে তার উপকরণ আপনিই বেড়ে যায়। যখন হাল-লাঙল ছিল না তখনো বনের ফলমূল খেয়ে মানুষের একরকম করে চলে যেত; এ দিকে তার কোনো অভাব আছে এ কথা কেউ মনেও করত না। অবশেষে হাল-লাঙলের উৎপত্তি হবা মাত্র সেইসঙ্গে জমিজমা চাষ-আবাদ গোলাগঞ্জ আইনকানুন আপনি সৃষ্টি হতে থাকল। এর সঙ্গে উপদ্রব জমেছে অনেক— অনেক মার-কাট, অনেক চুরি-ডাকাতি, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যাচার। এ-সমস্ত কী করে ঠেকানো যায় সে কথা সেই মানুষকেই ভাবতে হবে যে মানুষ হাল-লাঙল তৈরি করেছে। কিন্তু গোলমাল দেখে যদি হাল-লাঙলটাকেই বাদ দিতে পরামর্শ দাও তবে মানুষের কাঁধের উপর মুণ্ডটাকে উল্টো করে বসাতে হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো কোনো জাতের মানুষ নূতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরানো সঞ্চয়ের দিকেই উল্টো মুখ করে স্থাণু হয়ে বসে আছে; তারা মৃতের চেয়ে খারাপ, তারা জীবন্মৃত। এ কথা সত্য, মৃতের খরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিদ্র্যসমস্যার ভালো সমাধান। অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্তমান কালে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষের নয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা। বিলাস বলব কাকে? ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ ছেড়ে কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠন ছেড়ে বিজলি-বাতি ব্যবহার করাকে বলব বিলাস? কখনোই নয়। দিনের আলো শেষ হলেই কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালাকেই যদি অনাবশ্যক বোধ কর, তা হলেই বিজলি-বাতিকে বর্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে ভেরেণ্ডা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বালতে হয়েছে সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষসাধনের জন্য বিজলি-বাতি। আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেটাই দারিদ্র্য। একদিন পায়ে-হাঁটা মানুষ যখন গোরুর গাড়ি সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়িতে তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ির মধ্যেই আজকের দিনের মোটরগাড়ির তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ মোটরগাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ তাই আর-এক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।

এ কথা সত্য, আধুনিক কালে মানুষের যা-কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্পলোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ তাপ অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতি ক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ধনকে খর্ব করে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্যতা যোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা, অর্থাৎ সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্যপ্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে, কেউ-বা টাকা জমাতে

ভালোবাসে, কারও-বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা একাকারতা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক জগতেও যেমন মানবজগতেও তেমনি, সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে স্তব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে। অপর পক্ষে অতিবন্ধুরতাও দোষের। কেননা, তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায়। যেখানেই তেমন বাধা সেই গহ্বরেই অকল্যাণ নানা মূর্তি ধরে বাসা বাঁধে। পূর্বেই বলেছি, আজকের দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্য চার দিকে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত।

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্যে বিদ্যা স্বাস্থ্য ও জীবিকানির্বাহের জন্যে যে-সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত অর্থ, উদ্‌বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্বচর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।

আজ সভ্যতার-গৌরবরক্ষার ভার অল্প লোকেরই হাতে। কিন্তু এই অত্যল্প লোকের পোষণ-ভার বহুসংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুলসংখ্যক মানুষকে জ্ঞানে ভোগে স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মূঢ় বিকলচিত্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মূঢ়তা ক্লেশ অস্বাস্থ্য আত্মাবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেপে রয়েছে; অভ্যাস হয়ে গেছে বলে, একে অপরিহার্য জেনেছি বলে, এর প্রকাণ্ডপরিমাণ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করি নে। কিন্তু আর উদাসীন থাকবার সময় নেই। আজ পৃথিবী জুড়ে চার দিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ পুঞ্জীভূত শক্তির অতিভারেই এমনতরো দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আজ শক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

আমাদের এই গ্রামপ্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিরলাঙ্গিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো স্বভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; কিন্তু এখন ধনীরা আত্মসম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা রচনা করেছে তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে ব্যয়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সংকীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েছে। সে ভালোই হয়েছে; এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। এইজন্যই সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

১৩৩৫

পল্লীর উন্নতি

হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ন্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা— তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্বোধ নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপালদোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্বে পূর্বে দেখেছি। খেতে বললে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুশকিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল, সুতরাং সাহস বেশি ছিল, সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালির ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর-একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থপক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদি-বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি-চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড়ো একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বলতে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিই নে। সত্য কথাও খামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্তর মধ্যে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আসে। যেই, সময় পেলেই, দেখতে পায় সামনে গর্ত আছে, তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকার নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল, সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনি নে, ক্ষেত্রও চিনি নে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সামলাতে পারি নে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তা হলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এমন কথা বলেন নি যে, ‘এই আমাদের কাজ, এসো আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই।’ তাঁরা বলেন নি ‘কাজ করো’, তাঁরা বলেছেন ‘প্রার্থনা করো’। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর করো।

তাঁদের দোষ দিতে পারি নে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি, ‘আত্মানং বিদ্ধি’ এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইচ্ছা

করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখতে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে পথ দিয়ে এসেছি আজ সে পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে বলেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে 'আয় বৃষ্টি হেনে'। আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তা হলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখি নি। একদিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পশলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না। কত বৎসর ধরে কেবলমাত্র চাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হই নি। এমনতরো অদ্ভুত অসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক ছাত্র, দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত, তা হলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কিরকম বীভৎস হত—প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কিরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিসও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা, শাসন করা, এর প্রতি সদ্‌বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্‌ব্যয় হবে না তা নয়, অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারণ, আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা ও ধৈর্য চাই। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা, অমনি তার পরদিনেই কারখানা খুলে বসে সর্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনোরকমের মাল তৈরি করতে পারি নে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরিয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি, তবে দেশের সর্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ, সে অবস্থায় শক্তির কেবলই অপব্যয় হতে থাকবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে শয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্‌ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানছে তাকে আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্য পথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্যোগের চেহারা দেখছি, আমাদের ফসলের খেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এটি শুভযোগ হয়ে উঠবে।

বস্তুত ফললাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ মাটিতে। এক দিকে মেঘের আয়োজন, এক দিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন

সংস্পর্শে, চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠছে। আমাদের বিশেষ করে দেখতে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায়-উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এইজন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য জন্মে না। সেইজন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনোরকম বড়ো ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো-এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই-সমস্ত নূতন নূতন কেরানিগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসছে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই তো গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা, যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে, সে দিকে এখনো কারও দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেইসঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কে হে, শহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কী জান।' আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মানতে পারি নে। কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানছেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর যাঁরা মানছেন না তাঁরা উদ্যম-সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার

সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকলপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই-একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, 'তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল করো।' এজন্য আমি সকলপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করি নি। কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারি নি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না—উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণীর অকৃতজ্ঞতা অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে, এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকলপ্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবি করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয় নি, কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক, আমি পারি নি তার কারণ আমাতেই বর্তমান, কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় 'আমিই সব করব'। রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম, এতে লাভ আমারই। এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভালো কাজ করব এ দিকে লক্ষ না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে, বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারি নে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বার বার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করে নি। আমি বললুম, 'তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।' তারা বললে, 'এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?'

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যেই যখন গ্রামের লোক বললে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' তখন তারা এই কথাই জানত যে, এ ক্ষেত্রে যে মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্ছে সেটা আমারই পারত্রিক ভোজের, অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জ্বলে যাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা

দু-তিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনছে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-মোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয়, তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বলো, অন্ন বলো, বিদ্যা বলো, স্বাস্থ্য বলো, যে-কোনো অভাব-মোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন-কি, তার একপ্রকার অহংকার থাকে। সেই অহংকার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে ওঠে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠছে, পারলৌকিক বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়েমহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তার পরে দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন শহরে শহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃতী শহরে যায় কাজ করতে, ধনী শহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী শহরে যায় জ্ঞানের চর্চা করতে, রোগী শহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভালো কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা— এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতা-বৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে, তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড়ো অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে লোক দেবে এবং যে লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। এক দল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর-এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করে নি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্ত্যে যে ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড়ো ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন, যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ছাড়া তাকে কোনোমতেই কোনো দয়ায় বা কোনো বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্য সহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।

দুর্বলতা যে কিরকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বললে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে, তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই— কোনো ধনীর এক পেয়াদা তরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দু-চার জন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর শহরে রটে গেল যে, পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আসছে। বোলপুরে কেউ-বা দরজায় স্ক্রু এঁটে দিলে, কেউ-বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের

মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ-বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চার জন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর বাজারে যখন আগুন লাগল তখন কেউ যে কারও সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে, তখন নিজের কলসিটা পর্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসি তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমন-কি, গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝি নে এবং এইটে বুঝি নে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্ব-সম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।

২২ মার্চ ১৩২২

ভূমিলক্ষ্মী

মাতার কাছে ছোটো ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে যাইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্তত তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনায় অন্য কাজে

কেন পাঠাইতে চাও।' সে বলিল, 'হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতেই আমাদের অভাব স্বচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে।'

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাষী ঠিকমত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিত না। কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল যখন খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হইত সেইখানকার প্রয়োজনেই তাহার খরচ হইত। তখন দেশে রেলের রাস্তা খোলে নাই। গোরুর গাড়ি এবং নৌকার যোগে বেশি পরিমাণ ফসল বেশি দূরে সহজে যাইতে পারিত না। তার পরে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না, সুতরাং তখন মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও ছিল অল্প। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবি বেশি ছিল না, আর সেই দাবি মিটাইবার আয়োজনও সহজ ছিল। তখন চাষ চলিত না এমন বিস্তর জমি দেশে পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি—একদিন যে জমি চাষীকে গছাইয়া দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই জমি দাম দিয়া মেলে না। তখন দুর্ভিক্ষের দিনে চাষী আপন জমিজমা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, প্রজা পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাষী প্রাণপণে জমি আঁকড়িয়া থাকে, কেননা জমির দাম বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তাহার একটা মস্ত কারণ এই যে, চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফসল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে, অথচ সমস্ত জমি চষিয়াও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

জমিও পড়িয়া রহিল না, ফসলেরও দর বাড়িয়া চলিল, অথচ সম্বৎসর দুইবেলা পেট ভরিবার মতো খাবার জোটে না, আর চাষী ঋণে ডুবিয়া থাকে, ইহার কারণ কী ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন কেন হয়—যখনি দুর্বৎসর আসে অমনি দেখা যায় কাহারও ঘরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নাই। কেন এক ফসল নষ্ট হইলেই আর-এক ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাহাকারের অন্ত থাকে না।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবি সামান্য ছিল, যখন অল্প ফসল পাইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তখনো যে নিয়মে চাষবাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে—প্রয়োজন অনেক বেশি হইয়াছে, অথচ প্রণালী সমানই আছে। জমি যখন বিস্তর পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বৎসরে চাষ দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ ছিল। এখন কোনো জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাষের প্রণালী যেমন ছিল তেমনই আছে।

চাষের গোরু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গোরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল; রাস্তার পাশে, আলের উপরে, যেটুকু ঘাস জন্মে সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে, গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।

মনে করো কোনো গৃহস্থের যদি গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেক দিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুরুনদিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাতনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিংবা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন। ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরও বেশি বাহির করিতে হইবে।

আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি তাহার

বেশি পাইব কী করিয়া। এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন-অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে—নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুকুকে ফসল জোগান দিতাম যে প্রণালীতে, সমস্ত পৃথিবীকে ফসল জোগান দিতে হইলে সে প্রণালী খাটিবে না। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, আগেকার মতন ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্যই খাটানো ভালো, ইহা বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া দুই বেলা দুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো আমাদের চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে বর্তমান কালে সে টিঁকিতে পারিবে না। আমাদের ধনধান্য, ধর্মকর্ম, জ্ঞানধ্যান সমস্তই আজ বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করিতেই হইবে; যাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিয়াছে, অয়মহং ভোঃ! তাহাতে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহ আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডির মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।

তাই আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা এই পত্রিকার উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।

আশ্বিন ১৩২৫

শ্রীনিকেতন

সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কথিত

বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীরণে; হয়তো কোনো গাছ নির্জীব, এই আহ্বানের সে জবাব দিলে না—সে তার পত্রপুষ্প বিকশিত করলে না, সে মূর্ছিত হয়েই রইল। যে গাছের অন্তরে রসের ধারা আছে, বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে যখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনি তো উৎসব।

আমাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিশ্বসিত। যেখানে সে বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে একদিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানকে যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলক্ষ করে একটি সৃষ্টির সূচনা হল। কোথায় যে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে না। সূর্যকিরণসম্পাতে পর্বতশিখরে নিশ্চল কঠিন তুষার যেদিন গলে যায়, সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন্‌ কোন্‌ দেশকে ফলশালী করে সাগরে গিয়ে পৌঁছবে সেদিন তা কেউ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু গতি যেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেগে আপনার ভাগ্যকে বহন করে চলে। কত বিচিত্র শাখায় যে তার পরিণতি হবে সে তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা যে তার রুদ্ধ শক্তি মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একদা দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন আমরা কোনো-একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলাম, তাই নিয়ে আত্মাভিমানের ছোটো কথাটি আজকের কথা নয়। আমাদের আনন্দ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হবার চেষ্টা জেগেছে; সেই মিলনসাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আজ তপস্যার দীক্ষাগ্রহণের স্মরণের দিন। আজ মনকে নম্র করো, আপনার মধ্যে যে দীনতা রয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন করো—আনন্দে এবং গৌরবে। আজকে বিচার করে দেখতে হবে, যে কাজের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কী। আমাদের উদ্‌বৃত্তটুকু নিয়ে আমরা দাতাবৃত্তি করতে চাই নি। দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান—বাইরের অপমান তারই আনুষঙ্গিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার শহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ও চীনে, প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ববোধের স্বতশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আমাদের কোন্‌ ভাগ্যদোষে সমাজের সেই ব্যাপক ব্যবস্থার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল! রাজশক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন স্ফূর্তিকে চার দিক থেকে নিরস্ত করে দিলে। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে খাদে সহজে সঞ্চরণ করত, ব্যাবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সুবিধা করবার জন্যে তারই মাঝে মাঝে বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। এই বাঁধগুলিই হচ্ছে শহর। এ আমাদের দেশের প্রাণপ্রকৃতির মূলে ঘা দিয়েছে। শহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তীব্রতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাহিরে ঘন দুঃখের ছায়া কিরূপ অন্তহীন। অন্ন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আনন্দ নেই, আলোর পর আলো একে একে নিবল। যদি দেখতুম যা হারিয়েছি, শহরে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেলুম, তা হলেও সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু যা পাওয়া গেল সে তো কল-কারখানার জিনিস, আপিস-আদালতের জিনিস, বেচাকেনার জিনিস, সে তো স্বপ্রকাশ প্রাণের জিনিস নয়। তাতে সুবিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেখানে আপনাকে উপলব্ধি করে না—সেখানে যেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীয়ের অভিসারে সে আপন কুল খোয়াতে বসেছে।

এ দুর্গতি কিসে দূর হবে।

ছোটো ছোটো আনুকূল্যের দ্বারা তো হবে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা, সমস্যাকে খণ্ড করে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্‌বোধিত করে। তার থেকে সে যা-কিছু ফল পায়, সে ফল তত মূল্যবান নয় যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্মশক্তির উপলব্ধি। এতেই তার

সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে সৃষ্টিকর্তা। আমাদের এই আপন সৃষ্টিশক্তির মধ্যে আমরা বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ পাই। তার সঙ্গে সহযোগিতাতেই আমাদের গৌরব, আমাদের কল্যাণ। যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ, সেইখানেই আমাদের যত-কিছু দুর্গতি। যেখানে বিশ্বসৃষ্টিতে আমাদের কাজের বিধান নেই, কেবল ভোগের বরাদ্দ, সেইখানে তো আমরা পশু। মানুষ আপন ভাগ্যকে আপনি গড়ে তোলে, সেই তার আপন জগৎ। আত্মকর্তৃত্বের, আত্মসৃষ্টির সেই জগৎ যদি হারিয়ে থাকি, তবে সবই হারিয়েছি। মানুষের মধ্যে যিনি ঈশ্বর আছেন তাঁর উদ্‌বোধন করতে হবে। আমরা এই গ্রামের দ্বারে এসে সেই দেবতাকে ডাকছি, অন্তরের মধ্যে রুদ্ধদ্বার হয়ে রয়েছেন বলে যাঁর পূজা হচ্ছে না। মানুষ জড়ের মতন হয়ে রয়েছে, শুষ্ক কাষ্ঠের মতন, যার ফল নেই, ফুল নেই। মনুষ্যত্বের এত বড়ো অবমাননা তো আর হতে পারে না।

প্রশ্নকারী বলতে পারেন, তেত্রিশ কোটির তোমরা কী করতে পার। কিন্তু বিধাতা তো তেত্রিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেন নি? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কী করছ। যে কার্যক্ষেত্র তোমার, সেখানে তুমি নিজেকে সত্য করেছ কি না।' তেত্রিশ কোটির কী করতে পারি, এ প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁরা সত্যকাজের পথকে রুদ্ধ করেন। দুঃসাধ্যসাধনের চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসাধ্যসাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। যারা আমাদের চার দিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বালতে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন করে চলবে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোটো জায়গায় সার্থক করে তুলি, তা হলে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস কোরো না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হলেও দিগ্‌বিজয়ী। আপনার অন্তরের দীনতাকে দূর করো; তপস্যাকে সার্থক করে তোলো; তা হলে এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে—শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ছায়াদান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে।

১৩২৯

পল্লীপ্রকৃতি

মৌমাছি মৌচাক রচনা করলে, তার গোড়াকার কথাটা তাদের অন্নের ব্যবস্থা। ফুলে ফুলে কণা কণা মধু; কোনো ঋতু উদার, কোনো ঋতু কৃপণ, যে মৌমাছিরা দল বেঁধে সংগ্রহ আর দল বেঁধে সঞ্চয় করতে পারলে, মৌচাকে পত্তন হল তাদের লোকালয়। লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়, ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।

অনেকে ভোগ করবার থেকে যেটা আরম্ভ হল অনেকে ত্যাগ করবার দিকে সেটা নিয়ে গেল। নিজের জন্য কাজ করার চেয়ে সকলের জন্যে কাজ করাটা হয়ে উঠল বড়ো, সকলের প্রাণযাত্রার মধ্যেই নিজের প্রাণের সার্থকতা-বোধ জন্মাল—এরই থেকে বর্তমান কালকে ছাড়িয়ে অনাগত কালকে সত্য বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হল; যে দান নিজের আয়ু-কালের মধ্যে নিজের কাছে পৌঁছবে না, সে দানেও কৃপণতা রইল না; লোকালয় বলতে এমন একটি আশ্রয় বোঝাল যেখানে নিজের সঙ্গে পরের, বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রসারিত। এই হল অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ অন্ন যেই বৃহৎ হয়েছে অমনি সে স্থূলভাবে অন্নকে ছাড়িয়ে এমন-একটি সত্যকে প্রকাশ করেছে যা মহান। আদিমকালে পশুশিকার করে মানুষ জীবিকানির্বাহ করত, তাতে লোকালয় জমে উঠতে পারে নি। অনিশ্চিত অন্ন-আহরণের চেষ্টায় সকলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন তাদের স্বভাব ছিল হিংস্র, দস্যুবৃত্তি ছিল ব্যবসায়, ব্যবহার ছিল অসামাজিক।

মানুষের অন্নব্যবস্থা, সুনিশ্চিত ও প্রচুর হতে পেরেছে বড়ো বড়ো নদীর কূলে—যেমন নীলনদী, ইয়াংসিকিয়াং, অক্‌সাস, য়ুফ্রেটিস, গঙ্গা, যমুনা—সেইখানে জন্মেছে বড়ো বড়ো

সভ্যতা, অর্থাৎ লোকালয়বন্ধনের সুব্যবস্থা। পলিমাটিতে ভূমিকর্ষণ করে মানুষ যখন একই জায়গায় বৎসরে বৎসরে প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনি অনেক লোক এক স্থানে স্থায়ীভাবে আবাস পত্তন করতে পারল—তখনি পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরকে আনুকূল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেলে। একত্র মেলবার যে সামাজিক মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্নসংস্থানের সুযোগের দ্বারা সেইটে জোর পেয়ে উঠল। মানুষ ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ পেলে, একত্র সবাই পাত পেড়ে বসল, তখন পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের সন্ধান মিলল, বহুপ্রাণ এক-অন্নের দ্বারা এক প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার করল। তখন দেখতে পেলে পরস্পরের যোগ কেবলমাত্র সুযোগ নয়, তাতে আনন্দ। এই আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিস্বীকার, এমন-কি, মৃত্যুস্বীকারও সম্ভবপর হয়।

পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল-খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেই রূপ দেখে মানুষ কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না; সে উৎসবের আয়োজন করে, সে দেখতে পায় লক্ষ্মীকে যিনি একই কালে সুন্দরী এবং কল্যাণী। ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্যের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্যপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপ রস বর্ণ গন্ধ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রণের সৌহার্দ্যের ডাক। পৃথিবীর অন্ন যেমন সুন্দর, মানুষের সৌহার্দ্য তেমনি সুন্দর। একলা যে অন্ন খাই তাতে আছে পেট ভরানো, পাঁচজনে মিলে যে অন্ন খাই তাতে আছে আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার যজ্ঞক্ষেত্রে অন্নের থালি হয় সুন্দর, পরিবেশন হয় সুশোভন, পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।

দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সংকুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েছে মানুষের গ্রাম। মানুষের মধ্যে যা অমৃত তার প্রকাশ হল এই মিলন থেকে—তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মানুষ গভীরভাবে আত্মপরিচয় পেলে, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।

গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উদ্ভব। সেখানে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত; সেখানে সৈনিকের দুর্গ, বণিকের পণ্যশালা, বিদ্যাদান ও বিদ্যা-অর্জনের উদ্দেশে বহু স্থান থেকে এক স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশ, দূর পৃথিবীর সঙ্গে জানাশোনা দেনা-পাওনার যোগ। সেখানে মাটির বুকের 'পরে জগদ্দল পাথর, জীবিকা সেখানে কঠিন, শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা। সেখানে সকল মানুষকে হার মানিয়ে একলা-মানুষ বড়ো হতে চাচ্ছে। বাড়াবাড়ি না হলে তারও ফল মন্দ নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি অতিশয় চাপা পড়ে তা হলে ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষ ঘটে না। সমান-মাথা-ওয়ালা ঝোপগুলোর চাপে বনস্পতি বেঁটে হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অত্যাকাঙ্ক্ষা অগ্নিবাষ্পের ঠেলায় জনসঙ্ঘের সাধারণ আশ্রয়ভূমিকে উঁচুর দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, উৎকর্ষের আদর্শ বেড়ে ওঠে, পরস্পরের নকলে ও রেষারেষিতে মানুষের শক্তির চর্চা অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে থাকে, জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রে নবনবোন্মেষ সম্ভবপর হয়, নানা দেশের নানা জাতির চিত্ত-সমবায়ে বিদ্যার আয়তন প্রশস্ত হয়ে ওঠে। শহরে, যেখানে সমাজের চাপ অতিঘনিষ্ঠ নয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুযোগ পায়, মানসশক্তি একটা সাধারণ আদর্শের অনুচ্চ সমতলতা ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। এই কারণেই বুদ্ধির জড়তা ও সংকীর্ণতা সকল দেশেই সকল কালেই গ্রাম্যতার নামান্তর হয়ে আছে।

শহরে মানুষ আপন কর্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে; তার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহে প্রাণশক্তি যেমন এক দিকে ব্যাপ্ত, তেমনি আবার এক এক জায়গায় তা বিশেষ ও বিচিত্রভাবে সংহত। নিম্নশ্রেণীর জীবদেহে এই মর্মস্থানগুলি সংহত হয়ে ওঠে নি। দেহবিকাশের উৎকর্ষের

সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ফুস্ফুস্ হৃৎপিণ্ড পাকযন্ত্র বিশেষ বিশেষ দেহক্রিয়ার স্বতন্ত্র যন্ত্র হয়ে উঠল। এইগুলিকে শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শহরগুলি লোকালয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের কেন্দ্র, মানুষের উদ্যম এক এক স্থানে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সংহত হয়ে তাদের সৃষ্টি করেছে। পূর্বকালে ধনসৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজনসাধনে যন্ত্রের হাত ছিল অতি সামান্যই। তখনকার যন্ত্রগুলির সঙ্গে মানুষের শরীর-মনের যোগ সর্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্যে তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারত তা ছিল পরিমিত, আর তার মুনফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। সুতরাং তখন পণ্যরচনায় কর্মশক্তির আনন্দটা ছিল প্রধান, কর্মফলের লোভটা তার চেয়ে খুব বড়ো হয়ে ওঠে নি। তাই তখনকার নগরগুলি মানুষের কীর্তির আনন্দরূপ গ্রহণ করতে পারত।

অন্যান্য সকল রিপুর মতোই লোভটা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি। এইজন্যেই মানুষ তাকে রিপু বলেছে। বাইরে থেকে ডাকাত যেমন লোকালয়ের রিপু, ভিতর থেকে লোভটা তেমনি। যতক্ষণ এই রিপু পরিমিত থাকে ততক্ষণ এতে করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কর্মোদ্যম বাড়িয়ে তোলে, অথচ সমাজনীতিকে সেটা ছাপিয়ে যায় না। কিন্তু লোভের কারণটা যদি অত্যন্ত প্রবল ও তার চরিতার্থতার উপায় অত্যন্ত বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সমাজনীতি আর তাকে সহজে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আধুনিক কালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল করে উঠছে। দেখতে দেখতে চারি দিকে কেবল লড়াই ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। এইরকম অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চলে যায়, শহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

আজ গ্রামের আলো নিবল। শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলল— সে আলোয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সংগীত নেই। প্রতি সূর্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্যাস্তে যে আরতির প্রদীপ জ্বলত, সে আজ লুপ্ত, ম্লান। শুধু-যে জলাশয়ের জল শুকোলো তা নয়, হৃদয় শুকোলো। জীবনের আনন্দে মাঠের ফুলের মতো যে-সব নৃত্যগীত আপনি জেগে উঠত তারা জীর্ণ হয়ে ধুলায় মিলিয়ে গেল। প্রাণের ঔদার্য এতকাল আপনিই আপনার সহজ আনন্দের সুন্দর উপকরণ আপনিই সৃষ্টি করেছে— আজ সে গেল বোবা হয়ে, আজ তাকে কলে-তৈরি আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে— যতই নিচ্ছে ততই নিজের সৃষ্টিশক্তি আরও অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বেশি দিনের কথা নয়, নবাবি আমলে দেখা গেছে, তখনকার বড়ো বড়ো আমলা যাঁরা রাজদরবারে রাজধানীতে পুষ্ট, জন্মগ্রামের সমাজ-বন্ধনকে তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁরা অর্জন করেছেন শহরে, ব্যয় করেছেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেছে— নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হয়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে প্রাণের ধারা শহরে চলে যাচ্ছে, গ্রামের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যোগ আর থাকছে না।

আজ ধূমকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজল, মানুষকে দলে দলে তার স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে। মানুষ আবার ফিরল তার প্রথম আরম্ভের অবস্থায়— সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল; আপন আপন স্বতন্ত্র ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে লাগল; তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে। গ্রামে একদিন অনেক মানুষ মিলেছিল, সকলে মিলে সংগ্রহ সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্যে। এখন সংখ্যায় তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ একত্র মিলল, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের ভোগের কেন্দ্র নিজে। তাই সমাজের সহজ বিধানের চেয়ে পুলিসের পাহারা কড়া হয়ে উঠল— আত্মীয়তার জায়গায় আইনের জটিলতা বাইরের শিকল পাকা করে তুলছে। নিজেরা প্রত্যেকেই যেখানে নিজের ভোগের কেন্দ্র, সেখানে আমরা হয় পরের দাসত্ব করি নয় নিজের, কিন্তু দুই-ই দাসত্ব। এই কর্মপাশবদ্ধ মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যারা মিলল, অন্তরের

ক্ষেত্রে তাদের মিল নেই বলে এই-সব পরদাস ও আত্মদাসদের মনে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ প্রবল; প্রতিযোগিতার মন্থনদণ্ডে মিথ্যা ও হিংসাকে এরা নানা আকারে কেবলই মথিত করে তুলছে। ধনী দরিদ্রে অন্তত আমাদের দেশে বিচ্ছেদ অতিমাত্র ছিল না— তার একটা কারণ, ধনের সম্মান অন্য-সব সম্মানের নীচে ছিল; আর-একটা কারণ, ধনী আপন ধনের দায়িত্ব স্বীকার করত। অর্থাৎ, ধন তখন অসামাজিক ছিল না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠত। তখন মান অপমান ও ভোগের তারতম্য ধনকে আশ্রয় করে স্পর্ধিত আত্মম্ভরিতার সঙ্গে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করে নি। আজ অন্নব্রহ্ম লোভের অন্ন হয়ে ছোটো হয়ে যেতেই একদিন যা সমাজ বেঁধেছে আজ তাই সমাজ ভাঙছে— রক্তে ভাসাচ্ছে পৃথিবী, দাসত্বে জীর্ণ করছে মানুষের মন। আজ তাই ধন-অধনের উৎকট অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্যে চার দিকেই উত্তেজনা।

এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের দ্বারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবকে যারা বাহন করে তারা এক অসামঞ্জস্য থেকে আর-এক অসামঞ্জস্যে লাফ দিয়ে চলে, তারা সত্যকে ছেঁটে ফেলে সহজ করতে চায়। তারা ভোগকে রাখে তো ত্যাগকে তাড়ায়, ত্যাগকে রাখে তো ভোগকে দেশছাড়া করে— মানবপ্রকৃতিকে পঙ্গু ক'রে তবে তাকে শাসনে আনতে চায়। আমরা এই কথা বলি যে, সত্যকে সমগ্রভাবে না নিতে পারলে মানবস্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়— বঞ্চিত করলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন-কি, ঐ যে কলের কথা বলছিলুম— তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য করছি বলেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অঙ্গ। এ একেবারেই মানুষের জিনিস। হাতকে দিয়ে ডাকাতি করেছি বলে যে তাকে কেটে ফেললে মঙ্গল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। নিজেকে পঙ্গু করে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনোটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।

আদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির কোনো-একটা শক্তিরহস্য যেই সে আবিষ্কার করে, অমনি যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী করে তাকে আপনার ব্যবহারের করে নেয়। এর থেকেই তার সভ্যতায় এক-একটা নূতন পর্যায়ের আরম্ভ। প্রথম যেদিন সে লাঙল তৈরি করে মাটির উর্বরতাশক্তিকে কর্ষণ করতে পারলে, সেদিন তার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড়ো পর্দা উঠে গেল। সেই উন্মীলিত আবরণ কেবল যে তার অন্নশালাকে বৃহৎ করে অবারিত করলে তা নয়— এতদিন তার মনের যে অনেক কক্ষ অন্ধকার ছিল, তার মধ্যে আলো এনে ফেললে। এই সুযোগে সে নানা দিকেই বড়ো হয়ে উঠল। একদিন পশুচর্ম ছিল মানুষের দেহের আচ্ছাদন— যেদিন চরকায় তাঁতে সে প্রথম কাপড় বুনলে, সেদিন কেবল যে সে সহজে দেহ ঢাকতে পারলে তা নয়, এতে তার শক্তিকে বড়ো করে উদ্‌বোধিত করাতে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হল। তাই শুধু মানুষের দেহ নয়, আজকের দিনের মানুষের মন হচ্ছে কাপড়-পরা মন— মানুষ যে মানবলোক সৃষ্টি করছে কাপড়টা তার একটা বড়ো উপাদান। আজকের দিনে আমাদের দেশে আমরা ন্যাশনাল কাপড়টা খাটো করছি, কিন্তু ও দিকে ন্যাশনাল পতাকাটা বেড়ে চলল। তার মানে কাপড়টা কেবল একটা আচ্ছাদন নয়, ওটা একটা ভাষা। অর্থাৎ কাপড়ে মানুষের মন নিজেকে প্রকাশ করবার একটা নূতন উপাদান পেলে। এ কথা সবাই জানে, পাথরের যুগ থেকে মানুষ যখন লোহার যুগে এল তখন কেবল যে তার বাহ্যশক্তির বৃদ্ধি হল তা নয়, তার আন্তরিক শক্তি প্রসার পেলে। পশুর চার পায়ের অবস্থা থেকে যেদিন মানুষ দুই হাত দুই পায়ের অবস্থায় এল তখনি এর গোড়া-পত্তন। দুই হাত থাকাতে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের বেড়ে গেছে— এই তার দেহশক্তির বিশেষত্ব থেকে তার মনের শক্তি বিশেষত্ব পেলে। সেইদিন থেকে হাতের সাহায্যেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি করে হাতকেই বহুগুণিত করে চলেছে। তাতে করেই বিশ্বের সঙ্গে তার ব্যবহার কেবলই বেড়ে উঠছে, তার থেকেই তার মনের রুদ্ধদ্বার নানা দিকে খুলে যাচ্ছে। কোনো সন্ন্যাসী যদি বলেন যে,

বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহারের শক্তিকে সংকুচিত করতে হবে, তা হলে গোড়ায় মানুষের হাত দুটোকেই অপরাধী করতে হয়। ঘোরতর সন্ন্যাসী ততদূর পর্যন্তই যায়। সে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকে; বলে, 'সংসারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহারই নেই, আমি মুক্ত।' হাতের শক্তিকে খানিক দূর পর্যন্তই এগোতে দেব, তার বেশি এগোতে দেব না— এটা হচ্ছে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই ঊর্ধ্ববাহুত্বের বিধান। এত বড়ো শাসনের অধিকার পৃথিবীতে কার আছে। বিশ্বকর্মা মানুষকে যতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসবার জন্যে আহ্বান করেন তাকে ততদূর পর্যন্ত এগোতে দেব না— বিধাতৃদত্ত শক্তিকে পঙ্গু করবার এমন স্পর্ধা কোন্ সমাজবিধাতার মুখে শোভা পায়! শক্তির ব্যবহারের পন্থাই আমরা সমাজকল্যাণের অনুগত করে নিয়মিত করতে পারি, কিন্তু শক্তির প্রকাশের পন্থা আমরা অবরুদ্ধ করতে পারি নে।

মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ করে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠে নি, এও সেই একই কারণ।

আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা-অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে। এ স্থলে আমাদের এই কথাই বলতে হবে— যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল-বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে— শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই। মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডারজাত করে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই এক যুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধরে দিন চালাতে পারব না। আজ আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনি সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক।' মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা।

মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আবাহন করে আনতে পারে নি বলেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চার দিকে যা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য। পরাভবের অবসাদে মানুষ নড়তে পারছে না, তাই এত দিকে তার এত অভাব। মানুষ বলছে, 'পারলুম না।' শুষ্ক জলাশয় থেকে, নিষ্ফল ক্ষেত্র থেকে, শ্মশানভূমিতে যে চিতা নিবতে চায় না তার শিখা থেকে কান্না উঠছে, 'পারলুম না, হার মেনেছি।' এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী। আমাদের ফসল-খেতে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটাকতক সতরঞ্জ বুনিয়েছি— আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। যে বড়ো শক্তিকে আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারি নি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি; আজকের এই অল্প-কিছু সংগ্রহ যা আমাদের সামনে রয়েছে সেই দানবের সঙ্গে লড়াই করবার যথোচিত উপকরণ তা নয়।

পুরাণে পড়েছি, একদিন দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতারা হেরে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা আপনাদের গুরুপুত্রকে দৈত্যগুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিদ্যা দেবলোকে আনাই ছিল তাঁদের সংকল্প। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেন নি যে, 'দানবী বিদ্যাকে আমরা চাই নে।' দানবদের কাছ থেকে বিদ্যা নিয়ে তাঁরা দানবপুরী বানাতে ইচ্ছা করেন নি, সেই বিদ্যা নিয়ে তাঁরা স্বর্গকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হতে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েছে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়— বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।

আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্বদাই শুনতে পাই, য়ুরোপের বিদ্যা আমরা চাই নে, এ বিদ্যায় শয়তানি আছে। এমন কথা আমরা বলব না। বলব না, শক্তি আমাদের মারছে, অতএব অশক্তিই আমাদের শ্রেয়। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, তাকে ত্যাগ করলে মার বাড়ে বৈ কমে না। সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্য আমাদেরকে বিনাশ করে, তখন তার প্রতি অভিমান করে বলা মূঢ়তা যে 'সত্যকে চাই নে'।

উপনিষদ্‌ বলেন, যিনি এক তিনি 'বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি'—নানা জাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ, অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তা হলেই দানের জিনিস তার নিজের জিনিস হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই-যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিযোগাৎ'— বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিকগামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন— তারই যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন করে জয় করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক— একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক-না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনি আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি করে থাকে; সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য, যে অশক্তি, তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকেরই শেষে আছে— সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি-দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

দেশের কাজ

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে কথিত

আমাদের শাস্ত্রে বলে ছটি রিপুর কথা— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তাকেই রিপু বলে, যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে। এমনি করে নিজেকে হারানোই মানুষের সর্বনাশ করে, এই রিপুই জাতির পতন ঘটায়। এই ছটি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে তার প্রাণে, নিরুদ্যম করে দেয় তার আত্মকর্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উলটো হচ্ছে মদ— অহংকারের মত্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি; আর গর্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড়ো করে তোলে। এ জগতে

অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে। স্পর্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। আমাদের মরণ কিন্তু উলটো পথে— আমাদের আচ্ছন্ন করেছে অবসাদের কুয়াশায়।

একটা অবসাদ এসে আমাদের শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এককালে আমরা অনেক কর্ম করেছি, অনেক কীর্তি রেখেছি, সে কথা ইতিহাস জানে। তার পর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল ভারতবাসীর চিত্তে, আমাদের দেহে মনে অসাড়তা এনে দিলে। মনুষ্যত্বের গৌরব যে আমাদের অন্তর্নিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জন্যে যে আমাদের প্রাণপণ করতে হবে, সে আমাদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে আমরা নিজের মরার পথ বাধামুক্ত করেছি, তার পর যাদের আত্মম্ভরিতা প্রবল, আমাদের মার আসছে তাদেরই হাত দিয়ে। আজ বলতে এসেছি, আত্মাকে অবমানিত করে রাখা আর চলবে না। আমরা বলতে এসেছি যে, আজ আমরা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেম। একদিন সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেম। তখন জলাশয়ে জল ছিল, মাঠে শস্য ছিল, তখন পুরুষকার ছিল মনে। এখন সমস্ত দূর হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কোনো উপায় নেই এত বড়ো মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাই-চাপা পড়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। এ কথা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে স্বীকার না করি, তবে বুঝব এটাই মোহ। অর্থাৎ, যা নয় তাই মনে করে বসা।

একটা ঘটনা শুনেছি— হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেইরকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় করব, সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেছি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে প্রাণস্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসো, একত্রে কাজ করি।

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি॥

এই ঐক্য যাতে স্থাপিত হয়, তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলি-স্খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব-কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব— একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনোই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনি আপন বলে জানতে পারব তখনি দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।

রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে

গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যেও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী বারোটি গ্রাম একত্র করে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, 'আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়।' যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ: দুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েছি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। চৈতন্যের দুটি পন্থা আছে। এক হচ্ছে মহাপুরুষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে দেন। তখন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তখন সকল কাজই সহজ হয়। আবার দুঃখের দিনও শুভদিন। তখন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তখন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উদ্যত হয়ে উঠি। একান্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কী করে আনুকূল্য দাবি করতে হয় অন্য দেশে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ইংলন্ড আজ যখন দৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত তখন সে ঘোষণা করেছে, দেশের লোকে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবে। পথে পথে ঘরে ঘরে এই ঘোষণা যে, দেশজাত পণ্যদ্রব্যই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বহুদিনের বহু-অন্ন-পুষ্ট জাতের মধ্যে যখনি বেকার-সমস্যা উপস্থিত হল তখনি দেশের ধন নিরন্নদের বাঁচাতে লেগেছে। এর থেকে দেখা যায় সেখানে দেশের লোকের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ দেশব্যাপী আত্মীয়তা। তাদের উপরে আনুকূল্য রয়েছে সদাজাগ্রত। তাতে মনের মধ্যে ভরসা হয়। আমরা বেকার হয়ে মরছি অথচ কেউ আমাদের খবর নেবে না, এ কোনোমতেই হতে পারে না, এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাদের এত ভরসা। আমাদের ভরসা নেই। মারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, জাতিকে অবসন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমের সাধনা কই, সেবার উদ্যোগ কোথায়। যে বৃহৎ স্বার্থবুদ্ধিতে বড়ো রকম করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে আমাদের কোথায়।

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে—কোমর বেঁধে বলতে চাই, কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত—অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর হয়, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারত, তা হলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে বলতুম না। কিন্তু আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় কখনা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

উপেক্ষিতা পল্লী

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি॥

এখানে তোমরা, যাহাদের মন বিব্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে এক ভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

স হৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোবি বঃ।
অন্যোন্য মভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥

তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি করো।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া॥

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। এক-গতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বলো।

আজ যে বেদমন্ত্র-পাঠে এই সভার উদ্‌বোধন হল অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা বুঝতে পারি, মানুষের পরস্পর মিলনের জন্যে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীতে কতবার কত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে এবং আবার তাদের বিলয় হল। জ্যোতিষ্কের মতো তারা মিলনের তেজে সংহত হয়ে প্রদীপ্ত হয়েছিল। পরে আলো এল ক্ষীণ হয়ে; মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাদের পরিচয় মগ্ন হল অন্ধকারে। তাদের প্রকাশ পেয়েছিল নিখিল বিশ্বে, তার বিলুপ্তির কারণ খুঁজলে দেখা যায় ভিতর থেকে এমন কোনো রিপুর আক্রমণ এসেছে যাতে মানুষের সম্বন্ধকে লোভে বা মোহে শিথিল করে দিয়েছে। যে সহজ প্রয়োজনের সীমায় মানুষ সুস্থভাবে সংযতভাবে পরস্পরের যোগে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে, ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা সেই সীমাকে নিরন্তর লঙ্ঘন করবার চেষ্টায় মিলনের বাঁধ ভেঙে দিতে থাকে।

বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন-পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল, এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফলফুল-উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায়— তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা। য়িহুদীদের পুরাণে বেব্‌ল্-এর জয়স্তম্ভ-রচনার উল্লেখ আছে, সেই স্তম্ভ যতই অতিরিক্ত উপরে চড়ছিল ততই তার উপর লাগছিল নীচে নামাবার নিশ্চিত আকর্ষণ।

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে ভুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমায়

কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা। মানবসভ্যতার প্রধান জীবনীশক্তি তার সামাজিক শ্রেয়োবুদ্ধি, যার প্রেরণায় পরস্পরের জন্যে পরস্পর আপন প্রবৃত্তিকে সংযত করে। যখন লোভের বিষয়টা কোনো কারণে অত্যুগ্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অসাম্য সৃষ্টি করতে থাকে। এই অসাম্যকে ঠেকাতে পারে মানুষের মৈত্রীবোধ, তার শ্রেয়োবুদ্ধি। যে অবস্থায় সেই বুদ্ধি পরাভূত হয়েছে তখন ব্যবস্থা-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা আজ সকল দিকেই প্রবল। বর্তমান সভ্যতা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি করে আপন জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হৃদয়বান মানুষের চেয়ে হিসাব-করা ব্যবস্থাযন্ত্র বেশি প্রাধান্য লাভ করে। একদা যে ধর্মসাধনায় রিপুদমন করে মৈত্রীপ্রচারই সমাজের কল্যাণের মুখ্য উপায় বলে গণ্য হয়েছিল আজ তা পিছনে সরে পড়েছে. আজ এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধি। তাই দেখতে পাই এক দিকে মনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রজাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপর দিকে অন্যোন্যজাতিক শান্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অফ নেশন্‌স্‌। আমাদের দেশেও এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে; যা-কিছুতে একটা জাতিকে অন্তরে বাহিরে খণ্ড বিখণ্ড করে, যে-সমস্ত যুক্তিহীন মূঢ় সংস্কার মনের শক্তিকে জীর্ণ করে দিয়ে পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে থাকে, তাকে ধর্মের নামে, সনাতন পবিত্র প্রথার নামে, সযত্নে সমাজের মধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্য-বিধি-দ্বারা, পার্লামেন্টিক শাসনতন্ত্র নামধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়, এমন দুরাশা মনে পোষণ করি—তার প্রধান কারণ, মানুষের আত্মার চেয়ে উপকরণের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। উপকরণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কোঠায় পড়ে, শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম। সেই কারণেই যখন লোভরিপুর অতিপ্রাবল্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানাটানিতে মানবসম্বন্ধের আন্তরিক জোড়গুলি খুলে গেছে তখন বাইরে থেকে জটিল ব্যবস্থার দড়াদড়ি দিয়ে তাকে জুড়ে রাখবার সৃষ্টি চলেছে। সেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক। এ কথা মনে রাখতেই হবে, মানবিক সমস্যা যান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব।

বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় এক দল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেইরকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে—অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ-উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিঁকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু নগরে একান্ত কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

আজ য়ুরোপ থেকে রিপুবাহিনী ভেদশক্তি এসে আমাদের দেশে মানুষকে শহরে ও গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। আমাদের পল্লী মগ্ন হয়েছে চিরদুঃখের অন্ধকারে। সেখান থেকে মানুষের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। কৃত্রিম ব্যবস্থায় মানবসমাজের সর্বত্রই এই-যে

প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা এনেছে, একদিন মানুষকে এর মূল্য শোধ করতে দেউলে হতে হবে। সেই দিন নিকটে এল। আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনের ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনাপাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায় যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থসঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাবমোচনের জন্যে লাগছে না। এই যে গায়ের জোরে দেনাপাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। এইরকম অবস্থা ছোটো বড়ো নানা কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর সর্বত্রই পীড়া সৃষ্টি করে বিনাশকে আহ্বান করছে। সমাজে যারা আপনার প্রাণকে নিঃশেষিত করে দান করছে প্রতিদানে তারা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না, এই অন্যায় ঋণ চিরদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পারে না।

অন্তত ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।

এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে। পরীক্ষায়-পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্তে পড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

অরণ্যদেবতা

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ-উৎসবে কথিত

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারি দিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্‌ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারি দিকে তাঁর তৃণশষ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয় নি; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি; সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্‌, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইঁটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে— এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।

এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদ্‌কে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন— মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ— হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি,

এই অনুষ্ঠানের ফলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৪৫

অভিভাষণ

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্‌বোধন

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক্‌।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক, অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের স্বভাব অন্যরকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এ দিক-ও দিক করলেই কানে ধরে তাকে শায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে; তাতে সময় লাগে বেশি, কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতরো বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে-প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে-সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দপ্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ—জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়—তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো

দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, ‘এ আমি বিক্রি করব না।’ এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি, যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাব-বশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি— তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমত তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত— সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অংকুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারি দিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরও লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানাঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই-সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ, কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো,

সুরুল (শ্রীনিকেতন)-এর এক সভায় (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ : ভাষণপাঠরত ক্ষিতিমোহন সেন

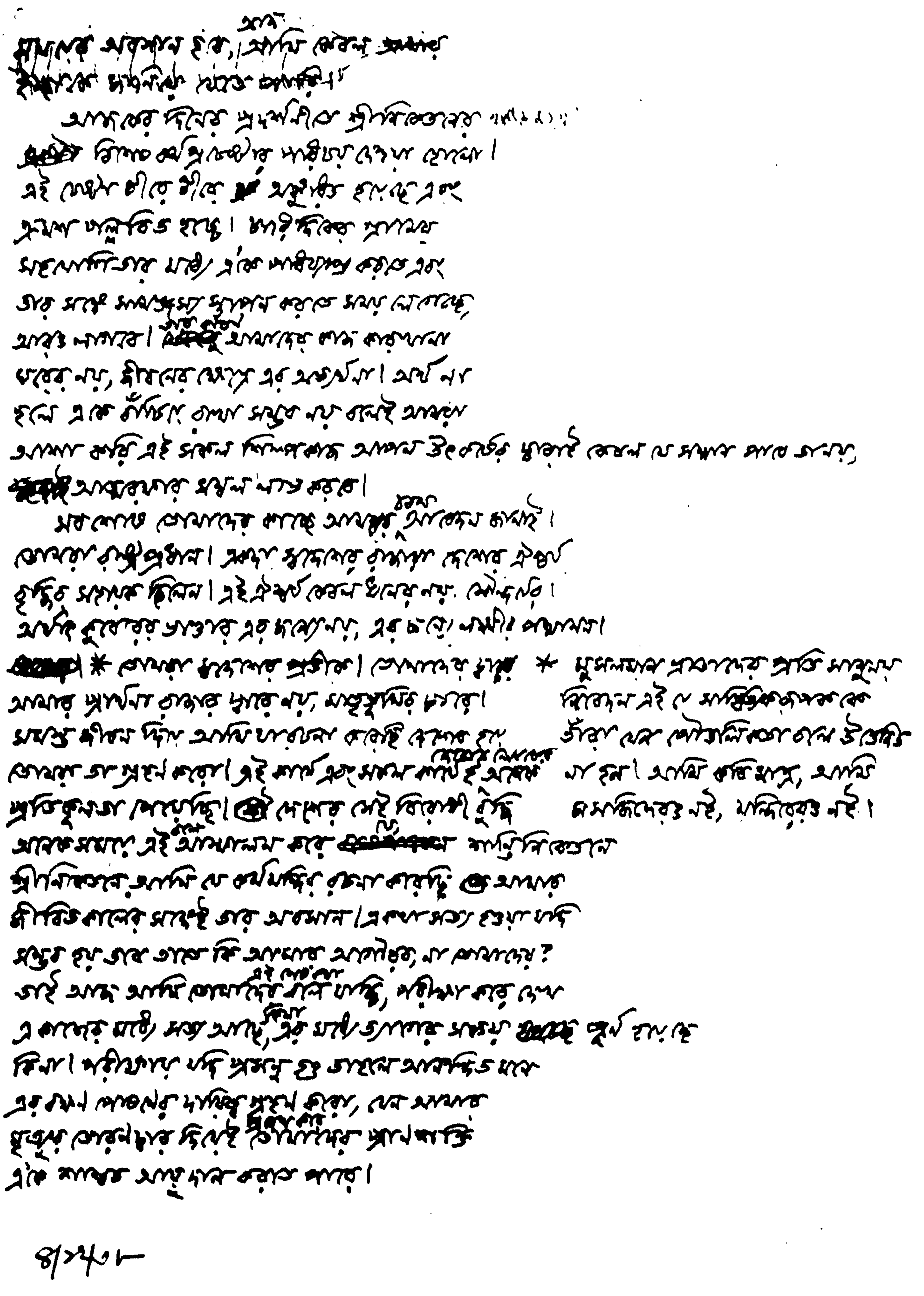

মানুষেরই অবকাশ হবে, তবে আমি কেবল আমার
ইচ্ছাকে জানিয়ে যেতে পারি।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের পল্লী-
~~[illegible]~~ শিল্পচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হোলো।
এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং
ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামের
সহযোগিতার মধ্যে একে সার্থক করতে এবং
তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে,
আরও লাগবে। ~~[illegible]~~ [illegible] আমাদের এই কারখানা
ধনের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর সার্থকতা। অর্থ নয়
হলে একে টাঁকায় ওজন করা চলে না বলেই আমরা
আশা করি এই সকল শিল্পকাজ আমাদের উৎসাহের দ্বারাই কেবল যে সমাদর পাবে তা নয়,
~~[illegible]~~ আত্মদানের মূল্য লাভ করবে।

সব শেষে তোমাদের কাছে আমার একটি নিবেদন জানাই।
তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। অতীত মুসলমানের রাজত্বে দেশের ঐশ্বর্য
বৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের।
অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডারে এর জন্ম নয়, এর স্থান লক্ষ্মীর পদ্মাসনে।
~~[illegible]~~ * তোমরা ঐশ্বর্যের প্রতীক। তোমাদের দ্বারা * মুসলমান রাজাদের প্রতি মানুষের
বিশ্বাস এই যে সাম্প্রদায়িকতাকে
তাঁরা যেন কোনোদিনও উত্তেজিত
না করেন। আমি কবি মানুষ, আমি
মসজিদেরও নই, মন্দিরেরও নই।
আমার প্রার্থনা রাজার দ্বারে নয়, মনুষ্যত্বের দ্বারে।
সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে
তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্য এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের
প্রতিকূলতা পেয়েছি। ~~[illegible]~~ দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি
অনেক সময়ে এই কর্ম আক্রমণ করে ~~[illegible]~~ শান্তিনিকেতনে
শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি ~~[illegible]~~ আমার
জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি
সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের?
তাই আজ আমি তোমাদের এই লোকের বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখ
এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে দেশের সত্য ~~[illegible]~~ পূর্ণ হয়েছে
কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে
এর রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন আমার
মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই [illegible] তোমাদের প্রাণশক্তি
একে শাশ্বত আয়ুদান করতে পারে।

৭।২।৩৮

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথের 'অভিভাষণ'
পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র

যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত

আমার যা বলবার ছিল তা অনেকবার বলেছি, কিছু বাকি রাখি নি। তখন শরীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে খর্ব করেছে, এখন আমার কাছে তোমরা বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

আমি এখানে অনেক দিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়—আমার উপস্থিতি ও সঙ্গমাত্র তোমাদের দিতে পারি। প্রথম যখন এই বাড়ি কিনলুম তখন মনে কোনো বিশেষ সংকল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল যে, শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষে শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ বিদ্যার কিছু বেশি দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই-সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ-দুঃখ নালিশ-আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি—নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটীর—আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম-বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা-আদায়, জমা-ওয়াশীল—এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলুম না; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময় আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি, পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমন ভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সংগে এ কাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথনির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে— তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে— মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্‌ করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্‌বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবাল। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘরভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধরে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বললে, 'ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি!' তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। একজন সম্পন্ন লোক গ্রামের পালক ও আশ্রয়; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার, তাঁরই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করেছি। যারা ধনী, ভারতবর্ষের সমাজ তাদের উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে; পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মন্দিরনির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই-সব কর্তব্যসম্পাদনেই ছিল তাদের সম্মান; এখনকার মতো খেতাব দেওয়ার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্রে তাদের স্তবগান বেরত না। লোকে খাতির করে তাদের বাবু বা মশায় বলত, এর চেয়ে বড়ো খেতাব তখন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এইরকমে সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে—ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব!'

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্য দিকে এই-সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হলে তাদের ভালো হতে পারে, কিন্তু বর্তমান জীবনের দুঃখদৈন্য থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই মনোবৃত্তি তাদের একান্ত অসহায় করে তুলেছে।

একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুণ্য কাজ বলে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারও কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোনো সুখ কোনো আনন্দ নেই তারা হঠাৎ কোনো বিপদ বা রোগ হলে রক্ষা পায় না। বাইরে থেকে এরা অনেক অত্যাচার অনেক দিন ধরে সহ্য করেছে। জমিদারের নায়েব, পেয়াদা, পুলিস, সবাই এদের উপর উৎপাত করেছে, এদের কান মলে দিয়েছে।

এই-সব কথা যখন ভেবে দেখলুম তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কখনো গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস করে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা করে দিতে হবে।

এইরকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম—অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায়-আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।' শুনে তারা বললে খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে। আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তা হলে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর-কিছুই নেই। আমাদের দেশে এক সময় শহরের যুবক ছাত্রেরা গ্রামের উপকার করতে লেগে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোক তাদের উপহাস করত; বলত, 'ঐ রে চার-আনার বাবুরা আসছে!' কী করে তারা এদের উপকার করবে—না জানে তাদের ভাষা, না আছে তাদের মনের সঙ্গে পরিচয়।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এইরকম নানাভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছুদিন চুপ করে বসে ছিলুম। অ্যান্ড্রুজ বললেন, 'বেচে ফেলুন।' আমি মনে ভাবলুম, যখন কিনেছি, তখন তার একটা-কিছু তাৎপর্য আছে—আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন করে হবে, তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোনো শুভলগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তখন অভাব। তার পর, আস্তে আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হত না। এল্‌ম্‌হার্‌স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।

সবশেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই—চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে—এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের

হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

ভাদ্র ১৩৪৬

হলকর্ষণ

শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ-উৎসবে কথিত

পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্রস্নানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে-সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। আর্য ঔপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন এই-সব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলে মূলে, আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিদ্রোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মানুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংস্রতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তখন অরণ্য মানুষের পথ রোধ করে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল এক দিকে আশ্রয়, অন্য দিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে তারা অগত্যা ছোটো সীমানায় ছোটো ছোটো দল বেঁধে বাস করেছে। এক দল অন্য দলের প্রতি সংশয় ও বিদ্বেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছে। এইরকম মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠান হয়েছে নরঘাতক। মানুষ মানুষের সবচেয়ে নিদারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজও অবসান হয় নি। এই-সব দুষ্প্রবেশ্য বাসস্থান ও পশুচারণভূমির অধিকার হতে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্য তারা ক্রমাগত নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। পৃথিবীতে যে-সব জন্তু টিঁকে আছে তারা স্বজাতিহত্যার দ্বারা এরকম পরস্পর ধ্বংসসাধনের চর্চা করে না।

এই দুর্লঙ্ঘ্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্রশক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তার পর কখনো দৈবক্রমে কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম সহায়-আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজও নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজও আগুন নানা মূর্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।

তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহার্যের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে

জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার একটা বড়ো যুগ। সেই দিন সখ্যধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল। তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফললাভের কামনায়। ধনসম্পদ ও শত্রুজয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শক্তি কল্পনা করে তারই সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠান তখন গৌরব পেত। কিন্তু যেহেতু এর লক্ষ্য ছিল বাহ্য ফললাভ, এইজন্যে এর মধ্যে বিষয়বুদ্ধিই ছিল মুখ্য; প্রতিযোগিতার সংকীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ ঐক্যবুদ্ধি এর মধ্যে মুক্তি পেত না।

তার পরে এল এক যুগ, তাকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে— আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান বলে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণরেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

যে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল, তাদের শক্তিকে পরাভূত করে তাদের হাত থেকে এই নূতন বিদ্যাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে বিস্তর প্রয়াস করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর দান গ্রহণ কবরার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান-কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।

আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।

কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরও দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষ্যার মানুষকে মানুষ মারত, কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘ যুগের ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর-এক তীর অধিকার করে থাকত। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শতসংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ

আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকান্ড একটা চিতা—সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ্‌, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট—যা এত বীভৎস রকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।

১২ ভাদ্র ১৩৪৬

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত

এক সময়ে আমি যখন ইংলন্ডে গিয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুকাল এক পল্লীতে এক চাষী গৃহস্থের ঘরে বাস করবার। আমি শহরবাসী হলেও সেখানকার পল্লীতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলন্ডের পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসন্তুষ্ট; গ্রামের ভিতর তাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পুষ্টি নেই, তারা কবে লন্ডনে যাবে এইজন্য দিন-রাত্রি তাদের উদ্‌বেগ। জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম—য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আয়োজন শিক্ষা আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা সংহত বড়ো বড়ো শহরে, এইজন্য শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই-যে ভাগ তা প্রধানত পরিমাণগত, শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে, কোনো বিরোধ নেই; যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে—শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈদ্য-কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, একটা বড়ো ইমারতের মধ্যে বন্ধ করে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতিসম্পদ্‌ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে—পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এ দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে

সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবেন না বলে পল্লীর উপকার করতে লেগেছিলেন। তারা পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি, পল্লীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারে নি। কী করে মিলবে। মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয় নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয় নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পঙ্‌ক্তিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেশনের পাতা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো করে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিভেদ এ'কে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান, কী পল্লী কী নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে— সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনোরকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে। মন অহংকৃত হয়; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে।' এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন-সব বিষয়ে মুখস্থ-করা উপদেশ দিতে আসেন হয়তো যে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চেয়ে ভালোই জানে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে শিলাইদহে আলুর চাষ বিস্তৃত ভাবে প্রচলন করব। আমার প্রস্তাব শুনে কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ বললেন যে, আমার নির্দিষ্ট জমিতে আলুর চাষ করতে হলে একশো মণ সার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি কৃষিবিভাগের প্রকাণ্ড তালিকা-অনুসারে কাজ করলুম; ফসলও ফলল, কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনোই সামঞ্জস্য রইল না। এ-সব দেখে আমার এক চাষী প্রজা বললে, 'আমার 'পরে ভার দিন বাবু।' সে কৃষিবিভাগের তালিকাকে অবজ্ঞা করেও প্রচুর ফসল ফলিয়ে আমাকে লজ্জিত করলে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ, বড়ো উদ্দেশ্য আছে, তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

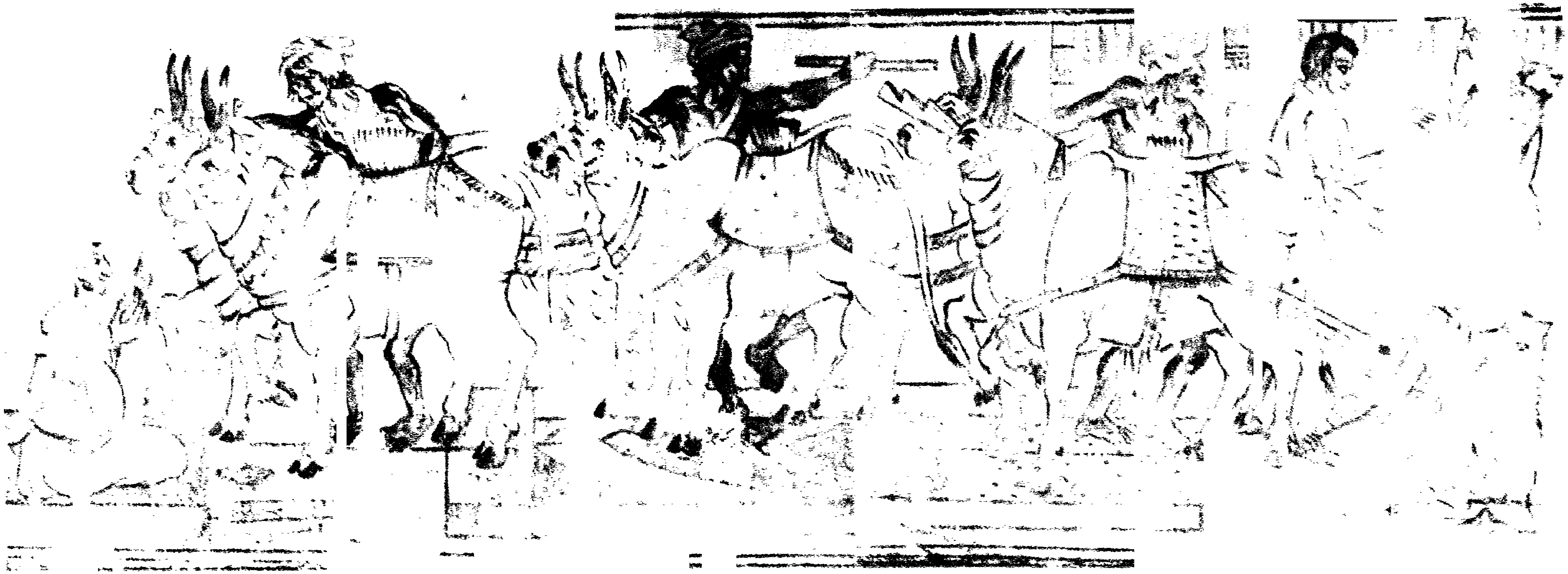

শ্রীনিকেতনে 'সাত যজ্ঞ' ১৩৩৬ ।ধুশেখর শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও লে এলম্‌হ..স্ট র হলচালনা।
স ঙ্কিত ভিত্তিচিত্র (মাঘ ১৩৩৬)।

অভিভাষণ

বিশ্বভারতী সম্মিলনী

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তামহাশয় বলেছেন যে আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা-কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মতো। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কতদিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর-একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মতো বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পক্ষে এই-সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য সে কথা মানি; তবুও এ কথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার প্রাণমন সত্তার উদ্ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড়ো-একটা দেখতে পাই নে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বেশি বাকি নেই।

বক্তামহাশয় বলেছেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জনতাবহুল শহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তাতে করে পূর্বে যে মাটিতে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত অথচ তা দরিদ্র হত না, সে মাটি শহুরে মানুষদের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতা-গুলির ক্রমে ক্রমে পতন হতে লাগল। অবশ্য আধুনিককালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে শহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও অন্য জায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানি হচ্ছে। এমনি করে খাওয়া-দাওয়া স্বচ্ছন্দে চলছে কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে মানুষকে নিশ্চয়ই একদিন কোনোখানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র-আবর্তনের কথা বলা হয়েছে তেমনি মনেরও চক্র-আবর্তন আছে, সেটাকেও অব্যাহত রাখতে হবে সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান, তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা কত ত্যাগ কত তপস্যায় তৈরি, কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে, তা হলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয়; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান্ প্রাণপ্রদ হতে পারে না, চিত্তশক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয় তবে তা নির্জীব হয়ে যাবে।

বক্তামহাশয় বলেছেন যে ধানের খড় গাড়ি-বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছে, আর তাতে করে কৃষকের ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং শহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই শহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লীসমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমি দেখেছি সেখানে কী নিরানন্দ বিরাজ করছে। সেখানে যাত্রা কীর্তন রামায়ণগান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্য দিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রাণবান্ হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্য যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ-আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ, তাদের দ্বারাই চিত্তক্ষেত্র উর্বর হয়। অথচ শহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। শহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তাবন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তাঁরা বলেন যে সেখানে খাওয়া-দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মতো খোরাক দুষ্প্রাপ্য, অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দশার কথা কেউ ভালো করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কী ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম এমন বিকৃত বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে-সব কথা খুলে বলা যায় না।

এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব আজকার বক্তৃতায় প্রশ্ন করেছেন যে প্রাণরক্ষার উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে। একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে গ্রামে যারা মদ খায় তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে, দরিদ্র লোকদের মদ খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। তাদের অবসাদ আসে— তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায় তাই ভিজিয়ে দুপুর বারোটা-একটার সময়ে খায়, তার পর খিদে নিয়ে বাড়ি ফেরে। যখন দেহপ্রাণে অবসাদ আসে তখন তা প্রচুর ও ভালো খাদ্যে দূর হতে পারে, কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাব-পূরণ হয় না বলে তারা তিন-চার পয়সার ধেনো মদ খায়, তাতে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তারা নিজেদের রাজাবাদশার মতো মনে করে সন্তুষ্ট হয়— তার পর তারা বাড়ি যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা-পার্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে, জবরদস্তি করে, ধর্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার দুর্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ

এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।

অপর দিকে আমরা শহরে অন্যরূপে মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্পপরিসরের মধ্যে উন্মাদনার আশ্রয়ে কর্তব্যবুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষায় লেখায় বা অন্য আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। তাই ক্ষুব্ধ কর্তব্যবুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্য আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই—আর আমার মতো যাঁরা কাব্যরচনা করতে পারেন তাঁরা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না, সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই হাড়িডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে আর আমাদেরও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে জানি তারা নন্‌-কো-অপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যতদিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ততদিন কাজ চলেছিল, তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়িডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন। পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকালসাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেছেন। এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধির কোনোরূপ খাদ্য তো চাই, সেই খাদ্য প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে তা হলে কাজেই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতে হয়।

আজকাল আমরা সমাজের তিন স্তরে তিনরকমের মদ খাচ্ছি—সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশান্ত করবার মতো মদ। হাড়িডোমদের মধ্যে একরকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর-একরকম মদ, আর শহরের শিক্ষিতসাধারণের মধ্যেও একপ্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েছে।

১৩২৯

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের এই কাজ উপলক্ষে কী করে মিলন হল একটু বলে রাখি। আমি নিজে অবশ্য ডাক্তার নই, এবং ম্যালেরিয়ানিবারণ সম্বন্ধে আমার মতের কোনো মূল্য নেই। আপনারা সকলে জানেন আমাদের যে 'বিশ্বভারতী' বলে একটা অনুষ্ঠান আছে, তার অন্তর্গত করে শান্তিনিকেতনের চারি দিকে যে-সমস্ত গ্রাম আছে সে গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের আশ্রমে আমরা প্রধানত বিদ্যাচর্চা করে থাকি বটে, কিন্তু আমার বরাবর এই মত—বিদ্যাকে, স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করলে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে মিশ খায় না, তাকে জীবনের বস্তু করা যায় না। এইজন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে চেষ্টা করছি চারি দিকের গ্রামের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের বিদ্যানুশীলনের কর্মকে একত্র করতে। এই কাজ আমাদের চলছিল। এখানে এই সভাগৃহে আমাদের এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। যাঁরা সে সভাক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা জানেন কিরকম ভাবে আমাদের কাজ হচ্ছে। এই কাজ হাতে নিয়ে প্রথমে দেখা গেল—রোগের ছবি।

আমরা অব্যবসায়ী, আমাদের তখনো সাহস ছিল না যে দেশের লোককে বলি যে, যাঁরা অভিজ্ঞ গ্রামের রোগনিবারণ কাজে তাঁরা সহায়তা করুন। নিজেরাই যেমন করে পারি চেষ্টা করেছি। এ সম্বন্ধে বিদেশী লোকের কাছে সাহায্য পেয়েছি, সে কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি। আমরা আমেরিকার একটি মহিলাকে সহায়-রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে, সেইটাকে মাত্র নিয়ে তিনি রোগীদের ঘরে ঘরে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন, অতি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন— অত্যন্ত ক্ষত ঘা, যা দেখে ভদ্রসমাজের লোকের ঘৃণা হয়, সে-সমস্ত নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়েছেন— যারা অন্ত্যজ জাতি তাদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, পথ্য খাইয়েছেন— আজ পর্যন্ত তিনি কাজ করছেন, অসহ্য গরমে শরীরের গ্লানি সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্মও তিনি ছাড়েন নি। শরীর যখন ভেঙে পড়ল, শিলং গিয়ে কিছুদিন ছিলেন, ফিরে এসে আবার শরীর নষ্ট করেছেন। এমন করে তাঁকে পেয়েছি। তাঁকে দেশে যেতে হবে, যে-কয়টা দিন আছেন প্রাণপাত করে সেবা করছেন।

আর-একজন সহৃদয় ইংরেজ এল্‌ম্‌হার্স্ট, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের খরচে বিদেশ থেকে নিজে টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি দিনরাত চতুর্দিকের গ্রামগুলির দুরবস্থা কী করে মোচন হতে পারে, এর জন্য কী-না করেছেন বলে শেষ করা যায় না। যে দুজনের সহায়তা পেয়েছি সে দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন, এঁদের নিয়ে কাজ করছি।

এইটে আপনারা বুঝতে পারেন, পতঙ্গে মানুষে লড়াই। আমাদের রোগশত্রুর বাহনটি যে ক্ষেত্র অধিকার করে আছে সে অতি বিস্তীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ জায়গায় পতঙ্গের মতো এত ক্ষুদ্র শত্রুর নাগাল পাওয়া যায় না। অন্তত ২।৪ জন লোকের দ্বারা তা হওয়া দুঃসাধ্য, সকলে সমবেতভাবে কাজ না করলে কিছুই হতে পারে না। আমরা হাতড়াচ্ছিলাম, চেষ্টা-মাত্র করছিলাম, এমন সময় আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, মেডিকেল কলেজে পড়ে, আমার কাছে এসে বললে, 'গোপালবাবু খুব বড়ো জীবাণু-তত্ত্ব-বিদ্‌, এমন-কি, ইউরোপে পর্যন্ত তাঁর নাম বিখ্যাত। তিনি খুব বড়ো ডাক্তার, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। আপনারা ম্যালেরিয়ার সহিত লড়াই করতে যাচ্ছেন, তিনি সে কাজ আরম্ভ করেছেন; নিজের ব্যবসায়ে ক্ষতি করে একটা পণ নিয়েছেন— যতদূর পর্যন্ত সম্ভব বাংলা-দেশকে তার প্রবলতম শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবেন।' যখন এ কথা শুনলাম, আমার মন আকৃষ্ট হল। আমাদের এই কাজে তাঁর সহায়তা দাবি করতে সংকল্প করলুম। মশা মারবার অস্ত্র পাব এজন্য নয়; মনে হল এমন একজন দেশের লোকের খবর পাওয়া গেল যিনি কোনোরকম রাগ-দ্বেষে উত্তেজনায় নয়, বাহিরের তাড়নায় নয়, কিন্তু একান্তভাবে কেবলমাত্র দেশের লোককে বাঁচাবার উপলক্ষে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন করে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন— এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ো বিরল। আমার মনে খুব ভক্তির উদ্রেক হল বলে আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় আলোচনা করতে চাই। এমন সময় তিনি স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি কী ভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। তখন এ কথা আমার মনে উদয় হল, যদি এঁর কাজের সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি তা হলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয়— এঁর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।

আপনারা দেখেছেন, যুদ্ধের পর এই-যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার প্রতিভা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দৈহিক দুর্বলতা তার কারণ। যখন ব্লকেড-দ্বারা খাবার বন্ধ করা হয়েছিল সে সময় অনাহারে অনেক মানুষ মরেছে সেইটাই বড়ো কথা নয়। যে-সমস্ত শিশুর দুধ খাওয়ার দরকার ছিল, যে-সমস্ত প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুগের শিশুরা অপরিপুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল। এর ফলে এরা বড়ো হলে তেমন বুদ্ধিশক্তির জোর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই এই হিসাবে দেখতে গেলে মাথা-গণতি অনুসারে লোকসংখ্যা হয় না, যাদের মাথা আছে

তাদের কার্যকারিতা কতদূর তা দেখতে হবে। শুধু সংখ্যাগণনা ঠিক গণনা নয়। বাংলাদেশে আমরা ভাবছি না— যেখানে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল উৎস সেখানে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা রোগের বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চিরদুর্বলতা বহন করে আছি। প্রতি বৎসর কত লোক জন্মাচ্ছে, কত লোক মরছে, সংখ্যা কত বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা বড়ো কথা নয়; যারা টিঁকে রইল তারা মানুষের মতো রইল কি না সেইটে বড়ো কথা। তাদের কার্যকারিতা, মাথা খাটাবার শক্তি, আছে কি না সেইটে বড়ো কথা। নতুবা জীবন্মৃতের দল যদি অধিকাংশ হয়, তার বোঝা জাতি বইতে পারবে না। শারীরিক দুর্বলতা থেকে মানসিক দুর্বলতা আসে। ম্যালেরিয়া রক্তের মধ্যে অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও বল পাই না। যার প্রাণের প্রাচুর্য আছে সে প্রাণ দিতে পারে। যার কেবল কোনোরকমে বেঁচে থাকা চলে, জীবনধারণের জন্য যা দরকার তার বেশি যার একটু উদ্‌বৃত্ত হয় না, তার প্রাণে বদান্যতা থাকে না। প্রাণের বদান্যতা না থাকলে বড়ো সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানে প্রাণের কৃপণতা সেখানে ক্ষুদ্রতা আসবে। প্রাণের শক্তির এত বড়ো ক্ষয় কোনো সভ্য দেশে কখনো হয় নি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্গতির কারণ সব দেশেই আছে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব কী। না, সেই দুর্গতির কারণকে অনিবার্য বলে মনে না করে, যখন যাতে কষ্ট পাচ্ছি চেষ্টা-দ্বারা তাকে দূর করতে পারি, এ অভিমান মনে রাখা। আমরা এতদিন পর্যন্ত বলেছি, ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী, তার সঙ্গে কী করে লড়াই করব, লক্ষ লক্ষ মশা রয়েছে তাদের তাড়াব কী করে, গভর্মেন্ট আছে সে কিছু করবে না— আমরা কী করব! সে কথা বললে চলবে না। যখন আমরা মরছি, লক্ষ লক্ষ মরছি— কত লক্ষ না মরেও মরে রয়েছে— যে করেই হোক এর যদি প্রতিকার না করতে পারি আমাদের কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ম্যালেরিয়া অন্য ব্যাধির আকর। ম্যালেরিয়া থেকে যক্ষ্মা অজীর্ণ প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়। একটা বড়ো দ্বার খোলা পেলে যমদূতেরা হুড়্‌ হুড়্‌ করে ঢুকে পড়ে, কী করে পারব তাদের সঙ্গে লড়াই করতে। গোড়াতে দরজা বন্ধ করা চাই, তবে যদি বাঙালি জাতিকে আমরা বাঁচাতে পারি।

আর-একটা কথা আছে, সেইটে আপনারা ভাববেন। এই-যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস এ যদি কোনো-এক জায়গায় মানুষ দূর করতে পারে— সমস্ত অমঙ্গল, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিধিলিপি বলে মেনে আসছি, যদি এর উল্টা কথা কোনো উপলক্ষে বলতে পারি— মস্ত কাজ হয়। শত্রু যত বড়োই হোক, তাকে মানব না, মশাকে রাখব না, যেমন করে পারি উচ্ছেদ করব— এ সাহস যদি হয়, তবে কেবল মশা নয়, তার চেয়ে বড়ো শত্রু নিজেদের দীনতার উপর জয়লাভ করব।

আর-একটা কথা— পরস্পরের মিলনের নানা উপলক্ষ চাই। এমন অনেক উপলক্ষ চাই যাতে আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলতে পারে। দেশ বলতে যা বুঝি সকলে তা বোঝে না, স্বরাজ কী অনেকে তা বোঝে না। কিন্তু মিলন বলতে যা বুঝি, এমন কেউ নেই যে তা বোঝে না। কিন্তু যদি কোনো-একটা গ্রামের সকলে মিলে কিছু পরিমাণেও রোগ কমাতে পারি, তবে বিদ্বান মূর্খ সকলের মেলবার এমন সহজ ক্ষেত্র আর হতে পারে না। গোপালবাবু এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এই-যে ইনি মণ্ডলদের নাম করলেন, শুনে সুখী হলাম এঁরা একযোগে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে অতি ক্ষুদ্র শত্রু মশা মারবার জন্য সকলে মিলে লেগেছেন। এর মতো সুলক্ষণ আর নেই। কারণ, প্রত্যেকের হিতের জন্যে সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই ভালো। একটি গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গোরুর গাড়ি চলায় তার একটা জায়গায় গর্ত হয়েছে— ৪।৫ হাতের বেশি নয়— বর্ষার সময় তাতে একহাঁটুর উপর কাদা জমে আর সেই কাদার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ হাটবাজার করতে যায়। নিকটবর্তী গ্রামের লোক, যারা সবচেয়ে কষ্ট পায়, তারাও এ কথা বলে না ‘কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি ফেলে জায়গাটা সমান করে দিই’, তার কারণ তারা ঠকতে ভয় পায়। তারা ভাবে, ‘আমরাই খাটব অথচ তার সুবিধে আমরা ছাড়াও অন্য সবাই পাবে, এর

চেয়ে নিজেরা দুঃখ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি— একটা গ্রামে বৎসর-বৎসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়া ছিল না, আমি তাদের বললুম, 'তোমরা কুয়ো খোঁড়ো, আমি সে কুয়ো বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'বাবু, মাছের তেলে মাছ ভাজতে চাও! অর্থাৎ, অর্ধেক খাটুনি আমাদের, অথচ জলদানের পুণ্যটা সম্পূর্ণ তোমার! তার চেয়ে ইহলোকে আমরা জলাভাবে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি যে সস্তায় সদ্‌গতি লাভ করবে সে সইতে পারব না।'

দেশের মধ্যে এরকম ভাব রয়েছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও আছে অন্য নানা আকারে, সে কথা আলোচনা করতে সাহস করি না। গোপালবাবু যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাতে লোকে এই কথা বুঝতে পারবে যে, পাশের লোকের বাড়ির ডোবায় যে মশা জন্মায় তারা বিনা পক্ষপাতে আমারও রক্ত শোষণ করে, অতএব তার ডোবার সংস্কার করা আমারও কাজ।

গোপালবাবু মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লোভ ক্রোধ বিদ্বেষের উত্তেজনা-বর্জিত নির্মল শুভবুদ্ধি তাঁকে এই কাজে আকৃষ্ট করেছে। মহত্ত্বের এই দৃষ্টান্তটি মশকবধের চেয়েও আমাদের কাছে কম মূল্যবান নয়। এইজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

২৯ অগস্ট ১৯২৩

ম্যালেরিয়া

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

এই-যে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা ও চেষ্টা, আজকে ওঁদের যে-বিষয়ক বিবরণের জন্য এই সভা আহূত হয়েছে, এতে আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছেন। এ কথা আপনাদের অবিদিত নয় যে, আমার কোনো অধিকার নাই এখানে আসন গ্রহণ করবার। একমাত্র যদি থাকে সে এই বলতে পারি আমার শরীর অসুস্থ— আমি রোগী, কিন্তু ম্যালেরিয়া-রোগী নই, সুতরাং সে দিক থেকেও আমার বলবার কথা কিছু নাই। একটা আসল কথা এই— এই ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভার মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ কেহ আছেন, তাঁরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বহু রচনা চারি দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন— এ বিষয়ে তাঁরা কাজ করেন, সুতরাং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অত্যুক্তি না-ও হতে পারে। যা হোক, আমার যা বলবার দু-একটা কথায় বলে বিদায় নেব, আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি, কারণ এ আহ্বানকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নাই।

আমার পূর্ববর্তী বক্তার যা বলবার কথা তার ভিতর অনেক ভাববার বিষয় আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে-সমুদয় ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করেছে তার একটি মাত্র কারণ নয়, প্রশ্নটি বহু জটিল, সহজে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে না। এক দিক থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে গিয়ে আর-এক দিকে ছেঁদা বেরুতে পারে— এ কথা যা বলেছেন অন্যায় বলেন নি, অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। সব দিক থেকে আটঘাট বেঁধে ম্যালেরিয়াকে না ঢুকতে দেওয়া, তাড়া করে বের করে দেওয়া, এর সব দিক আমাদের হাতে নাই। এ কথা সত্য, মস্ত সত্য যে, পূর্বে যেখানে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না সেখানে ম্যালেরিয়া এসেছে। তার একটা কারণ রেলওয়ে এ দেশে তখন ছিল না, স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল না। মশা উৎপন্ন হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই দাঁড়িয়েছে যে, রেলওয়ে লাইন দু ধারের গ্রামগুলিকে অত্যন্ত আঘাত করছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আরও ঘটনা ঘটেছে— যাঁরা বাণিজ্যের দিকে, প্রভুত্বের দিকে, লাভের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁদের লোভের দরুন অসহ্য দুঃখ এ দেশে উপস্থিত হয়েছে, বন্যা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ জেগে উঠেছে, এটা খুব বড়ো সমস্যা তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বক্তামহাশয় একটা বিষয়ে ভুল করেছেন। আমাদের মাননীয় বন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন এ যদি শুধু মশা মারার কাজ

হত তা হলে আমি একে বড়ো ব্যাপার বলে মনে করতুম না। দেশে মশা আছে এটা বড়ো সমস্যা নয়, বড়ো কথা এই—দেশের লোকের মনে জড়তা আছে। সেটা আমাদের দোষ, বড়োরকম দুঃখ-বিপদের মূল কারণ সেখানে। ওঁরা এ কাজ হাতে নিয়েছেন, সেজন্য ওঁদের কাজ সকলের চেয়ে বড়ো বলে মনে করি। গোপালবাবু উপকার করবেন বলে কোমর বেঁধে আসেন নি। কোনো-একজন ব্যক্তি বলতে পারে না, 'আমি কুইনাইন দিয়ে বা ইন্‌জেক্‌শন করে দেশের সকল রোগ ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নিবারণ করব।' এমন কথা বলবার দোষ আছে, কারণ তাঁরা কতদিন পৃথিবীতে থাকবেন। আজ বাদে কাল চলে যেতে কতক্ষণ। কতরকম ব্যাধি-বিপদ আছে! যদি ব্যক্তিগত কয়েকজন লোকের উদ্যমকে একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করি তা হলে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সকলরকম দুর্গতি-নিবারণের জন্য আমরা বাহিরের লোকের সহায়তা বরাবর অপেক্ষা করেছি। এমন দিন ছিল যখন রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষী হয়ে দেশ ছিল না, এমন সময় ছিল যখন দেশের জলাভাব দেশের লোক নিবারণ করেছে—অন্যান্য অভাবও দেশের লোক নিবারণ করেছে। কিন্তু তার ভিতর একটা দুর্বলতা ছিল বলে আমরা আজ পর্যন্ত দুঃখের হাত এড়াতে পারছি না। যারা সেকালে কীর্তি অর্জন করতে উৎসুক ছিল, যাঁরা উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁদের উপর দেশের লোক দাবি করেছে। তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি—তাঁদের উপর জল দেবার, মন্দির দেবার, অতিথিশালা করে দেবার, আরও অন্যান্য অভাব মোচন করবার দাবি করেছি—তাঁদের পুরস্কার ছিল ইহকালে কীর্তি ও পরকালে সদ্গতি। এখনকার দিনে তার ফল এই দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা এখন পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে কে এসে তাদের জলদান করবে—জলদান পুণ্যকর্ম, সে পুণ্যকর্ম কে করবে। অর্থাৎ, তাদের বলবার কথা এই—'আমাকে জলদান-দ্বারা তুমি আমার উপকার করছ সেটা বড়ো কথা নয়, তুমি যে পরকালে পুরস্কার পাবে সেজন্য তুমি করবে।' এই-যে তার প্রতি দাবি, এবং তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, সেটা আজ পর্যন্ত গভীরভাবে আমাদের দেশে আছে। এই একটা অসত্যের সৃষ্টি হয়েছে—সর্বসাধারণ সকলে একত্র সম্মিলিত হয়ে নিজের অভাব নিজেরা দূর করবার জন্য কখনো সংকল্প করে না। এমন দিন ছিল যখন দেশে উপকারী সুহৃদ লোকের অভাব ছিল না, সুতরাং সহজেই তখন গ্রামের উন্নতি হয়েছে, অভাব দূর হয়েছে। কিন্তু এখন সে দিনের পরিবর্তন হয়েছে, নূতন অবস্থার উপযোগী চিত্তবৃত্তি এখনো আমরা পেলুম না—এখনো যদি আমরা পুণ্যকর্মী কোনো সুহৃদের উপর ভার দিই, দেশের জলাভাব, দেশের রোগ তাপ সে এসে দূর করুক, তা হলে আমাদের পরিত্রাণ নেই। এখানে বলবার কথা এই, 'তোমরা দুঃখ পাচ্ছ, সে দুঃখ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে দূর করতে না পারবে ততক্ষণ যদি কোনো বন্ধু বাহির থেকে বন্ধুতা করতে আসে তাকে শত্রু বলে জেনো। কারণ তোমার ভিতর যে অভাব আছে সে তাকে চিরন্তন করে দেয়, বাহিরের অভাব দূর করবার চেষ্টা-দ্বারা। গোপালবাবু যে ব্যবস্থা করেছেন, যাকে পল্লীসেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ তোমরা একত্র সমবেত হয়ে তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমাদের দুঃখ দূর করো। এ কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তারা (গ্রামের লোক) বিশ্বাস করতে পারে নাই যে নিজের চেষ্টায় দুঃখ দূর করা যায়। সাধারণ লোকের এমন অভিজ্ঞতা কোনো কালে ছিল না। পূর্বে অসাধারণ লোকেরা তাদের উপকার করেছে—তাদের তারা খুব সম্মান করেছে। এখনো দেখি সে দিকে তারা তাকাচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস তাদের কেউ গোপালবাবুর উপর ক্রুদ্ধও হতে পারে এইজন্য—'ইনি আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন কেন, নিজে আমাদের ঔষধপত্র দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করলেই তো পারেন।' একটা প্রচলিত গল্প আছে—একজন মা-কালীকে মানত করেছিল মোষ দেবে। অনেকদিন অপেক্ষা করে মা-কালী মোষ না পেয়ে দেখা দিলেন, তখন সে বললে, 'মোষ দিতে পারব না, একটা ছাগল দেব।' আচ্ছা, তাই সই। তার পর ছাগল দেয় না। আবার দেখা দিলেন; লোকটি বলল, 'মা, ছাগল পাই না, একটা ফড়িং দেব।' 'আচ্ছা, তাই দাও।' তখন সে বললে, 'এতই যদি মা তোমার দয়া, তবে একটা ফড়িং নিজে ধরে খাও-না কেন।' এও তাই, আমাদেরও সেরকম অবস্থা। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি, সে ঘটনাটি এই—আমাদের একটা গ্রামের সঙ্গে

যোগ ছিল, গ্রামবাসীদের ফি বৎসর বড়ো জলাভাব হত। আমি বললাম, 'তোমরা কুয়া খোঁড়ো, আমি বাঁধিয়ে দেবার খরচ দেব।' তারা বললে, 'মহাশয়, আপনি কি মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চান? আমরা খরচ দিয়ে কুয়া খুঁড়ব আর স্বর্গে যাবেন আপনি।' আমি বললাম, 'তোমরা যতক্ষণ কুয়া না খোঁড় আমি কিছুই দেব না।' কুয়া হল না। গ্রামে প্রতি বৎসর আগুন লাগছে, তাদের পাড়ার মেয়েরা ৪।৫ মাইল দূরে বালি ভেঙে অসহ্য রৌদ্রে জল নিয়ে আসে, ঘরে অতিথি এলে একঘটি জল দিতে প্রাণে কষ্ট হয়, কিন্তু কয়জনে মিলে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তে পারবে না। কেহ বলছে, 'কোন্ জায়গায় দেব, ওর বাড়ির দুই হাত দূরে, ওর বাড়ির কাছে পড়ে; আর-একজন যে জিতল, আমার চেয়ে দুই হাত জিতল— এটা সহ্য হয় না।' নিজেদের পরস্পর চেষ্টা-দ্বারা পরস্পর কল্যাণের প্রবৃত্তি কারও মনে জেগে উঠে না, সকলের যাতে কল্যাণ হয় সে চেষ্টা আমাদের দেশে হল না, তাতে দুর্গতির একশেষ হয়েছে। আমি দেখেছি— একটা গ্রামে মস্ত রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল, ক্রমাগত গোরুর গাড়ি যাওয়ায় এক জায়গায় একটা খাদ হয়, বর্ষার সময় হাঁটু পর্যন্ত কাদা হয়, যাওয়া-আসার বড়ো কষ্ট হত। তার দু পাশে দুখানি বড়ো গ্রাম, দু ঘণ্টা কাজ করলে এটা ভরাট করা যেতে পারে। কিন্তু তারা বললে, তারা দু ঘণ্টা কাজ করবে, আর যারা কুষ্ঠিয়া থেকে কি অন্য জায়গা থেকে আসবে তারা কিছু করবে না— তারা সুবিধা পাবে! নিজে শত অসুবিধা ভোগ করবে তবু পরের সুবিধা সহ্য করতে পারবে না— দূরের লোক তাদের ঠকালো ক্রমাগত এই ভয়। অন্যে পরিশ্রম না করে আমার পরিশ্রমের সুবিধা ভোগ করবে, আমার পরিশ্রমের ফলে সকলের কল্যাণ হবে— এটা তারা সহ্য করতে পারে না। না করতে পারার কারণ এই— কর্মের পুরস্কার মনে মনে কল্পনা। নিজের পুরস্কার কামনা করে কর্মের প্রতি যে ঝোঁক জন্মে সে কর্ম হীনকর্ম। সর্বসাধারণের কল্যাণ হোক, নাহয় আমার পরিশ্রম হল, এ কথা তারা বুঝতে পারে না। দুঃখ দিয়ে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে, মরতে হয় তারা মরুক, মৃত্যুদূতের কানমলা খেয়ে যদি তাদের চৈতন্য হয় তাও ভালো। গ্রামে গ্রামে ঔষধ পথ্য দিয়ে গোপালবাবু সরে যাবেন এ কথা তিনি বলেন নি বটে— যাকে সেবা বলে তিনি তাই করছেন, বেশি দিন তা করবেন না। যেই তারা বুঝবে এই প্রণালীতে উপকার হয়, অমনি ওঁরা সরে আসবেন তাদের উপর ভার দিয়ে।

গাঁয়ে না গেলে বুঝতে পারবেন না ম্যালেরিয়া কী ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকের যকৃৎ-পিলেতে পেট ভর্তি হয়ে আছে, সুতরাং ম্যালেরিয়া দূর করতে হবে— বেশি করে বুঝাবার দরকার নাই। আমরা অনেকে জানি ম্যালেরিয়া কিরকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। এ দেশে অনেক জিনিস হয় না; অনেক জিনিস আরম্ভ করি, শেষ হতে চায় না; অনেক কাজেই দুর্বলতা দেখতে পাই— পরীক্ষা করলে দেখা যায় ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্য থেকে তেজ কেড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করবার ইচ্ছাও হয় না। সকলেই জানেন বাংলাদেশের কাজকর্মে পশ্চিম থেকে লোক আসে। যেখানে বাংলার জেলে ছিল সেখানে হিন্দুস্থানি জেলে এসেছে। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ নিস্তেজ, কাজেই উৎসাহ নেই। প্রভুরা বলেন বটে, চালাকি করছে, ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে, মজুরেরা কাজ করে না, আফিসে কেরানিরা কাজে মন দেয় না। জোয়ান জোয়ান সাহেব, তোমরা বুঝবে কী করে— ওরা চালাকি করে না; ম্যালেরিয়ায় যারা জীর্ণ, নিয়ত কাজ করবার, কাজে মন দেবার শক্তি তাদের নাই; মশার কামড় খেয়ে ওদের এরকম অবস্থা হয়েছে। কিছুদিন এ দেশে থাকো, এটা ভালো করে বুঝতে পারবে।

তাই বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকো না, মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে থেকো না। সাহস করো— আমাদের দুঃখ আমরা নিবারণ করতে পারব, শুধু সাহস চাই। কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা কর্মে যদি একবার জয়পতাকা খুলে দিতে পারো— সাহস আসবে। ম্যালেরিয়ায় কত লোক মরছে রিপোর্ট দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি শুনেছি তার খুব পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে বিশ্বাস। বাংলাদেশ থেকে মশা দূর করা সম্পূর্ণ না হোক, এতটা পরিমাণেও যদি হয় অনেক উন্নতি হবে। এতে যে কেবল মশা মরবে তা নয়, জড়তা মরবে।

নিজের প্রতি নিজের যে বিশ্বাস সেই চিরন্তন ভিত্তি, চিরকেলে ভিত্তি; কিন্তু মশা চিরকাল থাকবে ওঁর উপরে যদি মশা মারবার ভার দিই। শক্তি যদি দেশের মধ্যে জাগে, গ্রামের লোক যদি বলে—'আমরা কারও দিকে তাকাব না। যে-কোনো পুণ্যলোভী উপকার করবে তাকে অবজ্ঞা করব, ভিক্ষা করব তবু তেমন লোকের উপকার চাইব না। কলিকাতা থেকে যারা আসবে তাদের বলব তোমরা আমাদের ভারি সুহৃদ নাম করতে এসেছ, কাগজে বড়ো বড়ো রিপোর্ট লিখবে, তাই দেখে সকলে বাহবা দিবে। কোনোদিন তো দেখি নি তোমরা আমাদের উপকার করেছ। বরাবর জানি ভদ্রলোক সুদ নেয়, ভদ্রলোক ওকালতি করে, সর্বনাশ করে—জমিদার আছে, তারাও ভদ্রলোক, বরাবর রক্ত শোষণ করছে—গোমস্তা পাইক রয়েছে, তারা উৎপীড়ন করছে—এই তো ভদ্রলোকের পরিচয়। হঠাৎ আজ উপকার করতে এলে কেন।' যদি এ কথা বলে তবে খুশি হই, সে কথা বলতে হবে।

আমাদের বিশ্বভারতীর একটা ব্যবস্থা আছে—তার চারি দিকে যে-সমস্ত পল্লী আছে সেগুলিকে আমরা নীরোগ করবার জন্য কিছু চেষ্টা করেছি। এটুকু তাদের বুঝিয়েছি যে, 'ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছি সে আমাদের অপরাধ নয়, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের মিল আছে।' সে কথা তারা বিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে গিয়ে যা দেখেছি তাতে আমাদের চৈতন্য হয়েছে। আমরা যে সমস্ত বড়ো বিল্ডিং করতে চেষ্টা করছি, পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক জয়স্তম্ভ করবার চেষ্টা করছি, মাল-মসল্লার চেষ্টা করছি—কিসের উপর। বালির উপর—প্রাণ নাই, জীর্ণ জরাজীর্ণ অস্থিমজ্জায় দুর্বলতা প্রবেশ করেছে; নৈতিক নয়, বাস্তবিক, শারীরিক, কিন্তু সে মানসিক শক্তিকে নষ্ট করে। এক-আধজন এই বহুব্যাপী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতাকে দূর করতে চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু বাংলা এখনো রোগ-তাপ-দুঃখে ক্লিষ্ট, জয়স্তম্ভ থাকবে না, কাত হয়ে পড়ে যাবে, একে রক্ষা করতে পারবে না, ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে নইলে টিঁকবে না। দুর্বলতা এক রূপে না এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করবে। দুর্বলতার একটা কুশ্রী আকার আছে। সে হচ্ছে, আর-একজন গিয়ে সফলতা লাভ করবে, বড়ো কাজ করবে, এতে দুর্বলের মনে ঈর্ষ্যা হয়—কী করে তাকে ছোটো করা যায় প্রাণপণে সে চেষ্টা করে। আমি কারও দোষ দিই না। পিলে যকৃৎ ভিতরে বড়ো হলে হৃদয় বড়ো হতে পারে না। পিলে বড়ো হয়েছে, যকৃৎ বড়ো হয়েছে, অন্তরে তারা জায়গা করেছে, হৃদয়ের জায়গা ছোটো, এইজন্য বরাবর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে সকলের চেয়ে বড়ো কর্মী নিজে, আর কেহ নয়। মনে শান্তি নাই, তার কারণ ভিতরকার ঈর্ষ্যা। যে নিজে কিছু করতে পারছে না তার ভিতরে মাৎসর্য ফুটে ওঠে। আমি পারছি না, অমুক পারছে, চেষ্টা করছে, তখন 'ওর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি' এ কথা বললে অন্তঃকরণ শান্ত হয়—সুস্থ হয়। আমাদের দেশে এমন কর্মী কেহ নাই যার সম্বন্ধে আমরা এইরকম ভাব কোনো-না-কোনো আকারে মনে পোষণ না করে থাকি, তার কীর্তি কিছু-না-কিছু খর্ব না করতে চাই। এর কারণ সেই ম্যালেরিয়ার ভিতরে—দেহের শক্তি মনের শক্তিকে নষ্ট করেছে। তা হলে আপনারা বলতে পারেন, 'আগে দেহে শক্তি সঞ্চয় করুন।' তা নয়, মানুষকে ভাগ করা যায় না; দেহ মন আত্মায় সে এক, আগে এইটে পরে ঐটে বলা চলে না। মনে জোর দিলে দেহে জোর পাই, দেহে জোর দিলে মনে জোর পাই, আবার দেহমনে জোর দিলে ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—দেহ মন আত্মা একসঙ্গে গাঁথা। যে মন্ত্রে দেহের রোগ দূর হবে সে মন্ত্রে মনের যে দীনতা পরনির্ভরতা তাও দূর হবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এই-যে রেলওয়ে হয়েছে, ফলে জল-নিকাশের পথ বন্ধ হয়েছে—মস্ত মস্ত কারবারী লোক, তারা কিভাবে আমাদের দিকে তাকায়, কী দুঃখ আমরা ভোগ করছি তারা কি সেটা বোঝে। বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, তারা লাভের উপর লাভ করে যাচ্ছে, গলা পর্যন্ত যারা লাভ করেছে তাদের পরিত্রাণের আশা নাই। তারা এই-সমস্ত রেলওয়ে লাইন খুলছে। আমরা কে। আমরা 'থামো থামো' বললেই কি রেলওয়ে থামবে। না ক্রমাগত বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে? মস্ত মস্ত কারবারী তারা এই-সমস্ত করছে, আমরা কেঁদে কী করব। তবে কী হবে। সমস্ত গ্রামের লোক যদি বোঝে আমরা কেউ কিছু নয়, এটা নয়; যখন তারা বুঝবে এই

কো-অপারেটিভ সোসাইটি একটা মস্ত বড়ো জিনিস—ইচ্ছা করলে সকলে মিলে মিশে মরতে পারে, তখন তারা সকলে মিলে এই দুর্গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সকলে কণ্ঠ তুলে বলতে পারে, ‘ভাঙব তোমার রেলওয়ে লাইন। আমরা মরব আর তোমরা লাভ করবে?’ এখন বলতে পারবে না। (আপনারা করতালি দেবেন না।) এর জন্যে অনেক ভিত্তি গাড়তে হবে, অনেক দূর গভীর করে—এটা সকলের চেয়ে বড়ো কাজ। আমি অনেকবার বলেছি—কবি বলে আমার কথা শোনে নাই—আমি বলেছি সমাজের ভিতর থেকে সমাজের শক্তিকে জাগাতে হবে, পরস্পর সকলের সমবেত চেষ্টা-দ্বারা শক্তি লাভ করবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টাও করেছি, পল্লী-সমিতি বলে সমিতি গড়ে তুলেছি, এ বিষয়ে আমার মাথা ততটা খেলাতে পারি নাই। আজ দেখে আনন্দ হয়েছে--এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন্ জায়গায় আমাদের গলদ। গগনস্পর্শী পার্লিয়ামেন্ট্ হলে হবে না। আমাদের অভাব এখানে নয়। আমাদের অভাব ভিতরে—যার উপর গড়তে পারব। একবার মুষ্টিমেয় কলেজে-পড়া উপাধিধারী কয়েকজন ভেবেছিল, ‘আমাদের চেষ্টার উপর, উদ্যমের উপর দাঁড় করাতে পারব।’ মরে গিয়েছে—সমস্ত দেশ ক্রমে ক্রমে জীবন্মৃত হয়েছে তা নয়—যথার্থ মরেছে। সেদিন আমাদের একদল লোক চিত্রকলা অভ্যাস করতে গ্রামের চিত্রকলা দেখতে গিয়েছিল। তারা এসে বললে, ‘আমাদের আর অন্নে রুচি হয় না; দেখলাম একেবারে উজাড় হয়েছে—একটা গ্রামে, বড়ো গ্রামে, বড়ো বড়ো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চার ঘর কায়স্থ রয়েছে। এখনো বেঁচে আছে কী করে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমরা বৎসরের মধ্যে দুবার আসানসোল কি বর্ধমানে গিয়ে সম্‌বৎসরের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। যে কয়দিন বেঁচে আছি এমনি ভাবে যাবে, যখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসবে যাব। এক জায়গায় দেখলাম—সমস্ত বড়ো বাড়ি। যারা ৫০।১০০ বৎসর পূর্বে বর্ধিষ্ণু লোক ছিল এখন সেখানে তাদের রথ পড়ে আছে, দেবতা অচল।’ এইটা শুনাব না মনে করেছিলাম। আপনাদের মধ্যে অনেকে ধর্মপ্রাণ আছেন, তাঁরা বলবেন, ‘আমরা গিয়ে দেবতার রথ চালাব।’ আমি বলি সে চলবে না, দেবতা তোমাদের হাতের টানে চলবে না, দেবতা তার নিজের শক্তির রথে চলবে, গ্রামের লোকের নিজের শক্তির রথে চলবে, সে রথ বাঁশ কেটে করতে হবে তা নয়, সে পিতলের রথ—আশ্চর্য কারুকার্য—মোটা মোটা বাঁশ দিয়ে তা চালালে চলবে না, ঠাকুর তাতে চলে না, ঠাকুর চান আমাদের হৃদয়ের সেবা দিয়ে তাঁর রথ তৈয়ারি হোক—তাঁর রূপের অন্ত নাই। তাঁকে মেরে ফেলে মুমূর্ষুর গঙ্গাযাত্রার মতো তাঁকে কি টেনে নিয়ে যেতে হবে। তা তো নয়। কোথায় প্রাণ, যে প্রাণপ্রাচুর্যের ভিতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, যে সৃষ্টি সম্পদে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকে বিকশিত হয়, বসন্তের মতো নূতন প্রাণ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যেখানে, দেবতা সেখানে চলেন। নইলে তাঁর ভাঙা রথ যত জোরেই টান দেবতা চলবেন না। বাংলার সর্বত্র দেবতার ভাঙা রথ পড়ে আছে, দেবতা যদি চলত আমাদের এ দশা হত না, আমরা এমন করে মৃতকল্প হয়ে পড়ে থাকতুম না, এমন করে ঘরের আলো নিভে যেত না। এত দুর্গতি কেন। আমাদের রথ আমরা তৈয়ার করি নাই। যা ছিল তারও চাকা ভেঙে গেছে। এমন কেহ নাই তাকে ব্যবহারে চালাতে পারে। ছোটোখাটো একটা-কিছু তৈয়ারি ক’রে উপস্থিতমত চালিয়ে দেওয়া, বিষয়ী লোকের কথা। ছোটোখাটো লাভের কথায় হানি আছে। সর্বকালের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হবে, বড়োকে ভূমাকে লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তবে তাকে পাব, তবে তিনি তৃপ্ত হবেন, প্রসন্ন হবেন। তিনি প্রসন্ন হলে সকল তাপ দূর হয়ে যাবে। সেইজন্য সকলের চেয়ে বড়ো কাজ—ওঁরা যা করেছেন—উদ্‌বোধন, পল্লীর শক্তির উদ্‌বোধন। এরা একদিন দাঁড়িয়ে বলবে, ‘কাউকে মানব না, যেখানে অন্যায় পাপ দুঃখ শোক সেখানে তাকে তাড়া করে যাব।’ আজকে মশা থেকে আরম্ভ হয়েছে, এ কাজে আমাদের রায়বাহাদুর লেগেছেন। আমি ইন্‌জেক্‌শন করতে জানি না, কী পরিমাণ কুইনাইন দিতে হয় জানি না, কিন্তু এটা জানি এবং এইজন্য বহুকাল অরণ্যে রোদন করেছি—কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে তা হয় না, তাতে ভগবান প্রসন্ন হন না, সে পথ আপনার ঘরের ভিতরকার হলেও যখনই তাতে নির্ভর

করেছ, তখনি দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছ, কেননা তিনি অন্তরের ভিতর আছেন, আমার অন্তরের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি তাকে জাগাতে হবে, তিনি জাগলে সব দূর হয়ে যাবে, সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। কেউ কবি হতে পারে, কেউ ডাক্তার হতে পারে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে— যার যেরকম শক্তি, যার যেরকম শিক্ষা, সকলরকম চিত্তবৃত্তির সকলরকম শক্তির দরকার আছে। অনন্ত শক্তির উৎস যিনি তাঁর বহুধা শক্তি-দ্বারা তিনি বিশ্বকে পালন করেন। কেবল ইকনমিক্‌স্‌ নয়, কেবল পলিটিক্‌স্‌ নয়— বহুধা শক্তি, সে বৃহৎ শক্তিকে যদি আমাদের সমাজের ভিতর, নিজের ভিতর স্বীকার কর তা হলে অনন্ত শক্তির উদ্‌বোধন হবে— একটা ছোটো কাজ ক'রে, একটা কথা ব'লে কিছু হবে না। আমাদের সৌন্দর্যবোধ থেকে আরম্ভ হয়ে, কী করে অন্ন অর্জন করতে হয়, কী করে চাষ করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়, সব বিষয়ে দেশের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জাগাতে হবে। কবিকে যখন সভাপতির আসনে বসিয়েছেন তখন আমি বলব এবং এটা বলবার কথা— বসন্তকালের বাঁশি এই-যে সে শুধু একটা ফুলকে জাগিয়ে দেয় না, একটা গাছের পাতাকে ফোটায় না, দখিন-হাওয়ায় পাখিরা জেগে ওঠে, লতাপাতা ফোটে, গাছের ফল ফুল সমস্ত আনন্দ-উৎসবে শক্তির উৎসবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। সেই বসন্তের বাণীকে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

প্রতিভাষণ

ময়মনসিংহে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে

মহারাজ, ময়মনসিংহের পুরবাসীগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে আপনাদের প্রীতিসুধা সম্ভোগ করছি।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলুম— তুমি কেন আজকের দিনে পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্যে এসেছ, কোন্‌ সাহসে তুমি বের হয়েছ। কী করতে পার তুমি তোমার হীনশক্তিতে। এ প্রশ্নের আমার একটা খুবই সহজ উত্তর আছে। তা এই যে, আমি কোনো কাজের দাবি রাখি নে। যদি আমি কোনোদিন আনন্দ দিয়ে থাকি আমার সাহিত্য আমার কাব্যের মধ্য দিয়ে, তবে তারই প্রতিদান-স্বরূপ আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য সংগ্রহ করে যেতে পারি। বাংলাদেশ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করবার পূর্বে এটুকু পুরস্কার যদি নিয়ে যেতে পারি তো সেই আমার সার্থকতা। আমি কোনো কর্ম করেছি কি না এ কথার দরকার নেই। আপনাদের এ আতিথ্যের বরমাল্যই আমার যথেষ্ট। এ খুব সহজ উত্তর, কিন্তু এ উত্তর সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর-এক দিন এসেছিল যেদিন সমস্ত বাংলাদেশে মানবের চিত্ত উদ্‌বোধিত হয়েছিল। সেদিন আমিও তার মধ্যে ছিলুম— শুধু কবিরূপে নয়— আমি গান রচনা করেছিলুম, কাব্য রচনা করেছিলুম, বাংলাদেশে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সাহিত্যে তারই রূপ প্রকাশ করে দেশকে কিছু দিয়েছিলুম। কিন্তু কেবলমাত্র সেইটুকুই আমার কাজ নয়। একটি কথা সেদিন আমি অনুভব করেছিলুম, দেশের কাছে তা বলেও'ছিলাম— সে কথাটি এই যে, যখন সমস্ত দেশের হৃদয় উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে তখন কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগের দ্বারা সেই মহামুহূর্তগুলি সমাপ্ত করে দেওয়ার মতো অপব্যয় আর কিছু নেই। যখন বর্ষা নাবে তখন কেবলমাত্র বর্ষণের স্নিগ্ধ আনন্দসম্ভোগই যথেষ্ট নয়, সে বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে— বৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে। সেদিন আমি এ কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম— আপনাদের মধ্যে অনেকের তা মনে থাকতে পারে অথবা বিস্মৃতও হয়ে থাকতে পারেন— 'কাজের সময় এসেছে, ভাবাবেগে চিত্ত অনুকূল হয়েছে। এখনি কর্ম করবার উপযুক্ত সময়। কেবলমাত্র

ভাবাবেগ স্থায়ী হতে পারে না। ক্ষণকালের যে ভাবাবেগ তা দেশের সকলের চিত্তকে, সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের শক্তি ব্যাপ্ত হলে পরই কর্মের সূত্র-দ্বারা যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হয়। কর্মের দিন এসেছে।' এই কথা আমি বলেছিলুম সেদিন। কিরূপ কর্ম। বাংলার পল্লী-সব আজ নিরন্ন, নিরানন্দ, তাদের স্বাস্থ্য দূর হয়ে গেছে—আমাদের তপস্যা করতে হবে সেই পল্লীতে নতুন প্রাণ আনবার জন্যে, সেই কাজে আমাদের ব্রতী হতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করেছিলুম, শুধু কাব্যে ভাব প্রকাশ করি নি। কিন্তু দেশ সে কথা স্বীকার করে নেয় নি সেদিন। আমি যে তখন কেবলমাত্র ভাবুকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম এ কথা সত্য নয়। তারও আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগেই, আমি পল্লীর কর্মের কথা বলেছিলুম—যে পল্লী বাংলাদেশের প্রাণনিকেতন সেইখানেই রয়েছে কর্মের যথার্থ ক্ষেত্র, সেইখানেই কর্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই কাজের কথা একদিন আমি বলেছিলুম, নিজে তার কিছু সূত্রপাতও করেছিলুম। যখন বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়া বইতে আরম্ভ করে তখন কেবলমাত্র পাখির গানই যথেষ্ট নয়। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ তখন নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎসর্গ করে দেয়। সেই বিচিত্র প্রকাশেই বসন্তের উৎসব পরিপূর্ণ হয়—সেই শক্তি-অভিব্যক্তির দ্বারাই সমস্ত অরণ্য একটি আনন্দের ঐক্য লাভ করে, পূর্ণতায় ঐক্য সাধিত হয়। পাতা যখন ঝরে যায়, বৃক্ষ যখন আধমরা হয়ে পড়ে তখন প্রত্যেক গাছ আপন দীনতায় স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তখন নব পুষ্প নব কিশলয়ের বিকাশে উৎসবের মধ্যে সব এক হয়ে যায়। আমাদের জাতীয় ঐক্যসাধনেরও সেই উপায়, সেই একমাত্র পন্থা। যদি আনন্দের দক্ষিণ-হাওয়া সকলের অন্তরের মধ্যে এক বাণী উদ্‌বোধিত করে তা হলেও যতক্ষণ সেই উদ্‌বোধনের বাণী আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত না করে ততক্ষণ উৎসব পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে এই-যে উৎসবের কথা বললুম তা কর্মের উৎসব। আমগাছ যে আপনার মঞ্জরী বিকশিত করে তা তার সমস্ত মজ্জা থেকে, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে। কর্মের এই চাঞ্চল্য বসন্তকালে পূর্ণ হয়। মাধবীলতায়ও এই কর্মশক্তির পূর্ণরূপ দেখতে পাই। বসন্তকালে সমস্ত অরণ্য এক হয়ে যায় বিচিত্র সৌন্দর্যের তানে, আনন্দের সংগীতে। তেমনি আমরা দেখতে পাই সব বড়ো বড়ো দেশে তাদের যে ঐক্য তা বাইরের ঐক্য নয়, ভাবের ঐক্য নয়—বিচিত্র কর্মের মধ্যে তাদের ঐক্য। জাতির সকলকে বলদান, ধনদান, জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান—এই বিচিত্র কর্মচেষ্টার সমন্বয় হয়েছে যেখানে সেইখানেই যথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কবির গানে নয়, সাহিত্যের রসে নয়—কর্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তখনি সমস্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তৃতার মিথ্যা উত্তেজনায় শুধু বাক্যে শুধু মুখে 'ভাই' বললে ঐক্য স্থাপিত হয় না। ঐক্য কর্মের মধ্যে। এই কথাই আমি বলেছিলুম, যখন মনে হয়েছিল যে, সময় এসেছে। সময় এসেছিল, সে শুভ সময় চলে গিয়েছে। তখন আমার যৌবন ছিল; সব বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়েই আমি এ কথা বলেছিলুম, কেউ গ্রহণ করলে বা না-করলে তা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

আবার দিন এসেছে—দেশের লোকের চিত্তে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অনুকূল অবসর এসেছে—এমন সময়ে বয়সের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে কী করে চুপ করে বসে থাকি। আবার স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে যে, যদি মনের মধ্যে যথার্থই আনন্দ উপলব্ধি করে থাক তবে কেবলমাত্র বাক্যবিন্যাসের দ্বারা ভাবরসসম্ভোগে তা অপব্যয় কোরো না। যে অনুকূল সময় এসেছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার দ্বার থেকে, সকলে মিলে সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হও। সম্মিলিত দেশের সৃষ্টির মধ্যেই দেশের আত্মা তার গৌরবের স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিধাতা বিশ্বকর্মা আপনার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কোথায়। তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে। তেমনি দেশের আত্মার স্থানও দেশের যত সৃষ্টির কাজের মধ্যে, ভাবসম্ভোগে নয়। সেই বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি কি জেগেছে আজ আমাদের মধ্যে—যে শক্তিতে দেশের অন্নদৈন্য, স্বাস্থ্যের দৈন্য, জ্ঞানের দৈন্য, সব ঘুচে যাবে? বসন্তকালের অরণ্যে

যেমন তরুলতা সব ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি কর্মের বিকাশে সমস্ত দেশে একটি বিচিত্র রূপ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সেই লক্ষণ কি দেখতে পাই আমরা। আমি তো সায় পাই নে অন্তরে। ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মের প্রবর্তনা অতি অল্প। কিছু কাজ যে হয় নি তা বলছি নে, কিন্তু সে বড়ো অল্প। আবার সেজন্যে পুরোনো কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আমার সময় গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, আর অধিক দিন বাকি নেই আমার। তথাপি আমি বেরিয়েছি— পুরস্কারের জন্যে নয়, বরমাল্য নেবার জন্যে নয়, করতালিলাভের জন্যে নয়, সম্মানের ট্যাক্স আদায় করবার জন্যে নয়— দেশকে আপনারা জানতে চাচ্ছেন কর্মদ্বারা, এইটুকু দেখে যাব আমি। জীবনের অবসানকালে আমি দেখে যেতে চাই যে, সর্বত্র কর্মশক্তি উদ্যত হয়েছে। তা যদি না দেখতে পাই তবে জানব যে, আমাদের যে ভাবাবেগ তা সত্য নয়। যেখানে চিত্তের সত্য-উদ্‌বোধন হয় সেখানে সত্যকর্ম আপনি প্রকাশ পায়। দেশের মধ্যে কর্ম না দেখে আমাদের চিত্ত বিষণ্ণ হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই। খর্বাকৃতি কাঁটাগাছ, মনসাগাছ দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে; তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, আছে বিরুদ্ধ রূপ আর চিত্তের দৈন্য। মরুভূমিতে প্রাণশক্তি কর্মচেষ্টাকে বড়ো করে তুলতে পারে নি, সমস্ত উদ্ভিদ সেখানে দৈন্যে কণ্টকিত। এখনো কি তাই দেখব আমাদের মধ্যে বসন্তের দক্ষিণসমীরণ কি বইল না। মরুভূমির যে প্রাণের দৈন্য বিরোধে বিদ্বেষে ভেদে বিভেদে সব কণ্টকিত, তাই দেখব এখনো? তা হলে যে সব ব্যর্থ হবে, মরুভূমিতে বারিসেচন যেমন ব্যর্থ হয়। নেব আমরা এই শুভদিনকে, কেবল হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়— কর্মের মধ্যে চার দিকে তাকে বেঁধে নেব, কখনো যেতে দেব না— এই আমাদের পণ হোক। আমার কাজের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, কিন্তু অল্প কাজের মধ্যে সফলতার যে লক্ষণ দেখেছি, তাতে যে আনন্দ পেয়েছি, সেই আনন্দ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে চাই। পূর্বকালে এমন একদিন ছিল যখন আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রাণের প্রাচুর্য পূর্ণরূপে ছিল। গ্রামে গ্রামে জলাশয়-খনন, অতিথিশালা-স্থাপন, নানা উৎসবের আনন্দ, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা— এ-সবই ছিল। সেই ছিল প্রাণের লক্ষণ। আজকের দিনে কেন জল দূষিত হয়ে গেছে, শুষ্ক হয়ে গেছে। কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে। কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদীস্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। তেমনি এক সময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায় প্রবাহিত হত আজ তা নির্জীব হয়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফলছে না। দেশবিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে। চার দিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখছি। যদি সেদিন না ফেরাতে পারি, তবে শহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে। যখন কোনো রোগীর গায়ে ব্যথা, ফোড়া প্রভৃতি নানা রকমের লক্ষণ দেখা যায় তখন রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণকে একে একে দূর করা যায় না। দেহের সমস্ত রক্ত দূষিত হলেই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে যদি বিরোধ ভেদ বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগলক্ষণ দেখা দেয় তবে তাদের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে দূর করা যায় না। দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে স্বাস্থ্যসঞ্চার করতে হবে, তবেই সমস্ত সমাজদেহের বিরোধ বিদ্বেষ দৈন্য দুর্গতি সব দূর হয়ে যাবে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে আমি আজকে এসেছি। অনুকূল সময় এসেছে, বসন্তসমীরণ বইতে আরম্ভ হয়েছে— আমি অনুভব করছি যে, মনে করিয়ে দেবার দিন এসেছে। দ্বিতীয় বার যেন এ সময় আমরা নষ্ট না করি, যথার্থ কর্মে যেন আমরা ব্রতী হই। দারিদ্র্যের মাঝখানে, অপমানের মাঝখানে, দেশের তৃষ্ণার মাঝখানে, প্রত্যক্ষভাবে সকলে মিলে কাজ করতে হবে। এর বেশি কিছু বলতে চাই নে আজ। কালকে হয়তো আপনারা এ কথা ভুলেও যেতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে আমি খুব ভালো করে বলেছি। এইটুকুই যদি আমার পুরস্কার

হয় তবে আমি বঞ্চিত হলাম। আমি আজ যা বলছি তা আমার প্রাণ দিয়ে, আয়ুক্ষয় ক'রে। আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাসে। এর পরিবর্তে আমি চাই সত্যিকার কর্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্যে যারা ব্রতী তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য-রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন। আমার স্বল্পাবশিষ্ট নিশ্বাস ব্যয় করে এ কথা বলছি— আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতিলাভের জন্যে কিছু বলছি না— দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে। এই ব'লে আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

বাংলাদেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের খেত দিয়েছে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরছি— কার কাছে। সেই খেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর-কোনো উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন। এ দেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চির দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহুবিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জনসংখ্যা মাথা গ'ণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য থাকে না। প্রভুমুখপ্রত্যাশী জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারি নে। বড়োকে ছোটো করতে চাই। একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে-সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায় সেইগুলিই প্রবল হয়। গড়ে তোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালিকে কেবলই কোণ-ঠ্যাসা করছে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ— যারা সংঘবন্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলই তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলই খাটাচ্ছি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালি শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না। ছিল সে যন্ত্রজীবী। মাড়াইকল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরও বড়ো যন্ত্রের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার করে। সেই

অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাষ করে মরছি—মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসল।

তখন থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম-চালনায়। ঐ একটিমাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে, আপিসের বড়োবাবু হবার রাস্তায়। সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর-কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে; তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।'

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুপ্ত ভান্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিঁকতে পারব।

এ কথা মানি—যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই শামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেই-সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারে নি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সবচেয়ে তার বাধা ঘটছে কোন্‌খানে। যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্য-কালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মতো অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মতো আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্মী আনাতে হচ্ছে যন্ত্রদক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত দুটো এবং তার মন না চলে দ্রুতগতিতে, না চলে নিপুণভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলাদেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গ-বিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে-কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে, সক্ষম হতে হবে—মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মতো কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গ-বিভাগের সময়েই বাংলাদেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড়ো ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয় নি; তাই সেগুলি চলছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থরগমনে। মন তৈরি করে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথমে যে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ করেছে সে হল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সবশেষে বাংলাদেশে এসে পৌঁছল। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে-খড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য জানেন কী করে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি—সে হল হাতিয়ারবিদ্যার পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল।

বোম্বাই প্রদেশে এ কথা বললে ক্ষতি হয় না যে, 'চরখা ধরো'। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটিমাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলাদেশে হাতের চরখাই

যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছি— তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানব যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয় তবে আর-কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত করে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

যাই হোক, বাংলাদেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল 'মোহিনী' মিল; একে একে আরও কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেছে।

এদের যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে— বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাব তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেইজন্য বাঙালির দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহরক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে তাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কিরকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আমাদের সামনে আনতে হবে। কলকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্নদ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালি যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

অবশেষে উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত কারখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করছে, তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলাদেশের তাঁতিদের কেন নির্মম হয়ে মারি। বাঙালি দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতি সুতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব করে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তা হলে কী প্রমাণ হবে। তা ছাড়া কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ যে যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র। সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলাদেশের বহু যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরিবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি জোর করেই বলব, পুজোর বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতি যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।

অবশ্য, সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তা হলে মিলের কাপড় কিনতে হবে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলাদেশের বাইরে না যাই। যাঁরা শৌখিন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তাঁরা কেন যে তার চেয়ে অল্পদামে তেমনি শৌখিন শান্তিপুরি কাপড় না কেনেন তার যুক্তি খুঁজে পাই নে। একদিন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের

নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড়ো বজ্র হানলে। যে হাত তৈরি হতে কতকাল লেগেছে সেই হাতকে অপটু করতে বেশি দিন লাগে না। কিন্তু স্বদেশের এই বহুকালের অর্চিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে কি কারও ব্যথা লাগবে না। আমি পুনর্বার বলছি, কাপড়ের বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল যতটা, বিলিতি সুতো সত্ত্বেও তাঁতের কাপড়ে তার চেয়ে স্বল্পতর। আরও গুরুতর কথা এই যে, আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলা শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদনশক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাঁতিকে অনুনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিন্তু যদি না পৌঁছয়, তবে বাঙালি তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লৌহযন্ত্র ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

আশ্বিন ১৩৩৮

জলোৎসর্গ

ভুবনডাঙায় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কথিত

আজকের অনুষ্ঠানসূচীর শেষভাগে আছে আমার অভিভাষণ। কিন্তু যে বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হল তার পরে আমি আর কিছু বলা ভালো মনে করি না। সেগুলি এত সহজ, এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর যে, তার কাছে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল উৎসের মতো উৎসারিত।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন— যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত, মলিন, রুগ্‌ণ, উপবাসী। ঋষি বলেছেন— হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য করো। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য-দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।— জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃশ্য-লাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে। নিজের চারি দিককে অমলিন অন্নবান্ অনাময় করে রাখতে পারে না যে বর্বরতা, তা রাজারই হোক আর প্রজারই হোক, তার গ্লানিতে সমস্ত দেশ লাঞ্ছিত। অথচ একদিন দেশে জল ছিল প্রচুর, আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলায় কবরস্থ মৃত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে, আর তাদেরই প্রেত মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ দেশের সঙ্গে আপন প্রাণাত্মবোধের পরিচয় আজও ভালো করে দিল না। অন্য সকল লজ্জার চেয়ে এই লজ্জার কারণকেই এখানে আমরা সব চেয়ে দুঃখকর বলে এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণান্তিক বেদনা সম্বন্ধে দেশের চেতনার উদ্রেক হয়েছে। ধরণীর যে অন্তঃপুরগত সম্পদ, যাতে জীবজন্তুর আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনার গোড়ায়, এই সহজ কথাটি স্বীকার করবার শুভদিন বোধ হচ্ছে আজ অনেক কাল পরে এসেছে।

যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে— তাই মন্ত্রে আছে: আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরের পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত

থেকে মধ্যাহ্নরৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ দান!

অথচ বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার-অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য-অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদের জল দান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।

সেই ভুবনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পূর্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্তি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্যে নিঃসন্দেহ তাঁর কাছে যেতুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তিসমবায়ের দ্বারা এই-যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরও বেশি। এইরকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এখানে ক্রমে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চার দিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমূর্তি ধারণ করেছিল। আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। বন্ধুরা অনেকে অক্লান্ত যত্নে নানাভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শক্তির অনুপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক খর্ব করতে হয়েছে। আয়তন এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোখ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরূপ গ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হল।

এই জলপ্রসার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আভায় রঞ্জিত হয়ে নূতন যুগের হৃদয়কে আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিহৃদয় থেকে একে অভ্যর্থনা করছি। এই জল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত করে শস্যদান করুক। এর অজস্র দানে চার দিক স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

৭ ভাদ্র ১৩৪৩

সম্ভাষণ

শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য যে, আমি কী ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।

আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে

উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনি আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কী ভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর— যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে। পল্লীজীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি। সেবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে যখন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি হল তখন আমাকে তাঁরা তাঁদের গোলযোগের মীমাংসার জন্য সভাপতির পদে বরণ করেছিলেন। আমার অভিভাষণ শুনে দুই পক্ষই আমার খুবই প্রশংসা করে বললেন, আপনি ঠিক আমাদেরই পক্ষের কথা বলেছেন; আমি কিন্তু জানতাম, আমি কারুর কথাই বলি নি। আমার জীবনের মধ্যে পল্লীগ্রামের দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, বিচলিত করেছিল, আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।

আমার অন্তর্নিহিত গ্রামসংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত তখন দু ধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে। ভেবেছি এই-যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে। পারব না একে কখনো উত্তীর্ণ হতে? সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল; যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব। এ বিষয়ে কোনো

অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, করুণা করেন নি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্যের ভিতর। আবার মনে হল মহর্ষির সাধনস্থল শান্তিনিকেতনে যদি ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়তো হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন—মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও—এদের যদি খুশি করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিচিত্ত এই নূতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ-সাতটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না, কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেছি, নানা গল্প ও কাহিনী রচনা করে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি, তাদের চিত্তকে সরস করবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার যা-কিছু সামান্য সম্বল ছিল তাই নিয়ে এ কাজে নেমে পড়েছিলাম। তখন এমন কথা মনেও আসে নি যে, কত বড়ো দুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বর যখন কাকেও কোনো কাজের ভার দেন তখন তাকে ছলনাই করেন, বুঝতে দেন না যে পরে কোথায় কোন্ পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবতাও আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে ক্রমশ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন দুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন যে, আর সেখান থেকে ভীরুর মতো ফেরবার সম্ভাবনা রইল না। এখন আমাকে এই বিরাট এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোনো উপায় নেই আর তাকে অস্বীকার করবার।...

আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন; আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাড়ানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই—আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনো আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না—এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্রনারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি গদ্যে পদ্যে ছন্দে অনেক-কিছু লিখেছি, তার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি নে, বুঝি নে, পল্লী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানি নে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। তার পর এ কাজ একার নয়। এই কর্ম বহু লোককে নিয়ে। বহু লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্য-রচনা একলার জিনিস, সমালোচনা তার দূর হতেও চলে। কিন্তু এই-যে ব্রত, এই-যে কর্মের অনুষ্ঠান, যা আমি গড়ে তুলছি, যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি—তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে

এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনি দেখতে পাবেন।

এই-যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি, এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়।... আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাব্য-আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়। তাই এখানে আজ বার বার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন—তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩

অভিভাষণ

বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত

পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না, তেমনি বাধাও দেয় না। বকশিশ যখন জোটে নি বকশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন-মনে। সে যুগে যশের হাটে দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্বল্প। আজকের দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা আমার পক্ষে ছিল ভালো, কলমের উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ। পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর পথ দেখাতে পারে না—অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে—সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পৌঁছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অন্তত আমাদের ঘরে পৌঁছয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে। আমার মরাইয়ে আজ যা-কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অংকুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলায় চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন-মনে। অংকুরিত না হলে সে বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের খেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাই নি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

একসময়ে অঙ্কুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে।

সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে-ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে, স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে। পুব দিকে বটগাছ, ছায়া পড়েছে তার পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যাস্তের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সেই সময় অকস্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিলুম ডেঙ্গুজ্বরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের স্নিগ্ধ শ্যামল আতিথ্য আমায় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া; ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নৌকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যে-সব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়। পুকুরে আসত-যেত যারা সেই-সব পল্লীবাসী-পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে একরকমের চেনাশোনা হল— নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে— ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, ‘উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চাম্‌চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।’ আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারি দিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস; সেখানকার মানুষ যারা— সাঁওতাল— সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন— অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না— ‘ঐ কবি আসছেন’ ‘ঐ রবিঠাকুর আসছেন’ ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা, তাদের সঙ্গে একান্ত হৃদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে— সম্ভব ছিল তখন। ভয় করে নি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের চেহারা এর। পল্লীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম। এ দেশের এক নূতন দৃশ্য— শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে, অন্যসময় থাকে

শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এড়িয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা, কী করে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ থেকে। যেন উপলক্ষটা কিছুই নয়, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উপায়। কিন্তু এই উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন; তীর্থ সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম্‌-টেব্‌ল্‌ নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। শীর্ষদেশে হিমালয়, পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর—এ-সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্ল্যাক্‌বোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম, কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬

শিরোনাম-সূচী

শিরোনাম। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

অত্যুক্তি। ভারতবর্ষ ১৬১
অপমানের প্রতিকার। রাজা প্রজা ২০৭
অপর পক্ষের কথা। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩২২
অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি ৯০
অভিভাষণ। পল্লীপ্রকৃতি ৭৮৪
অভিভাষণ। পল্লীপ্রকৃতি ৭৯৫
অভিভাষণ। পল্লীপ্রকৃতি ৮১৫
অযোগ্য ভক্তি। সমাজ ৪১৪
অরণ্যদেবতা। পল্লীপ্রকৃতি ৭৮৩

আচারের অত্যাচার। সমাজ ৩৮৫
আত্মপরিচয়। পরিচয় ৫০৯
আদিম আর্য-নিবাস। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৬৯
আদিম সম্বল। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৭১
আল্‌ট্রা কনসারভেটিভ। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩২৫
আলোচনা (নকলের নাকাল সম্বন্ধে)। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৮৫
আষাঢ়। পরিচয় ৫৬১
আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৬২

ইংরাজের আতঙ্ক। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ২৯২
ইংরেজ ও ভারতবাসী। রাজা প্রজা ১৮৭
ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌। রাজা প্রজা ২২০

উপেক্ষিতা পল্লী। পল্লীপ্রকৃতি ৭৮০

কণ্ঠরোধ। রাজা প্রজা ২১৬
কর্তব্যনীতি। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৭৩
কর্মযজ্ঞ। কালান্তর, সংযোজন ৬৮১
কর্মের উমেদার। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৬৬
কালান্তর। কালান্তর ৫৮৭
কৃপণতা। পরিচয় ৫৫৭

শিরোনাম। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

কোট বা চাপকান। সমাজ ৩৯৬

ঘুষাঘুষি। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৩৭

চরকা। কালান্তর, সংযোজন ৬৯০
চীনেম্যানের চিঠি। ভারতবর্ষ ১৩৭

ছবির অঙ্গ। পরিচয় ৫৪৯
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। আত্মশক্তি ৭৬
ছোটো ও বড়ো। কালান্তর ৬০৬

জলোৎসর্গ। পল্লীপ্রকৃতি ৮১১

দেশনায়ক। সমূহ ২৫৯
দেশহিত। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৫৯
দেশীয় রাজ্য। আত্মশক্তি ১০৬
দেশের কথা। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৪৬
দেশের কাজ। পল্লীপ্রকৃতি ৭৭৭

ধম্মপদং। ভারতবর্ষ ১৭৪
ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত। স্বদেশ ৩৭৮

নকলের নাকাল। সমাজ ৪০০
নববর্ষ। ভারতবর্ষ ১১৫
নবযুগ। কালান্তর, সংযোজন ৭২৬
নারী। কালান্তর ৬৭৩
নূতন ও পুরাতন। স্বদেশ ৩৬৫
নেশন কী। আত্মশক্তি ৩৭

পথ ও পাথেয়। রাজা প্রজা ২২৯
পল্লীপ্রকৃতি। পল্লীপ্রকৃতি ৭৭২
পল্লীসেবা। পল্লীপ্রকৃতি ৭৯৩
পল্লীর উন্নতি। পল্লীপ্রকৃতি ৭৬৩
পূর্ব ও পশ্চিম। সমাজ ৪২০

শিরোনাম। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

প্রচলিত দণ্ডনীতি। কালান্তর, সংযোজন ৭২৯
প্রতিভাষণ। পল্লীপ্রকৃতি ৮০৫
প্রসঙ্গ-কথা ১-৫। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা। ভারতবর্ষ ১৪৬
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। সমাজ ৪০৪
প্রাচ্য সমাজ। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৬০

বঙ্গবিভাগ। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৪২
বহুরাজকতা। রাজা প্রজা ২২৮
বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত। পল্লীপ্রকৃতি ৮০৮
বাতায়নিকের পত্র। কালান্তর ৬১৯
বারোয়ারি-মঙ্গল। ভারতবর্ষ ১৫১
বিজয়া-সম্মেলন। ভারতবর্ষ ১৭৯
বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৭৭
বিবেচনা ও অবিবেচনা। কালান্তর ৫৯৩
বিরোধমূলক আদর্শ। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩২৮
বিলাসের ফাঁস। সমাজ ৩৯২
বৃহত্তর ভারত। কালান্তর ৬৬৭
ব্যাধি ও প্রতিকার। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৪৯
ব্যাধি ও প্রতিকার। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৮০
ব্রতধারণ। আত্মশক্তি ১০২
ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষ ১২৮

ভগিনী নিবেদিতা। পরিচয় ৫৩২
ভারতবর্ষীয় সমাজ। আত্মশক্তি ৪০
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা। পরিচয় ৪৯১
ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা। সমবায়নীতি ৭৪৯
ভারতবর্ষের ইতিহাস। ভারতবর্ষ ১২১
ভূমিলক্ষ্মী। পল্লীপ্রকৃতি ৭৬৮

মন্দির। ভারতবর্ষ ১৭১
মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩১৪
মুসলমান মহিলা। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৫৯
ম্যালেরিয়া। পল্লীপ্রকৃতি ৮০০

যজ্ঞভঙ্গ। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৫৭
য়ুনিভার্সিটি বিল। আত্মশক্তি ৮৬

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'। কালান্তর, সংযোজন ৭১৩
রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৫৫
রাজকুটুম্ব। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৩৩
রাজনীতির দ্বিধা। রাজা প্রজা ২০৩
রাজভক্তি। রাজা প্রজা ২২৩
রাজা ও প্রজা। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ২৯৫
রায়তের কথা। কালান্তর, সংযোজন ৭০৪
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ৩৩১

লড়াইয়ের মূল। কালান্তর ৬০৪
লোকহিত। কালান্তর ৫৯৮

শক্তিপূজা। কালান্তর ৬৩৫
শরৎ। পরিচয় ৫৬৬
শিক্ষার বাহন। পরিচয় ৫৩৯
শূদ্রধর্ম। কালান্তর ৬৬৩
শ্রীনিকেতন। পল্লীপ্রকৃতি ৭৭০
শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ। পল্লীপ্রকৃতি ৭৮৭

সত্যের আহ্বান। কালান্তর ৬৩৬
সদুপায়। সমূহ ২৮২
সফলতার সদুপায়। আত্মশক্তি ৬৪
সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা সম্মিলনী)। সমূহ ২৬৪
সমবায় ১। সমবায়নীতি ৭৪৩
সমবায় ২। সমবায়নীতি ৭৪৬
সমবায়নীতি। সমবায়নীতি ৭৫৩
সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ। পল্লীপ্রকৃতি ৭৯৭
সমস্যা। কালান্তর ৬৪৯
সমস্যা। রাজা প্রজা ২৪৪

শিরোনাম। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

সমাজভেদ। স্বদেশ ৩৭৪
সমাধান। কালান্তর ৬৬১
সমুদ্রযাত্রা। সমাজ ৩৮৮
সম্ভাষণ। পল্লীপ্রকৃতি ৮১২
সার লেপেল গ্রিফিন। রাজা প্রজা · সমূহ, পরিশিষ্ট ২৯১
সুবিচারের অধিকার। রাজা প্রজা ২১২
সোনার কাঠি। পরিচয় ৫৫৪
স্মৃতিরক্ষা। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৮৭
স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি ৪৩
'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। আত্মশক্তি ৬০
স্বরাজ সাধন। কালান্তর, সংযোজন ৬৯৮

শিরোনাম। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ। কালান্তর, সংযোজন ৬৮৪
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কালান্তর, সংযোজন ৭১০
হলকর্ষণ। পল্লীপ্রকৃতি ৭৯১
হিজলি ও চট্টগ্রাম ১-২। কালান্তর, সংযোজন ৭২৪
হিন্দু বিবাহ। সমাজ, পরিশিষ্ট ৪৩১
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচয় ৫২১
হিন্দুমুসলমান। কালান্তর ৬৭১
হিন্দুমুসলমান। কালান্তর, সংযোজন ৭১৮

Rabindra-Rachanavali, Trayodas Khanda, Prabandha:
Collected Works of Rabindranath Tagore (1861-1941),
Volume Thirteen, Essays, Government of West Bengal,
Calcutta, 1990
25 cm. × 16 cm.; pp. [8] + 820; 11 Illustrations